পৌষ সংক্রান্তির উপহারঃ

NET এর নতুন সিলেবাসের Unit-V এর ১৬ জন কথাসাহিত্যিকের মোট ৩২ টি গল্প একত্রিত করে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

গল্পকার	গল্প	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	- কুড়ানো মেয়ে	3
	- বিবাহের বিজ্ঞাপন	15
২) বনফুল	- শ্রীপতি সামন্ত	23
	- হৃদয়েশ্বর মুখুজ্জে	27
৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র	- মশা (ঘনাদা)	33
	- সংসার সীমান্তে	40
৪) পরশুরাম	- শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড	59
	- উল্টপুরাণ	75
৫) নরেন্দ্রনাথ মিত্র	- চোর	86
	- রস	96
৬) সুবোধ ঘোষ	- ফসিল	105
	- সুন্দরম	117
৭) কমল কুমার মজুমদার	- মতিলাল পাদরী	130
	- নিম অন্নপূর্ণা	148
৮) সমরেশ বসু	- স্বীকারোক্তি	166
	- শহীদের মা	187
৯) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	- সমুদ্র	203
	- গিরগিটি	229
১০) বিমল কর	- ইঁদুর	261
	- জননী	282

১১) মতি নন্দী - আত্মভূক ---------- 294
- শবাগার ---------- 303
১২) সন্তোষ কুমার ঘোষ - দ্বিজ ---------- 321
- কানাকড়ি ---------- 329
১৩) লীলা মজুমদার - পদিপিসীর বর্মীবাক্স ---------- 354
- পেশাবদল ---- ---------- 386
১৪) মহাশ্বেতা দেবী - দ্রৌপদী ---------- 397
- জাতুধান ---------- 408
১৫) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প ------- 425
- পাখি -------- ---------- (গল্পটি পাওয়া যায়নি)
- পাখির মা (সম্ভাব্য বিকল্প) ---------- 444
১৬) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - গোম্প ---------- 453
- বাদশা ---------- 469
- গোম্প(একটি আলোচনা) ---------- 483

*[সমস্ত গল্প অন্তর্জাল ও ফেসবুক থেকে সংগৃহীত। 486 পৃষ্ঠার এই বিপুলাকারের PDF ফাইলটির আয়তন মাত্র 43 MB. রাখতে গিয়ে দৃশ্যমানতার সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতে হয়েছে তারজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

** [**বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ** সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাখির মা' এবং মতি নন্দীর 'আত্মভূক' গল্পদুটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুপর্ণা রক্ষিত(FOCUS NET হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ)। ধন্যবাদ সকলকে।]

আপনাদের সাফল্য কামনায়

This Big PDF Created by Surajit Mondal

কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ বেহাই বাড়ী

অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূলে লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ডাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে?"

"সে কিরে চার আনা কি অল্প হল?"

"ঠাকুর, চার সের চাউল কিনতেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুনতেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই, পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা মেহনতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পুরোপুরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ চারটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি করতে এসেছ, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকালবেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসরখানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনাবশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা বিশেষ নহে, একটু যেন বিষণ্ণ হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসুধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পূর্ব্বের বিবাহোৎসবে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসরকাল উপর্য্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চূণ পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে

চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া নিশ্চয়ই সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূমপিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে বাবুকে একবার খবর দাও, নন্দীরের সীতেনাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশান্বিত বালক এ অনুরোধে বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তাড়াটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল যায়গায় রাখিল। তাহার পর অপ্রসন্নমুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরগত। দুইজনে নমস্কারের আদান প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল; মোটাকত বড় বড় অশ্রুবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সে ত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে কি, তাহার কোলে ফরাসী ছিটে দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্ত নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন; কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন? সে ভাবিল "মর মিন্‌ষে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোণা জুটুল না মুখ দেখতে!"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার কোথায় গেলিগো" বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ত্তরবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে?"

কান্না থামিলে সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাযের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—"দূর হোক্ গে, কাল সকালেই বলব, রাত্রিটা কোন মতে কাটিয়ে দিই।"

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকথিত ভৃত্যবালক একপাশে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্তরাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাযের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ কার্য্যোদ্ধার

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের বা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডন করবে বল? আমার আর চারটি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিন্নী দেখে যেতে পারলি, সেই দুঃখই চিরকাল থাকবে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়েছিল। বাড়ীতে রাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাৎ, তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বলত না। জায়ে জায়ে ঝগড়া কলহ, এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আসছে, কিন্তু আমার অন্য বউরা ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভগ্নীর মত মনে করতেন। দুঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি, জলস্পর্শ করেন নি। আজও বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

হৃষীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক আর সে সব কথা কয়ে ফল কি, অন্য কথা বলুন।"

সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাটি করিয়া দিল। নীরবে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আবার এ কথা সে কথা পাঁচ কথায় কাটিল। এবার সীতানাথ নিজের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া, ভূমিকামাত্র বর্জ্জন করিয়া, কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। শুনিতে এমন কাঠখোট্টা রকম ঠেকিল যে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

কথাটা আর কিছুই নয় বধূমাতার অলঙ্কারগুলির কথা। তাহাই বৃদ্ধ আদায় করিতে আসিয়াছেন।

প্রস্তাবটা শুনিয়া হৃষীকেশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বৈবাহিকের আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আর, এ ত জানা কথা। তবু তাঁহার মনে এক একবার দুরাশা উপস্থিত হইল, গহনাগুলি আটকাইবেন, দিবেন না। নাতিনীটি যদি বাঁচে—কুলীনের ঘরের মেয়ে, বাঁচিবারই ষোল আনা সম্ভাবনা—তবে তাঁহারই ঘাড়ে পড়িল। ঐ অলঙ্কারগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়া তিনি যখন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার ছেলেগুলাও কেহ মানুষের মত হয় নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে, কি করিয়া যে তাহারা সংসার চালাইবে, তাহাই তিনি মাঝে মাঝে ভাবিয়া আকুল হইতেন। এই সকল পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অলঙ্কারগুলি রাখিবার দুরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ অশুভদা কালহরণ, যত বিলম্ব হয়, তাহার

চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। বলিলেন—"মুখুয্যে মশাই, সেই জিনিসগুলি আপনারই। যখন একবার আপনার পুত্রকে দান করেছি, তখন আর তার একরতি মাত্রও ফিরে নেব না। তবে কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আপাততঃ আপনাকে দিতে পারছিনে।"

শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। ভাবিলেন, বুঝি যেহাই অলঙ্কার-গুলি কোথাও বন্ধক দিয়াছে। তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! বলিলেন—"কেন, এখন দিতে বাধা কি?"

হৃষীকেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এই সদ্য শোকটা পাওয়া গিয়েছে, এখনও ছ মাস হয়নি। আর কিছু দিন যেতে দিন। বাক্স থেকে সে অলঙ্কার এখন বের করে কে বলুন? মেয়েদের কোথায় কি থাকে কোথায় কি না থাকে, আমি ত কিছুই জানিনে। গিন্নী সে কালরাত্রির পর থেকে সে ঘরেই আর ঢোকেন নি। তাঁর বড় আদরের শেষ মেয়েটি, কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে। তার ঘরে পদার্পণ করেন না, তার কোন জিনিষটি ছুঁতে হলে কেঁদে আকুল হন। এমন অবস্থায় কি করে তাঁকে বলি, তোমার মেয়ের বাক্স খুলে গহনাগুলি বের করে দাও। শোকটা এখন বড্ড নতুন, কিছু দিন আর যেতে দিন।"

গহনা দেওয়ার বাধাস্বরূপ হৃষীকেশ কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা নিতান্তই সত্য; —তবে সকলের কাছে এ কারণ যথেষ্ট বলিয়া মনে না হইতে পারে। সীতানাথেরও মনে হইল না। একটু রাগ হইল। বলিলেন—

"ভাই, শোক আমারই কি লাগেনি? তবে কি করব? সংসার করতে গেলে শোক তাপ ত আছেই। এ থেকে কেউ নিস্তার পেলে এমন ত দেখলাম না,—তা সে রাজাই বল, বাদ্‌সাই বল, আর পথের ভিখারীই বল। তবু সংসারী লোককে দুদিনে তা ভুলে গিয়ে খেতে হয়, শুতে হয়, হাসতে হয়, সংসার ধর্ম্মের সবই করতে হয়। তা তাঁর যদি অত শোকই হয়ে থাকে, তবে তুমিই না হয় চাবিটা চেয়ে খুলে আনগে না।"

হৃষীকেশ আবার কিছুক্ষণ মৌনভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া সীতানাথ একবার তাগাদা করিলেন। তখনও হৃষীকেশ গহনাগুলি রাখিবার আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"বেয়াই মশায়, একটা বৎসর যেতে দিন। তখন এসে গহনাগুলি নিয়ে যাবেন। যদি আজ্ঞা করেন ত আমিই মাথায় করে সেগুলি আপনার বাড়ী পৌঁছে দেব।"

সীতানাথ রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"মানুষের শরীর—পদ্মপত্রের জল। আজ আছে কাল নেই। এক দণ্ডের কথা বলা যায় না, এক বৎসর যদি আমি না বাঁচি?"

হৃষীকেশ মনে মনে বলিলেন—"না বাঁচ ত ঐ গহনাতে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা হলে আপনার গহনা আমাদেরই কাছে থাকবে। ঐ গহনা দিয়ে আপনার পৌত্রীর বিবাহ দেব।"

সীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তুমি কি মনে করেছ আমার নাতনী চিরদিনই তোমার ঘরে থাকবে? একটু বড় হলেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বড় বউমা মেয়েটিকে দেখবার জন্যে পাগল। আসবার সময় আমাকে বললেন—'বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাব? খুকিকে দেখে আসব?' বিবাহের কথা বলছ, তা ভাই আমাদের এমন কপাল কি হবে? ঐ মেয়ে কি বাঁচবে? ওর যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে কোন মতেই ত সে আশা করা যায় না।"

হৃষীকেশ ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক;—স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। বলিয়া ফেলিলেন—"তা গহনা এখন থাকুক না। যখন মেয়ে নিয়ে যাবেন তখনই গহনা নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিয়া সীতানাথ জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তারা হে, আমাকে কি অবিশ্বাস করলে? জিনিসগুলি আটক করে ব্রাহ্মণকে মনঃক্ষুণ্ণ করে ফিরিয়ে দিলে কি তোমার মঙ্গল হবে?"

হৃষীকেশ বেহাইয়ের চরিত্র পূর্ব্বাবধিই জানিতেন। তিনি যখন ধরিয়াছেন গহনা লইয়া যাইব, তখন যে না লইয়া ফিরিবেন এমন আশা নাই। সুতরাং আর আপত্তি উত্থাপন করা নিষ্ফল মনে করিলেন। বলিলেন—"তবে নিয়ে যান।"

সীতানাথের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। বলিলেন,—"আহারাদির পর সকাল সকাল আজই বেরুতে হবে। তুমি তবে সেগুলো বের করে ঠিক করে রাখ, আমি গঙ্গা-স্নানটা সেরে আসি।"

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অনেক দূর হইতে মাঝিকে উচ্চস্বরে সীতানাথ বলিলেন—"ও মাঝি যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়। বলে অত গরীবের ঘরে আমরা মেয়ে দেব না। নৌকো ঠিক করে রাখ, খাওয়া দাওয়ার পর ছাড়া যাবে।"—বলিয়া ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘাটসুদ্ধ লোক তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছে কি না। যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে নিতান্ত বধির ভিন্ন আর কাহারও না শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। লোকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহার পর সীতানাথ গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ঘাটে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আজ দেবতাগণের বড়ই শুভাদৃষ্ট। এরূপ ভক্তিবাহুল্যের সহিত পূজা সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আর দেরী সহে না। হৃষীকেশকে বলিলেন—"ভাই এইবার জিনিষগুলি নিয়ে এস, দুর্গা বলে সকাল সকাল যাত্রা করি।"

হৃষীকেশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সীতানাথ ভাবিলেন সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যে কৃপণের স্বভাব, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ দেরী করিতেছে। যাহা হউক মনটার অবস্থা বেশ উৎফুল্ল থাকায় দরুণ সীতানাথ গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা রাগিণী ধরিলেন—

ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার,
শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি হল?"

"হল না।"

"সে কি?"

হৃষীকেশ ব্যাপারখানা বুঝাইলেন—"মুখুয্যে মশাই, জিনিষগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিন্নীকে গিয়ে বলাতে প্রথম তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে বললেন—চাবি ত নেই, চাবি আমার মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তারই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। রাগিয়া বলিলেন—"সে আমি শুনব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে যাচ্ছিনে।"

হৃষীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই, আমি কি করব? এই ত অবস্থা। এর ওপর কি কামার ডেকে এনে দমাদ্দম করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখায়, না সেটা করান আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়?"

সীতানাথ মুখ চোখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা খোলসা করে বল দেখি। যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে,

তেরাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিক-প্রবরের মুখচোখের ভঙ্গিমা দেখিয়া হৃষীকেশ বড় অপমান বোধ করিলেন; মনে মনে ভারি ঘৃণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতলার উপর তাহাকে লইয়া গিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে হৃষীকেশও গঙ্গাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে দিন আর এই দম্পতীর মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বুড়া বর

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নবগ্রাম। ভোর হইয়াছে। সকল পাখী এখনও প্রভাতী কলকূজন আরম্ভ করে নাই। একখানি ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে ধীরে স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিতেছেন। পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া তাঁহার পাগড়ি ও বালাপোষ ভিজাইয়া দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। দুই পাশে দুইটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বহুকাল সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিকে দুইটি কলিকাফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণরুদ্ধকণ্ঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।" একবার, দুইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রভুর পানে চাহিয়া সে অবাক্। সপ্তাহের মধ্যে আকার প্রকার যেন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, ব্যাগ নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আসিল। ভাবিয়া নিতাই কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে ভৃত্য বালক—এপ্রেন্টিস করিতেছিল, মাহিনা পায় না, "প্রসাদ" পায় মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল?"

নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বুঝি?" বৃদ্ধ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগাছটির উপর নিতাইয়ের অনেক দিন হইতে লোভ পড়িয়াছিল। একদিন সুযোগ পাইলে লাঠিখানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনে ছিল। সেই জন্য সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। মনে করিল নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জের বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কায, সেই লইয়াছে, লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল! সে ছাতা এমন ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বখ্‌সিস্ করিলেও নিতাই লইত কি না সন্দেহ। যদিও বা লইত, তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধনুকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাযে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই চকমকি ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্ত্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হুঁকাটি কলস্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাখিয়া দিলেন। তাম্রকূটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। চক্ষু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন,—

"হা হা হা হা—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপারখানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে নিতাই কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন,—"বড়বাবুকে উঠাগে যা।"

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয়নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক দুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুটধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান্ হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে? সে কি করে গহনার বাক্স নিলে? ছিনিয়ে নিলে? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না?"

"পুলিসে কি আমি যাইনি? পুলিসেও গিয়েছিলাম। থানার দারোগা ভূধর চাটুয্যের ভগ্নীপতি রে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক্ আর বাবাই হোক্। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টে সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সে অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি "মোক্তার গাইড্" পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শ দান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কালব্যাপী সকরুণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হা-হুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া আমরা সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা

বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে?"

"প্রথম স্বীকার করেনি। আমার যখন জ্ঞান হল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাঁধা ছিল সেটা কোথায়? বললে, তা ত কই আমরা পাইনি। তখন আমি চীৎকার করে বললাম, আমার সর্ব্বস্ব গেল রে, ব্রহ্মহত্যে করলে রে,—বলে আমার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে—ডাক্তারটি বললে তোমার কোনও ভাবনা নেই, তোমার বাক্স আছে। আমার সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, নাড়ি দেখে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই, তিন দিনের মধ্যে তুমি সেরে উঠবে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালতে নালিস করে ডাক্তারকে সাক্ষী মানব। কাণ ধরে ভূধর চাটুয্যের কাছ থেকে গহনা আদায় করে নেব না!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাইনি, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললে গহনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমায় সান্ত্বনা করবার জন্যে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস করলে আর কি হবে, ডাক্তার ঐ কথা বলে বসবে।"

"তবে কি করে জানলেন ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে?"

"তার পরে ভূধর চাটুয্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার করলে নিয়েছে, অথচ দিলে না? বাঃ—বেশ লোক ত! তবে তাঁর স্বীকার করবার উদ্দেশ্যটা কি? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে সুবিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে, উদ্দেশ্য আছে। বলে, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"—বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ গুম্ফপ্রান্ত দন্তে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান অন্নদাচরণ। তিনি এল, এ, ফেল করা নব্য-যুবক। মেজাজটা নিতান্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিস্কুট সহযোগে নিয়মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিব্য,—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীয় মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া, "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামধেয় একখানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্নীবৎসল বলিয়া তাঁহার সম্মানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ বিবাহে রাজি করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অতগুলি টাকার গহনার শোক আমি সহ্য করতে পারব না, আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিবাহ না করলে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগবে।"

অন্নদার চারিটি দাদা অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন

রাগ করিলেন,—কিন্তু কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে খোসামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারায় অনুরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অন্নদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধুরা সেগুলি, যখন যেরূপ সুবিধা হইল, সুতর্ক বা কুতর্কের সাহায্যে একে একে খণ্ডন করিল। কার্য্যের কথা ছাড়িয়া যখন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকবিহ্বল মৃতপত্নীকের দ্বিতীয় দার-গ্রহণের অজস্র উদাহরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করিল। "দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল।—দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর এক জন যশস্বী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলেই সমস্বরে বলিল, বাঙ্গালা ভাষায় একখানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সে-ই আবার একটা আধটা নয়, দুই দুইটা বিবাহ করিল।"—ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক-সমরে অন্নদা শেষে পরাজয় স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। তাহার তিন দিন কাটিয়াছে, সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন বাপ বলিল, "তবে আমিই বিবাহ করিব। দু-দুহাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না; ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।"

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্র একটা মহা হাসি টিটকারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারান, নোকা উল্টান সব ছল মাত্র। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন, আর উল্টাইয়াছে বুড়ার বুদ্ধিসুদ্ধি। কেহ বলিল, বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছে। কেহ বলিল, দীনবন্ধু মিত্রের একখানা "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেণ্ট কর! কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না! একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বহুলোকের অনুরোধে এই উপলক্ষে একটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

যাঁহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের দুই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন, "মুখুয্যে মশাই আপনি ত বিবাহ করতে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয়? আপনি কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা, হঠাৎ মেয়ে দিতে সম্মত নাও হতে পারে।"

সীতানাথ বলিলেন—"ও পাজি যে বিবাহ করবে না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ করলেও অলঙ্কার দেবে বলেছে। পেল্লায় মেয়ে এত বড়, অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয়নি, তাদের আর জাত থাকে না যুবো বুড়ো বিচার করলে তাদের কি করে চলবে?"

পাড়ার লোকের গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চারি ছেলে চারি বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—"দেখ, আমার বিবাহ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোণার চাঁদ বউ ঘরে আনি।"

অন্নদা বেচারি কিয়ৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—"তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্ করবে, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্ পানে চলে যাব।" বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—"ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি আকপাপো, এই বয়সে কত দেখলাম বাঁচি ত আরও কত দেখবো। এখন এ রকম করছ.

কিন্তু শেষরক্ষে হলে হয়!"

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বকী। সীতানাথ টাকাকড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে; —ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার,—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ নোলকপরা মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অনু ভাই লক্ষ্মীটি, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোণার সংসার ছারেখারে যায়।"

অন্নদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুনলাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজারখানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম, মনোমত সুপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার করতে পারত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

প্রাণের দায়;—পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওয়ানা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ একখানি পত্র

চন্দ্রবাটী,
২৭শে শ্রাবণ

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওয়ানা হইবার পরদিবস আমি কার্য্যগতিকে চন্দ্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশয়ের জীবনদাতা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশয় পরম সজ্জনব্যক্তি;—যারপরনাই আদর অভ্যর্থনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আমি তাঁহারই গৃহে অতিথি।

আমার পরিচয় পাইয়া গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন বিজ্ঞব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপু হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি নহি, পরন্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্ত বালিকাটির পাণিপীড়ন করিতে অভিলাষী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত খাইয়া গেলেন। মনে করিলেন বুঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। ওটি কুড়ানো মেয়ে। বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে যোগার মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে লক্ষ

লোকের সমাগম হইয়াছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তখন বছর দুই আন্দাজ। নিঃসন্তান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্যার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎকুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যখন আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তখন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে যথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমার সম্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের পরলোকগতা ছোটবধূর মত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের ব্যাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অম্লশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, দুই দিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ,—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বৎসরে এরূপ দুই একবার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার শ্যালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী মেয়েটিকে ত্রিবেণীর ঘাটে হারাইয়া আসেন। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিবেণীর চতুর্দ্দিকে অনেক নিষ্ফল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটির গায়ে অনেক সোণার গহনা ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে, গহনার লোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। অম্লশূলের ব্যারামটা—উহাও একটা প্রধান কথা। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উহা আছে, আমার স্ত্রীর ছিল, আমার শ্যালকগণও অল্পাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক আমি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অদ্য প্রভাতে তিনি আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহারই, সে বিষয়ে শ্বশ্রূদেবীর আর সংশয়মাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কন্যাটিকে বিবাহ করেন তাহা হইলে কতকটা সম্পর্কবিরুদ্ধ হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্যাটি পরাস্থা) কষ্টে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই অগত্যা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা

পুনশ্চ

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্বে একবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মুদ্রিত "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামক কাব্যখানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সঙ্গে আনয়ন করিবেন। চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এই সঙ্গে দিলাম, আপনার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের কোনও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি "আত্মজীবন চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই আলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতুকাবহ হইবার সম্ভাবনা।—ইতি শ্রীঅন্নদা

পৃঃ—২

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলংকারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সেগুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"শুধুযে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাক্স পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে: বলিও বাক্স আছে; উহাকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এই সুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু হে আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না। তাই দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথ্যা কতক্ষণ টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়া দিতে পারিতে না।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বিনয়ী ও অতিথিবৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতি মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি—

শ্রীঃঃ

[আষাঢ় ১৩০৬]

পত্নীহারা

চন্দ্রচূড়ার গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর হিতল অট্টালিকা। তাহার একটি সুসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী সুনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর। চোখে এখনও বালিকাসুলভ চপলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই সুন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাসমাত্র কাণে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে, সুনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে সুনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে সুনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা সুবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল,—"অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সহ্য হয় না নাকি?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বাইরে থেকে হাসতে হাসতে এসেছ। তা ত হবে না। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাসবে।"

"তুমি কি শুধু ঘরে আছ? তুমি কি বাইরে নেই?"

ফুলের কথা শুনিয়া রজনী তাহার কোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভার চক্ষু সেইদিকে পড়িল। প্রভা বলিয়া উঠিল, "আমার ফুল কি করলে? মুখে শুঁইয়ে এসেছ নাকি বীর-শ্রেষ্ঠ?"

রজনী দুঃখিতভাবে বলিল, "ফুলটি গেছে দেখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।"—বলিয়া প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া একগুচ্ছ কড়াইসুঁটি ফুল তুলিয়া আনিল। রজনীর কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এ ফুলের যে তারি প্রশংসা করছিলে—এই নাও।"

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সেখানে রাখাল বালক উপস্থিত ছিল, সুতরাং এবার আর 'ধন্যবাদ' দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া সস্নেহে নিষ্পেষণ করিল।

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আশা করিতে লাগিল গাড়ীখানি যদি খালি থাকে ত বড় ভাল হয়।

গাড়ীখানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে কোনও গ্রামের জমিদারের জামাতাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন বাইসিক্ল গাড়ীর ছাদে তুলিয়া লোক দুইটাকে পুরস্কৃত করিয়া প্রভা ও রজনী শ্রীরামপুর অভিমুখে চলিল।

গাড়ী ছাড়িল। রজনী বলিল, "প্রভা, আজ তোমার বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "গুরুজনের কথা না শোন কাণে—!"

রজনী বলিল, "সে ত কদিন থেকেই শুনছি। আমার কথার উত্তর দাওনা। খুব ক্ষিদে পেয়েছে না? চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে।"

প্রভা বলিল, "ক্ষিদে পেলে কি খেতে আছে? মা বলে দিয়েছেন গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

রজনী বলিল, "সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।"

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কখন গো?"

"কড়াইসুঁটির ক্ষেতে।"

প্রভা বলিল, "ওমা তাই ত! তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?"

"আমার দোষ? তুমি আমাকেও খাইয়ে দিয়ে আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ।"

"তোমার দোষ নয় ত কার দোষ তবে?"

রজনী বলিল, "বেশ! তোমার দোষও বুঝি আমার দোষ? তবু এখনও বিয়ে হয়নি!"

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল, "আমার কখনও কোনও দোষ হতে পারে? সব দোষ তোমার!"

এই অন্যায় অপবাদ রজনীর একান্ত অসহ্য হইল। সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে—রাস্তার দুইপাশ জনশূন্য দেখিয়া—প্রভার মুখখানি নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া লইল।

[ফাল্গুন, ১৩১১]

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখা-

পড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলামুক্ত একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছুদূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা কম্‌ঝম্ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলার শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ী।"

গুলাবছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী!
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ্ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ী!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হাল্‌ুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পয়সা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব-ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বামহস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল ঃ—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা

অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি।

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে; —নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? "প্রার্থনাসমাজী"র কন্যা। বাংগালা দেশে যে "ব্রহ্ম-সমাজী"রা আছে—"প্রার্থনাসমাজী"রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট! রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনাসমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে। সুতরাং আর একখানা কাগজে "শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকরেদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটি, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নক্‌লো বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল্, দেখ্ কি সমাচার।"

কাহাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল্,—পড়্।"

কাহাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সম্বৎশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।
—ইতি

লালা রাম অওতার লাল,
মহল্লা গোরাবাজার, সহর গাজিপুর।

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখবরে লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই লুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল।—কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। লুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কাহাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কাহাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ।"

কাহাইয়ালাল বলিল, "না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া

আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি?"

মহাদেও বলিল, "সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সী থিয়েটর দলের অনেক খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পোয়া ভাঙ, সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। "বরম্‌সমাজী"দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাহবা কি বাহবা। বাহ্ রে বাহ্!"

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি!" বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কারুকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের

শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই —খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা", "লয়লা-মজনু", "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা! কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রামু অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল, জানালা-গুলো বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্টলোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টি-পাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরনের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন"—"চাচাজী" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল; "কিষুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিবণপ্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধ ক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেমন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি?—আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্য প্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বইকি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কোন গলি গয়ে মোরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বইকি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্ ত কি আছে।" কাহাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পাণের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলো গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্, দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কাহাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন যাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে! একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাদুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারবিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্য-

বশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

[বৈশাখ, ১৩১১]

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[illegible]স আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্‌" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাসছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোসগল্প করিয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিম যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্‌টরি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। বাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া একা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পসার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দু ওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে উও তো বচ্চা হায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হায়?"—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বস্তুতঃ দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালাপ্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন—

"হুজুর,—দেখিয়ে তো তমাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকীল আয়েহেঁ,—ন মোচ ন দাড়ী—ঔর বহস্‌ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহেঁ! হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গাতেহেঁ—যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়!"

হাকিম একটু হাসা করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনত্ব জীবন প্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালক বালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল :—

কি কথা !

তিনুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো ?

না।

দুই জনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত।

সেই কয় মুহূর্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরুগন বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুগনের মনে হইল, এ কি করিলাম ? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম ?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল ? কে এ ?

আশ্চর্য !

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার ক্ষুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব ভীড়।

তিল ধারণের স্থান হয়ত আছে কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি পোষাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয় ত নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিনরাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

www.boiRboi.blogspot.com

কাল ত অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—ওরে দাঁড়া!

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ন নহেন, তাহা ঠিক—কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-কোট-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে ত আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বুদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়ত বুঝিতে পারেন নাই—তাই!

বলিলেন—"ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—"

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে ত গদি মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়া মানুষ—গরীব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন হুজুর, তিনরাত্রি ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরণে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচফাটা চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোম মুখখানি বিনয় গদগদ। মাথায় টাক! বর্ণ নাতিফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি"—

প্রথম শ্রেণীর যাত্রিটি সাহেবী পোষাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"দ্যাট কান্‌ট বি! আই কান্‌ট এলাউ!" সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন—"আমিও ত হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি! অনুমতি যদি করেন দয়া করে—"

এই বৃদ্ধের সহিত বাগবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দনে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ —

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন!

"শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি, কুরুকে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়— বাঞ্ছা,—ও বাঞ্ছা,—এই দিকে—এই খানেই চড়াও সব—"

হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটা তরমুজ, একটা বঁটী, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঞ্ছাকে বলিলেন—"তুই তাহলে ওই পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে! তামাক টিকে সব গুছিয়ে রাখ—"

বাঞ্ছা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর!—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা করতে হবে—"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু'র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু'র নির্দেশ মত নিজের যাবতীয় জিনিস-পত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবন্ধ করিলেন।

যদি কেহ গনিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট্ প্লীজ্।"

"মাই টিকেট্ ইজ ইন্ মাই স্যুটকেস্। প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর ইট্।"

"আই কাণ্ট পাণ্ড ইওর ওয়ার্ড! মাই ডিউটি ইজ টু পাণ্ড টিকেটস্—"

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বেশীক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি।

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা—শ্রীহরি!—

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে, যে, বাঙ্গালী বাবুদের সে ভালো করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুল-হীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচ্‌কচিতে আর কাজ কি! কটা টাকা লাগবে বলুন—আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন"—

সাহেব ও কুরু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—

"আপনিও ত হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধা মত—"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর কুরুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙ্গালী আপ দ্যাখো হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি"—

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙ্গালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

শরশয্যা

॥ এক ॥

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারী-ধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

...ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন...দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি?...সমস্ত ছাত্রজীবন

www.boiRboi.blogspot.com

জগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটা···সমুদ্র, নদী, ঝরণা, উৎস, কত কি হয়েছে। তারপর এসেছে উদ্ভিদ্-জগৎ। যে পৃথিবী উত্তপ্ত উষর ছিল, তার সর্বাঙ্গে শ্যাম কান্তি জেগেছে।

যে বন্ধ্যা ছিল সে হয়েছে জননী। প্রাণীদের জন্ম হয়েছে তারপর। ছোট-ছোট জীবজন্তু থেকে শুরু ক'রে বড়-বড় জীবজন্তু জন্মেছে। অনেক পরে এসেছে দানব, তারপর মানব। আরও কত কি হয়েছে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ সহায়তা করেছে দেবতাদের। বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য মহামানব দধীচি নিজের অস্থি দিয়েছেন বজ্র নির্মাণের জন্য। ইতিহাসের পর ইতিহাস রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু করুণা যদি মেঘরূপে এসে উত্তপ্ত পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ না করতো এসব কিছুই হতো না।

পিতা বরুণ কিন্তু কন্যা করুণাকে ভোলেন নি।

বিরাট সমুদ্রের বুকে সেদিন বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশ থেকে। সমুদ্রের অধিপতি বরুণ, বর্ষাকে সম্বোধন করে বললেন—"কন্যা, তুমি পৃথিবীর কান্না শুনে মেঘ হয়েছিলে বলে সমুদ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, আর আমি তাই সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে নির্বিঘ্নে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে ভুলিনি আমি, তোমাকে আমি নিত্য আশীর্বাদ করি। সূর্যের উত্তাপ যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়ে তখন আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করি নব রূপে। তোমাকে আমি ভুলিনি···

ঝরঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের ঘনঘটায় আকাশ পরিপূর্ণ।

"আমরাও ভুলিনি তোমাকে। এই দেখ, আমার স্বামীটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, মনে নেই?"···বিজলী চকমক করে উঠলো! বজ্রের গর্জন শোনা গেল! বজ্রের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। করুণা কোন উত্তর দিলেন না। অসংখ্য বৃষ্টিধারায় সে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

গৌরবগঞ্জের জমিদার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর চেহারাও ছিল অনন্যসাধারণ। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, বিরাট গোঁফ, জমকালো জুলফি। চোখ দুটি বড়বড় লাল-লাল। নাকটা খাঁড়ার মতো। শরীর যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রিদুবাবুকে সবাই ভয় করতো, আবার ভালোও বাসতো।

আমার সঙ্গে তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। আমি তখন সবে ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছি—কোথায় বসবো ঠিক করতে পারিনি তখনও, পয়সার জোর ছিল না তেমন, একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম; এমন সময় রিদুবাবু হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রিদুবাবুর নামটা শোনা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখিনি কখনও আমি। বাবার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তাঁর জমিদারিতে কিছু জমিও ছিল আমাদের। যৌবনকালে, আমাদের জন্মের পূর্বে,

বাবা গৌরবগঞ্জে বাসও করেছিলেন। তারপর চাকরি নিয়ে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন। সেই থেকে কোলকাতাতেই আছি আমরা, আর গৌরবগঞ্জে যাওয়া হয়নি।

হঠাৎ রিদুবাবুর চিঠি এসে হাজির হলো। বাবাকেই লিখেছিলেন তিনি—'শুনলাম তোমার ছেলে এবার ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে যদি আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও, খুবই খুশি হবো। আমার একটা অসুখ হয়েছে, তাকে দেখতে চাই। কবে আসবে, আগে থাকতে একটু জানিও, স্টেশনে লোক রাখবো।'

আগে থাকতে খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। স্টেশনে নেমে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমার জন্যে হাতী, ঘোড়া, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটরকার—সব রকম যান পাঠিয়েছেন রিদুবাবু। স্বয়ং নায়েবমশাই স্টেশনে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে, আসা-সোটাধারী বারোজন বরকন্দাজ। আমি তো অবাক্।

নায়েবমশাইকে বললাম, "এত সব কাণ্ড কেন! একটা যে-কোনও গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হতো। না পাঠালেও ক্ষতি ছিল না, কতটুকুই-বা পথ।

নায়েবমশাই মাথা চুলকে বললেন, "হুজুর বললেন, ডাক্তারবাবুর কিসে সুবিধে হবে তা তো জানা নেই, আমাদের যা আছে সবই নিয়ে যাও তুমি"—তারপর একটু হেসে বললেন, "পরিচয় হলে বুঝতে পারবেন, ওঁর স্বভাবই এই রকম।"

—"ওঁর কি অসুখ করেছে?"

—"অসুখ? অসুখের কথা শুনিনি তো!"

—"অসুখের জন্যই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!"

—"তা হবে। আমি কিছু জানি না।"

শাল-প্রাংশু মহাভুজ রিদুবাবুকে দেখে আমারও মনে হলো না যে, তিনি অসুস্থ। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল একদিন। এখানে যখন ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতাম দু'জনে। তোমার বাবা হয়তো সে-সব কথা ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ভুলিনি। আমাদের গোমস্তা রমেনের মুখে শুনলাম, তুমি ডাক্তারি পাস করেছো, খুব আনন্দ হলো শুনে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি অসুখ করেছে?"

—"ফুসকুড়ি বেরিয়েছে একটা পিঠের উপর। এরকম ফুসকুড়ি প্রায়ই হয় আমার। দেখ দিকি, এর যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারো।"

ফুসকুড়িটি দেখলাম। অতি ছোট ঘামাচির মতো, বিশেষ কিছু নয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাকে কোলকাতা থেকে ডেকে আনিয়েছেন ভেবে শুধু যে অবাক্ হলাম তা নয়, মনে-মনে একটু অপমানিতও হলাম। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নয় তো! স্টেশনে একজন লোককে আনতে অত রকম যানবাহন যিনি পাঠাতে পারেন···

রিদুবাবু বলে উঠলেন, "থাক্, ফুসকুড়ির কথা পরে চিন্তা কোরো। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে নাও আগে। নায়েবমশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক'টার সময় ওঠো তুমি?"

—"আমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস।"

—"বেশ ভালোই তো। কটায় সময় ওঠো।"

—"ভোর তিনটেয় আমার ঘুম ভেঙে যায়।"

—"আমি উঠি সাড়ে-পাঁচটায়। ঘুমটা কিছুতেই কমাতে পারছি না। তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি এরও কোনো ওষুধ থাকে, দিও। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। সকাল ছ'টা নাগাদ আবার দেখা হবে।"

রিদুবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই নায়েবমশাই হাজির হলেন এসে।

—"রাত্রে কি খাবেন, ডাক্তারবাবু?"

—"যা আছে, তাই খাবো।"

—"সব রকমই আছে। যা হুকুম করবেন, তাই এনে দেবো।"

—"সব রকম মানে?"

—"কয়েক রকম ভালো চালের ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সব রকম ডাল, রুটি, লুচি, পরোটা, ডালপুরী, রাধা-বল্লভী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, চার-পাঁচ রকমের মাংস, চার-পাঁচ রকম মাছ, তরি-তরকারি সব রকম, এ ছাড়া দই, ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টান্ন, মোরব্বা, চাটনি, এসব তো আছেই—"

—"বলেন কি! সব আমার জন্যে করিয়েছেন?"

—"এসব রান্না রোজ হয়।"

—"এত রকম?"

—"হ্যাঁ, মায় সাবু, বার্লি, হর্লিক্স, ওভালটিন পর্যন্ত।"

—"রিদুবাবু খুব খাইয়ে লোক বুঝি?"

—"মোটেই না। নিজে খুব সামান্যই খান। কিন্তু কি খাবেন তা আগে থাকতে বলবেন না কিছুতেই। তাই সব রকম তৈরি রাখতে হয়। কোনও জিনিসটা চেয়ে না পেলে কুরুক্ষেত্র করেন।"

—"বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই রান্নার ব্যাপারের জন্যেই জন কুড়ি রাঁধুনি, আর গোটা-পঞ্চাশেক চাকর রাখতে হয়েছে।"

"এরকম করবার মানে কি?"

—"খেয়াল! সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনি কি খাবেন বলুন।"

—"খানকয়েক লুচি, আর যা হোক দু'একটা তরিতরকারি পাঠিয়ে দেবেন।"

—"মাছ মাংস দুই-ই দেবো তো?"

—"দেবেন।"

—"মিষ্টান্ন?"

—"আপনার যা খুশি দেবেন মশাই, যা পারবো খাবো।"

—"বেশ। চা খাবেন ক'টায়? হুজুর বলে দিলেন, আপনি তিনটের সময় ওঠেন, আপনাকে ঠিক সময়ে যেন চা দেওয়া হয়। সাড়ে-তিনটেয় দেবো।"

—"কি দরকার অত কষ্ট করে।"

—"কষ্ট আবার কি! দুটো ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেই হবে। একটা ঘড়ি যজ্ঞেশ্বর গোয়ালার কাছে থাকবে, আর একটা থাকবে হীরু খানসামার কাছে।"

—"গোয়ালার কাছে কেন?"

—"সে আড়াইটের সময় উঠে দুধ দুয়ে আনবে। টাটকা দুধ না হ'লে কি চা ভালো হয়? লিপটনের দার্জিলিং চা আছে, অন্য চা-ও আছে, কোনটা—"

—"কেন অত হাঙ্গামা করছেন। যা আপনার সুবিধে হবে, তাই দেবেন।"

—"অত হাঙ্গামা না করলে আমার চাকরি থাকবে না। হুজুর যদি শোনেন যে আপনি উঠেই চা পাননি, তাহ'লে ভীষণ কাণ্ড হবে। সাড়ে-তিনটের চা পাঠিয়ে দেবো তাহ'লে।"

—"বেশ, তাই দেবেন।"

—"পাশের ঘরটাই স্নানের।"

—"ভালোই হয়েছে। ভোরে উঠেই আমার স্নান করা অভ্যেস।"

—"ও, তাহ'লে তো সে ব্যবস্থাও ক'রে রাখতে হয়—।"

নায়েবমশাই ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "পাশের ঘরে স্নানের এবং মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা রইলো।"

—"আচ্ছা।"

বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক ভোর তিনটেতেই ঘুম ভাঙলো আমার। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটি চাকর বসে আছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করলো, তারপর বললো, "এখনই স্নান করবেন কি? গরম জল তৈরি আছে, আনবো?"

—"নিয়ে এসো।"

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও এলাহি কাণ্ড। দাঁত মাজবার জন্যে কয়েকরকম দেশী-বিলাতী মাজন, টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশ, এমন কি, দাঁতন পর্যন্ত মজুত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানারকম তেল, সাবান, তোয়ালে, গামছা, এমন কি, স্নো, পাউডার, আতর-এসেন্স পর্যন্ত।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, হীরু খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেলাম ক'রে বললে, "চা তৈরি হুজুর।"

হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক সাড়ে-তিনটে বেজেছে।

ঠিক ছ'টার সময় রিদুবাবু এলেন।

তাঁর পিঠের ফুসকুড়িটা আর একবার দেখলাম ভালো ক'রে। সত্যিই বিশেষ কিছু নয়। আমার ব্যাগেই একটা মলম ছিল, লাগিয়ে দিলাম সেটা।

রিদুবাবু বললেন, "মাছ ধরতে ভালোবাসো তুমি?"

—"কখনও ধরিনি।"

—"মাছ ধরা দেখবে?"

—"তা দেখতে পারি।"

—"তাহ'লে বেড়াজালের ব্যবস্থা করতে হয়।"

রিদুবাবু তাঁর জলকরের নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসতেই বললেন, "জেলেদের খবর দাও। সাগরবিলে জাল ফেলুক তারা, বিকাশকে নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

সাগরবিল থেকে দশমণ মাছ উঠলো। বড় বড় রুই-কাৎলা। জল থেকে লাফিয়ে-

লাফিয়ে উঠছিল তারা। এত বড় বড় জীবন্ত মাছ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। দেখবার মত দৃশ্য বটে! আমি শহুরে-লোক, কোলকাতার গলিতে বাস করি, দৈনিক একপোয়া মাছ কেনা হয় আমাদের বাড়িতে, একটা কথা বারবার মনে হতে লাগলো আমার—দশমণ মাছ ধরবার কি দরকার ছিল। এ কি অপচয়! বাড়িতে একটিমাত্র মাছ গেল, বাকী সব মাছ বিলিয়ে দেওয়া হলো!

গৌরবগঞ্জে পাঁচ দিন ছিলাম। এই পাঁচ দিনের প্রতি মুহূর্তে একটি কথাই আমার কেবল মনে হয়েছে—ভদ্রলোক বড় বেশী অপব্যয় করেন। নায়েবমশাইয়ের মুখে শুনলাম, হুজুরের একজোড়া কাপড়ের দরকার হলে বিশজোড়া কাপড় আনাতে হয়। পাঞ্জাবি, কামিজ, গেঞ্জি, সমস্তই ডজন-ডজন করানো চাই, নানারকম ছিটের। এ-বছরের শাল ও-বছরের গায়ে দেন না। নিজে যে খুব বেশী ব্যবহার করেন তা নয়, কিন্তু কেনা চাই সব রকম। ওই ও'র শখ। একটিমাত্র ছেলে, বিলেতে লেখাপড়া করে। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন আগে।

শেষকালে নায়েবমশাই হেসে বললেন, "বড়লোকের একটা নেশা তো চাই। ওই ও'র নেশা। অপব্যয়ের নেশায় মশগুল হয়ে থাকেন।"

আমি যেদিন চলে আসি, সেদিন রিদুবাবুকে বলেছিলাম, "যদি রাগ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।"

—"কি বলো।"

—"এত অপচয় কেন করেন আপনি।"

—"অপচয়! অপচয় কোথায় দেখলে তুমি?"

—"রোজ এত রকম খাবার করবার দরকার কি? খান তো সামান্য একটু।"

—"বাকীটা আর পাঁচজনে খায়।"

—"ওদের খাওয়াবার জন্যে অন্নসত্র খুললেই হয়।"

—"সেখানে কি এমন খাবার তৈরি হবে? আমার জন্যে তৈরি হয় বলেই যত্ন ক'রে তৈরি করে সবাই।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

জলজল ক'রে উঠলো রিদুবাবুর চোখ দুটো।

বললেন, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি এটা জানো যে, পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না? তুমি হিন্দুর ছেলে, একথাটা শোনোনি যে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে! আমি হিন্দু। গৃহস্থ পাঁচজনকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করাই যে আমার কর্তব্য।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে রিদুবাবু হেসে বললেন, "দেখ, বলিষ্ঠ প্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে। ওই বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখ, সহস্র-সহস্র পাতা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটি কোটি বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, শত শত পাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে। এসব না করলেও ওর চলতো, কিন্তু তাহ'লে ও বটগাছ হতো না—"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

কোলকাতায় ফিরে আসবার দিন-সাতেক পরে রিদুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম একটা। চিঠিখানা এখনও আছে আমার কাছে। লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ। যদিও তুমি আমার ছেলের মতো, তবু তুমি ডাক্তার, তোমাকে 'ফি' না দিলে অন্যায় হইবে। তাই সামান্য কিছু পাঠাইলাম। দ্বিধা করিও না, ইহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। তোমার বাবাকে আমার ভালোবাসা দিবে, তুমি আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীহৃদয়েশ্বর মুখোপাধ্যায়

চিঠির সঙ্গে একটি পাঁচ হাজার টাকার 'চেক' ছিল।

রিদুবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় কুড়ি বছর পরে কাশীতে। তখন শীতকাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, চাতালের একধারে একটি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ বসে আছেন একজন। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। মুখটা চেনা-চেনা ঠেকলো, ক্ষীণভাবে মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি। একটু এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, "কে, বিকাশ নাকি!"

হঠাৎ রিদুবাবুকে চিনতে পারলাম। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম।

—"একি, আপনি এমনভাবে এখানে!"

—"আজকাল এখানেই থাকি।"

—"এখানেই? কেন?"

—"জীবনের শেষ আশ্রম যে, সন্ন্যাস।"

অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

—"কোথায় বাসা আপনার?"

—"বাসা নেই। এই মন্দিরে পড়ে থাকি, ভিক্ষা ক'রে খাই।"

যে-গল্পটি তোমাদের আজ বলতে যাচ্ছি, সেটি আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। ঠিক শুনিনি—দেখেছিলাম। চোখের সামনে ঘটনাগুলো পর-পর যেন ঘটে গেল।

···জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। পাহাড়ের উপত্যকাটি সাদা কাশফুলে ভরতি। মৃদু হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে সেই ফুলের সমুদ্রে। কুলকুল ক'রে একটি ঝরনা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ধাপে-ধাপে সুর চড়িয়ে একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকছে কোথায় যেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসছে। চাঁদের একটু দূরে একটা ছোট কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধীরে-ধীরে, তার কালো রং-এ লেগেছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। কালোই অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ কাশফুলের সাদা সমুদ্রেও ছোট একটি কালো মেঘ দেখা গেল। মনে হ'ল, আকাশের মেঘেরই ছোট্ট একটা টুকরো যেন নেমে এসেছে কাশের বনে। তারও চারপাশ ঘিরে জ্বলছে রুপোর জরি। আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল চাঁদের দিকে। হঠাৎ সে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন কাশের বনে যে ছোট্ট মেঘটি দেখা যাচ্ছিল, সে কথা কয়ে উঠল।

মশা

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ানো, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়বার-করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোনও বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, দুনিয়াময় টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি। তবে— বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনও সিপাই মিউটিনির, কখনও বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দুশো বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।

কয়েক বছর হল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণত সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিংবা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে ভাল আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন ভাল থাকে, তার কাছে সেদিন সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোনও একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রুপের স্বরে বলেন, কী কথা হচ্ছিল বন্যার?

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান, মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভাল ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, টাইড্যাল ওয়েভ কাকে বলে জানো? দেখেছ কখনও সেই প্রলয়ের ঢেউ— যাকে বলে সমুদ্র-জলোচ্ছাস!

সংকুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন, কেমন করে আর থাকবে! তা হলে শোনো। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি...

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কী করে এই রকম এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কী হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মতো আর কী!

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু আটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা— চোখের জোর আর বড় বেশি নেই। ঘনাদা তাঁর মাকা-মারা হাসিটি হেসে অমনই গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যান্ডিজ পাহাড়ের চুড়োয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি কন্ডর শকুনের বাসার খোঁজে।

হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার! অ্যান্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার জোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেনটাইন শিকারি আর বোরোরো জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড ইন্ডিয়ান গাইড। সন্ধ্যা হয়-হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়োর নীচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কী আর দেখা যাবে। কিন্তু তখনও বোরারো জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবিনের মতো করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বললে ব্যস, আর ভয় নেই!

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভয় তো নেই, কিন্তু কী দেখতে পেলে তুমি?

সে হেসে বললে, কেন, ওই তো নীচে শিকারিদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারি এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল—

শুনে আমি তো অবাক।

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততধিক অবাক হয়ে বললাম, বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!

তা না হলে আর চোখের জোর কীসের! শকুনের চোখ কী রকম জানো? দু মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গোরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোয়রা শিকারিদের চোখ তেমনই।

এরপর আমরা যে নির্বাক হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কী থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছোননি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তা ছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কী ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে। হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

কী কথা হচ্ছিল হে?

আমরা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বলি, নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।

বিপিন তাড়াতাড়ি আরামকেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, ওঃ, মশা!

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক, ঘনাদার দৃষ্টি তা হলে মশা পর্যন্ত পৌঁছোবে না! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে অ্যাটমিক!

হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।

আমরা স্তম্ভিত! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়, তা হলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না!

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল, একটি মশা মেরেছিলেন!

হ্যাঁ, একটিমাত্র মশাই জীবনে মেরেছি। আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন, মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ অগাস্ট, সাখালীন দ্বীপে!

আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মতো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিকটা ছিল জাপানিদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পুবদিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষারঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াশা। কোনও রকমে দামি কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখে আর হব না এই ছিল মতলব। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তানলিন নামে এক চিনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ—তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার জোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি তো নেহাত ছোটখাটো নয়, তার বেশির ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মতো দামি রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে কোনও বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেকজ্যানড্রোভসক থেকে ব্লাডিভল্টকের স্টিমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালানো সম্ভব। কিন্তু প্রধান স্টিমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরুতে পারবে না। অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে বার করবার সময় অন্তত আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেকজ্যানড্রোভসক-এর পুলিশের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মি. মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিস পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারির কাছে সকালবেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক দিয়ে একজন চিনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মতো কোনও প্রমাণ পাইনি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোনো একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণত তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মি. মার্টিন তাই কোনও রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, দেখেছেন, মি. মার্টিন!

মি. মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক হয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ! বেশ। জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?

খানিকক্ষণ লক্ষ করে বললাম, না, ভুতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে টিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোনও একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।

মি. মার্টিন অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওনোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারি ছাড়া এ অঞ্চলে তো কেউ আসে এদিকে কোনও খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশিই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চিৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মি. মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোনও কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমরবন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে টিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশি দূর নয়, প্রায় শ তিনেক গজ হবে। টিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয়নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানালা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চিৎকার আমরা শুনেছিলাম তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে একসঙ্গে সে শব্দ শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কী! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করাটা মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ফিরে যাওয়া তো তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্ত বড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসানো। সে কাঁচের ভেতর কী আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও না।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইংরেজিতে এক আদেশ শুনলাম, প্রাণে বাঁচতে চাও তো হাত তোলো—

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদুতের মতো চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মি. নিশিমারা নামে একজন জাপানি কীটতত্ত্ববিদ। সাখালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্য এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কী উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে পলাতক চিনা মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের

মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মি. নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মি. মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, পোকা-মাকড়ের ভেতর মশাই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।

মি. নিশিমারা একটু হেসে বললেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসেবে মশা কী পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।

মি. মার্টিন বললেন, কিন্তু আপনার গবেষণাগারে তো দেখছি মশার লালন-পালনই হল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কী প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।

আমাদের একটু অবাক হতে দেখে তিনি বললেন, মশা কী করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারি যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্রনল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোনও উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তা হলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চিৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোনও বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কী, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোনও ত্রুটি করেননি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মি. মার্টিন বললেন, এরই মধ্যে শুয়ে কী হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি। তাঁর কথায় রাজি হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

এর মানে? মি. মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোনও শয়তানি মতলব আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাদের কাছে হাওয়া চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোনও রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মতো রক্ত জল করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু এ কী ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তানলিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মতো কাফ্রি প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে করে মি. নিশিমারা।

ব্যাপার কী, মি. নিশিমারা? বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মি. নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশি অত্যাচার করছেন নাকি আপনারা? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে?

কেউ দেয়নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কী?

মি. নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, যা হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।মি. মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তানলিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বললেন, এ তো মারা গেছে। আর সাপেও একে কামড়ায়নি। বলুন, কী করেছেন একে?

কী করেছি জানতে চান? নিশিমারা কখন এরই মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বললেন, বেশ, সেই কথাই বলব তা হলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তানলিন সাপের কামড়ে মারা যায়নি—মারা গেছে মশার কামড়ে-সামান্য একটা মশার কামড়ে!

নিশিমরা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টাহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন? কোনও ভাবনা নেই, এক্ষনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম, মনে আছে তো? সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চিৎকার শুনেছিলেন, সে এমনই একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তানলিনের অবস্থা তো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন এইবার আপনার পালা।

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদুত তখন মি. মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনও আপনার মতো জনবিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই দিতে চাই। বেশি কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরি যে গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরি করে না...

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল! মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না! কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা করা যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর চারজন মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তানলিনের মৃতদেহ।

কোনওরকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব, এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রি বাঘের মতো আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রি এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মতো চিৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি, মি. নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মি. মাটিনকে চিত করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মি. মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল! মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা একসঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল!

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন, জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয়নি।

সংসার সীমান্তে

সত্যই এ-কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে-দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নাই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীন্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তাহা নয়, এই দুইটি জীবনের গভীব মর্ম বুঝিবার মতো দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়। হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আব কতটুকু! নিজেকে ছাড়াইয়া আশপাশের কয়েকজনকে বিলাইতেই র্ত তাহা ফুরাইয়া যায। আর উদারতা? এই শব্দটিকে এ পর্যন্ত কত ভাবেই না লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছি!

তবু একবার বলিবার চেষ্টা করিযা দেখি—

বিশ্রী বাদলেব রাত। সারাদিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায় নাই, ঝুপ্ ঝুপ্ কবিয়া বৃষ্টি পডিয়াছে, গভীর রাত্রেও তাহার বিবাম নাই। কয়দিনে এ-বৃষ্টি থামিবে কে জানে।

শহরের এক প্রান্তের যে-রাস্তাটিতে আমাদের গল্প সুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায। গোরুর গাডি ও মোটরলরির চাকায় তাহার যে হাল হইযা থাকে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। দিনরাত্রেব অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাহার আরও শ্রী ফিরিয়াছে, পাশের নর্দমার সহিত তাহাকে আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রাস্তাটির নাম না-ই বলিলাম— দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপ্রিগুলি তাহার শোভা-বর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।

গভীর বাদলের রাতে রাস্তাটি একেবারে নির্জন হইয়া আসিয়াছে। আলোর ব্যবস্থা কোনকালেই ভালো নয। যেটুকু ছিল বৃষ্টিতে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণধ্বনিমুখর অন্ধকারে দেখা যায়, রাস্তার ধারে একটি চালার সামনে স্তিমিতভাবে অত গভীর রাত্রেও কেরাসিনের ডিবিয়া জ্বলিতেছে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরাসিনের ধূমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিম্বা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোন অর্থই আর নাই। প্রত্যহের অভ্যাসবশতঃই ক্লান্ত হতাশ চোখে পথের দিকে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সে বসিয়া আছে।

কেরাসিনের ডিবিয়ার মৃদু আলোয় তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না। হাত দিয়া শিখাটিকে আড়াল করিবার দরুন তাহার মুখে ও দেহে গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।

ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কে একবার বলিল, "হ্যাঁ লা রজনী, বার-দরজা বন্ধ করতে হবে না! সমস্ত রাত ব'সে থাকবি না কি? এ-বৃষ্টিতে যে পথে কুকুর-বেড়াল বেরোয় না!"

দরজা হইতে রজনী কর্কশকণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় যে উত্তর দিল অন্য সময় হইলে তাহা হইতেই একটা তুমুল ঝগড়ার সূত্রপাত হইতে পারিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাগুলা বলা হইয়াছিল নিদ্রার ঘোরে সে বোধ হয় ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। আগামীকল্যের জন্য মুখরোচক কলহটি সে মুলতুবি রাখিল এমনও হইতে পারে।

গায়ের কাপড়টা আরও একটু ভালো করিয়া জড়াইয়া রজনী দরজাতেই তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। কাপড়-চোপড় তাহার ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানটায় পা রাখিয়াছিল সেখানেই কাদা হইয়াছে প্রচুর। পা দুইটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গিয়াছে মনে হইতেছিল। তবু ইহার মধ্যে রজনীর উঠিলে চলে না। হয়তো এই দুর্যোগের রাত্রেও মাতাল হইয়া কেহ এ-পথে আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতে পারে! নেশার ঝোঁকে সে ত আর বাদবিচার করিবে না!

আরও ঘণ্টাখানেক এই ভাবেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ রজনী সচকিত

হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের রাস্তাটা যেধারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ভদ্র হইবার চেষ্টা করিয়াছে, খোলার চালা পরিত্যাগ করিয়া একটি-দুইটি কোঠা ও ভদ্রগৃহস্থ বাড়ি দুই পাশে পাইয়াছে, সেখান হইতে যেন কাদার ভিতর কাহার পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। পদশব্দ ক্রমশঃই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নাঃ, কোন মাতালের পায়ের শব্দ এ নয়। কাদার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

রজনী নিরাশ হইল। জলবৃষ্টির ভিতর দিয়া কেহ যে উর্ধ্বশ্বাসে তাহার ঘরে আশ্রয় লইতে আসিতেছে না, ইহা ঠিক। একলা বসিয়া থাকিতে একটু বুঝি তাহার ভয়ও করিতেছিল। ভয় অবশ্য তাহার অমূলক, মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।

রজনী জোর করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর হইতে কৃষ্ণকায় একটি বিশাল মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। আশ্চর্যের বিষয় রজনীর দরজার কাছে আসিয়াই সে থামিয়াছে। পিছন দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর রজনীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাহারই কাছে আসিয়া চাপা-গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, "চ, তোর ঘরে চ।"

রজনী সত্যই এই আকস্মিক সম্ভাষণে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটা সে কোন কথা বলিতেই পারিল না। স্থাণুর মতো যেখানে বসিয়াছিল সেখানেই নিশ্চল হইয়া রহিল।

কিন্তু তাহার বাকস্ফূর্তি হইবার পূর্বেই লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ নিচু হইয়া ফুঁ দিয়া তাহার কেরাসিনের আলোটি নিভাইয়া দিয়া সে বলিল, "ঢঙ্ ক'রে তবু ব'সে আছে দেখ— কই তোর ঘর?"

এই অদ্ভুত ব্যবহারে ভীত হইয়া রজনী চিৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু লোকটা তাহার পূর্বেই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়াছে। রজনীর কণ্ঠ আর শোনা গেল না।

লোকটা চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ভয় নেই, চেঁচাস্ নি।"

রজনী ভীত ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটার হাত ঠেলিয়া দিবার একটু চেষ্টা করিল।

কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা। লোকটা অসুরের মতো শক্তিতে তাহার গলার কাছটা চাপিয়া ধরিয়া আছে, বেশি জোর জবরদস্তি করিলে বুঝি টিপিয়াই মারিবে।

অগত্যা বাধ্য হইয়াই সে চুপ করিল। লোকটা নিজেই উৎসাহী হইয়া টিনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার বলিল, "কি, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব সারারাত!"

রজনী সত্যই ভয় পাইয়াছিল, বলিল, "না, তুমি যাও!"

লোকটা অন্ধকারে রজনীর কণ্ঠ খুঁজিয়া লইয়া এক হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "দূর, কোথায় যাব এত রাতে!"...

আরও কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহিরে রাস্তায় কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লোকটার ভাব-ভঙ্গিও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই রজনীর মুখে হাত ঢাকা দিয়া তীক্ষ্ণ চাপা গলায় সে বলিল, "টুঁ শব্দটি করেছিস কি খুন ক'রে ফেলব।"

রজনী অবশ্য চেষ্টা করিলেও শব্দ করিতে পারিত না, লোকটা যে জোরে হাত চাপা দিয়াছে। বাহিরের পদশব্দ তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া বুঝি খানিক থামিল। কয়েকটা লোক কি যেন বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আবার পদশব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতেই লোকটা তাহার হাত তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "কেমন ভয় দেখিয়ে দিলাম, দেখলি?"

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠাট্টার নয় তাহা রজনী বুঝিয়াছিল। লোকটাকে মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিলেও সে মৃদুস্বরে একবার আপত্তি জানাইয়া বলিল, "আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যাও— আজ আমার শরীর খারাপ।"

লোকটা এবার জোরে হাসিয়া উঠিল, "হুঁ, শরীর ত বেজায় খারাপ, তাই বাদ্‌লা রাতে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলি— না? নে ছেনালি রাখ্। কোথায় তোর ঘর?"

নিরুপায় হইয়া রজনী বলিল, "দাও, টাকা দাও তাহ'লে আগে।"

অন্ধকারে তাহার হাতের মধ্যে সত্যই একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া লোকটা বলিল, "নে; হ'ল ত!"

রজনী এবার ধীরে ধীরে পাশের দাওয়ায় উঠিয়া তাহার ঘরের চাবি খুলিল। ঘর বলিলে তাহাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়; দুধারে দুই টিনের পার্টিশনের

মধ্যবর্তী খানিকটা অপরিসর স্থান মাত্র। মেঝেতে কোনওকালে বোধ হয় সিমেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। নোংরা একটি বিছানা ও একটি ভাঙা তোরঙ্গই অবশ্য অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে— মেঝের বাকি অংশ যেটুকু দেখা যায় তাহা বহুদিনের বহু মানুষের পদাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

উপরে খোলার চাল। সেখানকার একটি বাঁশ হইতে তার দিয়া টাঙানো চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠনটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। রজনী ঘরে ঢুকিয়া তাহার আলোটাই একটু বাড়াইয়া দিল। তাহাতে আলোকের অভাব কিন্তু দূর হইল না। শিখাটি আরও বেশি ধূমোদ্গীরণ করিতে লাগিল মাত্র।

মেঝের উপরকার ময়লা ছিন্ন বিছানায় একটা বালিশের উপর কনুই-এর ভর দিয়া লোকটা তখন বসিয়াছে।

রজনী তাহার দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি করলে বলো ত? জুতোটা বাইরে খুলে রেখে আসতে হয় না! সমস্ত ঘর যে কাদায় কাদা হয়ে গেল —এ মুক্তো করবে কে?"

সত্যই লোকটার ছেঁড়া জুতার সঙ্গে রাস্তার প্রচুর কাদা ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

ঘরে আসিয়া লোকটার চেহারা ও মেজাজ দুই-ই যেন বদলাইয়া গিয়াছে মনে হইল। রজনীর কথায় হাসিয়া জুতা-জোড়া পা হইতে খুলিতে খুলিতে সে বলিল, "ঈস্, কি আমার রাজপ্রাসাদ রে! জুতোর কাদায় নোংরা হয়ে যাচ্ছে!"

কথাগুলার পিছনে কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইল না। গলার স্বরে ও বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া রজনী বলিল, "তোমারই বা কি এমন সোনার খড়ম যে বিছানায় উঠতে চায়!"

ছেঁড়া জুতা দুইটা পা হইতে খুলিয়া উপুড় করিয়া ধরিতেই পোয়াখানেক ময়লা জল তাহা হইতে বাহির হইল। লোকটা হাসিয়া বলিল, "এমন জুতোর তুই নিন্দে করিস্! দেখেছিস্ এ ড্যাঙ্গায় হ'ল জুতো, আর জলে নামলেই নৌকো!"

ময়লা জলে ঘরটা আরও নোংরা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এবার রজনী রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

লোকটাকে এই সময়ের মধ্যে সে বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

বাহিরে তাহাকে যতখানি বিশালকায় মনে হইতেছিল ততখানি জবরদস্ত চেহারা তাহার নয়। মাঝারি দোহারা গড়ন। কেমন একটু পাকাইয়া গিয়াছে। হাত-পায়ের শিরগুলো দড়ির মতো মোটা মোটা। মুখখানা চোয়াড়ে হইলেও কেমন যেন কুৎসিত নয়। চোখে ও ঠোঁটের কোণে সর্বদাই একটু হাসির ভাব লাগিয়া আছে— নির্দোষ ব্যঙ্গের হাসি। সমস্ত মুখখানা বুঝি সেইজন্যই একেবারে আকর্ষণ শক্তি হারায় নাই। বয়স অবশ্য তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। রজনীর মনে হইল ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে কোন বয়স তাহার হইতে পারে। কিন্তু বয়স যাহাই হউক লোকটার স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট আছে।

লোকটা তাহার ভিজা জামা খুলিতেছিল, বলিল, "শুক্‌নো একটা কাপড় থাকে ত দে— পরি।"

"শুক্‌নো কাপড় কাঁদছে! থাকলে আমি এই ভিজে কাপড়ে থাকি!" —বলিয়া রজনী হাসিল।

"ওই ভিজে কাপড়ে থাকবি নাকি সারারাত?" লোকটা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

"তা ছাড়া কি করব?"

লোকটা "হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিছানার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা কি জিনিস পড়িয়াছিল। রজনী হঠাৎ সেইদিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ওতে কি আছে দেখি!"

এই সামান্য ব্যাপারে লোকটা এমন চটিয়া যাইবে কে জানিত। নিমেষের মধ্যে পুঁটুলিটাকে রজনীর নাগালের বাহিরে সরাইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "খবরদার বলছি, ওধারে হাত বাড়ালে হাত ভেঙে দেব।"

খর্‌খর্ করিয়া রজনী জবাব দিল, "ঈস্, কি আমার সাতরাজার ধন নিয়ে এসেছিস, ছুঁলে ক্ষয়ে যাবে!"

লোকটা এ-কথার উত্তর দিল না। পুঁটুলিটা নোংরা একটা বালিশের তলায় রাখিয়া তাহার উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কথায়-বার্তায় এতক্ষণ তাহাদের পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ বিরোধের ভাব যেটুকু কাটিয়া গিয়াছিল সেটুকু আবার এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। এই লোকটাকে শেষমুহূর্তে পয়সার লোভে ও পীড়নের ভয়ে ঘরে স্থান দেওয়ার

জন্য এখন রজনীর আফশোষ হইতেছিল। সে ত তখন ইচ্ছা করিলে চেঁচাইয়া বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিতেও পারিত। লোকটা কিছু এক মুহূর্তেই তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত না। এই উগ্র প্রকৃতির অপরিচিত লোকটার সহিত সারারাত একত্র কাটাইবার চিন্তায় রজনীর ভয় করিতে লাগিল। লোকটা খুনে-ডাকাত কি না কে জানে! সারারাত সে জাগিয়া কাটাইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। ঘরের দরজায় ভিতর হইতে চাবি দিয়া চাবিটি গোপনে আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া আলো নিভাইয়া যখন সে শুইয়া পড়িল তখন রাত প্রায় দুইটা।

অনেক রাত পর্যন্ত সে জোর করিয়া জাগিয়াছিল। কিন্তু ভোরের দিকে শরীরে আর সহিল না। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার মনে নাই।

সকালে সচকিত হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে রজনী টের পাইল বাড়িতে বিষম হট্টগোল বাধিয়াছে। বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীরা তাহার রাত্রের অতিথির কথা জানে না। কয়েকজন তাহার ঘরে ঢুকিয়া তীব্রস্বরে ভর্ৎসনাও করিতে সুরু করিয়াছে।

"হ্যাঁ লা, তোর আক্কেল কি বল্ দেখি! সদর-দরজা হাট ক'রে, নিজের দরজা খুলে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিস্!"

রজনী ধড়মড় করিয়া এবার বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই ঘরে কেহ কোথাও নাই। দরজা সত্যই খোলা!

কে আরেকজন বলিল, "আমরা সবাই ত বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছি, যদি সব চুরিই হয়ে যেত!"

কিন্তু চুরি যা হইবার রজনীরই হইয়াছে। তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া যে দরজার তালা খুলিয়াছে টাকাটি লইতে সে ভোলে নাই। রজনীর সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অশ্রুর উৎস একেবারে শুকাইয়া না গেলে সে বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিত। কিন্তু তবু কাহাকেও সে কিছু বলিল না। এই নিদারুণ প্রবঞ্চনার কথা কাহাকেও বলিয়া সে হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না।

তাহাদের রাস্তারই এক গৃহস্থবাড়িতে গতরাত্রে সিঁধ কাটিবার চেষ্টা কাহারা করিয়াছিল বলিয়া দুপুর বেলা যখন সংবাদ পাওয়া গেল তখনও মনের সন্দেহ সে মনেই চাপিয়া রাখিল।

বিশাল পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত, এমনি স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।

এই মিলনই একাধারে প্রথম ও শেষ হইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ।

দুপুর বেলা। রজনীর তখনও রান্নার আয়োজন চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া শিলে করিয়া সে বাট্‌না বাটিতেছিল, হঠাৎ দরজার সামনে একজনকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।

লোকটা দিব্য ভোল ফিরাইয়া আসিয়াছে। ফরসা কাপড়, গায়ের জামাটাও বোধ হয় নূতন। তালিমারা জুতাটায় আর কিছু না হউক বেশ করিয়া কালি মাখাইয়া চকচকে করা হইয়াছে। মাথার ঝাঁকড়া চুলের মাঝখান দিয়া লম্বা টেরি-কাটা।

তবু রজনী চিনিল। লোকটা দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। রজনী মুখ তুলিতেই কাছে আসিয়া বলিল, "কি গো চিনতে পারো?"

ঘৃণায় রাগে সহসা রজনীর সমস্ত শরীর রী রী করিয়া উঠিল। জীবনের উপর, ভাগ্যের উপর যত আক্রোশ তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়াছিল সমস্ত যেন আজ মিলিত হইয়া পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোন জবাব না দিয়া উন্মত্তের মতো নোড়াটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

নোড়াটা লাগিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় উপযুক্ত সময়ে লোকটা মাথাটা সরাইয়া লইয়াছিল। নোড়াটা প্রচণ্ড শব্দে সামনের টিনের দেওয়ালে গিয়া লাগিল।

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা শব্দ শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। লোকটা তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

নোড়ার আঘাতটা ফস্কাইয়া যাওয়ায় মনে মনে আশ্বস্ত হইলেও রজনীর রাগ তখনও যায় নাই। চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া সে জানাইতে লাগিল যে এই বদমায়েস লোকটাই সেদিন তাহাদের রাস্তার গৃহস্থ-বাড়িতে সিঁদ কাটিয়াছে এবং তাহার আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিয়া পুলিসে দেওয়া হউক।

চিৎকার শুনিয়া বাড়ির সমস্ত মেয়েরা এবং কয়েকটি পুরুষ তখন জড়ো

হইয়াছে। লোকটা এমন কাণ্ড হইবে বোধ হয় আশা করে নাই। মুখে হাসির ভান করিলেও সে এবার পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

কিন্তু এতগুলা লোক তাহাকে একা পাইয়াছে। রজনীর কথা বিশ্বাস হউক আর না হউক তাহারা এমন মজা ছাড়িবে কেন? একজন হঠাৎ সাহস করিয়া তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "শালা চোর, আবার ভদ্রলোক সেজে এসেছ!" আর যায় কোথায়! অন্য সকলে বোধ হয় এই প্রেরণাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। সকলে মিলিয়া লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল, চড়, লাথি যে যাহা পারিল মারিতে কসুর করিল না। লোকটা জোয়ান, কিছুক্ষণ সে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মারও সে সেইজন্যই বেশি খাইল। তাহার জামাকাপড় ছিঁড়িয়া আধমরা না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ কেহ নিরস্ত হইল না। বোধ হয় হাঙ্গামের ভয়েই শুধু পুলিসে দিতে তাহারা বাকি রাখিল।

রজনী মারামারিতে যথাসম্ভব যোগ দিয়াছে। এখন দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাল পাড়িতেছিল, "আঁচল থেকে টাকা খুলে নেবে না, পাজী বদ্‌মাস কোথাকার!"

বাড়ির বাহিরেও তখন পথিকদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। অতিরঞ্জিত হইয়া ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মুখে মুখে ফিরিতেছে। নানাজনে নানারকম মন্তব্যও করিতেছিল।

লোকটা তখন অবসন্নভাবে উঠানের উপর পড়িয়া। গায়ের মাথার অনেক জায়গা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। কাতরভাবে সে ধুঁকিতেছিল।

কে একজন বাহির হইতে খবর দিল যে মারামারির সংবাদ শুনিয়া পুলিস আসিতেছে।

আরেকজন বলিল, "পুলিস এলে ত যারা মেরেছে তাদেরও ছাড়বে না বাপু! চোরকে ধরিয়ে দিতে পারো, মারবার তোমরা কে? আর মার ব'লে মার! লোকটা ত মরে গেছে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, যুক্তিযুক্তও বটে। যাহারা এতক্ষণ সোৎসাহে হাত চালাইয়াছিল তাহারা যে যার সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

জনমতের গতি ফিরিয়াছে। একজন বলিল, "চোর ব'লে যে মারলে, চোর চিনলে কে শুনি? চোর কি ওর গায়ে লেখা আছে!"

বাহির হইতে একজন আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "তুমিও ত আচ্ছা লোক হে, মার খেয়ে চুপ ক'রে পড়ে আছ! থানায় চলো একটা ডায়েরি ক'রে আসি, মারার মজাটা সব টের পেয়ে যাবে!"

উঠিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই বোধ হয় লোকটা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যাহারা মারিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই পুলিসের ভয়ে রাগটা তখন রজনীর উপর গিয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতর হাঙ্গামা হইবার ভয়ে বাড়ির অধিস্বামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর কাছে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া সে বলিল, "দোষ ত এই মাগীর। 'চোর' 'চোর' ব'লে পাড়া মাথায় ক'রে তুললে কে? এখন ঠেলা সামলাক্।"

রজনীর গালাগাল খানিক আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটার এই পরিণতি দেখিয়া ভয়ে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু'একজন প্রহৃত লোকটাকে তখনও থানায় গিয়া ডায়েরি করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

বাড়িওয়ালী আবার তীব্রস্বরে বলিল, "ঢঙ্ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়! লোকটা ওইখানেই প'ড়ে থাকবে নাকি? থানা পুলিস না হ'লে সুখ হচ্ছে না, —না!"

কেন বলা যায় না, প্রহৃত হইয়াও থানায় যাইবার আগ্রহ লোকটার বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালীর ধমক্ খাইয়া ভয়বিহ্বল রজনী তাহাকে আসিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে সে নিজেই কষ্ট করিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে রজনীর কাঁধে ভর দিয়া তারই ঘরে গেল।

থানায় খবর দিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল তাহারা ইহাতে খুশি হইতে পারিল না। বাহিরের দরজার কাছে ঘোঁট অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

লোকটা কোনপ্রকার হাঙ্গামা না করিয়া রজনীর ঘরে যাওয়ায় বাড়িওয়ালী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রজনীর ঘরে ঢুকিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু মূল্যবান্ সদুপদেশ দিয়া যখন সে বিদায় হইল তখনও রজনী জল দিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলি ধোয়াইয়া দিতেছে।

বাড়িওয়ালী চলিয়া যাইবার পর লোকটা একবার উঠিবার চেষ্টা করিল।

ভীত পাংশুমুখে তাহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিয়া রজনী বলিল, "উঠছ কেন? কোথায় যাবে?"

যন্ত্রণাবিকৃত মুখেও হাসির চেষ্টা করিয়া লোকটা বলিল, "থানায় যাব নারে, যাব না। ভয় নেই! পেটটায় বড় বেদনা, বেটারা বড় জোর লাথি মেরেছে, একটু সেঁক দিতে পারিস?"

রজনী তাহার আয়োজনেই বাহিরে গেল।

নায়ক নায়িকার দ্বিতীয় মিলন এমনি করিয়াই হইল।

লোকটা কয়দিন ধরিয়া রজনীর ঘরেই আছে। মার খাইবার দিন হইতে তাহার প্রবল জ্বর। যাইবে সে আর কোথায়? রজনীকে বাধ্য হইয়াই সেবা করিতে হইতেছে। ব্র্যাপাটার সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বাড়ির আর সকলে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘরে বসাইয়া একটা লোকের দিনের পর দিন শুশ্রূষা করা রজনীর সাধ্য নয়। প্রথম দিন লোকটা পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই কোনমতে চলিতেছে। রজনী এ-দায় হইতে কোনরকমে নিষ্কৃতি পাইলেই বোধ হয় বাঁচে। পুলিসের ভয়েই সম্ভবতঃ সে এ পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করিতে পারে নাই।

কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সারিবার কোন লক্ষণ নাই! রজনীর ধৈয আর কতদিন থাকে! সকালে ঘায়ের পটি খুলিতে খুলিতে সে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিয়াছে, "ভিট্‌কেলমি ক'রে ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকা হবে শুনি? আমি আর পারব না, তা যা হয় হোক।"

'যা হয় হোক'টা পুলিসের ব্যাপার সম্বন্ধে। রজনীর সে-ভয় এখনও বুঝি একটু আছে।

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "পারবি নে কি? এতগুলো কর্‌করে টাকা কি মাগ্‌না দিলাম!"

"ঈস্, কত তোড়া তোড়া টাকাই না দিয়েছিলি! আট দিন ধ'রে ওষুধ পথ্যি সব পাঁচ টাকায় হচ্ছে— কেমন?"

"নাই বা হ'ল। তুই দিবি টাকা। হাতে হাতকড়া থেকে বেঁচে গেছিস জানিস!"

রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, "হ্যাঁ হাতে হাতকড়া সবাই দিচ্ছে! যা না তুই পুলিসে। আমিও বলতে জানি, সিঁদ-কাঠি নিয়ে প্রথম দিন ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই?"

লোকটা রাগিয়া বলে, "তুই দেখেছিস্?"

"দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে ত ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু?"

লোকটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "বুঝিছিস্ ত বুঝিছিস্? অঘোর দাস কারুকে ভয় করে না।"

নীরবে খানিকক্ষণ ঘা ধোয়ানো চলে। অঘোর এক সময় বলে, "জ্বরে জ্বরে মুখটা বড় খারাপ হয়েছে। আজ একটু অম্বল রাঁধতে পারিস?"

রজনী ঝঙ্কার দিয়া বলে, "হ্যাঁ পারি না, উনুনের ছাই রাঁধতে পারি! সখ কত! ঘায়ে পুঁজ শুকোচ্ছে না, অম্বল খাবে!"

অঘোর সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও এ-আশ্রয় পরিত্যাগ করে নাই। দিনে রাত্রে রজনীর সঙ্গে রোজ তাহার ঝগড়া বাধে। রজনী গালাগাল দিয়া বলে, "কাল যদি তুই বাড়ি থেকে দূর না হ'স ত মুড়ো ঝাঁটা মারব।"

অঘোর প্রচণ্ড শপথ করিয়া জানায় যে পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে রজনীর আর মুখদর্শন করিবে না। কিন্তু যাই-যাই করিয়া যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। ছন্নছাড়া জীবনে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভাগ্যের দ্বারা চিরদিন বুঝি সে বিতাড়িত হইয়াই ফিরিয়াছে। একটুখানি নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্থান তাহার কখনও মিলে নাই। তাই যাইতে তাহার সহজে মন ওঠে না। রজনী অন্য সময়ে গাল পাড়িলেও সকালবেলা ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার কথাটা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়।

অঘোর একেবারে অবুঝ নয়। ইতিমধ্যে একদিন বাহির হইয়া সে কয়েকটা টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রজনীর হাতে দিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফরমাস যাহা করিয়াছে তাহার বহর বড় কম নয়।

রজনী টাকা কয়টা রাগের মাথায় মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছে, "আমার টাকার দরকার নেই, অমন টাকা আমি ঢের দেখেছি। আমি কি তোর কেনা বাঁদি যে যা হুকুম করবি তাই করব!"

টাকা ফেলিয়া দেওয়ায় প্রথমটা মুখ গম্ভীর করিয়া অঘোর বলিয়াছে, "দেখ্, লোক আমি বড় ভালো নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভালো হবে না।"

কিন্তু খানিক বাদে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, "আহা, রাগ করিস্ কেন? তুই রাঁধিস্ ভালো তাই না বলছি। সাধ ক'রে কি এখানে প'ড়ে থাকি? তোর রান্না খাওয়ার পর মুখে আর কিছু রোচে না।"

"থাক, আর আদিখ্যেতায় দরকার নেই।"—বলিয়া রজনী শেষ পযন্ত নিজেই টাকাগুলা তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়াও বেশিদিন চলিল না। একদিন টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়াই অত্যন্ত কুৎসিতভাবে ঝগড়া করিবার পর অঘোর সত্যই সকালবেলা চলিয়া গেল।

বাড়িওয়ালী সংবাদ পাইয়া রজনীকে ভৎ'সনা করিয়া বলিল, "কি ব'লে যেতে দিলি তুই, তবু ত খরচটা চালাচ্ছিল!"

রজনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "খরচ চালাচ্ছিল না আর কিছু! খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল। আপদ গেছে বেঁচেছি!"

তাহার পর আপন মনেই বলিল, "এবার এলে দরজা থেকেই খ্যাংরা মেরে বিদায় ক'রে দেব।"

কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে তাহাদের দরজার কড়া নড়িয়া ওঠামাত্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া প্রথম দরজা খুলিতে যে গেল সে রজনী। অত রাত পযন্ত অকারণে কেন সে জাগিয়াছিল কে জানে!

সত্যই অঘোর ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত। জামায় কাপড়ে ধূলি কাদা লাগিয়াছে। কপালের উপরে পূর্বের যে ক্ষতটার দাগ এখনও মিলায় নাই তাহা হইতেই আবার রক্ত বাহির হইতেছে।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হয়েছে?"

"ও কিছু না!"—বলিযা পকেট হইতে অঘোর যাহা বাহির করিল তাহা দেখিয়া রজনীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এত টাকা একসঙ্গে সে কবেই বা দেখিয়াছে!

অঘোর হাত বাড়াইয়া তাহাকেই সেগুলা দিতে যাইতেছিল। রজনী সভয়ে হাতটাকে সরাইয়া বলিল, "না, না, ও চাই না।"

তাহার মনের সন্দেহ দৃঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় তাহার বাড়িয়াছে। অঘোর হাসিয়া বলিল, "কেন রে, হ'ল কি ?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে রজনী বলিল, "সত্যি বল্ দেখি, তুই চুরি করেছিস কি না !"

অঘোর তাহার দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কিয়া একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। রজনী আবার বলিল, "বল্ আমার গা ছুঁয়ে।"

"যদি ক'রেই থাকি।"

"যদি ক'রেই থাকি ! ধরা পড়লে কি হ'ত ?"

"কি আর হ'ত —জেল। আর বেশি কিছু ত নয়। সে আমার অভ্যেস আছে।"

রজনী সভয়ে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পালাতে গিয়েই কপালটা কেটেছে ত ?"

কপালের রক্তটা কাপড় দিয়া মুছিয়া অঘোর বলিল, "বেটারা ঢিল ছুঁড়ল যে !"

রজনী হতাশভাবে বলিল, "অমনি ক'রেই তুই কোন্ দিন ম'রে যাবি !"

"তা গেলেই বা কা'র কি ? অঘোর দাসের জন্যে তিনকুলে কাঁদবার কেউ নেই।"

রজনী তখন কোন কথা আর বলিল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে বিছানায় শুইয়া হঠাৎ অঘোরের গলায় হাত রাখিয়া রজনী বলিল, "একটা কথা বলব, রাখবি বল্ !"

নিদ্রাজড়িতস্বরে অঘোর বলিল, "কি ?"

"তুই আর চুরি করতে পাবি নি !"

ঘুমের ঘোরে 'আচ্ছা' বলিয়া অঘোর পাশ ফিরিয়া শুইল।

রজনী কিন্তু তাহাকে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে দিল না, হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ও রকম 'আচ্ছা' বললে হবে না, তুই দিব্যি ক'রে বল্, 'কখনও আর চুরি করব না' !"

কাঁচা ঘুম ভাঙায় অঘোব চটিযা গিযাছিল, বলিল, "তবে কি ডাকাতি ক'বে খাবো ?"

"না, তুই একটা কাজকর্ম দেখ্।"

"কাজকর্ম দেবে কে ? তুই বাজে বকিস নি, ঘুমোতে দে।"

কিন্তু রজনী ছাড়িল না। আবাব তাহাব হাত ঝাঁকানি দিযা একটু কঠিনস্বরে বলিল, "না তোকে চুবি ছাড়তেই হবে, না হ'লে এখানে আব আসতে পাবি না।"

"ও, তবেই ত আমাব গোকুল অন্ধকাব হযে যাবে।"—বলিযা অঘোব আবাব পাশ ফিরিল। কিন্তু এবারে খানিক বাদে প্রথম কথা সেই কহিল, বলিল, "কাজকর্ম পাওযা কি এতই সোজা বে। আর তা ছাড়া দলেব লোকেবা ছাড়বে কেন ? যদি বা একটা ভালো কাজ পাই, পুলিস আব দলেব লোকেবা পেছু লেগে অস্থির ক'বে দেবে না ?"

"দল তুই ছেড়ে দিবি।"

"এদেশে থাকতে আব তাব জো নেই।"

বজনী ইহাব পব অনেকক্ষণ চুপ কবিযা থাকিয়া বলিল, "তবে তুই এদেশ ছেড়ে চ'লে যা।"

অন্ধকাবেব মধ্যে অঘোবেব হাস্যধ্বনি শোনা গেল। বলিল, "তুই যাবি সঙ্গে ?"

বজনী সত্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যাব কি ক'বে ?"

দু'জনেই তাহাব পব নীবব। অঘোব একবাব খানিক বাদে বজনীকে ঠেলা দিযা জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমোলি নাকি ?"

"না।"

"তুই যেতে পাববি না কেন ?"

বজনী হতাশস্বরে বলিল, "আমাব এখানে কত দেনা, বাড়িওযালীব কাছে, কিস্তিদাবের কাছে, যেতে চাইলে তাবা ছাড়বে কেন ?"

হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া অঘোর বলিল, "আমি যদি সব দেনা শোধ ক'বে দিই !"

কিন্তু রজনীর এ-কথায বিশ্বাস নাই। বলিল, "সে অনেক টাকা। তুই পারবি কেন ?"

"হুঁ, অঘোর দাস ইচ্ছে করলে কি না পারে! তুই বল্ তাহ'লে যাবি আমার সঙ্গে? তাহ'লে তোকে সত্যি কথাটা বলি, এ-কাজে মাঝে মাঝে মাইরি ঘেন্না ধ'রে যায়। খালি সাবধান, খালি সাবধান, শুয়ে ব'সে একটু স্বস্তি নেই। চ, একেবারে দিল্লী আগ্রাই যাব চ'লে।"

রজনী কিন্তু তাহার উৎসাহে বাধা দিয়া বলিল, "তুই কি ক'রে টাকা যোগাড় করবি? এমনি চুরি ক'রে ত? সে আমার দরকার নেই।"

হাত বাড়াইয়া রজনীকে অন্ধকারে কাছে টানিয়া অঘোর বলিল, "এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি এই শেষ বার। ব্যস্, তারপর চুরিবিদ্যেয় খতম্।"

পরদিন বিকাল বেলা অঘোর নতুন একটা প্রকাণ্ড তোরঙ্গ ঘাড়ে করিয়া আনিয়া রজনীর ঘরে ঢুকিল।

রজনী বিস্ময়ে আনন্দে হাসিয়া বলিল, "ওমা, বাক্স আনতে বলেছিলাম ব'লে ওই অতবড় একটা ঢাউস জিনিস আনতে হয়? ওর ভেতর শুবি নাকি?"

অঘোর মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে তোরঙ্গের তালা খুলিয়া ফেলিল। ভেতরের জিনিসপত্র দেখিয়া রজনী ত অবাক। অঘোর কাপড়-জামা হইতে থালা গেলাস পর্যন্ত কত জিনিসই না কিনিয়া আনিয়াছে! রজনী পরিহাস করিয়া বলিল, "ঈস্ করেছিস কি? এত সাজসরঞ্জাম কেন বল্ ত?"

"বিয়ে করতে যাচ্ছি যে!"

"মরণ আর কি! আবুড়ো এমন চোয়াড়ের কাছে মেয়ে দেবে কে?" —বলিয়া রজনী হাসিতে লাগিল।

অঘোর গম্ভীর হইয়া বলিল, "না দেয়, চুরি ক'রে নেব।" রজনীর হাসি তাহার পর আর থামিতে চাহে না।

গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান্ নরনারীদের জীবন-লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়!

ভাবী-সংসার সম্বন্ধে দুইজনের ইতিমধ্যে অনেক মধুর আলাপ হইয়া গিয়াছে।

রজনী বলিয়াছে, "যাচ্ছি বটে তোর সঙ্গে, কিন্তু সেখানে যা-খুশি করবি

আর আমি মুখ বুঁজে তাই সইব মনে করিস্ নি যেন। রজনী তেমন মেয়ে নয়। অত নেশাভাঙ্ করা তোর চলবে না।"

অঘোর বলিয়াছে, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু আমিও লোক বড় ভালো নয়, বুঝেছিস্। এখানে যা করিস্ করিস্, সেখানে একটু 'বেচাল দেখলে আর আস্ত রাখব না।"

সেই রাত্রে অঘোর আবার বাহির হইল। আর কুড়িটা টাকা হইলেই রজনীর ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া তাহাদের সব খরচ কুলাইয়া যায়। অঘোর তাহাদের বিদেশ যাওয়ার উপকরণস্বরূপ অকারণে অনেকগুলা বাজে জিনিস কিনিযা পয়সা নষ্ট করিযা আসিয়াছে। রজনী সেইগুলাই বেচিয়া টাকা যোগাড় করিবার কথা বলিয়াছিল। অঘোরের আর নিজেকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। কিন্তু অঘোর সে-কথায় হাসিয়াছে মাত্র। বলিয়াছে, "অঘোর দাস জিনিস বিলিয়ে দেয়, বেচে না, বুঝেছিস্? তুই 'বাঁদা-ছাদা ক'রে সব ঠিক হয়ে ব'সে থাক্ দিকি, কাল ভোরেব গাড়িতেই কলকাতাকে কলা দেখিযে চ'লে যাব!"

□ □ □

আদালতে কাজের চাপ সেদিন অত্যন্ত বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার কোনমতে পূজার ঠাট্‌টুকু বজায় রাখিয়া বলির পর বলি শেষ করিয়া চলিতেছে। ছোটখাটো অপরাধের বিচার— রায় দিতে বিলম্ব হইবারও কারণ নাই। অনেকগুলি অপরাধীর বিচার হইয়া যাইবার পর একজন আসামী হঠাৎ কাঠগড়ায় উঠিয়া বিষম গোলমাল স্থরু করিয়া দিল। বুড়ো মদ্দ— ছাড়া পাইবার জন্য তাহার মিনতি ও শিশুর মতো কান্না দেখিয়া আদালতের লোকের পক্ষে হাসি সম্বরণ করা কঠিন।

বিচারক নামটা ভালো শুনিতে পান নাই। জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার গড় গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, আসামীর নাম অঘোর দাস, লোকটা দাগী চোর, ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে এবং সেদিন আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি।

আসামী তখন কাঠগড়া হইতে দুই হাত জড়ো করিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল— হুজুর, ধর্মাবতার তাহাকে যেন এইবারটি মাফ করেন।

সে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যই আর সে এমন কাজ করিবে না। সত্যই সে এ-পথ ছাড়িয়া দিতে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার তাহাকে ধমক্ দিলেন, পুলিসপ্রহরী একটা রুলের গুঁতা দিল, কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, চোখের জল মুছিতে মুছিতে একই কথা সে বার বার বলিতে লাগিল।

লোকটার কান্না একটু অসাধারণ হইলেও এই ধরনের বদমায়েসির সহিত বিচারকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের বক্তব্য শেষ হইবার পর তিনি রায় দিলেন। ইন্‌স্পেক্টার তাহা অনুবাদ করিয়া অঘোর দাসকে জানাইল। পাঁচ বৎসর তাহার জেল হইয়াছে।

অঘোর দাস খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা একেবারে অদ্ভুত। দেখা গেল, হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুঙ্কার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।

পুলিসপ্রহরী ও কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সেই মুহূর্তে তৎপর হইয়া তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে কি কেলেঙ্কারি যে হইত কে জানে! তারপর তাহারা তাহাকে পিছমোড়া করিয়া ধরিয়া রুলের গুঁতা দিয়া আবার কাঠগড়ায় আনিয়া ফেলিল। সে উন্মত্তের মতো তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে তখনও গর্জাইতেছে।

বিচারক বয়সে নবীন এবং সত্যই ভালো লোক। তাঁহার হৃদয় মন এখনও কঠিন হইয়া উঠে নাই। বিচার জিনিসটা এখনও তাঁহার কাছে শুষ্ক আইনের প্রয়োগকৌশল মাত্র নয়। আসামীর পিছনে রক্তমাংসের মানুষ আছে ইহা এখনও তাঁহার স্মরণ থাকে।

লোকটার অস্বাভাবিক কান্নার পর এই প্রকার আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল লোকটার এই অদ্ভুত ব্যবহারের গূঢ় কোন অর্থ থাকিতেও পারে।

বিচারককে আক্রমণের অপরাধে আসামীর নূতন করিয়া বিচার হইল। বিচারক মহাশয় এবারে শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করিয়া ত দিলেনই, মনে মনে

সঙ্কল্প করিলেন তাহার সম্বন্ধে কর্মচাবীকে দিয়া ভালো করিয়া পবে খোজ লইবেন।

. . . . . .

বিচাবকমহাশয অবশ্য নানা কাজেব চাপে সেকথা ভুলিয়া গিযাছেন। তাঁহাবই বা দোষ কি! অঘোব দাস এখনও জেলে পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষার রাতে এখনও নিশ্চয কলিকাতাব একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধাবে কেবাসিনের ডিবিযাব ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিযার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে আডাল করিযা গভীব রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয বিগতযৌবনা রূপহীনা বজনী একবাত্রেব অতিথিব জন্য হতাশনযনে পথের দিকে চাহিযা প্রতীক্ষা কবে।

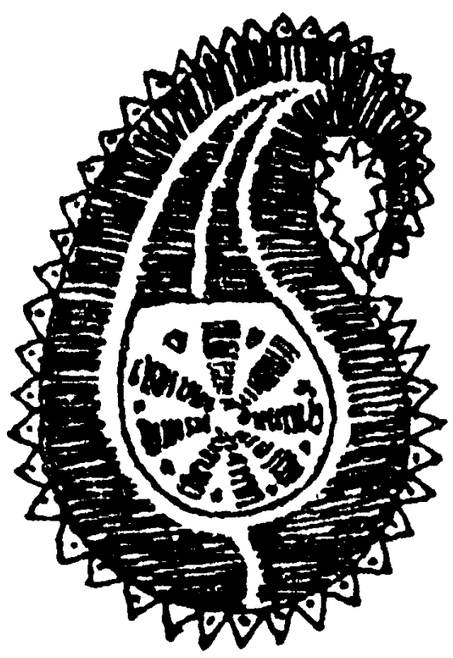

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মাঘ মাস ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানী গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত—যদিও নিষেধের নোটিশ লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধী-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিস-সমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্টস। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি. এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি, প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইন্ডিয়ান কম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কম্পানির নিয়মাবলী বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই. বি. রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংসভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন, এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।' বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন—'গঙ্গাজলের বোতলটা আন, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, বা ধুলো হয়েছে।' বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্তপ্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই যে শ্যাম-দা, অনেকক্ষণ এসেছেন

বুঝি? বড় দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?'

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল ব'লে।

অটলবাবু চাপকান-চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার-রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বুড়ো রাজী হ'ল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কি ক'রে?'

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কী রাজী হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেণ্টর কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম —কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২ টাকা ফী পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে।

শ্যাম। তাতে বড় হুঁশিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম—মশায় আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হ'তে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব, কিন্তু বেশী নয়, ডিরেক্টর হ'তে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশী নেব না। আজ মত স্থির ক'রে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

অটল। অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যাম-দা। আচ্ছা মহারাজাকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজাকে ধরতে বড়-শিকারী চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

'রাম রাম বাবুসাহেব

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে পালিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মলমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন—'আসুন, আসুন—ওরে বাছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি

হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।'

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জান-পহচান হয়ে বড় খুশ হ'ল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা ব'সে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিচ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

রাম রাম বাবুসাহেব

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে ক'রো না। ইংরেজী ভাল না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কি ক'রে?

গণ্ডেরি। বহুত বাঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অনেক পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হ'ল?'

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

অটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই ক'রে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম আর আর্টিকল্‌সের মুসাবিদা এনেছি। শ্যাম-দা, প্রসপেক্টসটা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোন। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা--দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ-পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকী টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন-মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনও কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রিসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থ-ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের হস্তে কার্য-নির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনও প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরিরাম বাট-পারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M. A., B. L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি. সি. চৌধুরী, B. Sc., A. S. S (U.S.A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেল কবে?'

শ্যাম। আর বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রী দিলে? ডিরেক্টর হ'তে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হ'ল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে প'রে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন—

মেসার্স ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটলবাবু বলিলেন—'কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।'

গণ্ডেরি। কুছ দরকার নেই! শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০৲ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালা-ওয়েন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে ঈসিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্ব-পীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার ব'লেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরি। ভালা বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তাণী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০৲ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরি। হম্দ্ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়—বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কি হ'ল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড-উইল হিসেবে পনের হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরি। আচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—স্বপন-উপন সব ঝুট, ছক্‌লায়কে রুপয়া লিয়া—তব্?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিসডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক, একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাততঃ দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধ-প্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recoveryর ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগলসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরি। বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মে নেহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

ঐসী গতি সন্‌সারমে

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আর ক'মে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখব।

গণ্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্ততঃ ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেণ্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরি। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়লোক আছেন।

গণ্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতী থাকবে। মেনেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং

এজেন্টস্‌দের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তার পর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকী কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গণ্ডেরি। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সির্ফ পচাস হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধ'রে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বদলাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবীরজী কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট
এক পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট॥

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খান্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জান। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মেরো না।'

গণ্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ?

গণ্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ—যো গায় ভ'ইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনা-বাদাম তল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হজার লাগাই, সাড়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডারজী—

গণ্ডেরি। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরি।

অটল। হাঁ, হাঁ, গণ্ডেরিজী। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গণ্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্‌ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পড়ি, রামভজন ভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি ব'লে?

গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হলুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্‌ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হমার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে—জানে

রন্‌ছোড়জী—হমার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছ্‌ করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গণ্ডেরি। কিয়েছে তো কি হইয়েছে? সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্‌? তদারক কোন্‌ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্‌ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্‌ দিয়েছি তব্‌ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরির।

গণ্ডেরি। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্‌ জগেমে খরচ্‌ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম স'য়কড়া পাঁচ রুপয়া দস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্‌ যদি সোলহ্‌ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস'সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা!

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যাম-দা গণ্ডেরি-দা যেন মানিকজোড়।

গণ্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পড়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্‌ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন—

বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখ্‌ন চলছি, রেস খেলনে। কোশ্চ্চি গেরিল ঘোড়ে পর্‌ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যাম-দা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যঃস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলী, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো, এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দুরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক-টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—'দেখুন স্বামীজী, হিসেবই হ'ল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনও ভয় নেই।'

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক ক'রে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টর্স্ ফী বাবদ কিছু বেশী খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হ'ল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন—ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হ'লে কতকালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি ক'রে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম ব'লে আমার নাম ছিল। মন্দির টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গণ্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবী লোক—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

'ঠাঁই হয়েছে'—চাকর আসিয়া খবর দিল।

'উঠতে আজ্ঞা হ'ক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটলবাবু, চল হে বিপিন।' তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন—'করেছেন কি রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না!'

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ ক'রে দেখবেন। শাক-ভাজা, কড়াইয়ের ডাল—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এ'চোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুষ্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি

জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্‌, উস্‌প্‌, উস্‌প্‌। প্রাণায় আপনায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্‌। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'লে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধ'রে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার বার তো রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও—

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত ক'রব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে সে হ'লে চলবে না। খরচ—তা আমি যথা সম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার ব'সে ব'সে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম। আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড-পাণ্ডা ক'রে দেব। এখনি গোটা-পনর দরখাস্ত এসেছে—তার মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরনো কাঁসর আছে—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটী কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম। নিশ্চয়ই নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

... ...

গণ্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন—'আর কেন শ্যাম-দা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।'

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি ক'রে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন্-ল কোম্পানির মরসুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম। আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে,—গণ্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

... ...

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানীর আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিতেছিলেন —'আ—আ—আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার—সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তার পর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানী, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে

আ—আ—আমি জানতে চাই

দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড় একটা আসে না।'

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংএ আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন—'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না — জমি-কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট-তৈরী, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস-খরচ—'

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'ব্যাপার কি?'

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক ক'রে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না—আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—'সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা call-এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।'

গণ্ডেরি বলিলেন—'আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।'

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন ক'রে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল?

গণ্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংএ প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুল-চুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা—তা—আমি চট্ ক'রে কথা দিতে পারিনে। ভেবে-চিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোল শ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না—আপনি কেনা-দাম ৩২০০৲ টাকা মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁঃ, ভাল ক'রে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ শ—দু-হাজার—হাজার—

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হ'তে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধ'রে দিন! ধরুন—পাঁচ শ টাকা। ট্রান্সফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে—নিয়ে এস তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ—আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়ই লোকসান হ'ল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরি। বাহবা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া!

কুছ্‌ভি নহি

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গনিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—'তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা-দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।'

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হাম্‌বগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক উঠে-প'ড়ে লাগতে হ'ল—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।'

গণ্ডেরি। অপ্‌নের কুছ্‌ তকলিফ করতে হোবে না। কোম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তা হ'লে কি বলতে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুম্‌ভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়ি-বাবু, শ্যামবাবুকা কারবারই নহি সমঝা? নব্বে হজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ ব্যদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটর সিকিন্ড কল আদায় করবে, তব্‌ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিণ্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি। আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল—আজ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।'

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি—

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গণ্ডেরি। রাম রাম!

ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৯ (১৯২২)

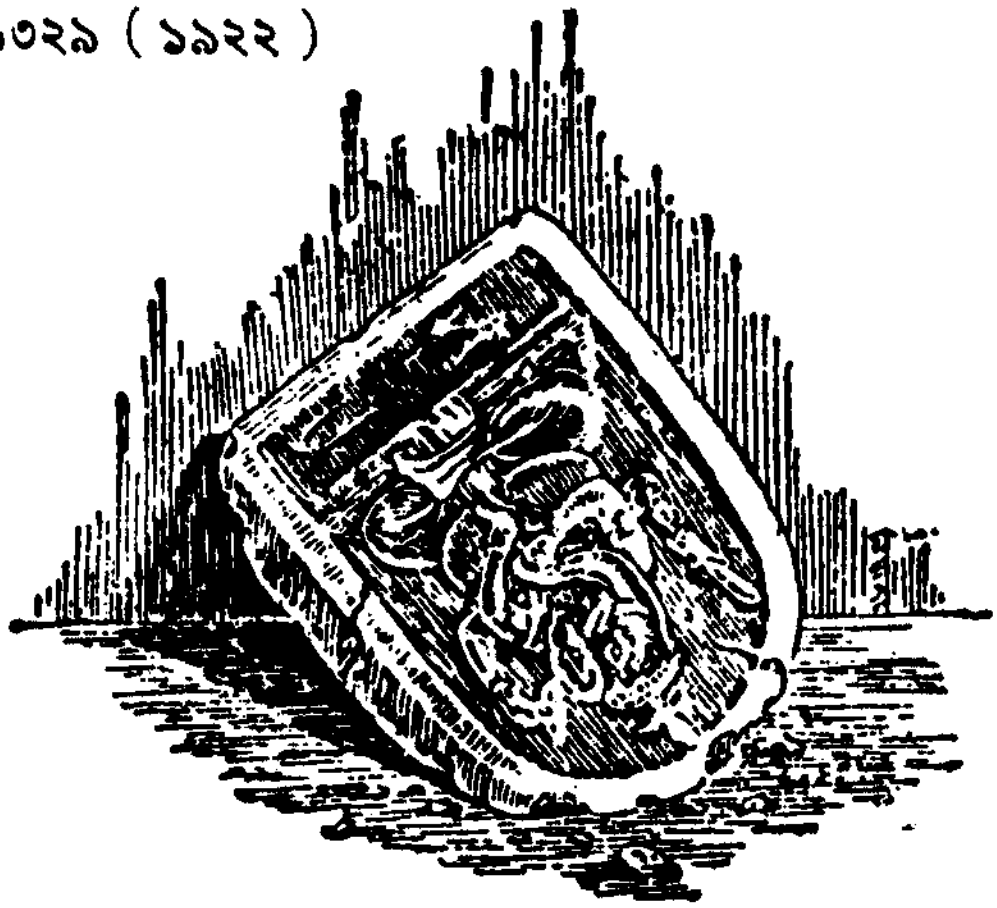

উলটপুরাণ

রিচমণ্ড বঙ্গ-ইঙ্গীয় পাঠশালা। মিস্টার ক্র্যাম (পণ্ডিত মহাশয়) এবং ডিক টম হ্যারি প্রভৃতি বালকগণ

ক্র্যাম। চটপট নাও, চারটে বাজে। ডিক, ইতিহাসের শেষটুকু প'ড়ে ফেল।

ডিক। 'ইওরোপের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। জাতিতে জাতিতে দ্বেষ হিংসা বিবাদ দূর হইয়াছে। প্রবলপরাক্রান্ত ভারত-সরকারের দোর্দণ্ডশাসনের সুশীতল ছায়ায়'—দোর্দণ্ড মানে কি পণ্ডিত মশায়?

ক্র্যাম। দোর্দণ্ড জান না? The big rod. Under the soothing influence of the big rod.

ডিক। 'সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া সমস্ত ইওরোপ ধন্য হইয়াছে। আয়ারল্যাণ্ড হইতে রাশিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড হইতে সিসিলি, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স এখন আর জার্মানির গলা কাটিতে চায় না, ইংলণ্ড আর জাতিতে জাতিতে বিবাদ বাধাইতে পারে না, অস্ট্রিয়া ও ইটালিতে আর মেতিপুকুরের দখল লইয়া মারামারি করে না।' মেতিপুকুর কোন্‌টা পণ্ডিতমশায়?

ক্র্যাম। ঐ সামনে মানচিত্র রয়েছে দেখ না। ইটালির কাছে যে সমুদ্র সেইটে। সেকালে নাম ছিল মেডিটেরেনিয়ান। ইণ্ডিয়ানরা উচ্চারণ ক'রতে পারে না ব'লে নাম দিয়েছে মেতিপুকুর। সেইরকম আল্‌স্টারকে বলে বেলেস্তারা, সুইট্‌সারলাণ্ডকে বলে ছছুরাবাদ, বোর্দোকে বলে ভাঁটিখানা, ম্যাঞ্চেস্টারকে বলে নিম্‌তে। তার পর প'ড়ে যাও।

ডিক। 'ইওরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে, পরকালের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। ভারত-সন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই পাণ্ডববর্জিতদেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।' আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, এসব কি সত্যি?

ক্র্যাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্যি বইকি।

ডিক। কিন্তু বাবা বলেন সব bosh।

ক্র্যাম। তোমার বাবার আর বলতে বাধা কি। তিনি হলেন উকিল, আমার মতন তো আর সরকারের মাইনেয় নির্ভর করতে হয় না।

ডিক। 'হে সুবোধ ইংরেজশিশুগণ, তোমরা সর্বদা মনে রাখিও যে ভারত সরকার তোমাদের দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যাহাতে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও।'

টম। বু—হু হু হু—

ক্র্যাম। ও কি রে, শীত করছে বুঝি? আবার তুই ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে এসেছিস! বাঙালীর নকল করতে গিয়ে শেষে দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবি।

টম। বাবার হুকুম পণ্ডিত মশায়। আজ পাঠশালের ফেরত খাঁসাহেব গবসন টোডির পার্টিতে যেতে হবে। তিনি নতুন খেতাব পেয়েছেন কিনা। সেখানে বিস্তর ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আসবেন, তাই বাবা বললেন, দেশী পোশাক পরা চলবে না।

ক্র্যাম। তা বাঙালী সাজতে গেলি কেন? ইজের-চাপকান পরলেই পারতিস।

টম। আজ্ঞে, বাবা বললেন, বাঙালীই সবচেয়ে সভ্য তাই—ব্রর্ র্ র্—

ক্র্যাম। যা যা শীগ্‌গির বাড়ি যা, অন্তত একটা শাল মুড়ি দিগে যা। ও কি, হোঁচট খেলি নাকি?

হ্যারি। দেখুন দেখুন, টম কি রকম কাছা দিয়েছে, যেন স্কিপিং রোপ!

ধর্মযাজকগণের মুখপত্র 'দি কিংডম কাম'
হইতে উদ্ধৃত।

সর্বনাশের আয়োজন হইতেছে। ভারতসরকার আমাদের ধনপ্রাণ হস্তগত করিয়াছেন—আমরা নিরীহ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করি নাই, কারণ ইহলোকের পাঁউরুটি ও মাছের উপর আমাদের লোভ নাই এবং সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু আজ এ কি শুনিতেছি? আমাদের ধর্মের উপর হস্তারোপ! ঘোড়দৌড় বন্ধ করার জন্য আইন হইতেছে। অ্যাসকট, এপসম প্রভৃতি মহাতীর্থ কি শেষে শ্মশানে পরিণত হইবে? বিশপ স্টোনিব্রোক নাকি গভর্নমেন্টকে জানাইয়াছেন যে ধর্মশাস্ত্রে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ নাই, অতএব রেস বন্ধ করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মের হানি হইবে না। হা, একজন ধর্মযাজকের মুখে এই কথা শুনিতে হইল! বিশপ কি জানেন না যে, রেস খেলা ব্রিটিশ-জাতির সনাতন ধর্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও উপর? আরও ভয়ানক সংবাদ—শীঘ্রই নাকি মদ্যপান রোধ করার উদ্দেশ্যে আইন হইবে। আমাদের শাস্ত্রসম্মত সনাতন পানীয় বন্ধ করিয়া ভারতসরকার কি ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াইতে চান?

'রাষ্ট্রবিৎ'—যাহার সঙ্গে সংযুক্ত আছে 'ইঙ্গবন্ধু'
হইতে উদ্ধৃত

আমরা খাঁসাহেব গবসন টোডিকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। দেশী লোকের ভাগ্যে এত বড় উপাধি এই প্রথম মিলিল। আমরা কিন্তু সরকারকে সাবধান করিতেছি—এই সকল উচ্চ উপাধি যেন বেশী সস্তা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় রায়সাহেব খাঁবাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং তাহাতে ইওরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে। নাইট, ব্যারন, মার্কুইস, ডিউক প্রভৃতি দেশী উপাধিই সাহেবদের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা হউক, মিস্টার টোডি যখন নিতান্তই খাঁসাহেব টোডি হইয়া

গিয়াছেন, তখন তাঁহার অতি সন্তর্পণে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলা উচিত। আশা করি, তিনি রাজদ্রোহী লিবার্টি-লীগের ছায়া মাড়াইবেন না।

গবসন টোডির অন্দরমহল। মিসেস টোডি, তাঁহার দুই কন্যা ফ্লফি ও ফ্ল্যাপি এবং তাহাদের শিক্ষয়িত্রী জোছনা-দি

জোছনা। ফ্ল্যাপি, তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠি নে বাছা। ওই রকম ক'রে বুঝি চুল বাঁধে? আহা কি ছিরিই হয়েছে! কান দুটো যে সবটাই বেরিয়ে রয়েছে। এতখানি বয়স হ'ল কিছুই শিখলে না। দেখ দিকি, তোমার দিদি কি সুন্দর খোঁপা বেঁধেছে!

ফ্ল্যাপি। Let her। কানের ওপর চুল পড়লে আমি কিচ্ছু শুনতে পাই না। আমি ঘাড় ছাঁটবো, ও-বাড়ির মিস ল্যাংকি গসলিং-এর মতন।

জোছনা। হ্যাঁ ঘাড় ছাঁটবে, নাড়া হবে, ভুরু কামাবে, রূপ একেবারে উথলে উঠবে। দেখাবে যেন হাড়গিলেটি। পড়তে শাশুড়ীর পাল্লায়—

ফ্ল্যাপি।

Little Pussy Friskers
Shaved off her whiskers ;
And sharpening her paw
Scratched her mum-in-law.

জোছনা। কি বেহায়া মেয়ে। মিসেস টোডি, আপনার ছোট মেয়েকে দুরস্ত করা আমার সাধ্য নয়।

মিসেস টোডি। ছি ফ্ল্যাপি, তুমি দিন দিন ভারী বেয়াড়া হচ্ছ। জোছনা-দি তোমাদের শিক্ষার জন্য কত মেহনত করেন তা বোঝ?

ফ্ল্যাপি। আমি শিখতে চাই না। উনি ফ্লফিকে শেখান না।

জোছনা। আবার 'ফ্লফি'! দিদি বলতে কি হয়? অ্যাঁ ও কি—ফের তুমি পেনসিল চুষছ! ছি ছি, কি নোংরা! আচ্ছা, এখন তুমি ও-ঘরে গিয়ে সেই উর্দু গজলটা অভ্যাস কর।

মিসেস টোডি। জোছনা-দি, আপনার ডিবে থেকে একটা পান নেব? থ্যাংক ইউ।

জোছনা। দেখুন মিসেস টোডি, কথায় কথায় থ্যাংক ইউ—প্লীজ—সরি এগুলো বলবেন না। ভারী বদ অভ্যাস এর জন্যেই আপনাদের জাতের উন্নতি হচ্ছে না। ওরকম তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা বা দুঃখ জানানো আমরা ভণ্ডামি ব'লে মনে করি। নিন একটু দোক্তা খান।

মিসেস টোডি। নো, থ্যাংক্‌স,—থুড়ি। দোক্তা খেলেই আমার মাথা ঘোরে। বরং একটা সিগারেট খাই।

জোছনা। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। আপনি একটু চেষ্টা ক'রে দোক্তা ধরুন।

মিসেস টোডি। কিন্তু দু-ই তো হল তামাক?

জোছনা। তা বললে কি হয়। একটা হ'ল ধোঁয়া আর একটা হ'ল ছিবড়ে। ধোঁয়া পুরুষের জন্যে, আর ছিবড়ে মেয়েদের জন্যে। ফ্লফি, তোমার সেই বাংলা উপন্যাসখানা শেষ হয়েছে?

ফ্লফি। বড় শক্ত, মোটেই বুঝতে পারছি না।

জোছনা। বোঝবার বিশেষ দরকার নেই, কেবল বাছা বাছা জায়গা মুখস্থ ক'রে ফেলবে। লোককে জানানো চাই যে বাংলা ভাল ভাল বইএর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমার উচ্চারণটা বড় খারাপ। সভ্যসমাজে মিশতে গেলে চোস্ত বাংলা উচ্চারণ আগে দরকার, আর গোটাকতক উর্দু গান। আচ্ছা, তুমি বাংলায় এক দুই তিন চার ব'লে যাও দিকি।

ফ্লফি। এক দুই তিন শাড়—

জোছনা। শাড় নয়, চার।

ফ্লফি। চার পাইচ—

জোছনা। পাইচ নয়, পাঁচ।

ফ্লফি। পাঁইশ—

জোছনা। পাঁ—চ।

ফ্লফি। ফ্যাঁচ—

জোছনা। মাটি করলে। মিসেস টোডি, ফ্লফিকে বেশী চকোলেট খেতে দেবেন না, ছোলাভাজার ব্যবস্থা করুন, নইলে জিবের জড়তা ভাঙবে না। দেখ ফ্লফি, আর এক কাজ কর। বার বার আওড়াও দিকি—রিশড়ের আড়পার খড়দার ডান ধার—ছাঁদনাতলায় হোঁতকা হোঁদল।

নেপথ্যে গবসন টোডি। ডিয়ারি—

মিসেস টোডি। কু! কোথায় তুমি?

গবসন টোডি। বাথরুমে। আরও গোটাকতক আম দিয়ে যাও।

জোছনা। বাথরুমে আম?

মিসেস টোডি। তা ভিন্ন আর উপায় কি। গবি বলে, আম যদি খেতে হয় তবে ভারতীয় পদ্ধতিতেই খাওয়া উচিত। অথচ আপনাদের মতন হাত দুরস্ত নয়,—পোশাক কার্পেট টেবিল-ক্লথে রস ফেলে একাকার করে। তাই গবিকে বলেছি বাথরুমে গিয়ে আম খাওয়া অভ্যাস করতে। সেখানে দু-হাতে আঁটি ধ'রে চুষছে আর চোয়াল ব'য়ে রস গড়াচ্ছে। Horrid!

জোছনা। ঠিক ব্যবস্থাই করেছেন। দেখুন মিসেস টোডি, আপনি যে স্বামীকে 'গবি' বলছেন, ওটা সভ্যতার বিরুদ্ধে। আড়ালে গবি হাবি যা খুশি বলুন, কিন্তু অপরের কাছে নাম করবেন না। দরকার হ'লে বলবেন—'উনি'। আর যদি অতটা খাতির না করতে চান, তবে বলবেন—'ও'।

মিসেস টোডি। তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি বসুন একটু। আমি ওকে আম দিয়ে আসছি।

'রাষ্ট্রবিং'-এর বিজ্ঞাপনস্তম্ভ হইতে।

বিশুদ্ধ আনন্দনাড়ু। চর্বিমিশ্রিত ইংরেজী বিস্কুট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের আনন্দনাড়ু খান। দাঁত শক্ত হইবে। কেবল চালের গুঁড়া ও গুড়। যন্ত্রদ্বারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া। এক ঠোঙা পাঁচ শিলিং। সর্বত্র পাওয়া যায়। নির্মাতা—রসময় দাস, টিকটিকি বাজার, কলিকাতা।

অম্বুরী বরুণ। মেমগণের দুঃখ এইবার দূর হইল। এই আশ্চর্য গুঁড়া মুখে মাখিলে ফ্যাকাশে রং দূর হইয়া ঠিক বাঙালী মেয়ের মতো রং হইবে। যদি আর

একটু বেশী ঘোর করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে একটু বের্দিগ্রীন মিশাইয়া লইবেন। রামচন্দ্রজী উহা মাখিতেন। দাম প্রতি পুরিয়া পাঁচ শিলিং। বিক্রেতা—শেখ অজহর লেডেনহল স্ট্রীট, ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

আগামী আশ্বিন মাসে এই লণ্ডন নগরে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ বসিবে। স্বয়ং মহাক্ষত্রপ ভারতসরকারের প্রতিনিধিরূপে এই যজ্ঞের যজমান হইবেন। হোতা, ঋত্বিক মোল্লা, মওলানা প্রভৃতি ভারত হইতে আসিবেন। দুই মাস ব্যাপিয়া দীয়তাং ভূজ্যতাং চলিবে, খরচ জোগাইবে অবশ্য এই গরীব ইওরোপবাসী।

সমস্ত ইওরোপের শোষণকার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই। ভারতমাতা তাঁহার খরজিহ্বা লকলক করিয়া বলিতেছেন—হে সপত্নীপুত্রগণ, আনন্দ কর, আর একবার ভাল করিয়া তোমাদের হাড় চাটিব।

ঠিক ঐ সময়েই হাগ-নগরে প্যান-ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের অধিবেশন হইবে। হে ব্রিটন, জন-অ-গ্রোট্স হইতে ল্যাণ্ডস্-এণ্ড পর্যন্ত যে যেখানে আছ, দলে দলে সর্বরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে যোগ দাও। যদি তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে তবে রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিসীমায় যাইও না। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যাণ্ড —যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই—এইবার বিয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। তোমার ভেড়ার লোম ছাঁটামাত্রই পঞ্জাবে যাইতেছে এবং তথা হইতে বনাত কম্বলরূপে ফিরিয়া আসিয়া তোমার অঙ্গে উঠিতেছে। ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়াছে। হায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছে। তোমার ভাল ভাল গো-বংশ ভারতে নির্বাসিত হইয়াছে, সেখানকার হিন্দু-মুসলমান ক্ষীর-ছানা ঘি খাইয়া নির্দ্বন্দ্বে মোটা হইতেছে। বিয়ার হুইস্কির আস্বাদ তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, ভারতের গাঁজা আফিম তোমার মস্তিষ্কে শনৈঃ শনৈঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তোমার সর্বনাশের উপরে ভারত তাহার ভোগবিলাসের বিরাট মন্দির খাড়া করিয়াছে। তুমি ডিসেম্বরের শীতে পর্যাপ্ত কয়লার অভাবে হিহি করিয়া শিহরিতেছ, ওদিকে তোমারই অর্থে শেভিয়ট হিলে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়াইয়া কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করা হইয়াছে; কারণ, ভারতীয় আমলাগণ শীতকালে সেখানে অপিস করিবেন —লণ্ডনের শীত তাঁহাদের বরদাস্ত হয় না।

হে বহুধাবিভক্ত আত্মকলহপরায়ণ ইওরোপীয়গণ, এখনও কি তোমরা তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিবে না? এখনও কি অ্যাংলো-সেল্টিক দ্বন্দ্ব, ফ্রাঙ্কো-জার্মান দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব বন্ধ হইবে না?

হাইড পার্ক। বক্তা—সার ট্রিক্সি টার্নকোট।
শ্রোতা—তিন চার হাজার লোক।

টার্নকোট। মাই কাণ্ট্রিমেন, তোমরা আজ আমাকে যে দু-চার কথা বলবার সুযোগ দিয়েছ তার জন্য বহু ধন্যবাদ। তোমাদের কি বলে সম্বোধন করব খুঁজে পাচ্ছি না,

কারণ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদেশবাসী ভগবানের নির্বাচিত মানবগণ, হে ব্রিটন-স্যাকসন-ডেন-নর্মান বংশোদ্ভব ইংরেজ জাতি—।

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। ইংরেজ নয়, বলুন ব্রিটিশ জাতি। স্কচরা কি ভেসে এসেছে নাকি?

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ জাতি, একবার তোমাদের সেই প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ কর। হে হেস্টিংস-ক্রেসি-এজিনকোর্টের বীরগণ, যাদের বিজয়পতাকা একদিন ইংলান্ড, স্কটলান্ড, আয়ারলান্ড, ফ্রান্সে—

ম্যাক্‌ডুড্‌ল। মিথ্যে কথা। স্কটলান্ডে তোমাদের বিজয়পতাকা কোনও কালে ওড়ে নি।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা, স্কটলান্ড বাদ দিলুম। যাদের বিজয়পতাকা একদিন আয়ারলান্ড ফ্রান্সে—

ও' হুলিগান। Oireland ! Say it again !

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। বিজয়পতাকা কোথাও ওড়ে নি। হে ইংলিশ-স্কচ-আইরিশ-মিশ্রিত-ব্রিটিশ জাতি—

ও' হুলিগান। Begorrah ! আমরা ব্রিটিশ নই,—সেলটিক।

টার্ন্‌কোট। আচ্ছা, আচ্ছা। হে ব্রিটিশ ও সেলটিক ভাইসকল আজ তোমরা কেন সমবেত হয়েছ?

ও' হুলিগান। Sure, Oi don't know।

টার্ন্‌কোট। কেন এখানে সমবেত হয়েছ তাও কি ব'লে দিতে হবে? হে হতভাগ্যগণ, তোমাদের এই পৈতৃক দেশের বুকের ওপর কোন্ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে তার খবর রাখ? রাজসূয় যজ্ঞ। ভারতসরকার মহা আড়ম্বর ক'রে তাঁর ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমের পসরা খুলে বসবেন, আর সমস্ত ইওরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে মহাক্ষত্রপকে কুর্নিশ ক'রে বলবেন—ভারতসরকার কি জয়! এই আউট্‌ ল্যান্ডিশ কান্ড এই স্যাক্রিলেজ—

(লর্ড ব্লার্নির বেগে প্রবেশ)

লর্ড ব্লার্নি জনান্তিকে। আরে তুমি কি বলছ সার ট্রিক্‌সি! নিজের সর্বনাশ করছ? আমি কত ক'রে ক্ষত্রপকে ব'লে-ক'য়ে এসেছি যেন Chiltren Hundreds-এর দেওয়ানিটা তোমাকেই দেওয়া হয়। কি আরামের চাকরি, একেবারে sine cure। ক্ষত্রপের ইচ্ছে চাকরিটা টোডিকে দেন, কিন্তু আমার একান্ত মিনতি শুনে বলেছেন বিবেচনা করে দেখবেন। এখনই খবর আসবে, আর এদিকে তুমি রাজদ্রোহ প্রচার করছ!

টার্ন্‌কোট। বটে বটে? আচ্ছা, আমি সামলে নিচ্ছি।

জনতা হইতে। Go on Tricksy, go on।

টার্ন্‌কোট। হ্যাঁ, তার পর কি বলছিলুম—হে আমার দেশবাসিগণ, এই ঘোর দুর্দিনে তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা কি এই যজ্ঞে এই বিরাট তামাশায় যোগ দেবে?

জনতা হইতে। Never, never।

বিল স্নুক্‌স। Say guv'nor will they stand treat? মদ ক পিপে আসবে?

টার্নকোট। এক ফোঁটাও নয়। কেবল বাতাসা বিলি হবে। হে বন্ধুগণ, এই মহাযজ্ঞে তোমাদের স্থান কোথায়?

লর্ড ব্লার্নি। আঃ, কি বলছ টার্নকোট!

টার্নকোট। ঘাবড়ান কেন, শুনুন না। হে বন্ধুগণ, এই বিরাট যজ্ঞে কি তোমরা যাবে?

জনতা হইতে। বরং শয়তানের কাছে যাব।

টার্নকোট। না, না, সেটা ভালো দেখাবে না। তোমাদের যেতেই হবে—না গিয়ে উপায় নেই, কারণ ভারতসরকার স্বয়ং তোমাদের আহ্বান করেছেন।

লর্ড ব্লার্নি। হিয়ার, হিয়ার।

জনতা হইতে। মিয়াও, মিয়াও।

টার্নকোট। দোহাই তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। মনে রেখো ভারতের সহানুভূতি না পেলে আমাদের গতি নেই—আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারের দয়ার উপর—(পচা ডিম)—এঃ, চোখটা খুব বেঁচে গেছে। হে বন্ধুগণ, আমি কর্তব্য-পালনে ভয় খাই না, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি তাই অকপটে বলব।

লর্ড ব্লার্নি। বাঃ, ঠিক হচ্ছে। ঐ যে টেলিগ্রাম নিয়ে আসছে। ব্রেভো সার ট্রিক্‌সি, নিশ্চয় ক্ষত্রপ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। আমি প'ড়ে দেখছি, তুমি থেমো না, বক্তৃতা চলুক।

টার্নকোট। হে ভাই-সকল, আমি যা বলছি তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই।—ব্লার্নি, খবর কি হে?—হে প্রিয় বন্ধুগণ, দেশের মঙ্গলের জন্য আমি সকল রকম লাঞ্ছনা ভোগ করতে প্রস্তুত। তোমাদের ঐ বেরালডাক আমারই জয়ধ্বনি। তোমাদের এই পচা ডিম আমি মাথা পেতে নিলুম। যদি তোমাদের তূণীরে আরও কিছু নিগ্রহের অস্ত্র থাকে—(বাঁধকপি)—নাঃ, আর পারা যায় না! ব্লার্নি বল না হে, কি লিখেছে?

ব্লার্নি। পুওর ট্রিক্‌সি! শেষটায় টোডি ব্যাটাই চাকরি পেলে। নেভার মাইন্ড, তুমি হতাশ হয়ো না। আবার একটা সুবিধা পেলেই তোমার জন্য চেষ্টা করব। ক্ষত্রপটা অতি গাধা। এটা বুঝলে না যে টোডি তো পোষ মেনেই আছে। আর তুমি হ'লে এত বড় একটা ডিমাগগ—তোমাকে হাত করবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে! ছি ছি!

টার্নকোট। ড্যাম টোডি অ্যান্ড ড্যাম ক্ষত্রপ। হে আমার স্বদেশবাসিগণ—

জনতা হইতে। Shut up! kick him—lynch the traitor!

টার্নকোট। না, না, আগে আমাকে বলতেই দাও। এই রাজসূয় যজ্ঞে তোমাদের যেতেই হবে। কেন যেতে হবে? বাতাসা খেতে? সেলাম করতে? ভারতসরকারের জয়জয়কার করতে? নেভার। সেখানে যাবে যজ্ঞ পণ্ড করতে, লণ্ডভণ্ড করতে—ভারতসরকার যেন বুঝতে পারে যে তামাশা দেখিয়ে আর বাতাসা খাইয়ে তোমাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

জনতা হইতে। Long live Tricksy! Turncoat for ever!

নারীজাতির মুখপত্র 'দি শিম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

কাল বৈকালে ঠিক তিনটার সময় নিখিল-ব্রিটিশ-নারী-বাহিনীর শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রিজেণ্ট পার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পোর্টলাণ্ড প্লেস, রিজেণ্ট স্ট্রীট,

পিকাডিলি সার্কাস, ট্রাফালগার স্কোয়ার হইয়া এই বিরাট প্রসেশন পার্লামেন্ট হাউসে পৌঁছিবে।

হাজার হাজার বৎসর হইতে পুরুষজাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আর তাহাদের চালাকি চলিবে না। আমরা সবলে নিজের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইব। আমরা ভোটের অধিকার যাহা পাইয়াছি তাহা একেবারে ভুয়া। জুয়াচোর পুরুষগণ ছলে বলে কৌশলে ভোট যোগাড় করিয়া রাষ্ট্রীয়-পরিষৎ প্রায় একচেটে করিয়াছে। এ ব্যবস্থা চলিবে না। ব্রিটেনের লোকসংখ্যার শতকরা ষাটজন নারী। আমরা এই অনুপাতেই নারীসদস্য চাই। সরকারী চাকরিতেও আমরা শতকরা ষাটজন নারী চাই। পুরুষের চেয়ে কিসে আমরা কম? আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মুখে কবিরাজি কেশ-তৈল মাখিয়া গোঁফ-দাড়ি গজাইব। পুরুষের সহিত কোনও কারবার রাখিব না, কারণ ওরূপ কুটিল স্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তারা মনে করে এই জগতটা পুরুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তাদের ভগবান পর্যন্ত পুংলিঙ্গ। আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়না, কালী অথবা শূর্পণখা—এ'দের দ্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।

হে নারী, তুমি আর অবলা সরলা niminy piminy গৃহিণী নহ। তুমি দাঁত নখ শানাইয়া এস, ভয়ংকরী মূর্তিতে এই মহাবাহিনীতে যোগ দিয়া পার্লামেণ্ট আক্রমণ কর। অকর্মণ্য পুরুষদের তাড়াইয়া দিয়া সরকারের নিকট হইতে আপন অধিকার আদায় করিয়া লও।

পুরুষজাতির মুখপাত্র 'দি মিয়ার ম্যান' হইতে উদ্ধৃত।

সরকার কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কাল এই লণ্ডন শহরের উপর যে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গেল তাহাতে বোধ হয় যেন দেশে অরাজকতা উপস্থিত। দুর্বৃত্তা নারীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে বিষম অত্যাচার করিয়াছে, দোকান-পাট ভাঙিয়া তছনছ করিয়াছে, নিরীহ পুরুষগণকে খামচাইয়া কামড়াইয়া জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু সরকারের পেয়ারের উড়িয়া-পুলিস তখন কি করিতেছিল? তারা একগাল পান মুখে পুরিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া হাসিতেছিল এবং নারীগুণ্ডাগণকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিবার জন্য হাততালি দিয়া বলিতেছিল—'হী—হ-হ-হ-হ-।' খাঁসাহেব গবসন টোডি, স্যার ট্রিক্‌সি টার্নকোট প্রভৃতি মাননীয় দেশনেতৃগণ দাঙ্গানিবারণের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া সার্জেণ্টরা তাঁদের অপমান করিয়া, বলিয়াছে—'এ সাহেবঅ, ওপ্পকে যিব তো ডণ্ডা খিব।'

সরকার নিশ্চয় এই ব্যাপারে মনে মনে খুশী হইয়াছেন, কারণ দেশে আত্মকলহ যত হয় ততই সরকারের বলিবার ছুতা হয় যে আমরা স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য।

'রাষ্ট্রবিৎ' হইতে উদ্ধৃত।

ইংরেজগণের মধ্যে যদি কেহ বুদ্ধিমান থাকেন তবে এইবার বুঝিবেন যে তাঁহাদের স্বাধীনতার আশা সুদূরপরাহত। লিবার্টি লীগ, অ্যাংলো-সেল্টিক ইউনিয়ন, হেটেরো-সেক্সুয়াল প্যাক্ট—এ সব শুনিতে বেশ। কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশের রক্ত যখন দ্বেষ-হিংসায় গরম হইয়া উঠে তখন আর তত্ত্বকথায় চলে না। যখন দাঙ্গা বাধে তখন একমাত্র ভরসা ভারতসরকারের দণ্ডনীতি এবং দুর্দান্ত উড়িয়া-পুলিস।

কেবলই শুনিতে পাই—স্বায়ত্তশাসনে ব্রিটিশ জাতির জন্মগত অধিকার। কিন্তু হে ব্রিটন, তোমাদের ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? স্বাধীনতা কাকে বলে তোমরা কখনই জানিতে না। প্রথমে রোমানগণের, তারপর অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, ডেন, নরম্যান প্রভৃতি দস্যুজাতির অধীনতায় তোমাদের দিন কাটিয়াছে। যাহারা বিজেতারূপে তোমাদের দেশে আসিয়াছে, পরে তাহারাই আবার অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। আজ কে বিজেতা কে বিজিত বুঝিবার উপায় নাই—তোমরা কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পার নাই। তোমাদের জাতির স্থিরতা নাই, দেশ নিজের নয়, ধর্ম পর্যন্ত নিজের নয়। একতা তোমাদের মধ্যে কোন কালেই নাই। সামাজিক আর্থিক কতরকম দলাদলি তোমাদের আছে তার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র ব্রিটেনের যখন এই অবস্থা, তখন সমস্ত ইওরোপের কথা না তোলাই ভাল! নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ইওরোপকে চিরকলের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারতসরকারের শাসনেই এই মহাদেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। তোমরা আগে একটু সভ্য হও, তার পর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিও। তোমরা মদে ও জুয়ায় ডুবিয়া আছ, বর্বরের মত তোমরা এখনও নাচিয়া থাক, স্নান করিতে ভয় খাও, আহারের পর কুলকুচা কর না। এখন কিছুকাল শান্ত শিষ্ট হইয়া সর্ববিষয়ে ভারতের অনুগত হইয়া চল, তার পর যথাসময়ে তোমাদের অধিকার দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

ভোমস্টাট প্রাসাদ। প্রিন্স ভোম, চৈনিক পর্যটক ল্যাং প্যাং
এবং প্রিন্সের খানসামা কোবল্ট।

প্রিন্স ভোম। আচ্ছা হের প্যাং, আপনি তো নানা দেশ বেড়িয়েছেন—আমাদের এই রাজ্যটা আপনার কেমন লাগছে?

ল্যাং প্যাং। মন্দ নয়। মাঠ আছে, জল আছে, রুটি আছে, ঘাস আছে, শুওর ভেড়া আছে। কিন্তু দেশের লোক যেন সব ঝিমিয়ে রয়েছে। কেন বলুন তো?

প্রিন্স। ঐ তো মজা। সমস্ত ইওরোপে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখেছেন, এখানে তার কিছুই পাবেন না। ভারতসরকার বলেন—আমাদের খাস রাজ্যে আমরা ইচ্ছামত প্রজাদের একটু আশকারা দেব, আবার রাশ টেনে ধরব। কিন্তু তুমি নাবালক, ওরকম করতে যেও না, মারা যাবে। তোমার রাজ্যে গোলযোগ দেখলেই তোমায় কান ধ'রে বার ক'রে দেব। তাই রাজ্যসুদ্ধ মৌতাতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি—সব ভোম হয়ে আছে। কোবল্ট, এক গুলি দে বাবা, তিনটে বাজে, হাই উঠছে। আহা, কি জিনিসই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আবিষ্কার করেছিলেন হের প্যাং!

ল্যাং প্যাং। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে জন্মায় না। যা খাচ্ছেন তা ভারতের, আপনাদের জন্যই উৎপন্ন হয়।

(প্রিন্সের মন্ত্রী ব্যারন ফন বিবলারের প্রবেশ)

বিবলার। মহারাজ, ইংল্যাণ্ড থেকে সার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোট দেখা করতে এসেছেন।

প্রিন্স। আঃ জ্বালালে। একটু যে শুয়ে শুয়ে আরাম করব তার জো নেই। নিয়ে এস ডেকে। বাবা কোবল্ট, আমায় বাঁ পাশে ফিরিয়ে দে তো।

ল্যা প্যাং। আমি তা হ'লে এখন উঠি—

প্রিন্স। না, না, বসুন। আমি ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে গোলাকাত

করি, একে একে অডিয়েন্স দেওয়া আমার পোষায় না, একসঙ্গেই পাঁচ-সাত জনের দরবার শুনি। তাতে মেহনত কম হয়, গল্প-গুজবও ভাল জমে।

(টান্‌কোটের প্রবেশ)

প্রিন্স। হা-ডু-ডু সার ট্রিক্‌সি?—বসুন ঐ চেয়ারটায়। তার পর খবর কি বলুন।

টান্‌কোট। প্রিন্স, আপনাকে হাগ যেতে হবে, প্যান ইওরোপিয়ান লিবার্টি-লীগের সভাপতিরূপে।

প্রিন্স। মাইন গট! এ বলে কি? কোবল্ট, আর এক গুলি দে বাবা।

টান্‌কোট। আচ্ছা সভাপতি হ'তে আপত্তি থাকে, না হয় অমনিই যাবেন। না গেলে আমরা ছাড়ছি না।

প্রিন্স। হাগ যাব? খেপেছেন নাকি?

টান্‌কোট। কেন, তাতে বাধা কি? এই তো ভাইকাউণ্ট পাফ, কাউণ্টেস গ্রিমালকিন, গ্রাণ্ডডিউক প্যাঞ্জানড্রাম—এঁরা সব যাবেন।

প্রিন্স। আরে তাদের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা হ'ল নগণ্য ভারতীয় প্রজা, ইচ্ছা করলে জাহান্নমে যেতে পারে। আর আমি হলুম একজন স্বাধীন সামন্ত নরপতি, যাব বললেই কি যাওয়া যায়? যদি মহাক্ষত্রপের হুকুম নিতে যাই তো বলবেন—ব্যাটা এক্ষুনি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাও।

টান্‌কোট। তবে কথা দিন রাজসূয় যজ্ঞেও যাবেন না।

প্রিন্স। গট ইন হিম্মেল! আপনার দেখছি মাথা বিগড়ে গেছে। রাজসূয় যজ্ঞে যাবার জন্যে ছ-মাস ধ'রে আয়োজন করছি, কোটিখানেক টাকা খরচ হবে—আর আপনাদের আবদার শুনে সব এখন ভেস্তে দিই! হাঁ—ভাল কথা—ব্যারন, জগঝম্প সব কটা ঠিক আছে তো? সতরটা গুনে দেখেছ?

বিবলার। আজ্ঞে হাঁ। আমি সব-কটা রন্দুরে দিয়ে টনটনে ক'রে রেখেছি।

প্রিন্স। ঠিক সতরটা?

বিবলার। ঠিক সতর।

ল্যাং প্যাং। জগঝম্প কি হবে প্রিন্স?

প্রিন্স। বাজবে। যখন আমি যাত্রা করব, সঙ্গে সঙ্গে সতরটা জগঝম্পই বাজবে। প্রিন্স ড্রুংকেনডর্ফের মোটে তেরটা। আমার সতর।

ল্যাং প্যাং। আপনার অভাব কি, আপনি মনে করলে তো সতরর জায়গায় সাত-শ জগঝম্প, জয়ঢাক, চড়বড়ে, কাঁসি, ভেঁপু, রামশিঙে যা খুশি বাজাতে পারেন।

প্রিন্স। হেঁ হেঁ, জগঝম্প হ'লেই হয় না। সরকার যে-কটি বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন ঠিক সেই কটি বাজানো চাই। বেশী যদি বাজাই তবে বিলকুল বাতিল হবে। বাবা কোবল্ট, আমার নাকের ডগায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দে তো।

টান্‌কোট। তা হ'লে আপনি আমার কোনও অনুরোধই রাখলেন না?

প্রিন্স। অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আপনাদের উদ্যমে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন। ব্যারন বিবলার, আপনি একটু ও-ঘরে যান তো। হ্যাঁ—দেখুন সার ট্রিক্‌সি, আপনাদের সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমার এই পৈতৃক রাজ্য আর পৈতৃক প্রাণটি খোয়াতে পারব না। তবে যদি বেঁচে থাকি, আর আপনাদের কার্যসিদ্ধি হয়, আর ইওরোপের জন্য একজন জবরদস্ত এম্পারার কি কাইজার কি ডিকটেটার দরকার হয়, তখন আমার কাছে আসবেন। ঐ কাজটা আমাদের বংশগত

কিনা, বেশ সড়গড় আছে। তার পর সার ট্রিক্‌সি, একগুলি খেয়ে দেখবেন নাকি? মাথা ঠাণ্ডা হবে। অভ্যাস নেই? আচ্ছা, তবে এক গ্লাস শ্ন্যাপ্স্‌ খান।

'দি লণ্ডন ফগ' হইতে উদ্ধৃত

দুইমাসব্যাপী হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। ইওরোপের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছে—অবশ্য জনকতক ধামাধরা ছাড়া। আমরা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না, সুতরাং আর কোনও খবর জানি না।

'রাষ্ট্রবিং' হইতে উদ্ধৃত

রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তথাকথিত দেশনায়কগণকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া ইউরোপের জনসাধারণ এই বিরাট উৎসবে যোগ দিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে।

যজ্ঞ উপলক্ষে যাঁহারা সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সার ট্রিক্‌সি টার্ন্‌কোটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনিতেছি ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার যে কমিশন বসাইয়াছেন, সার ট্রিক্‌সি তার প্রেসিডেণ্টরূপে শীঘ্রই কামরূপ যাত্রা করিবেন।

ঘরে ঢুকে গা থেকে চাদরটা খুলে অমূল্য বিছানার ওপর রাখল, তারপর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল, 'নাও, তুলে রাখো।'

রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে। তারপর সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আবার এ-সব এনেছ যে!'

অমূল্য একবার যেন চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই তীব্র দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে বলল, 'এনেছি বাজারে বিক্রি করবার জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠল অমূল্য, 'বলি, জিনিসগুলি হাত থেকে নিতে পারবে কি না?'

রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'হাতে করে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন?'

এর পর জিনিসগুলি তুলে নিয়ে রেণু জল-চৌকিটার ওপর রেখে দিল।

অমূল্য বলল, 'শেষ পর্যন্ত না নিয়ে যখন পারবেই না জানো, তখন আগে থাকতে ভদ্রভাবে নিলেই হয়। অত চেঁচামেচি অত সতীপনা কিসের জন্যে? আর একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম বলে কি রোজই তাই করব না কি। এগুলি আমার নিজের পয়সায় কেনা।'

রেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল, 'দেখ আর যাই কর, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না!'

অমূল্য আবার জ্বলে উঠল, 'না খড়দ'র মা-গোঁসাই এসেছ কি না তুমি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না!'

এবার সত্যিই হাসি পেল রেণুর, 'খড়দ'র মা-গোঁসাই ছাড়া আর কারো কাছে বুঝি সত্যি কথা বলা যায় না?'

অমূল্য এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। হাসলে ভারী সুন্দর

দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।

রেণু একবার চোখ নামিয়ে নিল, তারপর আবার অমূল্যের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হ'লে আমার আর কি, একদিন যদি হাতে হাতে ধরা প'ড়ে যাও তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায়?'

অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয়।'

হাত কাঁচা নয়, এই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাও হয় না অমূল্যর, সেই লজ্জায় রেণুর নিজের মরে যেতে ইচ্ছা করে। হাত কাঁচা নয় তা ঠিক। কোন যেন দ্বিধা নেই অমূল্যর! বিয়ের ক দিন পরে তারা ট্রামে যাচ্ছিল ইডেন গার্ডেন দেখতে। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রেণুর সঙ্গে গল্প করছিল অমূল্য। কন্‌ডাক্‌টর এলো টিকিট চাইতে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পে অমূল্যর মনোযোগ আরও বেড়ে গেল।

কন্‌ডাক্‌টর তবু জিজ্ঞেস করল, 'বাবু টিকিট?'

অমূল্য একবার মাথা নেড়ে রেণুর সঙ্গে গল্পই করতে লাগল। রেণু স্পষ্ট দেখল কন্‌ডাক্‌টরটা একটু মুচকী হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অমূল্য অনর্গল কথা বলতে লাগল কিন্তু লজ্জায় রেণুর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ছি ছি, কি মনে করল কন্‌ডাকটরটা! মাত্র দু' আনার তো ব্যাপার।

কন্‌ডাক্‌টর একটু দূরে স'রে গেলে রেণু চুপে চুপে স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, টিকিট করলে না যে!'

অমূল্য হেসে বলেছিল, 'ওঃ, তুমি বুঝি আবার তা লক্ষ্য ক'রেছ। টিকিটই যদি করব তো ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছি কেন!'

রেণু অবাক্ হয়ে বলেছিল, 'ওমা, ফার্ষ্ট ক্লাসে ছাড়া আবার ভদ্রলোক মেয়ে-ছেলে নিয়ে ওঠে না কি। তাই ব'লে টিকিট করবে না?'

অমূল্য সগর্বে বলেছিল, 'একা যখন উঠি তখনই ডবলুটিতে চলি, আর আজ তো তুমি সঙ্গে আছ। বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু'-চার পয়সাও যদি এ ভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা হ'লে কি ক'রে চলে বল।'

রেণু ভেবেছিল, অমূল্য বুঝি পরিহাস করছে। কিন্তু ফেরার পথেও অমূল্য যখন কন্‌ডাক্‌টরকে দেখে গম্ভীর মুখে একবার মাথা কাত ক'রে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন রেণুর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে। রক্ষা যে, সেই আগের কন্‌ডাক্‌টর নয়। এবার সে তা হ'লে অমূল্যর কাছ থেকে টিকিটের পয়সা আদায় ক'রে ছাড়ত। ছি ছি ছি! এক-গাড়ী লোকের সামনে কি ক'রে তাদের মান থাকত, কি ক'রে মুখ দেখাত তারা।

গাড়ী থেকে নেমে রেণু বলেছিল, 'ছি, এ-সব আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

অমূল্য বলেছিল, 'কি সব?'

'এই টিকিট না কেটে ট্রামে বাসে চলা, ছি।'

অমূল্য হেসেছিল, 'ও, গম্ভীরভাবে তুমি বুঝি সেই কথাই ভাবছ। আচ্ছা শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে তো হে তুমি। বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভোগাবে। হিষ্টীরিয়া টিষ্টীরিয়া নেই তো আবার?'

'কেন? তার মানে?'

'তার মানে এ সব মেয়েদের তাও থাকে।'

রেণু বলেছিল, 'ছি, সমান্য দু' আনা পয়সার জন্য—'

অমূল্য বাধা দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দু' আনা নয়, দু' আনা দু' আনা, চার আনা, দিব্যি এক প্যাকেট সিগরেট হবে।'

'চাইলে না কেন, সিগারেটের পয়সা আমি তোমাকে দিতাম।'

এর ক'দিন পরে অমূল্য দামী একখানা চিরুণী নিয়ে এসে উপস্থিত। 'দেখতো, কেমন চিরুণীখানা!'

রেণু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিরুণীখানা নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার তো! কত দাম?'

অমূল্য বলল, 'আড়াই টাকা।'

রেণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'ছি, এত দাম দিয়ে কেন আনতে গেলে বলো দেখি, চিরুণীর তো আমার অভাব নেই, এই সে দিন বৌভাতেই তো তিনখানা চিরুণী পেয়েছি। যা-ই বলো, এ সব বাজে বাবুগিরি আমার মোটেই পছন্দ হয় না, যে দিন-কাল তাতে এ ভাবে পয়সা নষ্ট করবার কোন মানে হয়?'

অমূল্য আত্মপ্রসাদে হেসে বলল, 'পাগল হয়েছ! গাঁটের পয়সা ব্যয় ক'রে বাবুগিরি করতে যাব, অত পয়সা পাল ব্রাদার্স দেয় না।'

রেণু বলল, ও, কোম্পানী বুঝি নিজেদের লোক ব'লে খুব সস্তায় দিয়েছে!'

অমূল্য হেসে বলল, 'কেবল সস্তায় নয় হে, একেবারে বিনামূল্যে। জানে কি না, আনকোরা নতুন বৌ এসেছে ঘরে।'

রেণু সলজ্জে বলল, 'যাও, কি যে বল। মুখের তোমার কোন আগল নেই। সত্যি, আড়াই টাকার জিনিস কত দামে পেলে বল না, আমার বৌদির জন্য একখানা আনাব।'

অমূল্য অকস্মাৎ চটে উঠল, 'হয়েছে। আর ন্যাকামী কোরো না, মেয়েদের

ন্যাকামী কখনো কখনো ভালো লাগে, তাই ব'লে কি সব সময়েই সহ্য হয় ?'

'তার মানে ?'

'তার মানে পয়সা লাগেনি, হাত সাফাইতে এসেছে। তা তোমার জন্যে পারি ব'লে তোমার বৌদির জন্যেও পারতে হবে এমন কি কথা আছে ?'

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে রেণু বলেছিল, 'ও চিরুণীতে আমার কাজ নেই। ওটা তুমি কালই ফেরৎ দিয়ে এসো, ছি।'

'অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বৌদির জন্যেও এক-খানা হবে। হাজার হ'লেও শালাজ তো!'

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে রেণু আর কথা বলেনি।

আজও রেণু চুপ ক'রে রইল। কোন ভদ্রলোকের ছেলে যে এ-সব করতে পারে, তা যেন ধারণায় আনা যায় না। গরীব তো তার বাপ-ভাইও। কিন্তু পরম শত্রুও কি কোনদিন বলতে পারবে যে, পরের কোন জিনিস লুকিয়ে আনা তো দূরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত তারা দেখেছে ?

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হলো তাকে। আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যর প্রবৃত্তি আর বদলাবে না। কেন না, এ সব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হোলেও না, পয়সা হোলেও না,—রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তারপর সব একাকার হয়ে যাবে; কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে ? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বউ।

অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি ক'রে আনতে যার কোন লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে ?'

'কি ?'

রেণু বলল, 'ও-ভাবে জিনিসপত্র আর এনো না। সত্যি বলছি, ও-সব আমার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি আর কিচ্ছু চাইনে, কেবল তুমি ভালো হও, ভদ্র হও। দশ জনে যদি তোমাকে ভদ্রলোক ব'লে জানে, তাহ'লেই আমার তৃপ্তি।'

এবার স্তব্ধ হবার পালা অমূল্যর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে সে পাশ ফিরলো। এই নীতি-শিক্ষার দক্ষিণা রেণুকে পুরোপুরি ভাবে না দিয়ে তার শান্তি নেই।

রেণু বলল, 'ও কি, রাগ করলে না কি ? তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

অমূল্য জবাব দিল, 'আমিও ভালোর জন্যই বলছি। চুপ করে ঘুমোও।'

পরদিন ভোরে উঠে অমূল্য স্ত্রীকে কাছে ডাকল, 'এই শোন।'

রেণু কাছে এসে বলল, 'কি।'

অমূল্য ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ওপরের বিনোদ বাবুদের ঘরে কাল নতুন কতকগুলি কাঁসার বাটি এসেছে, না ?'

রেণু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে তোমার কি।'

'বিনোদ বাবুদের বৌয়ের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব। ও-ঘরে তো তোমার অবাধ গতিবিধি।'

'হ্যাঁ, মাসীমা ভারি ভালোবাসেন আমাকে। আর তাঁর ছোট ছেলে তো আমার হাতে ছাড়া খেতেই চায় না।'

অমূল্য তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তবে তো আরও সুবিধে। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় ক'রে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।'

রাগে এবং দুঃখে মুখ দিয়ে রেণুর কিছুক্ষণ কথা সরলো না। একটু পরে সে বলল, 'কি যা তা বলছ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?'

অমূল্য অম্লান মুখে বলল, 'মোটেই না, কাঁসার আজকাল সের কত ক'রে জানো ? দু'-তিনটে বাটি যদি সরাতে পারো তাহ'লে দু'দিন বক্সে বসে দু'জনে বেশ থিয়েটার দেখে আসতে পারব।' অমূল্য হাসল।

রেণু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেমন মানুষ, তেমন তার ঠাট্টা। ও-সব ঠাট্টা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

অমূল্য বলল, 'ঠাট্টা নয় সত্যিই বলছিলাম।'

দুপুরবেলায় মাসীমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর

হাত কাঁপতে লাগল। কি সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে!

কয়েক দিন পরে। বেলা সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু বিছানা থেকে অমূল্যর ওঠার নাম নেই, অন্য দিনে চা-টা খেয়ে এর মধ্যে অমূল্য রওনা হয়ে পড়ে। দোকানে আটটা থেকে তার ডিউটি।

রেণু কাছে এসে অমূল্য মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি মশাই, খুব যে ঘুমনো হচ্ছে? বেলা হয় না আজ?'

অমূল্য অদ্ভুত একটু হাসল 'আজ আর বেলা হবে না।'

স্বামীর হাসি আর কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল রেণুর; বলল, 'কেন, দোকান আজ বন্ধ না কি? কি উপলক্ষে বল দেখি?'

অমূল্য চটে উঠে বলল, 'ন্যাকা! কি উপলক্ষে! উপলক্ষ আবার কি, উপলক্ষ আমার শ্রাদ্ধ।'

বলতে বলতে অমূল্য আবার পাশ ফিরতে চেষ্টা করল।

রেণু এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন যে হবে আমি আগেই জানতুম।'

অমূল্যর আর পাশ ফেরা হলো না, 'কি, কি বললে?'

রেণু বলল, 'বলবার আর আছে কি, তবু ভাগ্য যে, পুলিসে দেয়নি। অমনিই ছেড়ে দিয়েছে।'

অমূল্য বলল, উঃ কি আপশোষের কথা! কিন্তু এর চেয়ে বোধ হয় পুলিসের হাতে যাওয়াই ভালো ছিল। আমি জেল খাটতুম আর তুমি তত দিন সাধুসঙ্গ ক'রে একটু মুখ বদলে নিতে পারতে!'

কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কি মতলব ঠিক ক'রে অমূল্য উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে রেণু দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়ে বসে আছে।

অমূল্য কাছে এসে বলল, 'বা, অমন ক'রে বসে রয়েছ যে! হলো কি তোমার?'

কিন্তু রেণুর কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

অমূল্য বলল, 'বা, মুখই তুলবে না বলে ঠিক ক'রেছ না কি? কিন্তু মুখ দেখাতে লজ্জা তো আমার হবার কথা, তোমার কি?'

রেণু হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তোমার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলতে কিছু নেই একেবারে? তুমি কি পাষাণ?'

অমূল্য পাষাণ নয়। নীরবে আস্তে আস্তে রেণুর চুলের ওপর হাত বুলাতে লাগল।

মিনিট খানেক পরে রেণু মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি এমন অপরাধ ক'রেছিলে যে ওরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিল?'

কৈফিয়ৎটা অমূল্যর কাছে নয়, অমূল্যর মনিবদের কাছেই যেন দাবী করছে রেণু। অমূল্য একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'অপরাধ আবার কি। বুড়ো ক্যাসিয়ার বেটা পিছনে লেগেছিল। অপরাধ তার স্ত্রীর জন্ত কেন এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি। ম্যানেজারকে গিয়ে লাগিয়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

রেণু আজ স্বামীর কথার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস ক'রে বলল, 'হুঁ, সাধু যে পৃথিবীতে সকলেই তা জানা আছে।'

দিন কয়েক খুব চাকরি খুঁজল অমূল্য। কিন্তু হয় হয় ক'রে কোনটাই ঠিক হয়ে উঠল না। রেণু ভরসা দিয়ে বলে, 'অত ভাব কেন, চাকরির কি অভাব আছে না কি আজকালকার দিনে? হবেই এক দিন।'

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই চাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল। শুধু চাল নয়, তেল, নুন, ডাল বলতে কিছুই নেই।

অমূল্য মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'এক কাজ করা যায়; কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'না, মনে আবার কি করব?'

'স্নো আর সাবানের বাক্সগুলি দাও। জানা লোক আছে। উচিত দামেই দিয়ে দিতে পারব।'

রেণুর মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠল। তারপর বলল 'আচ্ছা নাও। কিন্তু এ ভাবেই তো আর দিন চলবে না!'

অমূল্য বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে।'

দু'-তিন দিন পরে দেখা গেল, অমূল্য কোথেকে একটা দামী ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসেছে।

রেণু একবার পে-টার দিকে তাকাল, আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল। অম ল্য প্রতি মুহূর্তেই আশংকা করতে লাগল এই বুঝি রেণু তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না। যেন কোন নতুন কিছু ঘটেনি, তেমনি সহজ নিশ্চিন্তভাবে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

মাঝখানে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'নারকেল তেল কিন্তু একেবারে নেই।'

অমূল্য বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার দিকে পেনটা আর দেখা গেল না। তার বদলে চাল, ডাল, তেল, কয়লায় ঘর ভ'রে গেল। সুগন্ধি নারিকেল তেল এল এক শিশি।

রেণু এবারও কোন কথা না ব'লে জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলছে, অমূল্য বলল, 'দাঁড়াও, আর একটা জিনিস আছে তোমার জন্য।'

রেণু বলল, 'কি।'

অমূল্য পকেট থেকে একটা ওটিন স্নো বের ক'রে রেণুর হাতে দিয়ে বলল, 'পাল ব্রাদার্স থেকে একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা। বুড়ো বিষ্টুবাবুর নাকের সামনে পাঁচ টাকার নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, চেঞ্জ প্লিজ! একটু তাড়া আছে বাইরে।'

রেণু হেসে বলল, 'এতও জানো তুমি, আর এতও তোমার মনে থাকে!' রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাঁপছে এখনো। এত সাহস কি ভালো?'

রেণুর খোঁপার ওপর সাদরে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অমূল্য বলল, 'সাহস ভালো নয়? সাহস না থাকলে এত দিন উপোস ক'রে মরা ছাড়া গতি ছিল না কি? তোমার মত ভীরু হলেই হয়েছিল আর কি। আস্তো একটি অকর্মার ধাড়ী। তোমার মত অমন সুবিধা-সুযোগ যদি আমার থাকত!'

অভিমানে কথা ফুটল না রেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার। এর জবাব রেণু স্বামীকে একদিন না একদিন না দিয়ে ছাড়বে না।

দু'-তিন দিন বাদে। সুযোগ তো এসেছে, কিন্তু রেণুর হাত কাঁপে আর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। দেওয়ালের এক কোণে পেরেকে বিনোদ বাবুর হাত-ঘড়িটা ঝুলানো রয়েছে। এমন প্রায়ই থাকে। ভারী ভুলো মন বিনোদ বাবুর। যে দিন আপিসের বেলা বেশী হয়ে যায়, সে দিন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান না। কোন দিন বা ঘড়ি ফেলে যান, কোন দিন মণিব্যাগ।

খটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে মাসীমা অচেতনভাবে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর কোলের ছেলেকে দুধ খাইয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল রেণু। নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি এত শব্দ হয়? না, এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ! একবার

রেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার সাধ্য নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাঁটা দু'টি তার দু'চোখের তারাকে বিদ্ধ ক'রে রেখেছে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে, যদি খোঁজ পড়ে ঘড়ির। তার রেণু কি জানে? এই ছ' মাস ধ'রে বিনোদ বাবুদের ঘরে সে আসে যায়, গল্প করে একগাছা কুটো পর্যন্ত নড়চড় হয়েছে কেউ বলতে পারবে?

রেণু যখন কোন রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর?

সন্ধ্যার পর অমূল্য ম্লান মুখে ঘরে ফিরে এলো। আজ আর কোন দিকে সুবিধা হয়নি। হঠাৎ রেণুর দিকে চেয়ে অমূল্য অবাক্ হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার, আজ যে একটু বিশেষ সাজের ঘটা দেখছি।'

দরজায় খিল দিয়ে এসে রেণু স্বামীর সঙ্গে প্রায় মিলে গিয়ে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলল, 'অত হিংসা কেন, সাজ তোমারও আজ মন্দ হবে না। যদিও কেবল এই রাত্রিটুকুর জন্য। কিন্তু একটা রাত্রিই কি কম?'

অমূল্য ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ, একটু পরিষ্কার ক'রে বল, হেঁয়ালি ভালো লাগে না সব সময়!'

রেণু বলল, 'সবুর, সবুর, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তোমাদের সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো, একটুও ধৈর্য সয় না প্রাণে, না?'

খাওয়া দাওয়ার পরে আলো না নিবিয়েই স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল রেণু।

অমূল্য অবাক্ হয়ে বলল, 'আলোটা কি সারা রাত জ্বালাই থাকবে না কি আজ?'

রেণু মুচকি হেসে বলল, 'থাকলই বা ক্ষতি আছে না কি তাতে? না গো না, সারা রাত জ্বালা থাকবে না, একটু পরেই নিববে। দেখি, দেখি, বাঁ হাতখানা বার কর দেখি।'

'বাঁ হাত দিয়ে আবার কি করবে।'

'অল্প একটু দরকার আছে।'

ব্লাউজের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডসুদ্ধ ছোট ঘড়িটুকু বের ক'রে রেণু স্বামীর মনিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলল, 'দেখি তো, কেমন মানাচ্ছে?'

অমূল্য মুহূর্তকাল অবাক হয়ে থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি সর্বনাশ, এ তুমি কোথায় পেলে ?'

রেণু গভীর রহস্যলোক থেকে যেন মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তা নিয়ে তোমার দরকার কি, মানাচ্ছে কি না তাই বলো।'

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে লাইটটা অফ ক'রে এসে রেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোন কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় ক'রে ফিরেছে।

'কি গো, কথা বলছ না যে! বলো না, ঠিক মানিয়েছে কি না ?'

মানাবারই তো কথা। আজ রেণু তার যথার্থ সহধর্মিণী। এত দিন ধ'রে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা ক'রে এসেছে। আজ তার উল্লসিত হয়ে উঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-কণিত মৃণালভুজ নয়, তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

গল্প : রস
নরেন্দ্রনাথ মিত্

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এলো পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনকে। পাড়া-পড়শি সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছরখানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজু খাতুন ত্রিশে না পৌঁছালেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজু খাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালীর শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজু খাতুনের আছেই বা কী। বাঙ্-সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠভরে যেন কত ক্ষেত-ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজু খাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠাখানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমনকি একখানা ডানাকাটা হুরীর মতো চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁটসাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কী আছে মাজু খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদারবাড়ি, কাজীবাড়ির বউ-ঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধুলা-পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদের ছোট বউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চৌখে ধুলা-পড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চৌখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্প বয়সী খুবসুরত চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এত দিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সেই হেঁকে বসেছে পাঁচ কুড়ি-সাত কুড়ি। মোতালেফের সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল ফুলবানুকে।

চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠারো-উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য এক হাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে-পরতে কষ্ট দেয়, মারধর করে—এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া-কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু এক হাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। একনজরেই বুঝেছিল যে সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফরসা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তা ছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে কজনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে, গতবার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে-শুনে যার-তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে-আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুনাগার দু-এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজি হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙ্গলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হলো ফুলবানুর সঙ্গে। কলসি কাঁকে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু, 'কী মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'
'চলব না? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বাজানের!'
ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা বাজানের গুনা, তার দাম দেবা না?'
মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বাজানের নয়, বাজানের মাইয়ার। হাটে-বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'
মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা-জহরত ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হনহন করে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'
মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কী শুনব?'

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এলো ফুলবানু, 'শোনবা আবার কী, শোনবা মনের কথা। শোন, বাজানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা-দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাগ দেখতে চায়, বুঝছ?'
মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছে।
ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম-কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মতো জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাগও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি

দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গায়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে দেখল মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি–কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার-পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড় কুড়ি গাছ বেশি হলো। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনত কম নয়, এক একটি করে এতগুলো গাছের শুকনো মরা ডালগুলো বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুতসই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমত। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মায়ের দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায়-বানে মুখ দিলেই হলো।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভেতর থেকে মিষ্টি রস চুইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে কাঁচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হলো। এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোনো ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক-ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফারফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাতভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজ হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এসব তত্ত্বকথা আর বিধিনিষেধও তার মুখের। রাজেকের মতো অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে, সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়ত আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠত। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোনো ক্ষতি হতো না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের শাগরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। শাগরেদ দু-চারজন আরো ছিল রাজেকের–সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মতো হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মতো।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে, কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালি গুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমত, মেহনত। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দুই বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজু খাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজু বিবি?'
ঘরের ভেতর থেকে মাজু খাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছি বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাঁপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজু খাতুন উঠে ঝাঁপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কী কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজু খাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কী বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'
মাজু খাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোলো আনা দিতে চাই, রাজি হবা তো নিতে?'
মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজু খাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাশা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'
মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজু

বিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইশারা-ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট করে খুলে বলল মনের কথা। কোনো রকম অন্যায় সুবিধা-সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজু খাতুনকে। ঘর-গেরস্তালির ষোলো আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজু খাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাশার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়াপোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে!'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজু বিবি। কম বয়সী মাইয়াপোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজু খাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'
'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাশতার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মতো মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলো মাজু খাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলো মনের ভেতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্প দিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হালকা ঠাট্টা-তামাশা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজু খাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাঠখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছাছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজু খাতুনের উঠানে আর মাজু খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালি গুড়। হাতের গুণ ছিল মাজু খাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দুই পয়সা বেশি দরে বিক্রি হতো বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু-এক হাঁড়ি রস কোনোবার ভদ্রতা করে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ, কিন্তু আগেকার মতো হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দুই আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজু খাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করাচ্ছে সেই গুড়, ষোলো আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজু খাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু-একজন কিন্তু মাজু খাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে, তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজু খাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলো ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরত মুখ কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হলো দু-এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি পরে, রং-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল মাজু খাতুন।

ঘরদোরের কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছাল হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজু খাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝকঝকে, তকতকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরনির দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের–বোসেদের, বাঁড়ুজ্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাঁকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজু খাতুনকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিম দিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জ্বালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজু খাতুন। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়? মাজু খাতুন এর-ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেক দিন পরে মনের মতো কাজ পেয়েছে মাজু খাতুন, মনের মতো মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লাবাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারা দিনের ময়লা রস চোঙাগুলোর মধ্যে জমা থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছয় আনা সের। দুবেলা দুবার করে এতগুলো গাছে উঠতে-নামতে ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুইয়ে চুইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে। পায়ের নিচে দূর্বার মধ্যে চিকচিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়া-পড়শিরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ, কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মতো পরিশ্রম করতে এর আগে

তাকে দেখা যায়নি কোনো দিন। ব্যাপারটা কী? গাছ কাটা অবশ্য মনের মতো কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এলো ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দুই হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হলো চরকান্দায় এলেম সেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখল রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'
মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার–'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোনায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায়নি কোথাও, কোনো জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কী করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান আমার মাইয়া। মাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি-কাটাকাটি কইরা মরবে দিনরাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজু খাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম সেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে-শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কী!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কী করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কী করে।
ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আরেকজনের গন্ধ জড়াই রইল, তা ছাড়াবা কেমনে।'
মনে এলেও মুখ ফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আরেকজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তাহলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুল বিবি। সোডা-সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুরভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুরভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাকো আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দুই মাসের বেশি সবুর করতে হলো না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরো পঞ্চাশ টাকা জোগাড় হইতে মোতালেফ মাজু খাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শিকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজু বিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজু খাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিঁপড়ার মতো লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর দূর!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাবগাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এলো বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এলো ফুলবানু। ফুলের মতোই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়া-পড়শি বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের!'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষান কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘরগেরস্তালি। কাছে বসো আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয় মাস কাটাইলা কী কইরা মেঞা?'
মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'
নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। গাছির আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বারো মাস চোয়াইয়া চোয়াইয়া পড়ে।'

মাজু খাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতোই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়া-পড়শিরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ বউ বউ কইরা পাগল হইয়া গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে মাজু খাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এলো সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলো। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কম বয়সী ছুঁড়ি-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজু খাতুনের মতো একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজু খাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'
ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজু খাতুন খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল–হ্যাঁ, ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।
তারপর মাজু খাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান! ওসব কাম কোনো কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষান কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান বউ, গাছি ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজু খাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারেকাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজু খাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহলে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি করতে চায় না।' মাজু খাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কী।'

দেরি বেশি হলোও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজু খাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মতো ফাঁৎ ফাঁৎ নিঃশ্বাস ফেলত, চোখের ওপর শাপমন্যি করত দিনরাইত, তার হাতগুনা তো বাঁচলাম, কী কও ফুলজান?'
ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'
মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'
'ক্যান, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'
'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন উড়াল দেয় তার ঠিক কী!'
ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উড়াল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'
মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে-তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আনো ক্যান, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিনরাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।' মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিনরাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কিষান বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মতো নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষান খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমত খাটুনি খাটে। ফরসা রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে। কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাঁকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলো পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজি নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউশ ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষান খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাঁচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে-বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পারো না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।' যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সেসব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কিষানের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ধামায় করে পৈঁকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'
ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্ত ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি?'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন-কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ে। এ কাজে নামডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সেই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার-দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মতো দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুম ভেঙে আসে চোখ। দুহাতে ঠেলে, দুহাত জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্তা একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বোরোয় নাক থেকে, আর কোনো অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে, ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু-এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস একসঙ্গে সে কোনো দিন দেখেনি, কোনোকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কী, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমতো। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনো

দিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়া মানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'
মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইসো বাজারে। তুমি আইসো বেইচা। খুবসুরত মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু-চার দিনের মধ্যেই কোনো রকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মতো, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মতো সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভেতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মতো এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বারকয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কি না, ডালবার সময় হইল কি না রস।'
ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'
হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজু খাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু খাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এলো মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাঁকাটির চালার দোরের কাছে, 'কী রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভেতর থেকে কোনো জবাব এলো না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভেতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কী রকম গন্ধ আসছে যেন ভেতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তা-ই। সবচেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কী করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভেতর থেকে। বুকের মধ্যে জালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চিৎকার বেরুল—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদি?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দুই দিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড়চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা-সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদি, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'
'ও, হাতে মারলে মনে যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না সেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'
ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম সেখ এলো চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।
ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বাজান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদলবদল আর ঘর-বদলানো কি চলে! তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে? একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেল, খানিক বাদেই আবার যেচে আপস করল মোতালেফ। সেধেভেজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোনো রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কী।'
কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্ক-বিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মতো যেন সুখ নেই মনে, ফুর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মতো খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মতো খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটাফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।
'সেলাম মেঞাসাব।'
'আলেকম আসলাম।'
মোতালেফ বলল, 'ভালো তো সব, ছাওয়ালপান ভালো তো–?'

মাজু খাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোনো রকম সকমে।'
মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওলপানের জৈন্যে সের দুই-তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'
নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনোকালে খারাপ হয় না।'
হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'
অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?'

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'
'দামের জৈন্যে কী? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'
নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'
মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ, খাইয়া দ্যাখেন, দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলো কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় এক সের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজি হয় নাদির, আর বাকি দুই সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।
মাজু খাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোঁব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজু খাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির করো, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'
মনে মনে মাজু খাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দুই হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপটানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, 'কেডা? ও আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান মেঞাসাব?'
মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির, কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজু খাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম-গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কী কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভেতর ডেকে নিল মাজু খাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে

কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে, আস্তে—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শুনতে পাবে। মাইনষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর-বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইনষে।'

মাজু খাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর-বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ করো, রস খাওয়াইয়াতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজু খাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল, তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভেতর থেকে আহত-বঞ্চিত নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভেতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দুটি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেননি একটু?'
নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই কন না, দোষ কী তাতে।'
মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। কন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'
নাদির কিছু বলবার আগেই মাজু খাতুন ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে-বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।' গলাটা যেন ধরে এলো মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কী বলতে যাচ্ছিল, বাখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছলছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হলো না।

হঠাৎ যেন হুঁশ হলো নাদির শেখের, বলল, 'ও কী মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'
হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড ; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গ-মাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন ; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি, তিনি নরপাল, ধর্ম্মপাল এবং অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত ; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পারে ; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তরবারির ঘটা ; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব, সচিবোত্তম আর ন্যায়াধীশ—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, আর সেরেস্তাদার। ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দু'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্ম্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্ম্মি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্দ্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টীম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা যব জনার চাই-ই।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে

ক্ষাত্রবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পরে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্ত্তি হয় সোজা কোন ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্ম্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মত সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্ত্তনে তাদের দিনসন্ধ্যের সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড থেকে দয়াধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা-আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই, আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্ব্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উসুল আর তসীল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ! রাজবাড়ীর বাপের কালের সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজী আইননবীশ। আমাদের মুখার্জীই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জীই হয়ে গেল 'ডি ফ্যাক্টো' সচিবোত্তম আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া মার্কিণী ডেমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে

অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে —যে সৎ-সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জী তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে, একদিকে যেমন কড়া অন্য দিকে তেমনি হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জীর নির্দ্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজী। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরীপ হল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হল। এমন কি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিস করে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

স-এজেণ্ট মুখার্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ! কলকাতার মার্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্ব্বেল, মোজেয়িক কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্ম্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানি আইরিস পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জন গড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেণ্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে —মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসানো ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো কেয়ারিকরা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্ম্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুর্গি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে; আরো এগার বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাষ্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা।—উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনির শ্লুস-বসানো বড় বড় ডাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢল কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্ম্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি। আউশ আর আমন। তা ছাড়া

একটা রবি। বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক ; দক্ষিণে আখ, যব আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক ; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি পরিকল্পনায় সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয় ; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি! মুখার্জী উঠলো। দেখা যাক্, বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির, গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জীর সামনে এগিয়ে দিল দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারী হাত না পড়ে। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য : কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জী, শালাদের সাহস।

—হ্যাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি ; দুদিন দুরাত দেখি।

মুখার্জী মহারাজকে শান্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মারসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ। ফয়জাবাদ ষ্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেণের কামরায় তুলে দাও! বাস্—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলতো—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সবই দুলাল কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বলতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দিচ্ছি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্ত্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাততঃ কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক্।

—আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুসমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ…।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য। ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখার্জীর কিছু জানতে বাকী রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘে বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জ্জর এই সব নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক্।

পেয়াদারা এসে মহারাজকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জীর। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ'ল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মত ভীরু—দুলাল যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব সয়তানী করছ! মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হ'ল মুখার্জীর ওপর।—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটীশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্ত্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র। —যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না।..... আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। .....আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্ত্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ছট্‌ফট্ করছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করল-- মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা? সিণ্ডিকেটের দুষ্ট

উৎসাহেই কুর্মি সমাজের নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়েঘরের কাছে মুখার্জী এসে দাঁড়ালো। ব্যস্তভাবে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকী এনে মুখার্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটির ওপর। মুখার্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে শেষে বড় অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমারা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ না হয় তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাচাবে।

মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেণ্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটি একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জী দুলালের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোষাক বদলাবার কথা মুখার্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

- দেখুন মিঃ গিবসন, রাজা প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়েছে।

-গিবসন বললো—মিষ্টার মুখার্জী, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহ'লে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক. ওয়েল্‌থ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দেয়।

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিষ্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজও খুসি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জী! গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালো।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে অফিস ছেড়ে চলে গেল।

ম্যাক্‌কেনা এসে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জী, ছাট্ মংকি অফ অ্যান এ্যাডমিনিস্ট্রেটার, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। শুনেছ তো, ওর ঐ ইরিগেশন স্কীমটা? সময় থাক্‌তে ভণ্ডুল ক'রে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে। খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধ হয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাক্‌কেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়! ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলোর মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান; খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারদিকে পায়চারী করছেন ছটফট করে। মুখার্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জী সচিবোত্তমের দিকে তাকালো। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্য কথা। আমি সব জানি মুখার্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধূলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের ওপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যঞ্জন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জী ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—তাই হোক্, কুর্ম্মিদের আপনি সায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব, আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জী এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবতঃ শশক হলেও মুখার্জী আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জী, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাতপায়ের

গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে! শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট্ চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে চুপ্‌সে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জী চার্জ্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। অকারণে পোলো লনের চারদিকে বিদ্যুদ্বেগে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন।—বড় রাফ্ খেলা খেলছ মুখার্জী।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে! মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার দুসমন মুঠোর মধ্যে, নির্দ্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার।—সচিবোত্তম কোথায়? শীগগির ডাক।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুর্ম্মিরা লকড়ি কাটছিল। জঙ্গলের রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্ম্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর?—মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল! তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিকাল এজেন্টের হুঁসিয়ারী চিঠিটা যেন চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে ?

—অন্ততঃ সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জীকে ডাকলেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও ; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জী বলল—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জী বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার ; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চোদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চেণ্টরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্ত্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আছছে—বুম্ বুম্ বুম্। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধূলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।—কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয়নি, মরেও নি কেউ।

মার্চেণ্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো ছ'দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর লাভ কি হবে ? দি মহারাজার কানে পৌছে গেছে সব। তা ছাড়া, ছাট মাহাতো ; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে ? কালকের সকালেই সহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি ; একটা গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার ?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না! একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জীর।

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মুর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জীকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার তাই মুখার্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জী শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে রইল।

গিবসন মুখার্জীর পিঠ ঠুকে একবার বলল—এসব কাজে একটু শক্ত হ'তে হয় মুখার্জী, নার্ভাস্ হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটর গাড়ী আর মানুষের একটা জনতা। ফৌজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত্ত পীটটার মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জীর চোখ দুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণত-মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থি-কঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ির গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্য্যয়ে কোয়ার্টস্ আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!

সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে সে! আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জ্জন দুপুর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎ স্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুঁজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্, এই এগজামিনটা পর্য্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক—এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম্!

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোট বোন রানু আর ঝি—তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে—যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়! ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারের মনকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই

করালেন।—নাও সই কব। মুন্সেফী চাকরী, ঠাট্টা নয়! সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ীর বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই; সব হো যায় গা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায় নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে, আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ একআধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ীর সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বললো—আপনাকে এবার ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞা-চক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেণ্ট বোধ হয় সার্থক হয়ে উঠলো। সুকুমার কাব্য পড়ে, বার কয়েক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবু ফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ সুখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত ক'রে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু।

—কি ?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে, আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্পপণে দয়ালু সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। —ভাল করে দেখে নে সুকু। মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে।

যাত্রাকালে রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে! বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী সাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছে ধারকরা চুড়ি, রুলি, বালা ও অনন্ত কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট্ করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নাই!

দেখার পালা শেষ হ'লো। বাড়ী ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়!—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপেই রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হাঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতে চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্রী দেখছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়।

তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা প্রথম গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্ব্বল্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারন্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাস ডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে যাদু সার্জ্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ! ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্ত্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোঁটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ীর সবাই এল বেরিয়ে।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পটিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কৃপা কর বাবা!

—এই বুড়িটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরাণী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠ্ঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হাদিমার মেয়ে।

—আপন মেয়ে ?

হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই করা থালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দ্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্ব্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা খ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দন্তর মতো একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে। কিন্তু যদু বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। দেশী মদের একটা নতুন ভাটিখানা হবে সেখানে। সহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নাই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ায় ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বল্লেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই, এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হ্যাঁ, দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়ীও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাবার পর তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো ?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন ? সবই হবে। তবে সেটা আর সত্যিই বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হলো দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্য্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত্ত একটু ছায়া—প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইসারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধ হয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে। ভটচায্যি বাড়িব সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিষটা। কুলনারীব গুণ লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্ব্বাচন করতে হবে—গৃহিনী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সবদিক যাচাই করে দেখতে হবে। সারা জীবনের ধর্ম্ম সাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই হলো না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হাঁ তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবাব যতদূব সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সবকাবেব মেয়ে অনুপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশী। বোগা বা অতিতন্বী দুইই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কিনা না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করল রাণু।—না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন—ভালই হলো। জানি তো, যা কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিষ নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ীর সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল।—যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকারিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ—সুন্দরী বামা, রাজপদং ধনসুখং ইত্যাদি ইত্যাদি।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাইকরা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিল।—ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিসনে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল্।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম। একবার ভাব তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কাণ পর্য্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চিজ হবে সেটা!

কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাতপাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে, অ্যানথ্রপলজিষ্টরা যেমন বলেন…।

—অ্যানথ্রপলজিষ্ট না চামড়াওয়ালা? কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন।—আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে

বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিস্তের মুরোদ! মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্ব্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব্ব করে? আধুনিক হয়েছে? যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ী থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বল্‌তে বৃথা চেষ্টা করে চুপচাপ রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাস জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমাকে আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নাই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসন্ধি আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্ত্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হলো। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোভয়া স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

সত্যবাবু মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিলেন।—বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো—এ নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ পিসিমা।

পিসিমা একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সঙ্গেই বিয়ের এক রকম ঠিক। এবার শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয় নি তাই হলো। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্য দাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হদকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়েব ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিম্‌টে দিয়ে বিদেয় করে দাও না।

কৈলাসবাবুব অটলতার ব্যতিক্রম হলো না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্ত্তি হয়ে রাণুকে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো।

—কোন দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে-বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এ বাক্যলাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ?

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

—কেন দেব না?

—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

—সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্ক বিম্বাধর—আরও যা আছে লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমাবেব মার মেজাজও ধৈর্য্য হারাবার উপক্রম করলো।

তবু মনের ঝাঁঝ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না। আমরা দেখছি।

—ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার আমি দায়মুক্ত ?

—হাঁ।

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আর আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না ঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু ডোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই ?

—বড় পাজি এ ছুঁড়িটা হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলো। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখারীর জাত দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কটা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ করে রাখবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হলো লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—এ কি ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা, তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো!

কৈলাস ডাক্তার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে ? টেবিল থেকে নতুন বেলেডনার শিশিটাই বা গেল কোথায় ?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হলো।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া

গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে! বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরু সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যদু ডোম এসে তখুনি খবর দিল, তিনটে লাস এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চল্ রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে!

ময়না ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে নাকি রে যদু?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচা পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকী একটা শুধু···।

—নে কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আল্‌গোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরি মেয়েটা।

কৈলাস ডাক্তার বোকার মতো যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা সাড়ীটা গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস্ কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল করে। ইউকালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আর একটা বাতি জ্বাল।

—One more unfortunate!

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হলো। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের ওপর। গলাটা চিরে দেওয়া হলো

লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ও দুপাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হলো। সাঁড়াসী দিয়ে পট্ পট্ করে পাঁজরগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেত পটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিবর্ণ।

—ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যদু বললো—হাঁ হুজুর কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা!

—এত লালা! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখলেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন—খণ্ডফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিকীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুশেষীর তরঙ্গ আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্য্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক…।

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো—এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটি অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ পাউরুটি—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়ল মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন—পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্ব্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যদু এসে ডাকলো—হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই বললো—এত দেরী কেন রে যদু?

—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

এবার শোভনা খাদের গলায়, 'কই তুমি তো আমায় খেলে না ? তুমি আমায় ভালবাসো না ?'

'বাসি !'

মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুম্বন করলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে, 'আগে কাউকে কখন এমনভাবে...'

'হ্যা...আচ্ছা আপনি ?'

'আমায় তুমি বলো, আমি তোমার কে ? বলো ?'

'আচ্ছা তুমি ?'

'না', দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি—'

'বউ'

শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখসৃত লালা মল্লিকার গালে লাগল।

—চতুরঙ্গ। বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৮

মতিলাল পাদরী

হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। দূর নিমড়ার টিলা থেকে, দূর সাগরভাঙার উৎরাই থেকে এবং আর আর অনেক গোয়াল, বাথান, গ্রাম থেকে দেখা যায়। এ কারণে যে, গির্জাটি কষা হাঁদা জমির উচ্চে অবস্থিত।

প্রতি প্রাচীন জ্যামিতিক চিহ্ন নীল আকাশের মধ্যে ; কি চাঁদের আলোয় অথবা হুণ সূর্য্যের দাপটে সমানই বিস্ময়কর এবং শান্ত। কঠিন জ্যামিতিক চিহ্নের মধ্যে এত বেদনা অটুট হয়ে থাকে তা কে জেনেছিল, যে বেদনার ভার প্রাণের মাধুর্য্য চিরকালই বইবে।

ঢ্যাঙা ইউকালিপ্টসের সারির ফাঁকে বিলাতি কুঁড়ের মত ছোট গির্জ্জাঘর ব দেওয়াল যথাযথ পরিষ্কার করে নিকানো। তবুও আঙুলের বাহাদুরী লাল হয়ে আছে। বাঁশের সতরঞ্চ করা জানলা, ঘরে মেজেয় বিশুদ্ধ এক কোণে অনেক মাদুর জড়ানো ; রবিবারের অথবা স্মরণীয় কোন দিবসে সবগুলি পাতা হয়। সম্মুখে 'পবিত্রতা'র ছবি ; নিম্নে লম্বা টেবিলে অনেক রঙীন বাতি, ধূপদান, ইতস্তত ফুল বিক্ষিপ্ত। এর পাশেই মাটি থেকে ওঠা অলটার নিখুঁত সাঁওতালী কারু-নিপুণতা। গির্জ্জার দুপাশে সবুজ মাঠ (যা এখানে অসম্ভব) ফুলের মাদা কেয়ারি করা ক্যানা গাছ। একান্তে একটি ঘণ্টা লাটঠা।—এর গা বেয়ে পাক দিয়ে ওঠা সবুজতা। উপরিস্থিত ঘণ্টার দড়িটি অনেক নীচে বাঁধা। বহু যোজন খর জমির মধ্যে এইটুকুই নয়ন অভিরাম হরিৎ শোভা। মতিলাল পাদরী অনেক পরিশ্রমে এইটুকু আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এখানে লোকে সন্তর্পণে পা দিত ; পাছে পাপ হয় তাই সভয়ে বিচলিত পদে, কাপড় সামলে গির্জ্জায় আসত। মতিলাল সত্যিই বড় পুণ্যের স্থান করে রেখেছেন। পাশের কুয়া থেকে বাগান ভাসিয়ে নিত্য জল দেওয়া হয়, কেউ না আসলে এই বয়সে তিনি নিজেই জল দেন ওপাশের আর একটু নীচু জায়গায়, যেখানে কিছু পাতাবাহার কিছু খুরুশ আর মাঝে

মাঝে অনুচ্চ বেদী। বেদীর উপরে লালপাতার ক্রুশ। একমাত্র মতিলাল পাদরীর মায়ের কবরেই কাঁঠাল কাঠের ক্রুশ ছিল। আত্মার শান্তিময় ক্রোড় বিবেচিত হলেও, পাখীরা—কখনও পরশ খঞ্জনা অথবা চীনা বুলবুল, এছাড়া কাক চিল সেখানে বসত। প্রথম প্রথম মতিলালের খারাপ লাগত, তিনি ভেবেছিলেন একটা কাকতাড়ুয়া করব যাতে কাক চিল না আসে। তারপর ভেবেছিলেন সেটা বড় খারাপ দেখাবে। পরে ফুললকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, 'একটা গুলতি করে মেরে তাড়াব।' পেয়ারার ডাল দিয়ে গুলতি করবার সময় মনে হল, এটা ঠিক ক্রিশ্চানসম্মত কাজ নয়, যদি লাগে পাখীদের! তিনি সত্যই দুঃখ পেয়েছিলেন। ফলত গুলতি স্থগিত রইল।

মতিলালের চাইবার কিছুই ছিল না, শান্তি নয় কিছু নয়। বিচারের ভীতি তাঁর কোনক্রমেই ছিল না। শুধুমাত্র একটি আশা, পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান। পুরো ক্রিশ্চান বলতে অর্থাৎ কথাটার মধ্যে বহু পুরাতন প্রেমের অনুভব ছিল, অনুতাপ নয়। তাই পাশাপাশি পাঁচ-দশ মৌজার এমন কোন স্থান নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এ-কথা না ভেবেছেন। সুদীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লিষ্ট মানুষটির ছায়া কোথায় না পড়েছে।

দীর্ঘ শালবল্লা থেকে তাঁর দেহটা যেন কুঁদে তোলা—মাথার প্রথমেই টাক, তারপর লম্বা চুলগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। কানে গলায় ময়লার স্তর, পরনে অতি পুরাতন কালো শতচ্ছিন্ন আঙরাখা। ক্রিশ্চান হবার বাসনা নিয়ে এক টিলা থেকে আর এক টিলায় বহুবার পার হয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন।

গির্জাঘরের পিছনে বহুদূরে তাঁর খোড়ো চালা। বারান্দায় ইজি চেয়ার, মনে হয় বসলেই পড়ে যাবে। সকালে এখানে বসে যখন মানুষের জিব দেখেন, চোখ দেখেন, নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ কাটে, তখন আর্ত্তরা আর এক ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পায়, সভ্যতার দিকে এগিয়ে আসে। কেউ জলচৌকিতে বসে নীতিবিচার শোনে, বিশ্বাসের কথা শোনে, তাদের রক্ত স্থিরতা লাভ করে। সামনে ছোট বাগানে যখন গীতসংহিতা হাতে পায়চারী করেন, তাঁর লতার অগ্রভাগের মত দেহটা কি যেন জড়িয়ে ধরতে চায়, তখনই দেখা যাবে দূরে বসে কোন বুড়ী তার ডালপালার বোঝাটা পাশে রেখে, বসে বসে কিছু পুণ্যের পথের হদিশ আশা করে ; আর তিনি, এই উধাও হাহা করা ফাঁকের মধ্যে একটি পুরাতন ক্রিশ্চান, কিছু কিছু বলেন।

এখন আষাঢ় মাস। ভারী ঝড়, ভারী জল। কামাসক্ত আলিঙ্গনের মধ্যেও দুস্তর পারাবার সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমাগত বিদ্যুৎরেখা, ঘোর কৃষ্ণময়ী রাত্রি। কক্ষস্থিত লণ্ঠনের শিখা পর্য্যন্ত কাঁপছে। মতিলাল তক্তপোশে, বাইবেল খোলা, তবু তাঁর কানটা যেন কোথায় ছিল। মতিলাল টেবিলস্থিত আলোর দিকে চাইলেন, উপরেই 'তাঁর ছবি' সেখানে একবার নজর পড়ল, কিছু হয়ত বলেও ছিলেন।

এমন সময় মাথায় একটা পেকা দিয়ে ভুলুয়া এসে দাঁড়াল, ইচ্ছা করে বেশী কেঁপে বললে, 'যেমনি বরখা···কি বা ঠাণ্ডা গো···'

মতিলাল কান খাড়া করে অন্য কিছু তখনও শুনছিলেন। একবার ভুলুয়ার দিকে চেয়ে পরে খোলা দরজার বিদ্যুৎপীড়িত অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

'কি বরখা গো···খাবেন নাকি গো?'

'ওরে কুকুরটা এত ডাকছে কেন রে?'

'উ বেটা ভারি পাজী গো, বেরাল টেরাল দেখছে মনে লয়, মারব এক ঠ্যাংআ?'

'একবার ভুকভুকিয়া (টর্চ্চ) ফেলে দেখনারে'।

'তুমি দেখ গো, আমার ভাত পুড়বেক, আমি যাই গা'—ভুলুয়ার জবাব রুক্ষ নয়। পাদরী যেন এদের মা।

পাদরী কোমরের দড়িটা একটু এঁটে, খড়ম পায়ে বাইরের বারান্দায় এলেন। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, কুকুরটা গির্জ্জাঘরের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে। টর্চ্চ জ্বলল কিন্তু আলো ধিমিয়ে আছে, শুধুমাত্র বৃষ্টির দড়ি দড়ি রেখাই স্পষ্ট হল, গির্জ্জাঘরের আলোর রেশ এখান থেকে স্পষ্ট, শুধু দরজা পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাদরী ঘরে এসে কি ভাবলেন, তারপর ছাতি নিয়ে কোনমতে ঝোড়ো হাওয়া এবং জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গির্জ্জার জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলেন। পবিত্রতার ছবিটা একটু দুলছে, নিম্নে সেজের বাতির শিখা উপদ্রুত, ওপাশে ঝিম লণ্ঠনের ভীত আলো। মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, দরজা পড়ার শব্দের মধ্যেও তিনি অস্থির গোঙানির আওয়াজ শুনলেন, জানলার বসানে মুখ রেখে দেখতে গিয়ে গাল তাঁর ঘষে গিয়েছিল।

কিছুটা সেজের লণ্ঠনের, বিশেষত বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল একটি সাঁওতালীসদৃশ স্ত্রীলোক, যার কর্দ্দমাক্ত হাত দুটি মাটির সঙ্গে এঁটে আছে, পা দুখানিও কর্দ্দমাক্ত এবং দুই দিকে বিভক্ত, বিস্তৃত হস্তপদদ্বয়ের মধ্যে বিবস্ত্র দশাসই দেহটাই কিসের সঙ্গে যেন বা লড়তে গিয়ে কোন এক বেদনায় সেতুর মত বক্র হয়ে উঠেছে। এক কোণে, একটি কাপড় বিরক্তির ভাবে বসা মুরগীর মত ফুলে ফুলে উঠছে। তার মুখের দুপাশে কষ, আর অসম্ভব গোঙানি। প্রাকৃতিক শব্দ ভেদ করে, সমস্ত স্মৃতিকে ছাপিয়ে জিগির দিয়ে ওঠে।

এইটুকু তিনি বুঝেছিলেন যে মৃত্যুর গোঙানি-এ নয়। এ এক অন্য, পুরুষ এই বেদনার কাছে নাবালক। তবু হলকর্ষণের শব্দে যেমন আনন্দ থাকে এখানে সেটুকু ছিল। এখানে, লতাপাতা জল ঝড় মাটি পাথর সকল কিছুর, এমন কি জড়তার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত হয়েছিল। কুকুরটিও জানলায় পা দিয়ে উঠতে চাইছিল, মতিলাল পাদরী তাকে সরিয়ে কোনক্রমে এপাশের গির্জ্জাঘরের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

কালো দরজাটা হড়াস করে খুলে নড়তে লাগল। এ ঘোর জলেও তাঁর দেহ কি এক সত্যদর্শনে বিব্রত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিরাট পাহাড় ধসে যাওয়ার যে গম্ভীর বজ্র ব্যাপার, প্রকাণ্ড প্রমত্ত সমুদ্রের দেহের ছোট নদীতে ঢল ঢুকে পড়ার যে প্রলয় অমোঘ ব্যাপার, তার থেকে ঢের ঢের বেশী এ দৃশ্য! চন্দ্র সূর্য্য তারকা নেই; শুধু প্রসিদ্ধ রক্তের জোয়ারের উত্তাল অলৌকিক শব্দ। যে রক্ত স্তিমিত আলোয়, বিদ্যুৎ এমন কি, কালোর পরিবর্তে অধিক লাল। মাংসল বীজ বিদীর্ণ করে ফেটে ছিঁড়ে, অন্ধকারবিরোধী একটি হাতিয়ার আসছে, অথবা ধরা যাক, আর একটি বৃক্ষ; যে বাসা দেবে, ছায়া দেবে, বৃষ্টি আনবে! অথবা শুধু মাত্র সন্দেহের পিণ্ড যা অজস্র আখছার। এ পিণ্ড আর একটি। দরজা আবার পড়ল আবার খুলে গেল, সম্মুখে পবিত্রতার ছবি, নিম্নে আধো অন্ধকারে বিদ্যুৎপীড়িত এই রমণী! যাকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল অখণ্ড আকাশের শরতের লঘু মেঘ—যা হঠাৎ গির্জ্জা থানে ঢুকে পড়েছে।

পাদরী বড় বড় চোখে শুধু চেয়েই রইলেন। হাত থেকে ছাতাটা তাঁর পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে ধরবার ক্ষীণ চেষ্টার ভদ্রতা মাত্র করেছিলেন, ফলে শরীরটা তাঁর বক্র হয়েছিল। ছাতা এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যানা গাছের ঝোপে গিয়ে নড়তে লাগল। কুকুরটা

ততখানি দৌড়ে গিয়েছিল। মতিলাল পাদরী এখনও দরজায় বিমূঢ়, হাত দুটি আপনা থেকেই নমস্কারে পরিণত। সেখানে একটি নীল সঙ্গীহীন শূন্যতার মধ্যে আরবী তাঁবুর হিজিবিজি, একটি গভীরতা। এ নমস্কার তাঁর স্বভাববশতই এসেছিল, অন্য কিছু নয়।

এ সময় তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল ; জল আঙরাখা বেয়ে হু হু করে পড়ছে। দাড়িটা একবার নিঙড়ে, লাফ দিয়ে উঠে তিনি ছুটলেন, যা সত্যিই তাঁর পক্ষে অসম্ভব— একে আঙরাখা বৃষ্টিতে জগদ্দল এবং দেহ বৃদ্ধ রুগ্ন—তবু কবরখানার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে নীচে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে বিঘে দুয়েক জমি পার হলেন।

বেড়া ধরে দাঁড়াতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলেন, 'ফুলল ! ফুলল !'

ফুলল ঘরের দাওয়াতেই ছিল তাঁকে দেখে পেকা মাথায় দিয়ে দৌড়ে এসে বললে, 'কি গো বাবা ?'

'ওরে গির্জেঘরকে...'

'কি গো ?'

'ভয়ানক তড়কা ব্যাপার গো...বুঝতে লারলাম !'

'সে কি গো...'

একটু দম নিয়ে আর একদমে সব কিছু যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়ে চোখ বড় করে ফুললের দিকে তাকালেন।

ফুলন চোখ বড় করে বললে, 'তবে মাগী বিয়োবে নাকি—বিয়োচ্ছে নাকি পাদরী বাবা ?' বলেই নিজের মাথার পেকা পাদরীর মাথায় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দাওয়া থেকে একটা পেকা মাথায় দিয়ে এল।

পাদরী বেড়া ধরে বেপথুমান। বিদ্যুতের আলো পড়ল, চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তাহলে—এখন ?'

'কি সব্বলাশ গো ! গিজ্জা...'

পাদরী জোর করে বেড়াটা ধরে বললেন, 'তাহলে...' অসম্ভব লজ্জিত ভীত এ যেন তাঁর নিজেরই দোষ।

'তাহলে আর কি বীণা হাড়িকে ডাকি গা', বলেই সে অন্ধকারময় স্রোত-বওয়া রাস্তা দিয়ে ছুটল। পাদরীও পেকাটা এক হাত দিয়ে চেপে তার পিছু নিলেন। কুকুরগুলো তাদের কাছে ছুটে আসছে, তারা হেই হেই করে তাড়া দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আর ফুলল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'কি সব্বলাশ গো আ।'

বীণার বাড়ি। বিদ্যুতে স্পষ্ট হল যে, দাওয়ায় বসে বীণা তামাক খাচ্ছে। প্রথমে ফুলল এসে দাওয়ার খুঁটি ধরতেই দেহটা দুলে গেল। মাথাটা নিচু করে সকল কথা বললে, এমন সময় পাদরীও এলেন। কথা কটা শুনেই বীণা দাঁড়িয়ে উঠল। চালে গোঁজা কয়েকটা বাঁশের অস্ত্র নিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে পেকা মাথায় দিলে। তিনজনই খর পায়ে। পাদরীর মাথা থেকে কখন যে পেকা উড়ে গেছে, তা তাঁর খেয়াল থাকলেও খবার সময় ছিল না।

গির্জাঘরের সামনে কুকুরটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, তাদের দেখে ন্যাজ নাড়তে লাগল। বীণা খড়ছেঁচা জলে অন্তরগুলো ধুতে ধুতে বললে, 'হেই মিনষে উঁকি মারছিস কেনে, শরম সহবত নাই, মারব এক লাথি'—বলে লাথি ছুঁড়লে।

ফুলল লজ্জায় দরজার এক পাশে দাঁড়াল। পাদরী দাড়ি নিঙড়ে মুখ মুছতে লাগলেন। বীণা বাঁশের অস্তর থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'এক হোলা আগা, লিয়ে এসো গা,

আর একটা লণ্ঠন, তড়পা তড়পা খড়, গরম জল...'

বীণা অন্তরগুলো মাথায় ঠেকিয়ে 'দুর্গা দুর্গা মা ষষ্ঠী !' বলে গির্জেঘরের, এদিক ওদিক চেয়ে দেওয়াল ঘেঁষে এসে দূরের কাপড়টা তুলে অন্তর মুছতে মুছতে সেই বিরাট স্ত্রীলোকটার দিকে তাকাল। এখন বিদ্যুতে মুখ তার দেখা যায়, হাওয়ায় চুল মুখে উড়ে খেলা করে। বীণা বিজ বিজ করে কি বলতে বলতে তিনবার তাকে প্রদক্ষিণ করে অন্তর হাতে নিয়ে মেয়েটিকে গড় করে প্রস্তুত হল। হোলায় আগুন, লণ্ঠন, খড় নিয়ে এসে ফুলল দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ করে বললে, 'আনছি গো।'

'চোখ বন্ধ করে দুয়ার দিয়ে ঠেলে দাও হে...দিয়ে দরজা শালাকে চেপে ধর।' জিনিসপত্তর দিয়ে ফুলল আর পাদরী দরজার কড়া ধরে সিঁড়িতে বসলেন। ভুলুয়া এসে উঁকি মারতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাদরী তাকে শুধু বললেন, 'ভুলুয়া !'

'আচ্ছা দুটা পেঁয়াজ পুড়াইয়া এসে দেখব গো', বলে সে কোনমতে চলে গেল। দুজনেই কড়া ধরে নির্ব্বাক। দরজায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, ওরা এক একটি কড়া জোর করে ধরে বসে।

অনন্তর ক্রন্দনের শব্দ ঝোড়ো হাওয়ায় কভু বা চাপা কভু উত্থিত হয়। এই ক্রন্দনের শব্দে, কালো মেঘবন্ধ আকাশে বক উড়ে যাওয়ার ছবি, অথবা নীল দিব্য আকাশে পায়রার কথাই বার বার করে পাদরীর মনে হয়েছিল। শায়িত মেরুদণ্ড শুধু খাড়া হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই এ ক্রন্দনে ছিল না, একটু আলোও ছিল। সুতরাং পাদরীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ আবার মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিকট শব্দ প্রকম্পিত হয়ে আর এক স্তব্ধতার সূচনা করলে এবং পরক্ষণেই বীণার চৌকিদারী আওয়াজ 'হে হো বেটা-ছানা গো ছেইলা হে।' কথাটা যেন দূর ঊর্দ্ধ থেকে ক্রমে নামল।

দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলে, ফুলল পাদরী বাবার দিকে চেয়ে সে কিছু শোনবার আশা করেছিল। তারপর হিহি করে হেসে বললে, 'হিঃ বেটা ছানা... !'

পাদরীর হাত আস্তে কড়া থেকে খসে গিয়েছিল, ফুলল খপ্ করে সেই পাল্লার কড়াটা ধরে ফেলল। পাদরী হাঁটুর উপর কনুইয়ের ঠেস রেখে গালে হাত দিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবতে মনস্থ করলেন। বুড়ো মানুষ, পরিশ্রম হয়েছিল, দাড়িটা আঙুল দিয়ে খেলাতে খেলাতে আপন মনে বললেন, 'কি বললে হে'—যদিও স্পষ্টই তিনি শুনেছিলেন, তবু সুনিশ্চিত হওয়ার যেন প্রয়োজন ছিল।

ফুললের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু শব্দ হল না। কান্নার শব্দ ঝড়কে দাবিয়ে উঠতে চায়। বিশাল অজর প্রকৃতিকে ভীত করতেও চাইছে, আর রোমাঞ্চিত পাদরী কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছেন, এ ঘোর রাত্রে এ কি অসম্ভব কাণ্ড ! এত জায়গা থাকতে এই গির্জ্জাঘরে ! তাঁর বিস্ময়, মনের মধ্যে কি এক অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিল, তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল শিশুর কান্নার পিছনের অর্থ যে মন খোঁজে, সেই মন দিয়ে পাদরী কি এক অর্থ খুঁজতে চাইলেন, ক্রমে বৃদ্ধ পাদরীর ভাবান্তর হল। বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে ধীরে বাগানে এসেই জলের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসলেন, করজোড়ে শুধু বলেছিলেন...'প্রভু !'

এই প্রার্থনা অসহায় মানুষের বোকামীর জন্য নয়, বিকারের জন্য নয়। বহুদিন পর এ প্রার্থনায় প্রশ্ন ছিল, হতবাক বিমূঢ় চিত্তের প্রশ্ন। এই মেঘঘটা ত্রস্ত রাত্রে, বিদ্যুতে জনসাধারণ ভীত, পৃথিবী গুহাবৎ, ধর্ষিত ক্ষিপ্ত হারমানা বনরাজি—এ হেন সময়ে, এ দীন দুঃস্থ গিজ্জা ঘরে কে জন্মাল ? খরধার বৃষ্টিতে তাঁর দেহ বিধ্বস্ত হয়ে উঠছিল। সহসা তিনি যেন

এক বর্ণচ্ছটা দেখেছিলেন, অন্য কিছু নয়। অনন্তর তাঁর মনে হল যে, এতাবৎকাল তিনি এই প্রতীক্ষায়ই ছিলেন ? আর যে, অবশেষে এই তাঁর পবিত্র পুরস্কার এল ?

ফুলল বোকার মতই অবাক হয়ে পাদরীকে লক্ষ্য করছিল। অন্যমনা হওয়ার জন্য হাত আলগা হওয়ার কারণে, দরজা বশ মানছিল না, খুলে যেতে চাইছিল। সে সজোরে টেনে রেখে তারস্বরে হাঁকলে, 'খ্যাপা হইছে হে !'

ভিতর থেকে বীণা দরজাটা টানতেই ফুলল কোনক্রমে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বীণা গভীর স্বরে বললে, 'যাও গা, একটা জায়গা লিয়ে এসো গা ফুল ফেলব, কুদালই আনবি হে', তরপর বললে, 'একটা চুটা দে।'

ফুলল আপনার টাঁক থেকে অগত্যা একটি চুটা বার করে তার সামনে তুলে ধরলে ; বীণা হাড়ি তার অশুচি হাত চালছেঁচা জলে ধুয়ে, হাত ঝেড়ে চুটাটা নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হল।

ফুলল বীণার হুকুমটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। বীণা এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে কড়া দুটিকে কব্জা করে আরামে চুটাতে টান দিয়ে ফুললকে বুঝিয়ে দিলে। ফুলল ব্যাঙের মত থপ থপ করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনতে চলে গিয়েছে, চুটার ধোঁয়া ছেড়ে বীণা তার অল্প চোখ দুটি মিটমিট করে হাঁকল, 'আ হে পাদরী গো—'

বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় পাদরী তখনও প্রার্থনায় স্থির। প্রাচীন কোনদিনের মধ্যে তাঁর স্থূল অশরীরী দেহ চলে গিয়েছিল, যে মাটিতে প্রথম প্রচার হয়েছিল। আর একজনের কথা তাঁর মনে হয়, যিনি নিজের অস্থি দিয়ে মানুষের মনে সবুজতা এনেছিলেন।

'আ হে হে পাদরী গো !'

বীণা তাঁকে এই পরিবেশে আনতে গিয়ে গলার স্বর কাঁপিয়ে তুললে। পাদরীর অসম্ভব উদ্দীপনা হল ; সংসার চিরদিনই শুদ্ধ পবিত্র, একথা তাঁর কোনক্রমেই অবিশ্বাস হয়নি, আজ আরও দৃঢ় হয়েছে। ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি।

বীণা চুটাতে জম্পেস টান দিয়ে বললে, 'খাড়াও গো, ছানা দেখবে কি গো ? এক ঠেকা (ধামা) ছেইলা হে ! গতর কি বা রাজপুত্তুল গো, হে হে রাজপুত্‌ল' বলে তার অল্প চোখ দুটি ঘুরাতে লাগল।

এমত সময় ফুলল পিঠটা বাঁকিয়ে মাথা নীচু করে আধ-ছোটা পায়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বীণা বলল, 'বুড়া মাথা খাইছ কি হে, এটুক হোলায় মাটি তুলতে লারব হে, বড় ঠেকা লিয়ে এস গা···।'

ফুলল বললে, 'দুঃ শালী একবারে বলবি ত' বলে চলে গেল। পাদরীর চোখ যদিও এদের দিকে ছিল কিন্তু কোথায় যেন তিনি ছিলেন। ঠোঁট অনবরত পটপট করে মন্ত্রশব্দে কাঁপছে। ইতিমধ্যে ফুলল ফিরে এল। বীণা চুটাটা নিবিয়ে কানে গুঁজে সরঞ্জাম নিয়ে ভিতরে গেল।

বীণা কোনমতে প্রসূতিকে এক পাশে শুইয়েছে। এখন খড়ের ডাঁইয়ের উপর ছেলেটি, ক্রমাগত কাঁদছে। সে আস্তে আস্তে কোদাল দিয়ে লোহা মাটি তুলে হোলায় এবং ঠেকাতে ভরে, এক হাতে হোলা অন্য হাতে ঠেকা নিয়ে দরজায় লাথি মারতেই তারা দরজা খুলে দিলে। তারা দুজনেই অন্যদিকে মুখ করেছিল। বীণা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, হেসে বললে, 'লাও গো পাদরী, ঘরকে দেবতা আনলাম, একটা পিদ্‌বার কাপড় দিও গো, লাও হে পদ্ম দেখ' বলে এই বৃষ্টির মধ্যে মাথা দুলাতে দুলাতে অনেক দূরে চলে গেল। সেখান থেকে বললে,

'বিটি ছানা মাগীটা কুথাকার গো···বলে তার কেউ নাই।'

বীণার 'ঘরকে দেবতা আনলাম' কথাটা পাদরীকে এক অনৈসর্গিক আলোর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

দুজনেই কি করা উচিত তা ভেবে পায়নি। একজনা বাঁ হাত, অন্যজন ডান হাতে কড়া দুটি ধরে দরজা হাট করে খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অদ্ভুত নাটকীয় শিল্পীকল্পিত ভঙ্গী দুজনার।

মতিলাল সদ্য গোলাপী স্পন্দন দেখে হতবাক হয়েছিলেন একথা সত্য ; কিন্তু বিস্মিত হননি। আর কিছু দূরে একটি মেঘতুল্য স্ত্রীলোক আর তারই সম্মুখে বীণার কথামতই এক ধামা দেবশিশু ! সুন্দর একটি গন্ধও অনুভব করেছিলেন, আর একটু উপরে, চাতালে তিনি উঠে গেলেন ; সেখানে বসেই করজোড়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে একটু হাসলেন, এ হাসি মানুষের প্রার্থনায় দেখা দেয়।

ফুলল খুব গম্ভীরভাবে বললে, 'সব ত হল এখন, ওই বিটি ছানার ঘর কুথা গো।'

মতিলাল সে কথা শুনেও তখনও জল-ভরা চোখে শিশুর দিকে চেয়ে। কতবার ইতিমধ্যে দরজা পড়ল এবং খুলে গেল।

ফুলল নিশ্চিত হবার জন্য বললে 'বাপের ছেইলা বটে কেমন—তোমার কি মনে লয় বাবা ?'

পাদরী কঠিনভাবে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ফুলল !' উচ্চারণে একটা ধমক ছিল। অসম্ভব কণ্ঠস্বর, তথাপি তাঁর যে দাঁত আছে একথা প্রমাণের থেকে বেশী করে ছিল হিতকর সভ্যতাজ্ঞান।

এখানকার লোকে, পাদরীকে ঢ্যাঙা বালক ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না, এমন কি তাদের ধারণা ওঁকে সহজেই কোলে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ফুলল এই ধমকে বেয়াকুফ হয়েছিল, তবু সে দমল না। জিবটা ঠোঁটে বুলিয়ে মাথায় ঝিক দিয়ে বললে, 'হে হে বেগোড় কি বললাম গো, ন্যায় কথাই পাড়লাম···কুহক রহস্য নাই···'

মতিলাল নিজের ভিজে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে ইসারা করে বললেন, 'পরে।'

'তুমি বলছ বটে, চুপ করব বটে, তুমি এসবের কি বুঝ, পাদরী মানুষ বৈ ত অন্য লও। হাট ঘাট জান না···গিজ্জাটা লষ্ট···পতিত হল···বীণা ঠিক খবর লিক।'

মতিলাল মাথা নাড়িয়ে অধৈর্য্য হয়ে বললেন, 'ফুলল তুই জানিস না এ কে উপরের দিকে তাকিয়ে একবার ধন্যবাদ দে···' মৃদু গলায় বলেই বললেন, 'ওরে যা ঝপ্ ঝপ্ করে আমার বাইবেলটা লিয়ে আয়, আমি সব কথা ভুলেছি হে···।'

ফুললও পরিশ্রান্ত হয়েছিল। বাইবেলের কথা শুনে তার গা পাক দিয়ে উঠল। যদিও সে ক্রিশ্চান তবুও বিরক্ত হল, বললে, 'তুমি কি মরবে নাকি গো ! ছেইলা ত হল এখন কাপড় ছাড় গা···কুথাকার কে···লাও ওঠ।'

'না না তুই লিয়ে আয় গা···একটা লালটিন।'

'দূর বাপু···একে ঝড় ঝাপটের রাত, তার উপর শাল্য কচে বারো এই ছেইলা হওয়ার হ্যাঙ্গামা, আবার বাইবেল কেনে ? তুমার কি ভীমরতি হইছে বাবা ?'

'লিয়ে আয় গা···যা ধন···'

ফুলল বাধ্য হল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বাইবেলটা দিয়ে লালটিন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইবেলটি গ্রহণ করে পাদরী বললেন, 'লে লালটিনটা তুলে ধর।' কথামত ফুলল

লালটিন তুলে ধরলে। সঠিক পাতা খুলে, দুবার দাড়িতে হাত বুলাতেই মন প্রস্তুত হল। ঠোঁট কাঁপছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের অস্ফুট শব্দ। এখন একটা গুবরে পোকা এসে পাতার উপর বসল, লণ্ঠন হাতে ফুলল পাদরীর ভক্তিভাবের দিকে তাকিয়ে টোকা মেরে সেটাকে ফেলে দিল। পাদরী পাঠ শেষ করেই বললেন, 'আমেন।' ফুললও তাড়াতাড়ি বললে, 'আমেন' বলে সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখেই বললে, 'শালী!'

পাদরী তার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন।

ফুলল একটু থতমত খেয়ে বললে, 'না এই দেখ্ আক্কেল কি বা ধনির, কখন গ্যাছে, এখনও আসবার লাম নাই গো···হেই আসছে গো···কুথাকে গিয়েছিলে গো···শালী!' বলে বীণার উপর নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলে।

'মরতে হে, সোহাগসফর করতে হে', এবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাদরী বাবা তোমার লেগে আইলাম, উয়াকে, শালা ফুলল ঢেমনাকে বল মান্য করে কথা বলতে গো···বেটা বেজাত ক্রেশ্চান···'

'হেই হেই···হাড়ি···দেকো পুষী (হিন্দু ছোট জাত)।'

এ সময়ে ঠিক এমন ছ্যাঁচড়ামির জন্য পাদরী প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছিল। গর্ত্তে মুখ রাখা খরগোসের মতই তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন। বার বার তাঁর সে সমাহিত ভাব দুমড়ে যাচ্ছিল। বীণা হাড়ি তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝেছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। বললে, 'তোমার কিরে (দিব্যি) মাইরি মদ খাই নাই, দুটা ভাত লিয়ে এলাম, রাত এঠেন থাকব, আমি চুটা তামুক খাব?'

'ইটা গির্জ্জাঘর বাপ্, এখানে নাই বা খেলি। আমার কোঠায় আয়···'

'আমি আতুড় ছাড়ি ঘন ঘন যাব সে কি গো? তা ছাড়া কুথাকার, কুলশীল বেজানা, থানা মৌজার ঠিকানা নাই, সে তোমার এখানকে বিয়োতে পারে, তাতে ঘাট-দোষ নাই···বাঃ হে বাঃ···।'

ফুলল বীণার এ উক্তি সমর্থন করে পাদরীর দিকে তাকাল।

কতগুলি হীন নোংরা-মাখা হাত যেন পাদরীকে জড়াতে চাইল, তিনি যেন আরও সরু হয়ে গেলেন, শুধুমাত্র অসহায় শব্দ করে বললেন, 'বীণা, চিনিস না গো ইয়াকে···।'

বীণা এতক্ষণ হাতের পুঁটলিটা নামিয়ে রেখে, পাদরীর কথা শোনার থেকে বেশী উত্তর দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। যাত্রাই ঢঙে হাত দুটি দুলিয়ে বললে, 'ওহো কত থানা, হাট ঘুরলাম, কখনও উয়াকে দেখি নাই···আর লিজে মাগী বুললে উয়ার কেউ নাই! সে বিয়োতে পারে, আর চুটা খেলেই দোষ···?'

'আমিও বলি ইটা বড় খারাপ হল গো,' ফুলল বললে।

পাদরী মুসকিলে পড়লেন। এদের কথাবার্তা তাঁর মনকে একটু মলিন করবার চেষ্টা করছিল। একবার ভাবলেন বলি, 'ছোট ছেলে আছে···চুটা খাওয়াটা ঠিক নয়···' কিন্তু একথা বলার পূর্ব্বেই তিনি বলে ফেললেন, 'ওরে কে জন্মাল তোরা তা জানিস না—'

'এই লাও' ফুলল বীণার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলে।

বীণা তেমনি ঢঙে বললে, 'হে, হে, আমি খালাস করলাম, লাড়ী কাটলাম, যত্ন নিলাম, আর আমি জানি না···তুমি।'

বালকের মত চেয়ে থেকে, সেই একই বিশ্বাসের কথা পাদরী সরল মনে বললেন, 'কে জন্মাল তা জানিস না হে।'

বীণা হাড়ি অত্যন্ত পাজী, সে কোমরে হাত দিয়ে, এক পাক সখী-নাচ নেচে বললে,

'তোমার কথা শুনে নাও খুব নাচলাম···এবার জাত খোয়াব ক্রেস্তান হব !'

এমন যে ফুলল, তার এ নাচ ভাল লাগে নি, সে একটা ধমক দিয়েছিল। পাদরীর এ ব্যাপারকে অত্যন্ত গর্হিত মনে হতে পারত, কিন্তু তা হল না। অসহায়ভাবে হেসে বললেন, 'বীণা যদি বেঁচে থাকিস ত বুঝতে পারবি, আমার ডাকা সফল হয়েছে।' বলেই আবার ঘরের ভিতর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। বাতিদানের উপরে পবিত্রতা, নিম্নে কর্ষিত ক্ষেত্র, সম্মুখে গোলাপী স্পন্দন। দেখেই পাদরী যেন পাগলের মত এদিক সেদিক চাইলেন, এবং হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঘণ্টা লাট্ঠার দড়ি খুলে যথেষ্ট জোরে বাজাতে লাগলেন। মেঘগর্জ্জনের প্রত্যুত্তরের মত শোনাল।

বীণা বলল, 'হে রে মদ্দ যা যা ক্রেশ্চান ক্ষ্যাপা হইছে গো, ড্যাকরা তুই না ক্রেশ্চান উয়াকে বাঁচা, বাঁচা গা শালা।'

ফুলল মহাবিরক্তিসূচক আওয়াজ করেছিল। অনেকক্ষণ গায়ে অযথা বর্ষার জল জমেছে, তার উপর এই সব পাগলামির খেসারত দেওয়া তার কোনক্রমেই ভাল লাগছিল না। তবু তাকে এগিয়ে যেতেই হল। বীণার কথায় তার মন খানিক স্বাভাবিক ক্রিশ্চানসুলভ হয়েছিল, গির্জ্জার মধ্যে যে কোন কাজ, বিশেষত পাদরী মতিলালের জন্য যে কোন কাজই পুণ্যের, সে কথা মনে হয়েছে।

সে গিয়ে দেখলে পাদরী পাগলের মতএলোমেলোভাবে ঘণ্টার দড়ি টানছেন। বিদ্যুতের আলোয় দৃশ্যটা ভৌতিক, ফুলল ভীত হয়েছিল। তবু সে নিজেকে প্রস্তুত করে, এগিয়ে দড়িটা নিয়ে নিতেই পাদরী বললেন, 'খুব বাজা রে' বলেই শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠে বললেন, 'জল ছাড়ছে ফুলল, ওরা সবাই আসবে, আমি বলব উয়াদের কে এসেছে···।'

'হেঃ জল থামবে না হাতী', ফুলল বললে। সে চেয়েছিল বেদম জল বর্ষাক, সে তাতে ছুটি পাবে। এরপর ভীষণ রেগে গিয়ে অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, 'তুমি আছ আর আমাদের দরকার কি।'

আশ্চর্য্য জল রুখে গেল। অবশ্য এখানকার বৃষ্টি এইরূপের। মেঘ সত্বর উধাও. পাহাড় প্রতীয়মান, ইউক্যালিপ্টসের ঝিরঝিরে ফাঁকে চাঁদ স্পষ্ট। একজন দুজন করে বেশ চাট্টি লোক কাদা ভেঙে এল। একরাশ টোকা আর পেকা জমা হল সকলেই নরকবাসী দরিদ্র, তবু নরককে ভয় করে সৎ হতে চায়, সকলেই মাঠে শান্ত হয়ে দাঁড়াল। পাদরীর ঘাড় আনন্দে নড়ছে, বললেন, 'আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইয়াছে রে।' এই সুসমাচার দেওয়ার পর পাদরী বললেন, 'ফুলল বাবা, বাইবেল—'

ফুলল বাইবেল এবং আলো এনে দাঁড়াল। পাঠ হল, গান হল 'জগৎরঞ্জন করি আগমন নবজীবন তুমি, করহে বন্টন'। প্রার্থনা, 'যে এল সে নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাবে···।'

অনন্তর সকলেই গির্জ্জাঘরের কাছে এলে, কেউ জানলায় কেউ দরজায় উঁকি মারতে লাগল। নিজেরা বুড়ো বয়সেও কাঁদে বলে ও-ক্রন্দনকে তারা অবহেলা করলে না। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি সকলেই মন দিয়ে শুনেছিল এবং সকলেরই মনে হল এ ক্রন্দনধ্বনি সাধারণ নয়।

বীণা এসে বললে, 'বুঝলে হে, এতগুলা মদ্দর লিশ্বাস ভাল লয়, ছানার গা পুড়বেক গো···ইয়াদের সরাও বাচ্চা-খেকো মদ্দাদের।'

ফুলল কোনমতে ভিড়কে হাটিয়ে দিয়েছে। জনতার প্রত্যেকেরই তবুও শিশুর মাকে দেখার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথমত গির্জ্জাঘর তার উপর পাদরী বাবা এখানে হামেহাল খাড়া, ফলে কেউ বিশেষ সাহস করতে পারলে না।

মতিলাল পাদরীর ঠিক পাশেই আর একটি কোঠা ছিল। সেখানটা আপাতত নবজাত শিশু ও তার মায়ের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তারা সেখানেই থাকে।

বিকেল হবে হবে ; এমন সময় বদন হিজড়ে এসে দাঁড়াল। পাদরী ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, হাতের বাইবেল থেকে চোখ তুলে তিনি বললেন, 'কি রে কোথায় গিস্‌লি রে ?'

'বাবা গিয়েছিলাম বটে দিদির ঘরকে গো, খেলাম কত ফেললাম কত, এই করতে খবর হয়, তুমার ঘরকে নাকি স্বগ্‌গ থেকে বাবু আইল হে, মনকে বুললাম, কেমন সে বাবু হুজুর দেখবি গো ত আমার সঙ্গে চল।'

মতিলাল পাদরীর মনটা তার কথায় জুড়িয়ে গেল। আরও কিছু শুনবার জন্য অবাক হয়ে চাইলেন, তখনও বদন হেলে আর দোলে।

'ভাবলুম দূতবাবুর কাছে গান গাই গা, যদি আসছে জন্মে মানুষ হই ছেইলার বাপ হই ! এ জনম ত হাজা মজা গেল গো,' বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছলে।

মতিলাল পাদরী জন্মান্তর সম্বন্ধে ছোট করে বুঝিয়ে দিতে মনে মনে চাইলেও মুখে কিছুই বললেন না, যেহেতু তিনি বেশ করেই জানতেন যে কোন ফলই হবে না ; এছাড়া বদনের কাতর উক্তির জন্য তাঁর কষ্ট হল। শুধু বললেন, 'খাড়াও বদন...' তারপর উঠে গিয়ে ভামরকে অনুরোধ করলেন।

ভামর দর্শন দিতে দিতে বেশ পটু হয়েছে। সে শিশুপুত্রটিকে কোলে করে নিয়ে বারান্দার তক্তপোশের উপর বসল। তার বসবার ধরনের মধ্যে দেবীভাব ছিল। বদন অবাক হয়ে শিশুটিকে দেখে, অঙ্গভঙ্গী করে বললে, 'বাবা গো আমি আপখোরাকী লোক, কাউকে মান্য করে কথা বলতে লারব, সত্যিই বাবা গো স্বগ্‌গ দেখি নাই বটে তবে মহিমা বুঝলাম...'

বদনের কথায় মতিলাল কোথায় যেন বা ডুবে গিয়েছিলেন। বদন এই সুযোগে ভামরের দিকে চাইল, ভামরের গা গতর চেহারা চেকনাই তাকে খারাপ করে দিলে ; কোনক্রমে সে নিজেকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে, ছোট আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগল—

'কিসের ভাবনা লো কিসের ভাবনা,
স্বগ্‌গ এখন ঠাঁই করেছে ঘরে
আমার কিসের ভাবনা...'

এই ঝুমুর গানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। নোংরা কথা দু-একটি স্বভাববশত মুখে আসলেও সে কিছু বলতে পারছিল না। এক একবার আড়ে আড়ে পাদরীকে দেখে, এবং পরক্ষণেই গানটিকে অত্যন্ত ভাবময় করবার চেষ্টা করে সে গাইছিল আর নাচছিল, আর গাইছিল।

অন্যপক্ষে ভামর বদন হিজড়েকে দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলেও সে কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছিল না, শুধু মাত্র তার দিকে শিশুর মতই হাঁ করে ছিল।

বদন শিশুকে বললে, 'আমার পানে চেয়ে আছ গো, চিনছ কি আমায় ? হাঁসছ বড় যে, কি গো দূতবাবু—জন্ম জন্ম তোমায় গান শুনালাম গো' বলেই একবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিজের স্বভাববশতই ভামরকে চোখ টিপল।

ভামর এ হেন ব্যাপারে কিছুই সত্যই প্রথমত বুঝতে পারেনি। তখনও শিশুর মতই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বদন নাচে আর এক পাক দিয়ে এসে পুনর্ব্বার একটু কড়া কুৎসিত ইঙ্গিত করে চোখ মটকায়। ভামর এতে করে রোমাঞ্চিত হল এবং পরক্ষণেই ভীত ত্রস্ত হয়ে মাথা নীচু করে তির্য্যক চাহনিতে পাদরীকে দেখেছিল। শান্ত মূর্ত্তি। তখন তার

কেমন এক অস্বস্তি হয়। শিশুর মাথা যেখানে দপদপ করে উঠানামা করে সেই দিকে চেয়ে রইল সে। হিজড়ে এখন নাচে ; তার ছায়া ঘুরে ঘুরে যায় তক্তপোশের উপর দিয়ে। সে ভয়ে মুখ তুলতে পারছে না। এখান থেকে উঠে যাবার আর কোন সুযোগ না পেয়ে ভামর ছেলেটিকে ছোট একটি চিম্‌টি কাটল ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন।

পাদরী খাড়া হয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আহা হা কান্‌ছে কেনে মাই দে গো।' তারপর বদনকে বললেন, 'ওরে বাবা বদনচাঁদ তুই যা রে এখন।'

'যাই গো মশায়, বাবা এখন আশীর্ব্বাদ কর আসছে জন্মে যেন বাপ হতে পারি···ধম্ম যেন একটা হয়'—বলে বার বার গড় করলে।

কয়েকদিন পার হয়েছে। সেরেনডির উৎরাই অনেক বড়, এখানে বহু লোক হাল চষে। ছোট ছোট ছায়া ফেলে মস্ত মস্ত এঁড়ে কাঁড়া হালে, জলের উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করে। বদন হাল চষে। এটা যদুর জমি, সে জনমজুর। বদন কিন্তু তার দুঃসাহসের কথা এতাবৎ প্রকাশ করেনি, কেননা সে জানত যে সে কথা লাগসই হবে না ; আর যে সকলেই মারমুখো হবেই। তাই যদুকে সে বলে, 'আমার মনে লয় মাগী পাঁচ হাত তোলা···।'

যদু তাকে ঝুটো তাড়না করে বললে, 'মর বেহুড়োলে (অমানুষ)' বলে হালের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে এক ঘুরতি মেরে এসে বললে, 'দুঃ শালা···' অর্থাৎ সে প্রশ্ন করেছিল।

'ওগো বলি শোন মাগী বড় সুবিধের লয়, লাঙসোঁয়ারি'

যদু একথায় খুব খুসী হয়, সে হে হে করে সবাইকে ডাকল। এর মধ্যে প্রায় লোকেই ক্রিশ্চান। সকলেই ইদানীং শিশুপুত্রের জন্য বেশ গর্ব্বিত। যদুর তাদের মত দরদ ভক্তি থাকার কথা নয় কারণ তার বিশ বিঘে জমি আছে তাছাড়া সে মন্ত্র নেওয়া হিন্দু। এবং সকলের থেকে একটু বেশী বোতলে ঝুমুরে মন। সকলে হাল ঠেলে আলের কাছে আসতেই, জলের উপর ছোট চাবুকটা মেরে যদু অকারণে বেশী উল্লসিত হয়ে বললে, 'দুঃ শালা হিজড়ে। শুন শুন তোমরা হে—'

'শালা বলে মান্য করলি আমার কুথাটাকে মান···' বদন বললে।

'শালা পাজী মিছাই বলছিস···এরা শুনলে বলবেক কি···'

সমবেত অনেকে এ সকল কথার কোন কিছু অর্থ ঠাওর করতে পারছিল না, শুধু তাদের দেহ অস্বস্তিতে নড়ে এবং তাদের দৃষ্টি যদুর মুখ থেকে বদনের মুখে আনাগোনা করছিল। আর মাঝে মাঝে এই সরল মানুষেরা কিছু রগড়ের আশায় হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

'বুকের পাটা থাকে ত বল না এদের সামনে হে', যদু বললে।

'আমি আপখোরাকী লোক, আমি কি ডরাই !' বলে বুকের গামছাটায় একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'মিছাই বললে আমার লাভ কি গো। না কি বল···' গলাটা তার নেমে আসছিল ; পরে আস্তে আস্তে বললে, 'দূতবাবুর মা···উঃ শালী লাঙসোঁয়ারি বলেই বলদকে হেট্ হেট্ করলে, তারা চলতে লাগল।

সমবেত ক্রিশ্চানমণ্ডলী, চোখ বড় করলে, নিজেদের মধ্যে হে হে করে যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, তখন বদন বলদের ন্যাজ মলা দিয়ে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। যারা যারা ছিল পাপের ভয়ে এবং কিছুটা আঘাত লাগায় লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল, বলদ জোড়া এগিয়ে গেল আর বদনকে জলে ফেলে দিল। অনেকেরই নিজেদের ঠোঁট খুলে গিয়েছিল ; কোমরলগ্ন ঘুনসির তামা রোদে চক্‌চক্ করে উঠেছিল। যে যার হাল ধরতে চলে গেল, বদন তখনও জলে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে।

ক্ষেত যখন ফাঁকা, তখন যদু বললে, 'উঃ শালা মিছাই বলবে কেনে উঃ শালা ত ঢোঁড়া গো···ঢেঁটার গো'।

এই অসভ্য কথাটা একটু এপাশ ওপাশ হল। ফলে গিজ্জার রাস্তায় কেউ বেরোতে গেলেই অন্যে সন্দেহের চোখে দেখত। পরিহাস তামাসা করবার মত তখনও কিছু সাহস আসেনি।

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন যদু একটি বৃহৎ ছাগল নিয়ে এসে পাদরীর দরজায় হাজির। চোখে তার কাজল, কাঁধে একটি পরিষ্কার গামছা।

শিশুপুত্রের নাম চারিদিকে ছড়াচ্ছে জেনে পাদরী বাবা প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এ কারণে যে, তাঁর বিশ্বাসে সকলেই প্রত্যয় করে ; এবং প্রত্যয় হেতু তার চিত্তবিনোদন হয় না, প্রগাঢ় ভক্তি আসে, শিহরণ হয়।

যদু বললে, 'বাবা গো, ভালয় ভালয় খেত রুইলাম এবার ধান কাটব তাই···' বলে ছাগলটিকে দিলে, সে আরও বলেছিল, 'ফসল হইছে···হবেই দূতঠাকুর যখন আছেন···' বলে শিশুপুত্র এবং তার মাকে দেখে, ভাঙা বুক নিয়ে ফিরে গেল।

পতাকী এসেছিল আর একদিন, সে আর এক বদমায়েস। এসে কাঁদলে, বললে, 'আমায় ভাল করে দাও গো···।'

ভুলুয়ার জ্ঞানগম্য নেই সে ভীত হয়ে পতাকীর সামনেই বললে, 'বাবা গো এদের দশা লাগা লজর···ভারী কেউটে গো···!'

পাদরী এ কথায় অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা অনুভব করলেন। পতাকী চলে যাবার পর বললেন, 'ভুলুয়া খারাপ বলে কিছু নেই···।'

'না দেখে লিলেই খারাপ হবে গো, বেগুন না দেখে লিলেই কানা দিবে, বিড়ি আদ পয়সার না দেখে লিলেই ভাঙা দিবে।'

'প্রভুর নাম যেখানে যেখানে হয় সেখানে খারাপ আর থাকে না···'।

'হে হে খারাপ নাই—রোজ আমার বিড়ি চুরি করে কে ? এখন আমি ট্যাঁকে রাখি···' বলে ট্যাঁক দেখালে।

ভুলুয়ার অগামারা হাস্যধ্বনি মতিলাল পাদরীকে ঈষৎ বিমনা করেছিল। ধোঁয়াতে স্মৃতির মধ্যে একদিনের কথা ; ভামর সামনের তক্তপোশে বসে, কোলে তার শিশুপুত্র, আপনকার কোমরের কষি আঁটতে গিয়ে টক্ টক্ টক্ করে তিনটে বিড়ি পড়ল, তার মধ্যে একটি অর্দ্ধদগ্ধ। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাদরী চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'আর খেও না···।'

'এগুলো ভুলুয়া আমায় রাখতে দিয়েছে···।'

মর্ম্মাহত না হয়েই মতিলাল পাদরী বললেন, 'তুমি আর রাখবে না', একটু পরে আবার বললেন, 'ভামর তুমি জান না কার মা তুমি, নির্ম্মল হও।' বলে শিশুপুত্রের ছোট পা খানি আপনার মাথায় ঠেকালেন।

ভুলুয়ার বিড়ির কথায় সে কথা মনে পড়ল। কিন্তু তবু এই নরতম পুরস্কার তাঁকে মতিলালকে আর এক আনন্দের মধ্যে নিয়ে জমা করে রেখেছিল।

অনেকে অনেক কথা আলোচনা করছে। ফুলল একদিন এসে বলেছে, 'বাবা তুমি বল আমরা কি জবাব দিব !'

স্থির পাদরী বাবা তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বর আছেন।'

ফুলল অবশ্য নিজেই নাহয় অবোধ ভুলুয়া মারফৎ প্রশ্ন করেছে, সব থেকে তারই উৎসাহ

বেশী। বহু হাটে অনেক লোককে সে প্রশ্ন করেছে সঠিক উত্তর কখনও পায়নি। প্রথম দিনের ধারণাই এখনও তার বদ্ধমূল, মাগী লষ্ট দুষ্ট।' ভামরেরও দোষ আছে, ভুলুয়াকে সে বলেছে, রায়নায় বাড়ি, ফুললকে বলেছে সারেঙ্গা, আর কাকে বলেছে বেলপাহাড়ী।

ফুলল প্রায়ই বহুদূর গ্রামের লোক চৌকিদার নিয়ে এসেই বলে, 'দূর গাঁয়ের লোক আসছে রাজাকে দেখতে গো···।'

মতিলাল এতশত বুঝতে চেষ্টা করেন না। ভামর ছেলে কোলে করে ভীত ইঁদুরের মত চেয়ে থাকে, আর মনে মনে জপ করে পাদরী বাবা না উঠে যায়। পাদরী উঠে গেলেই দর্শনার্থী চোখগুলো ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, আর ফুললকে একাই প্রশ্ন করে, 'তোমার মানুষ কোথায়, দেশ কোথায়?' ভীত ভামর চোখ মোছে।

এইভাবে অনেকদিন চলে গেল, ভামর যে কে তার হদিশ কেউই করতে পারল না।

ভামর যেন মনে হয় পাগল হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যায় পাদরী যখন গির্জ্জাঘরে প্রার্থনায় সমাহিত, ভামরের বিরাট সুন্দর দেহটি এখানে এসেই পাথরের মত হয়ে গেল। নিশ্চল ভামর কখন যে পাদরীর পা ধরেছে তা সে নিজেই জানত না, পায়ের তলায় তার মুখখানি, কেশদাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, অশ্রুজলে মাটি সিক্ত।

পাদরী তার উষ্ণ অশ্রুজলের ছোঁয়ায় আরও ধীর, শুধু মুখ ফিরিয়ে দেখে পা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আলুথালু ভামর কোনমতে মাটি থেকে এবার চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলে, 'বাবা···।'

'গির্জ্জা থানে মানুষের পায় হাত দিতে নাই ভামর।'

'আমার কি হবে?'

'লোক অনুতাপে নূতন জীবন পায় গো মা! তুমি অনেক অনুতাপ করেছ তাই এই নূতন জীবন পেয়েছ—যে জন্মেছে তাকে চিন—অতি বড় সাধু হে···সে তাঁর নাম প্রচার করবে হে···।'

পাদরী সন্ধ্যায়, রাত্রে, প্রাতে শিশুপুত্রের সামনেই প্রার্থনা করেন। এখানে বাক্য নেই, শুধু মন স্থির করা ছিল। কখন শিশু মায়ের কোলে শায়িত, কখন কোলে, কখনও স্তন্যপানকালে। এ ছাড়া টিলায় টিলায় মধ্যরাত্রে ত প্রার্থনা আছেই।

একদা মধ্যরাত্রে, পাদরী বারান্দায়। টিলায় যাবেন বলে তৈরী হচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন ভামর অদ্ভুতভাবে আপনার ঘর থেকে বার হয়ে আসছে, এ অন্ধকারেও তার চোখে শুধুই সাদা, মণি বলে কিছু যেন নেই। তাঁকে দেখেই ছুটে এসে পায় পড়ল। শুধু অস্ফুট স্বরে বললে, 'বাবা···।'

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বললেন, 'প্রভুকে ধন্যবাদ তুমি নবজীবন পেয়েছ মা। একে দেখ,' বলে শিশুপুত্রকে দেখালেন।

ভামরের জন্য মতিলাল পাদরীর বড়ই কষ্ট হয়েছিল এবং ভালও লেগেছিল যেহেতু মন এমন পীড়িত হলেই তবেই মুক্তি।

আর এক রাত্রে। তখন ভাঙা চাঁদ নিম্ন আকাশে। এ টিলা বড় নিঃসঙ্গ। বড় বড় পাথরের ঢিবি চারিদিকে, তখন মাত্র প্রার্থনা সেরে উঠেছেন, দেখলেন ভামর খানিক স্খলিতবসনা; তাঁকে দেখে, বোধ হয়, চমকে উঠে এসেই পা ধরে বললে, 'আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখ কাঁটায় আমার পা বিক্ষত···আমার কি হবে?'

পাদরী তাকে বললেন, 'ওকে আদর কর—সব দূরে যাবে···।'

আর এক রাত্রে।

ইদানীং শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাদরী প্রার্থনা করতে যান। বড় বড় শালের ছায়ার মধ্য দিয়ে ছোট পাহাড়ী সারনদো নদী বয়ে গেছে মাঝে ছোট জলাশয়, সেখানে অন্ধকার, এর মধ্যে দিয়ে জলস্রোত। পাদরী এর পাড়ে এসেই দেখেন ওপারে পাথরের উপর কে একজনা। পাদরী বললেন, 'কে ?'

'আমি বাবা।'

জল অতিক্রম করে বালি মাখা পায় এসে ভামরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে ?'

'আমি কাঁদি...ওখানে কাঁদলে আপনার খারাপ লাগবে...।'

'ছিঃ কাঁদতে নেই, তুমি তো পেয়েছ' বলে তার কোলে শিশুপুত্রকে দিলেন। মতিলাল লোকের কথা একবার স্মরণ করেছিলেন ! মনে হল, ভামরের মত শুদ্ধতা আকাশের তলায় ক্বচিৎ আছে।

শিশুপুত্র এখন সর্ব্বক্ষণ তাঁরই কাছে। এই ছোট্ট রূপটির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। পাদরীর কোলে কোলে সে অনেক মধ্যরাত্র দেখেছে, অনেক টিলায় কেঁদেছে, বিরাট আকাশের মধ্যে শিশুর ব্যাকুলতা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। কত ক্ষেতে সে পা দিয়েছে, অসুস্থ রোগীর মাথায় তার পা ছোঁয়ান হয়েছে। এইরূপে এখন সে বেশ বড়সড়। পাদরীকে বাবা বলে, দুরন্তপনা ক'রে মাঝে মাঝে বাইবেলের পাতা খুলে দেয়, তাতে তিনি নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পান। একথা খুব আশ্চর্য্যের, খুব গর্ব্বের যে, সে কখনও একটি পাতাও ছেঁড়েনি। পাদরী 'ও প্রাণ, প্রাণ' বলে তাকে ডাকেন, সে থপ থপ করে আসে।

একদিন শিশুপুত্র কাঁধে, নিমড়া থেকে ফিরছেন হঠাৎ সরতার ছোট শাল আর মহুয়া কুঞ্জে দেখলেন একটি আসর বসেছে।

চেটাই পাতা ; যদু, জহর, বদন হিজড়ে, ভোলা পাইক, পতাকী সকলে বসে। কয়েকটি বোতল, জগা বসে কয়েকটি তিতির ছাড়াতে ব্যস্ত। পাদরীকে দেখেই কয়েকটি বোতল আড়াল হল, যদু শুধু একটি বোতলের মুখে হাতের তালু দিয়ে ঢেকে বসে।

পাদরী থম্‌কে দাঁড়ালেন, ওরা গড় করলে। তিনি বললেন, 'ও কিরে...?'

'আজ্ঞে এ আমাদের সন্ধ্যেবেলার কেরাছিন।'

'কেরাসিন ?'

'আজ্ঞে না খেলে আলো জ্বলবেক্ না গো...'

'ছেড়ে দেরে ওসব খাওয়া, দেখ না কে এসেছে...'

'দেখলাম না ?...ও তো আমাদের উদ্ধার করবে গো—আমরা এ জন্মে পাপ করি—'

'ছিঃ ছিঃ, এখনও পাঁকে ডুবে থাকবি রে...'

'পাঁক না হলে তুলবে কো'থিকা গো...'

ক্রিশ্চানরা কেউই কোন উত্তর দেয়নি, একমাত্র যদুই দিয়েছিল। পাদরী দুঃখিত মনে নিজের পথ নিলেন। উনি জানতেন, এরপর কলসী আসবে।

এখন অনেক রাত, হঠাৎ তাঁর মনে হল সন্ধ্যার সেই আসরের কথা। ওদের নিষ্ঠুরভাবে 'পাঁকে ডুবেছিস' কথাটা বলা ভারী অন্যায় হয়েছে বলে তাঁর মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর মনে হল, ওদের কাছে গিয়ে তাঁর সত্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত। একবার দোমনা, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্থির। বেরিয়ে পড়লেন।

যদুর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, সে ফেরেনি। জহরও বাড়ি নেই। ফলে অনেকগুলো চড়াই উৎরাই ভেঙে পাদরী চললেন নিমড়ার দিকে। এখন সমস্ত প্রহর ছুটে এসে ফাল্গুনে বিক্ষিপ্ত। মহুয়া ফুটছে। এই চড়াইয়ে উপরেই সেই মহুয়া কুঞ্জ। যেই তিনি চড়াই বেয়ে এখানে, হঠাৎ কার যেন গলা শোনা গেল, 'হেইগো, হেইগো, পাদরী বাবা আসছে বাবা আসছে···হে' কাদের যেন সাবধান সজাগ করে দিতে চাইছে।

অদূরে, পাতার ছায়ার ফাঁকে চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দু-একটি লোক মুখ গুঁজড়ে পড়ে, বোতল গড়াচ্ছে, কলসী কুকুরে চাটছে, একটু নিকটে আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি স্ত্রীলোকের সুন্দর দশাসই দেহ। যেন ছিটকে পড়ে মাটিতে তার মুখ গুঁজড়ে আছে। উদম নির্লজ্জ বিবসনা। হাওয়ায় চুলগুলো খেলে বেড়ায়। আর বিভ্রান্ত তিতিরের পালক ওড়ে। কে একজন বললে, 'হেইগো ভামর, পাদরী গো।' এই সেই দেহ যাকে একদিন মনে হয়েছিল শরতের মেঘসদৃশ।

কোনমতে ভামর মাথা তুলে বললে, 'বাবা, আমার কি হবে গো?'

এই বীভৎসতা তিনি আশা করেননি। নিজের গলার স্বর নিজের কানে এল, 'নবজীবন পেয়েছ', 'তুমি জান না তুমি কার মা!' নিজেকে অপদস্থ হতে দেখে, ঠকতে দেখে, অপমানিত হতে দেখে, বুকটা তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর বৃদ্ধ ক্ষমাশীল চোখে জল এল। দেহ নিস্পন্দ, শুধুমাত্র হাওয়ায় দাড়ি নড়ছে, পিঠে যেন কেউ লাথি মেরে মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছে। রাগ আর লজ্জায় গলা ফুলে উঠল। চোখের জল নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে এসে গির্জ্জাঘরের সামনে বালকের মত কাঁদলেন। গির্জ্জাঘরে পা দিয়েই তিনি চমকে উঠেছিলেন। এখানে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না।

ঘরের পথে রাস্তায় একবার তাঁর হাতদুটি ক্যানা পাতা ছিঁড়তে উদ্যত হয়েছিল। ঘরে এসেই আলো তুলে বাইবেল খুললেন, মন কিছুতে বসল না। একবার ইচ্ছা হল ভুলুয়াকে জিজ্ঞসা করেন, ভামর কোথায়? ফলে বারান্দায় এসে ঘুমন্ত ভুলুয়ার দিকে চাইলেন, কিন্তু ওপাশের জানলার দিকে চাইতে গিয়ে তাঁর রোমহর্ষ হল, সেখানে অন্ধকার! চেয়ারের হাতল জোর করে চেপে খানিক বসে রইলেন, ঘামে মুখমণ্ডল সিক্ত! দ্রুত নিশ্বাসকে সরল করা তাঁর সাধ্যাতীত!

এখন গির্জ্জার মাঠে। মনে হল একবার প্রার্থনা করতে, কিন্তু দেহের অন্তরে যে মন, সে ত নিশ্চয়ই, এমন যে অস্থিনিচয় তাও চূর্ণীকৃত। যে মতিলাল পাদরী এক পলকের জন্য পরম পিতাকে ভুলে যায়, তাহলে, তার আর অস্তিত্ব রইল কোথায়? ঘোড়ার ছুটন্ত পা তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এখন বুক নেই, হৃদয় কোথায়? আত্মা সে ত বাইবেলের একটি লাইন মাত্র, বিধর্মীরা যার কাগজ পুড়িয়ে ছেলের দুধ গরম করে।

কোথাকার একটা পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি তাঁর নেই, আজকের পৃথিবী সেটুকু অপহরণ করেছে, দূরের পাপিয়ার ডাক তাঁকে ফেরাতে পারেনি যেখানে সৃষ্টির শেষ মাধুর্য্য ছিল। অকারণে নিজের মনে হল, আমার ভক্তি ছিল না, ছিল ভীরুতা।

স্ফীত নাসাপুট, উষ্ণ নিশ্বাস, কুঞ্চিত চোখ আর ভয়ঙ্কর দাঁত যখন লাগাম ধরে তখন তারা আর এক কথা ভাবায়, আর এক পথ দেখায়। শুধু মনে হল 'আমি ঠকেছি' আর এক-একবার মহুয়া কুঞ্জের সেই উদ্ভিন্নযৌবনা দেহটির কথা মনে পড়ে, আর তিনি পাগল হয়ে যান।

একদা শুধুমাত্র প্রভুর নাম শুনে মনে হয়েছিল, আমরা সত্যই দেবদূতগণের থেকে সুখী,

কারণ তাঁর নাম শুনেছি, আমরা জিতেছি। এখন শুধু মনে হল ঠকেছি। সত্যই জনমজুরের থেকে পাদরীরাই বেশী ঠকে ।

বেচারী মতিলাল। বারান্দার খুঁটি ধরে নিজের আঙুল দাঁত দিয়ে যত জোরে চাপছেন ততই চোখের জল হু হু করে পড়ছে। এমন সময় আর এক কান্নার শব্দ আলো হয়ে, বর্ণ হয়ে তাঁর কাছে আসতে চাইছে। তিনি গভীরভাবে সেই দিকে চাইলেন। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, ফলে লণ্ঠনের আলো কাঠখোদাইয়ের কিরণের মত হয়ে গেছে, তারই মধ্যে শিশুপুত্র—সুন্দর গোলাপী একটি বেদানা যেমত। পাদরী চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবার চোরা চাহনিতে শিশুকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। চাঁদের আলো-অন্ধকারে তাঁর মত মানুষকে এমন দেখায় না, কারণ মানুষ ত নখী দন্তী নয়। তবু চকিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এই মতিলাল পাদরী। মাথাটা তাঁর ঘুরে গেল, বসন ভূষণ এলোমেলো হল, বিরাট একটা বাদুড়ের মত ক্ষিপ্রবেগে ঘরে প্রবেশ করেই শিশুপুত্রটিকে একটানে তুলে নিলেন। মনটা মচকালেও তিনি নিজের গতিকে ক্ষিপ্র করে রাখতে কৃতসঙ্কল্প। শিশুপুত্র হয়ত কাঁদতে গিয়েছিল কিন্তু সে কিছুই থৈ পায়নি।

শিশুটি তাঁর দিকে চাইল এবং বুঝল, এ ত পুরাতন কোল। পাদরী একবার তার দিকে চাইতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

পাদরী দ্রুত লম্বা পায়ে চলেছেন, কখনও বেসামাল, কিন্তু বদ্ধপরিকর। কতবার ক্ষেতের আল থেকে পা পিছলে গিয়েছে। কিন্তু আবার পথ। এক ছেড়ে অন্য পথ। এটা আর একটা।

আকাশ মুক্তার মত হয়ে এল। ক্রমে আলো টিলা দিয়ে গড়াতে গড়াতে আর টিলায় যাবে। ছায়াগুলি লম্বা ও গভীর হবে। পাখী উড়ছে, ডাকছে। শিশুপুত্র জেগেই হাসতে লাগল।

পাদরীর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি অসম্ভব কঠিন, একবার তার দিকে চাইলেন, আরবার চাইলেন। কঠোর সঙ্কল্প বুকে পাথর হয়ে রয়েছে। হঠাৎ তাঁর কপাল কুঁচকে উঠল, তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু স্থিরতায়, পাছে তিনি পুনর্ব্বার মতিলাল পাদরী হয়ে যান, সেই আশঙ্কায় পা দুখানিকে, ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও গতিশীল রাখছিলেন। এবং নিজের কোল থেকে শিশুপুত্রকে কাঁধে উঠিয়ে আবার চলা শুরু হল রাস্তায় দু-একটি মেয়ে গোবর কুড়োতে বার হয়েছে, তারা ঝুড়ি রেখে পথেই এগিয়ে তাঁকে গড় করলে। তিনি কোনদিকে না তাকিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন।

এটা খোন্দাড়ির জঙ্গলের অভ্যন্তর।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন, কত পাখী উড়ে চলে গেল। শাল কেন্দ বয়ড়া আমলকী গাছ আর পলাশ ফুটে আছে, তবু জল হয়েছে। পাতা ঝরে সুক্ সুক্ করে জল পড়ছে। রাতে বৃষ্টি পড়েছিল, ফলে নিম্নে বনধোয়ানির ঝরনার শব্দ আর কিয়ৎ উপরে নিস্তব্ধতা।

এই চত্বরটি আরও পরিচ্ছন্ন। আঁঠরালতা উঠে গেছে শালগাছে, নিম্নে গুলঞ্চ আর চারিদিকে দোনার ঝোপ। শিশুপুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাদরী দাঁড়ালেন। আঙুল মটকাতে গিয়ে কি যেন মনে হল, সেখানে যেন প্রার্থনার কথা ছিল, আঙুল মট্‌কে প্রার্থনাকে ভেঙে দিলেন, তুই-তোকারির সাদামাটা জগৎ থেকে সে প্রার্থনা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

পাদরী নিঃসঙ্গতার দিকে চাইলেন, ফোঁটা ফোঁটা জল কভু হাওয়ায় ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। শিশুপুত্রের এরূপ নিঃসঙ্গতা বহু জানা, বহু বিদ্‌ঘুটে রাতের সঙ্গে তার পরিচয়

ছিল। পাদরীর আঙরাখা ধরে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে, জলের ফোঁটায় কৌতুক অনুভব করছিল আর মাঝে মাঝে…'বাব্‌বা…ও ও' বলে উঠেছিল।

বনধোয়ানির আর পত্রচ্যুত জল পড়ার শব্দকে পাদরীর মনে হতে পারত, এ যেন গির্জ্জার মধ্যে অনুতপ্ত সকালের ব্যাকুলতায় কাঁপা ঠোঁটের শব্দ। কিন্তু তিনি কুড়ুলের মতই দৃপ্ত, ছিলার মত সোজা। অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে ঝুমঝুমিটা বার করে তার হাতে দিতে গিয়ে দূরে ফেলে দিয়েই চমকে উঠলেন। শিশু হাতীর মত আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে নিতে এগিয়ে গেল সেখানে, যেখানে পাতাগুলো দুর্ব্বল জন্তুর মত কাঁপছিল।

ইতিমধ্যে পাশের দোনা গাছটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। একটা জন্তু যেন ঝোপ ভেদ করে চলে গেল। দোনার কাঁটায় পাদরীর আঙরাখা ছিন্ন, তবু তিনি কোনমতে পার হয়ে এলেন।

শিশু যেদিকে ছিল সেই দিকে, কম্পিত গাছ থেকে ফুল দু-চারটে ঝরে পড়ল। এই ফুলঝরা তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেলেন। আর দেখলেন এক একটি ফোঁটায় বড় বড় জল পাতা খসে পড়ছে এবং শিশুপুত্র বিচলিত আন্দোলিত পাতার দিকে অতীব খুসীতে চেয়ে আছে।

মতিলাল পাদরীর নিজের ভিতর থেকে অসুস্থ উঁ উঁ শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে চোখ বন্ধ করে আবার আস্তে আস্তে হাত খানিক নীচে নামালেন, হাতদুটি (যা করযোড়-নিমিত্ত তৈরী) ইদানীং সে দুটি কম্পিত হয়। দোনার কাঁটায় বৃদ্ধের কপাল কিছুটা ছড়েছে। অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন, শিশুপত্র হাত পেতে আছে। তার হাতের তালুতে পট পট করে জল পড়ে।

ভারী খুসী, শিশুর ছোট ছোট দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যায় ঝুমঝুমি তুলে ধরে আবার সেই খেলা। পাতা নড়ে জল পড়ে, খেলনা ঝুমঝুম করে ওঠে। এবার শিশুপুত্র তার একটা হাত আঙরাখার উদ্দেশ্যে তুলে দিলে, হাতটা একাই ভয়ঙ্কর ভাবে পাদরীকে খুঁজছে আর এক হাত ক্রীড়ারত।

পাদরীর আঙরাখার হদিশ না পেয়ে চকিতে শিশু ফিরে তাকালে, চারিদিকে তাকালে, ঠোঁট কেঁপে উঠে 'বা-ও-বা' বলে কেঁদে ফেলল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অসম্ভব ক্রন্দন—প্রথম দিন এমনি সে কেঁদেছিল।

কান্নার শব্দ মতিলালকে বিচলিত করলে না, সাপে তাড়া খাওয়ার মত দু-চার রশি দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ একটা মানুষ-গভীর গর্ত্তে পিছলে নেমে পড়লেন, গা-ময় কাদা, কান্নার শব্দ এখনও আসছে। চোরের মত সন্তর্পণে উঠে, আস্তে আস্তে মুখটা অল্প বার করে রাখলেন।

এখান থেকে দেখা যায়। শিশু কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে, এবার খর জমির উপর পড়ে খানিক হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনমতে উঠে দাঁড়াল। তার কচি হাঁটুতে দু-একটা কাঁকর লাগা, আর রক্ত।

এই প্রকাণ্ড বনভূমি, সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি তির্য্যক আলোকপাত। সমস্ত কিছুই রহস্যময়। শিশুর ভীত চোখ এখনও কাকে খোঁজে, চোখ অনবরত মোছার ফলে মুখমণ্ডল মলিন হয়েছে। সে কাঁদে, এগিয়ে আসে।

আলোক ভেদ করে তার কান্নার শব্দ। পাখী উড়ে যায়, পাতা উড়ে উড়ে পড়ে আর দু-চারটে শাল ফুল পালকের মত দুলে দুলে নামে। শিশুপুত্র টলতে টলতে আসছে।

পাদরী নিজের বুকে যেন লাথি মেরে লাফ দিয়ে উঠেই দৌড়ে শিশুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শুধু তার ছোট দেহে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ও প্রাণ, প্রাণ।'

তার হাঁটুতে মুখখানি বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে বললেন, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্ !'

তাহাদের কথা

আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্ত বেলা, পাতা ছিঁড়ে বিকালের আলোর ছিনিমিনি তার মুখমণ্ডলে, অধিকন্তু পাতার সবুজতা ; এতে করে তার মনের অধৈর্য্য আরও যেন বেশী করে প্রকাশ পায়। সে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।

গাড়ি আসে, কোঁয়োন পা দিয়ে পাটায় আওয়াজ করে, ছিপটি ঘুরায় এবং হাঁকে, 'আমবোনা আমবোনা' 'গড়শিমলা ই ওঃ'। অথবা সাইকেল কিংবা গরুর গাড়ি, কভু বা কল্যাণময়ী সাঁওতাল রমণীর—তারা নালিশ-করা সুরে কথা কয়, তাদের দেহ বড় গড়বড় করে। কখনও বা মামলার ফিকির আঁটে কতিপয়, একজনের পায়ে বুট জুতো, সে মাথার উপর হাতের হল্কা খেলিয়ে বলবে, 'লিল্‌লিহো শালা, উয়া জমি ডিহি আমি একো গরাসে খাই লুব হে ! দেখ বটে', থেমে 'সন তের শ চৌদ্দ' গলার স্বর নেমে ছিল না দূরে গিয়েছিল। আর ক্বচিৎ, ছোকরারা ফিসফিস করে কথা কয়, নিশ্চয় স্বদেশীর কথা।

মামলার সূত্রে কোর্ট, কোর্টের ঘণ্টা দূর থেকে শুনলে জ্যোতি ত্বরিতে ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যায়, বড় অসহায় বোধ করে। এখন সে পিরানের মধ্যে হাতা গলিয়ে পৈতেটা টেনে কাঁধে তুললে। হাফপ্যান্টটা ঢাউস। এর একটা ঠ্যাঙের মধ্যে তার সমস্ত শরীর গলে যেতে পারে। বাবুই দড়ি একটা ছিল, এখন নেই ; সুতরাং সে কাপড়ে যেমত গিঁট দেয় তেমন তেমন গিঁট দিয়েছিল। ছোটার সময় অবশ্য তাকে প্যান্ট ধরেই ছুটতে হয়।

ক্রমাগত সে তিক্ত হয়ে ওঠে, অন্নপূর্ণা কেন যে এখন আসছে না ? এর জন্য তার রাগ সে কারণে তার অভিমান। এই রাস্তায় তাকে ফিরতেই হবে, তখন জ্যোতি তাকে দেখে নেবেই ; তার মন বড় তছনছ হয়ে আছে। সে সাহস করে একবার রাস্তায় উঠল, এখন গাছের পাশে ফিরে আসছিল।

'কে বটে জ্যোতি লয় ?'

জ্যোতি কোন এক সামগ্রী চুরি করতে গিয়েই হাত সরিয়ে নিলে—এমনই তার স্বর, তথাপি বিপিন গুপ্ত মশাইকে দেখে হাসবার চেষ্টা করার থেকে মাথা বেশী নাড়ল। বিপিন গুপ্ত কাঁধের থেকে ছাতাটা নামিয়ে শান্ত চোখ দুটিকে তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'প্যান্টালুন বিলেতী লয় ?'

অসহায়ভাবে মুখটি আন্দোলিত করে জ্যোতি উত্তর করলে, 'জানি না, একজনা দিইছে বটে।'

'আহা হা ! বাবা কেমন রে'—বিপিন গুপ্ত এ-প্রশ্নে জ্যোতির উত্তরটা মুছে দিয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল। 'তুই আর তুয়ার দিদি একবার আসিস কথা ফয়সলা আছে বটে', বলেই আবার হাঁটতে লাগলেন। ছাতাটি পুনর্ব্বার ঘাড়ে খোলার কথা—তাতে

নীচে এল ।

বাড়ির ওদিকে সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তা, সে-পথ ধরে খানিকটা এসেই সে থমকে দাঁড়াল কেননা, নীচে, ভিজে নদীর তীরভূমি । চৈতী হাওয়ার মত বড় আলো ছোঁ মেরে চলে যায়, এবং ক্রমাগত লড়াইয়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়, নদীবক্ষে ভাসমান শবদেহ । করতার কামানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করলে, 'আই ল্যভ ইউ' । এহেন যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ দম্ভভরে কেউই এ কথাটা আজ পর্যন্ত বলেনি, এবং হঠাৎ সে পা পিছলে নীচে পড়ে গেল, হাতের কাদা দেখতে দেখতে ক্ষোভে আড়ষ্টস্বরে সে ক্রমে ক্রমে বলেছিল যে 'আই ল্যভ ইউ' ; হঠাৎ অপমানে সে জর্জ্জরিত হয়েছিল । কোনমতে উঠে লটপট করতে পুনর্ব্বার সে এই বাড়িতে ফিরে এল । সম্ভবত মনে হয়েছিল, ঘরগুলো ভাল করে দেখা হয়নি । মেয়েটি হয়ত সেখানেই আছে ।

আর যে সে নীচে এসে দাঁড়াল, সেই শবগন্ধ গৃহই বটে । উপরে গিয়ে সন্ধ্যার আলো, যেমত এখানে সেখানে, বেচারী উচ্চ জ্বেলে ও হাত দিয়ে খোঁজ-ই বুদ্ধিতে খুঁজলে !

এ ঘর সেই ঘর, দাঁতে দাঁতে তার রাগ শাণিত হয়ে উঠছিল । বদরাগী নাম নম্বরওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না । হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল, এবং দেওয়ালে মেয়েটির আলেখ্য ঝাঁঝরা হয়ে গেল ।

গুলির শব্দ যেমত শোনা গিয়েছিল তেমনই এও সত্য যে 'আই ল্যভ ইউ' কথায়, দিক সকল, যুদ্ধক্ষেত্র, এই প্রথম মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

—কৃত্তিবাস । শ্রাবণ ১৩৬৭।

নিম অন্নপূর্ণা

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে সর্ব্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারী আনন্দ হয়েছে—সে খুসী, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে ; তখন সে, যূথী, সখেদ একটি 'আরে' বলে, পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে ।

সম্মুখের টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তার করে—কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কি যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এসবই তার নজরে পড়েছিল । কখনও বা টিয়াপাখিটি তেতো বিরক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ্য করেছিল এবং সে, তখনই, একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখেছিল । এবার, আবার তার সামনে, সবুজ পাখী সাদা দেওয়াল, অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হয়েছে—তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্বৃত্ত এবং সে মরিয়া হয়েই, কোনক্রমে, পাখীর বাটিতে আঘাত করে, ফলে দাঁড়টিতে দোলা

লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিয়ে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে ; এখন, সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত করছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙীন অদ্য ম্লান ফুলগুলি মুচড়ে মুযড়ে গিয়েছিল। আর পাখীটি ভারী অস্থির, পাখীটি ভারী তেরছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশী করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখীটি একবারও আওয়াজ করে নি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল—সে যদি পাখী হত—কেননা সে শুনেছে কোন কোন ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারী খাবার, তাতে জিলিপী আছেই কচুরী নিমকি আর আর কি সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চীৎকার করে, এবং তার ঘটিয়াল ভুঁড়িখানি নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়—আকাশটা যেমত বা গাড়ীর আড্ডা—ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত চিলগুলো চিঁহি চিঁহি করে উঠে ; তদনন্তর খাবারগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না' ; এখানে অনেক ভিখারীর ছেলেরা দাঁড়িয়ে, কেউ মার কোলে, সকালের সৌখীন রোদ এদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা ময়রার মহানুভবতা দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলের খাওয়া দেখে !—এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারী' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ করলেই ভিখারী হয় ; ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায় না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়ত চিলই তার ভয়ঙ্কর ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববার পর, সে আর বেশী সময় নেয়নি, একারণে যে বেশী দেরী করলে, এ বাড়ির লোক—নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

ইদানীং পাখীটি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীর জ্বলজ্বলে মুখখানি, ছেঁড়া লাল পাড় দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে, হিঙ্গুল, মারাত্মক ; মুখের ছোলাগুলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কি যেন লক্ষ্য করবার জন্য আনচান করছিল, পরক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ করে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখীটা তৎক্ষণাৎ তার লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চীৎকারে এই বাড়িখানি যেন বা 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল ; পাখীটা এখনও যূথীর আঙুল ছাড়েনি, দাঁড় নড়ছে, এবং কয়েকটি ছোলা যূথীর মাথা এবং গা বেয়ে ঝরে পড়ে। কোনক্রমে, ভাগ্যক্রমে সে আপনার হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল।

যূথী বোকার মতই আঙুলটির দিকে চেয়েছিল, কেননা, আঙুল বেয়ে খরধার রক্ত পড়ে, আর যে কোন কিছু করার মত দক্ষতা তার নেই। এবাড়ির বৌটি বয়সে নবীনা, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পরা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরণের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বার করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চীৎকার তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পরক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-রহিত ; ফলে সায়া থেকে উঠা লাল গামছাখানি তার হাতে তেমনি সম্বদ্ধ ছিল, সুন্দর খঞ্জন নয়নযুগল—স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত,

শক্ত, উজ্জ্বল, রগছোঁয়া, ভ্রূদ্বয়ে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বয়সোচিত ধর্ম্মে উষ্ণ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুনগরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি—যা সিক্ত—তার ঘাড়ে সপ্‌সপে হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষের আঁধার থেকে সকালের তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়।

যূথীর পালাবার কোনই পথ ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ৎ-পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্ত্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গী সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চীৎকার করেছিল। এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্ত্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

দ্বিতীয় চীৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নী খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়—ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদে এসে থেমেই, 'কি হল কি হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততার শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্ত্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গী যে করা উচিত তা ভাববার মত তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশী করে আলো অথবা বেশী করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন তাঁর দেহটি কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবশে সম্মুখে এবং শুচিবায়ুতার জন্য পিছনে দুলে গিয়েছিল, আর মুখে বারম্বার একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওমা কি সব্বনাশ গো, কি সব্বনাশ!' তাঁর স্বরের মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইতঃমধ্যে নবীনা বৌটি কোনক্রমে এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সায়াটি আঁট করে ধরা, এবারে ঝটিতি গিঁট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য করতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা, খেতুর মা আপনার গায় গতর খেলিয়ে বলেছিলেন, 'বলি হ্যাঁগা, তুমি কি পাগল নাকি। বললে বড় অন্যায় হয়, সাধে কি তোমার ভাগাড়ে কোল....বলি চান করেছ না, ওকে ছুঁলে আবার কাপড় জুটবে....?' ইত্যাকার বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিত্তিরের মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সম্‌ঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং আপন পুত্রবধূকে নিবারণ করে এবার যূথীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নে নে চোষ না হারামজাদী আঙুলটা, মরণ! হ্যাঁরা কাটল কি করে?'

যূথী চুপ, হয়ত তার মনে পড়েছিল যে, পাখীটা কথা বলতে পারে, ফলে আরও ভীত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল; নবীনা বৌটি রক্তদর্শনে মুখখানিকে ঠেলে বাঁধা পুঁটলির মত করেছিল, অজস্র চুলকে ঘাড় থেকে একটু হাটাবার জন্য মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'পাখী।'

'পাখী! সাত সকালে কি অলুক্ষণে কাণ্ডরে বাবা' বলে খেতুর মা সাক্ষী-মানা কণ্ঠে বললেন, 'পাখী, আমার পাখীর ত অমন স্বভাব নয়' এবং পাছে দোষ পড়ে—একথা নিশ্চয়ই স্মরণ করত পুনরায় বলেছিলেন, 'তুই সাত সকালে মরতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলি কেন?....নে চোষ না আঙুলটা পোড়ারমুখী, আবার ধ্যানাপানা....নাও বৌমা, টক্ করে একটু চুন এনে দাও....'

বৌটি সত্বর চুন আনতে গেল।—যূথী, এখনও বুদ্ধিভ্রংশ, খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ—এতাবৎ

আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয় নি, একারণে যে চিবোলেই ত শেষ, তাই অতি কৃপণের মতই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল—হঠাৎ ঠিক এই মুহূর্তে তার মুখনিঃসৃত ছোলা কটি পড়ে, গড়িয়ে, খেতুর মার জল-সাদা হাজাদষ্ট পায়ের নিকটে লেগেছিল। বেচারী যূথী! উপরন্তু বেচারী যূথীর মুখ থেকে অল্প লালা তার নিজের হাতেই পড়েছিল এবং সে কম্পমানা!

অন্যপক্ষে, ছোলা পড়তেই, খেতুর মা ঝটিতি দু-এক পা সরে এসেছিলেন, মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যূথীকে দেখে, রাগে রোষে আক্রোশে তাঁর গাত্রবস্ত্র যেমত বা শুষ্ক হয়েছিল ; কি বলে যে গঞ্জনা সুরু করবেন তা সঠিকভাবে তাঁর ঠোঁটে গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না, সহসা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল, 'ওমা মেয়ের কি নোলা গো!....কোথা যাব গো...' এসময় আপনার গণ্ডস্থলে তর্জ্জনী ছিল, এর পরই দাঁতে দাঁতে ঘষে বলতে লাগলেন, 'বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, এবার নিজের রক্ত পেট ভরে খাও....'

যে যূথী এতক্ষণে কাঁদে নি, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার দরুণ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, তথাপি চোখ দুটি ভারী সজাগ ছিল, খেতুর মা আপনকার গা গতর ভিজে কাপড়ে ঘর্ষণ করত বললেন, 'একাঃ চড়ে তো....দাঁত কপাটি ভেঙে দেব, আবার কাঁদনা হচ্ছে, ছ্যাঁচড়া আক্কটে ভিকিরীর মরণ! পাখীটা তোর টুঁটি ছিঁড়লে আমি হরিনুট দিতুম....হারামজাদী, ছোলাচুরি! ফের যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবি ত ঝেঁটিয়ে তোর খাল খেঁচে নেব....তাই বলি আমার পাখী কেষ্ট নাম ভেন্ন যে জানে না, সে কেন কামড়াবে....উঃ তোর বাপ মা কি কিছু খেতে দেয় না....চোষ না রক্তটা!'

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই, হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি কোন আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি....আকালের কথা কি তোমার অজানা....না....'

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি রেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। রক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ করে রইলি যে হারামজাদী!'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচারী যূথীর প্রকৃতপক্ষে কি যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা করতে পারছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবার খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুর মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্তের মধ্যেই সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবারমাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই একথা ভেবেছিলেন যে তাঁকে এ কাজের পর আর একবার স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীর বেড়া-বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো করে ধরার পরে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে—সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলের উপর চেপে ধরেছিল, এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা কাছের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল!

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড় নিশ্চিন্ত হয় ; ঝাঁটা লাথি—এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতরাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে

কোনমতেই দুই চোখে দুইদিকে দুভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না, এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা, তাই যূথী ইত্যাকার নির্ম্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল ; এখন খেতুর মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কালবিলম্ব না করে তার চুলের মুঠি ধরে এক টান মেরেছিলেন !

খেতুর মা তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পাখীটার পাশ দিয়েই তাঁদের যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুর মার কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা-গোপ্তা চাহনিতে পাখীটার প্রতি সে দেখে, পিতলের চক্‌চকে দাঁড়ের উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক রুক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপরেই পাখীর সুডৌল উদর দেখা যায়,—শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন, হয়ত সবুজ কিম্বা পাণ্ডুর, কি নরম কি তুলতুলে ! সুওদর সুউমার—শুকউদর সুকুমার তথা কোমলতা, এরূপ যে প্রবচন, সেইটুকু প্রত্যক্ষের, দেখার মানসে মানুষ কি টিয়াপাখী পোষে !

যূথী আপনাকে নির্ব্বিকারভাবে, খেতুর মার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিয়ে, রাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্‌চিক্ করে থুতু ফেলে—মাথার কাপড়ে হাত দেবার কথা তাঁর মনেই হয়নি, একারণে যে গলি সুন্‌সান্—যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দরজায় লাথি মারতেই, দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেননি, ফলে দোমনা হয়ে ছেলেমানুষের মত অহেতুক সর্দ্দি টেনেছিলেন।

দরজা খোলার পর, ভিতরের ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল, প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদীপিঙ্গল, তবু সেখানে অন্ধকার ; সে জননী, তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ে ন্যাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে—মিলেমিশে—দিনগুলিকে যেমন বা সুদীর্ঘ করে, আর যে, তাকে, প্রীতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে ; বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও, আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করত অন্ধকার দেখে।

খেতু মিত্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকেছিলেন, তারপর নিজের বেণীধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে....' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়াসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে—তেমন তেমন লাফ, তেমনি যেমন বা তার ভিতরে দিয়ে উঠল, কিন্তু দেহে কোন সাড় দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কি বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকাল লোকে শুনলে বলবে খেতু মিত্তিরের মা কি লোক গা....ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরীর অদম গা....পাখীর

ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে....মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম....' এই টুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই ; আর যে—তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই ? ফলে তাঁর বড় অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি....সৎশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে....বাতাসী ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে....'

প্রীতিলতা, আশ্চর্য্য, মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায়, কথার টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল ; বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে ।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে । দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে ।' সে, প্রীতিলতা, যেমত বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরী' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায় মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল । খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মত তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যাঁ' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ইঃ' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী-বিমান উড়ে গিয়েছিল । এখানকার সকলেই, এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল । তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গী করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মত ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না....না ?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্ব্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না'....এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজী বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজীআত্মক—তার জিহ্বা যারপর-নাই কড়কে উঠল ।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারী খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন । প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচারী এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল ! তবু সে কাতর নয়, সে হেসেছিল ; তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ করে, এবং সে, প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকারে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বর-দেখা হাসি হাসল ।

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তার মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপর ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকের কথা স্মরণ করিয়েছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতি কই ? নিশ্চয়ই সে তাদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল । সহসা, পলকেই তার মাথায় যেমত বা বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমার পায়ে পড়ি আর করব না

আ....করব না' এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড় !

যূথীর গলায় আর কোন স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশী এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতরে, তার নিজেরই, কোনই ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীর মুখে না-পাওয়ার দুর্দ্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা—এই 'না-মাজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকার দিনের পরিচ্ছন্ন দৈন্য-উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্যন্ত নিহিত থাকে ; এবং দীনা প্রীতিলতার মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল ; এখন সে থমকে দাঁড়াল ।

প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাস্টে অন্ধকার—বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই ; প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপর দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী । অবশ্য, মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, ক্বচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই ; এতদ্ব্যতীত রাত্রে হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায়—ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্ম্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায় । অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অল্পকাল নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালীর কতিপয় ফাঁকা বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দ্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারীর শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত করতে ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে ; রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্ম্মা, সে-আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে । সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের তার চিনতে পারবে না ! কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে ।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাত কন্যা যূথীর দুঃখময় সুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে-যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল, পরিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন, তা ছাড়া শুভ্র ; মুহূর্ত্তের জন্য সে রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজের ফাঁদ থেকে অনায়াসে

অব্যাহতি পেয়েছিল—প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বার হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তার হয়েছিল যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদের মত ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়। এ-কারণেই রক্ত তার দিঙ্‌মণ্ডলকে প্লাবিত করে, উক্ত কথার স্মৃতি মেয়ের মন থেকে মুছে দেবার নিমিত্তই সে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্ব্বিভাব্য গতিবেগে যূথীকে পার হয়ে, ক্ষণেক থেমে, আশ্চর্য, পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকর যেমন মড়ার খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে—এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোন উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দার, ধূমসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতার চিত্তবিভ্রম ঘটে ; সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য্য অভাবের মধ্যেও—যে গভীরতা গীতের শুদ্ধ পর্দ্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুর হাস্যের রহস্যের মাধুর্য্যের প্রাণধর্ম্ম—এ-গভীরতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মার বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজর রেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তারা ঘরে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল, সে মার কোলে ঠেস দিয়ে আর লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তক্কে বুঝেছিল যে আমরা বড় নিঃসহায়। এবং মার দিকে বড় বেশী করে ঘেঁষে এসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতার মধ্যে, এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মত ঘৃতকুমারীর মত এক ধরণের গন্ধ তাকে বিপর্য্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন ! এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কি অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুতগতি দেখা যায়, মাটি থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ', এতে লতি যখন এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মত করে নেড়েছিল, আর যূথী লতিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পিঁপড়েটিকে হারিয়েছিল ! সারাটা মেজেতে চোখ বুলিয়ে যূথী সখেদে বলল, 'হ্যা।' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে।' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘের, মেঘ যেমন বাষ্পের, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এ লাইন বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে চলে যায় ; দুই বোনই দেখেছিল, মধ্যে পগার তারপর যে বিরাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালোয়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ আসে। বেচারী লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোন এক অন্তরাল থেকে দেখেছিল, কোন এক মন দিয়ে শুনেছিল ! এ কথা স্মরণে তার গায়ে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল ! প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশির আওয়াজ, সে আওয়াজে বটগাছের শিকড় পর্য্যন্ত

অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতার প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা আপনার দৃষ্টিকে রূঢ় করে কব্জা করে রেখেছিল সম্মুখের অনেকটা সিমেন্ট করা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালের দিকে, অথচ বিস্ময়কর এ কথা যে, কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে জানলার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায় দু একটা গরাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত করে নিজেকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কেননা এসময় কাশির এবং লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমে নিকটস্থ হয়, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছায়া পড়বে, এরপর গলির মাঝের নর্দ্দমার ঝাঁঝরিতে লাঠির আঘাতে ঠং করে একটা পাজি আওয়াজ সংঘটিত হবে, আর যে, তার পরক্ষণেই পৌঁছবে, তাদের সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের রকে—ঐ জানালার পিছনে—ধপ করে গাঁঠরি রাখার শব্দ হবে, আর যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীরতার শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীর রুক্ষতার উদয় হবে। এই ভয়ঙ্কর নিশ্বাস সকলের শব্দ প্রীতিলতার ঘাড়ের অতীব নিকটে অনুভূত হয়, সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়ের এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপরিসর স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় করেছিল, কেননা দেহের মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দ্দিত, ত্রাসিত, শঙ্কার, জড়তার, ক্লৈব্যের, শৈত্যের, জাড্যের, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চার হল ; সে আপনাকে আর কোনক্রমে আর দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়েছিল।

জানালার পিছনেই রক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়ের খেলা, এ খেলার আশপাশ দিয়ে অন্ধকার সহস্র ছেঁড়া চুলের মত ভেসে ভেসে যায়। এবার ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপর বৃদ্ধের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া-মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহকবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়ের উপর নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দ্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টহলদারী, রেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আপনকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না ; গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময়, গায়। এখন, সহসা সে বুঝতে পারল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায় দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোন উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পরে, যূথী-লতিকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপাতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনের অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ করে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায়! হায়! সত্যিই যদি আয়না থাকত!

খানিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোন কিচ্ছু ভাববার পূর্ব্বেই প্রগল্‌ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতার কর্ত্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয় নি ; সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কি মরবে ?'

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্ত্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁস নি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনার টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাতে টিনটা মুখের কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমত বা বিদ্যুৎ খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশের উপর রাখতে যেই গেল, সে-মুহূর্ত্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহের হিম কল্পনা হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায়...।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কি বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোর কিছুটা মুখে তুলে নিয়ে বললে, 'চিবিয়ে খাবে বুঝি!'

যূথী পাখীর মত মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি ত করি', এবং পরে ইস্কুল মাষ্টারনীর মত করে স্পষ্ট বলেছিল, 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘরকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তারা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনার বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদের ও কথা বলছে। এতে করে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু, বলেছিল, 'খামাখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে...ভাল জ্বালা', এ কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লতি যূথী...'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেন না সে কোনক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবিতব্যের দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভরত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্ব্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর তাকে, ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে...বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।'

'দূর'

'শুনেছি ভিখারীদের অনেক টাকা থাকে...'

'দূর, লড়াইয়ের বাজারে...টাকা করতেই লোকে...বলে...পয়সা দেবে কে...'

ব্রজর উত্তরের মধ্যে ঊর্ধ্বের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখেছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায়...'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মুখের অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনরায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে...'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই নাকি', তারপর বলেছিল, 'ও'—ছোট কথা অর্থাৎ উত্তর দুটি তার নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে

স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে শুনেছি—কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমের মোহ অথবা সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতির ধমনী, এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাঁসের সন্তরণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া নিয়ে এসে, গতকালের যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে, এবং তারই দুরদৃষ্ট অথবা হয়ত অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টতঃ ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশীক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল।

তারা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে মা-বাবাকে গর্বিত করা। প্রীতিলতা অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালের আলোকে পড়ে নেবার জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতির ন্যাকা, কদর্য্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্ব্বণের চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল ; প্রীতিলতার দেহে এ কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, সে আর যেন স্থির থাকতে পারল না,ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে, পিছনের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল—থমকে দাঁড়াল ! তার পরক্ষণেই, ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওয়াজ করে বলল, 'বসে আছ, মারতে পারছ না ?' ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে, তথাপি নিজে থেকে কোন বিহিত করার মত মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়ত অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধরে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেনি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয়, যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দনরত মেয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল যূথী উদম ল্যাংট এ কারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুছিয়ে তার একান্তে, পাশে লতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনার সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীয় কোন স্থাপত্যের আচ্ছাদিত ফ্রিজের (frieze) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্ব্বভাবে হেসেছিল, হয়ত আপন আপন চোখের জল রোধ করবার জন্যই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্ম্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল ! ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অ-ছবিলা !

'আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই···খাই····কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন····' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মারবার হুকুম আছে, তাই তার দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নয়ত, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহের গন্ধ—মানুষেরা কি আদতে মাছ—অভুক্ত তথা বুভুক্ষু জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ফলে এ কথায়, নিজের জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করলে—কথা সব শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি', বলে অসম্ভবভাবে যূথীর কণ্ঠস্বর নকল করে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি করে হয় জানিস—হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়, ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ—ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ'····' এ কথা শেষ করেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিয়েই, প্রীতিলতা ভয়ঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিরাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন করেছে। এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড়, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয়, তার ইদানীং স্বভাবসিদ্ধ যন্ত্রণায় চীৎকার—কি আর্ত্তনাদ—করে উঠতে চেয়েছিল, এ কারণে যে তার মুখ চীৎকারকারীর ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোন আওয়াজ নেই। পরক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ করতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা-উপশিরা বর্ত্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্য্যে সে ব্যাপৃত হয়—কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্ব্বেই অথ খণ্ডিতা লক্ষণনিচয় ওতঃপ্রোত ; মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পূরণীয় কাম দ্বারা জর্জ্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়োটাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে····কার মনে যে কি আছে...বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ—ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া', বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে·····'

ব্রজ বুঝল, যদিও এ-হেন আপৎকালে দীন-ভিখারী-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গিতের পিছনে কোন সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জ্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল !' ইস্ ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই, সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'—এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট—যূথী কাদের বাড়ি থেকে

মনোরম নয়ন-অভিরাম জরীর পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনার গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে দেখিয়েছিল, তারা মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কি তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরের বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থির থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি করে জানলাটা আরো ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওয়া যায়—এরপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত।(ভগবান! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষের এত ভয় কেন!) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুরিয়ে বসে, এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। পুনরায় সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি! মনে হয় এরা বীভৎস, এরা ক্রমশঃ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্রজর প্রতি রাগ করার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজর প্লুরিসিই তার কাল, উপরন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে বানচাল করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্য্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই যারা আছে বোরখা-পরিহিত আলোয় ভৌতিক। তারা সকলেই পরমায়ুকে সব কিছু বলে ধরে নিয়েছে। প্রীতিলতাদের কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়, এতে করে আর কারও না হোক প্রীতিলতার গা ছম্‌ছম্ করে। তখন এ ভয়কে ঠেকাবার জন্য বৃদ্ধের গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আরোগ্য-স্নান করে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত। পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জ্জনা যেমত অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মত শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার! এ-অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রের কিছুটা সংস্কার করতে মনস্থ করেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাতে কি, যূথী-লতি ত আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিল, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা.....'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই....আমাদের অমন করে কথাদ বলতে নেই....'

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল ; ফলে লতি দিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, বুড়ো....মানে বুড়োমানুষ' বলে মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, 'বুড়োমানুষ রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে....'

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কি!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কি দুটি হাত ছেলেমানুষের মত হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল ; সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর....' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল, 'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটা যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্ব্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি?'

'মোড়ে—কাশছে আর রক্ত পড়ছে....' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজনে তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষ রূপে নিপট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, এ কথা ঠিক যে, এই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে, কচি কচি মুলো দিয়ে আধা সর্ষে বাটা দিয়ে ডেংও ডাঁটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওয়া—স্বাদ পেল। এতে করে একটি ঢোঁক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অদ্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল ; যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না—বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্ব্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুসী করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামী থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগ দিল, 'ভাতের থেকে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস...' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ করেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না...লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেষণ শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেবদের মত খাই' এ কথা শেষ না হতেই যূথী সুকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে দুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই দুজনকে প্রচণ্ড দুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল' ; এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্ত্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্যমনস্ক ভাবে কোন আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এ সব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পারে।

ব্রজ আজ দুদিন কোন কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো—এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায়....' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কথার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা একটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই

অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্যপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধরে, 'আমার বুকে হাত দিয়ে বল, কখনও এসব গল্প....আমার বড় ভয় করে', বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনরায় তড়িৎগতি স্বামীর হাতে হাত রেখেই ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবার জ্বর—তাহলে....'

'একটু গা গরম....'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যার মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসের পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোরীর লজ্জার লাল ; আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ করত বাইরে আনতে ব্রজর ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতার প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতির মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বারা রমণীরা চিরকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছুটা ঘর্ম্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনার আঁচল দ্বারা স্থানটি সংস্কার করে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে, লতির মুখে বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি মাথা খারাপ নাকি—আশ্চর্য্য আজ মাসখানেকও হয় নি ভুগে....' বলে মাদুরটা মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে দিয়ে, একান্ত তখনও তার হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ করে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে...'

ব্রজ নিজের অসুস্থতার কারণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীর কথায় ভীত হবার পূর্ব্বেই বলেছিল, 'দূর...'

'আমারও তাই মনে হয়...দাঁত ফাঁত দিয়ে হয়ত পড়ে থাকবে...' এই বলতে বলতে মাদুর পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমার শরীর...'

'আঃ দূর'

'তা পয়ে ভাবলুম কিছু ত দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কি বল...গরীবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে...'

পুনরায় অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার—একদা মায়াবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' এর মানে কি, ব্রজ নির্বোধের মত এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি—উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদর প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কি অন্ধকারময়ী ! তারাই ধন্য, যারা খাবার দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা, আপনকার হাঁটুতে মাথা রেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে ; অদূরে কন্যাদ্বয় দেওয়ালে—ভিজে ভিজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে ; একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মত বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্ব্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে : ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যূথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়েছিল—প্রীতিলতা

কিন্তু মাথা তোলে নি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহ ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, কি দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা !

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যান্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করেছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে, মনে হল সেখানে কি মৃত্যু নেই...আর্ত্তনাদ নেই ! যে আর্ত্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মত, অনেকটা ধুকুড়ীয়া বাগানের আখমাড়া ম'ম' করা রাণ্ডি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দ্দির আদুরে আওয়াজ, পাটের রকমারি রঙে উদ্‌ব্যস্ত রুমালে বটবৃদ্ধ শরীরটা ঢেকে বসে আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে ত...'

হ্যাঁ সাতটা আটটা...' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কি দুর্দ্ধর্ষ রহস্য ! মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতার মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন করে সেই গীতধ্বনি করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আর উঠতে পারবে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মার ঘাড়ের উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখ লতি কি কুড়িয়ে খাচ্ছে...'

অচিরাৎ জ্যা-মুক্ত ছিলার মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বর বারান্দায় গিয়ে লতির সম্মুখে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য মার মনে হয়েছিল, আমার কি যূথীর মত হিংসে হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়ের আওয়াজ শোনা গেল—এ চড় লতির গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে লতির মুখ থেকে কি যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যূথী ছুটে গিয়ে দেখে, জলসিক্ত হরীতকী...। ছোট একটা নিরেট নিপট আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদের সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্ব্বে সেনেটে উক্ত লাটিন ডায়লগ : 'এবং তুমিও !' এ দৃশ্যে পরক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজ শুনেছিল।

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কশ্চিৎ জলপ্রপাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধ্যানপ্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘরের মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে, ঘুরে, গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যূথী-লতিকে বাপের জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, এ কথা ভুলে গেল, সে সত্যই দেওয়ালে হস্তদ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' এরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায় নি—অনেকবারই সে সেখানে, দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বৃদ্ধের প্রভাতী গীতের রেশ বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যহের সময়মাফিক নর্দ্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর

আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দ্দিত করেছিল ; এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না—যেহেতু এখানে অন্ধকার—সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায় নি !)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হাতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল, এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল'—অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মানা।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মত বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে চলে গেল, শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজার নিকটে এসে স্থির, এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে উষ্ণ, দীর্ঘ, হারমানা।

এখন, সে, সদর দরজার এপাশে, অল্প গ্যাসের আলোয় সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মত বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গীসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডায়মান। মনে হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পারে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি !

ঝটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, বস্তাটায় হাত দিতেই, হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পরক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধরে কায়দা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে—বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল—বোধ হয় খোয়ার জন্য, তারপরই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে, দেওয়াল ঘষতে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল ; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনক্রমে রকের কিনারাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল ; হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয় তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে, প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকার উদ্যত হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকের কিনার থেকে জর্জ্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীরটা তারই দিকে ঢলে পড়তেই একটু সরে গিয়ে—রকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কি মানুষেরা

মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে !

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গরাদ মুঠো করে পুনর্ব্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'রক থেকে দেখ ত কি হল বুড়োর'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয় নি। যূথী-লতি দেখার পূর্ব্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট করে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, হ্যাঁ শাল্‌লা—চ বে ওঠা শালাকে...'

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠির বা মগের কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তারা যেন এক পরীর রাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তারা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্যেও একটা জায়গা করেছে ; এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা ! বাবা !' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল—চাল পেয়েছি,' বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। 'একি চাল কোথায়...'

'বলছি,—তোমার শরীর...'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি...'

'বেশ বেশ...আর দেরী কর না, বসে পড়।'

গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল, এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায় পেলে...'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত করবার জন্য ডালভাতের ন্যাকড়াটার গিঁট খুলবার জন্য একটু ঘুরে বসতেই...ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, 'ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত...'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুরে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুড়োটা মরে গেছে...'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কি যে অসভ্যতা কর এদের সামনে, জান না কিসের রক্ত—নোংরা' বলেই থেমে গিয়ে জিব কাটল।

ব্রজ দুবার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খা-না তোরা', প্রীতিলতা দমকা আওয়াজ করে বলেছিল। অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকী গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে...খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

boiRboi.net

স্বীকারোক্তি

…তার পরে ওরা আমাকে এস বি সেল-এ এনে ঢোকালো। বাইশে ডিসেম্বরের বেলা দশটা হবে তখন। আমার কাছে ঘড়ি ছিল না। শীতের বেলা দেখে, আর লালবাজার থেকে লর্ড সিন্‌হা রোড পর্যন্ত রাস্তার চেহারা দেখে আমার মনে হলো, তখন বেলা দশটাই হবে, যদিও একটা আচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল। সারারাত্রি ঘুম হয় নি। লালবাজার হাজতের সেই ঘর, টিমটিমে অকম্পিত সেই আলো, চার দেওয়াল জুড়ে সেইসব বিচিত্র আঁকাজোকা হিজিবিজি লেখা, আর অর্ধোন্মাদ সেই বন্দী, যে আমার দিকে স্থির চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল, হেসে উঠছিল, বিড়বিড় করে বলছিল বা গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এমন করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন ওখানে কোনো দেওয়াল নেই, একটা দরজা আছে, খোলা দরজা—যেখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। তার পরে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে অর্থাৎ হাজতঘরের দিকে ফিরে বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে হাত তুলে তর্জনীটা শূন্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ভুরু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বিড়বিড় করছিল। ও যে কে আমি তা জানতাম না। পোশাক-আশাক মোটামুটি ভদ্রকমের হলেও ও রাজনৈতিক বন্দী কিনা আমি বুঝতে পারছিলাম না। চোর কিংবা ডাকাত বা পকেটমার সেরকম কাউকে আমার সঙ্গে একই হাজতঘরে পুরে দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ ওরা জানত, তাতে আমার মনোবল আরো নষ্ট হবে, আমি আরো বেশি গ্লানি বোধ করব, মুক্তির ইচ্ছে আমার প্রবল হয়ে উঠবে। আর তা উঠলেই ওরা আমার কাছে যা জানতে চাইছে, ওদের ধারণা, তা সহজ হয়ে উঠবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরশু ওরা তা-ই রেখেছিল। তিনটি ছোকরাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাদের দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওরা যেন হাজতে আসে নি, কোনো চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে এসেছে। ওরা বকবক করছিল, হাসাহাসি করছিল, খিস্তি করছিল, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করছিল, এবং সে-সময়ে অশ্রাব্য উক্তিই শুধু করছিল না, কোমরের পরিধান শিথিল করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিম্নাঙ্গ দেখাচ্ছিল যাতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ফুটে উঠছিল। স্বভাবতই আমার খুব খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এটাও বুঝতে পারছিলাম, ওদের কোনো দোষ নেই, ওরা ওদের স্বাভাবিক

[১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত]

ব্যবহারই করছিল, এমনকি ওরা এও বুঝতে পারছিল আমি অত্যন্ত অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করছি, যে-কারণে আমার দিকে তাকিয়ে ওরাও একটু সংকুচিত হচ্ছিল, আড়ষ্ট বোধ করছিল এবং আমাকেই সাক্ষী মানছিল, 'দেখুন না বড়দা…' ইত্যাদি। ওদের কথা থেকেই জানা যাচ্ছিল বন্দরের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে বে-আইনী আমদানী করা মালপাত্র পাচার করার সময় ওরা ধরা পড়েছে। ইতিপূর্বেও ওরা কয়েকবার ধরা পড়েছে, কয়েক মাস করে জেলও খেটেছে। কোনো কিছুই নতুন নয়। তবু ধরা-পড়ার কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়েই ওদের ঝগড়া হচ্ছিল। একটাই শুধু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কিছুই জিগ্যেস করে নি, আমি কে, কী অপরাধে হাজতবাস করছি। প্রথম থেকেই ওরা আমাকে 'বাবু' বা 'বড়দা' এইরকম সম্বোধন করছিল। আমি কর্তৃপক্ষের কথা ভাবছিলাম, তারা কেন ছেলে তিনটেকে আমার ঘরেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় নি পুলিশের ওটা কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, একটি সুচিন্তিত পরীক্ষা মাত্র। এটা যখনই বুঝতে পারলাম তখনই মনকে প্রস্তুত করে নিলাম এইভাবে যে আমি যেন কোনোরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝখানে রয়েছি। ভীষণ ঝড় বা ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো কোনো দুর্যোগের মধ্যে নয়, যেন দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়ি-বাঁধের ওপর কোনো গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশে পাঁক কাদা নোংরা পশুর মৃতদেহ জোঁক আর কেঁচো পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর আকাশ কালো, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। বৃষ্টির বা পাঁক কাদার বা জোঁক কেঁচোর কোনো দোষ নেই, সবই স্বাভাবিক এবং যা-কিছুরই দায়, সবই আমার জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত, যে গতি-প্রকৃতির দ্বারা আমি লোকালয়-বহির্ভূত ভেড়িবাঁধের ওপর একটি বিচ্ছিন্ন একক গাছের নিচে উপস্থিত। অতএব—

অতএব ছেলে তিনটির সঙ্গে হাজতে আমার সারাদিন ও রাত্রি একরকমভাবে কেটে গিয়েছিল,। তার জন্যে যে-সব কষ্ট, গ্লানি ও পীড়া আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল, সে-সব আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। ওদের খিস্তিখেউড় অশ্লীল গল্প, পরস্পরকে নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন এবং রাত্রে আলোকিত হাজতঘরের মধ্যেই কম্বলের আড়াল রাখবার চেষ্টা করে ওদের সমকামী আচার আচরণ হাসি ইশারা গোঙানি এবং আর্তনাদ সবই একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের মতো ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আর যেহেতু মন অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগের মতোই অধিকাংশ সময় কোনো-কিছু দর্শনে স্মৃতির অন্ধকার দেওয়ালে এক-একটা ঝলক দেখতে পায়, সেইরকম কোনো কোনো সমকামিতার ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। যেমন আমাদের শহরের স্কুলের মাস্টার প্রিয়তোষ আর ছাত্র খোকন, কিংবা—যাক, সে-কথা, অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেইসব ঘটনা ও ঘটনার চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ছিল। এবং একসময়ে অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে এসে যেমন হঠাৎ-আলোর সামনে পড়া যায়, তেমনিভাবে নীরাকে আমার আলিঙ্গনে আবিষ্কার করেছিলাম—যে-আলিঙ্গন আমার স্ত্রীকে, সমাজকে, পার্টিকে এবং গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে হয়। আর নীরাকে মনে

পড়ায়, শেষরাত্রের দিকে যেটুকু বা আমার একটু ঘুমের আশা ছিল সেটুকু তিরোহিত হয়েছিল। যদিও তখন ছেলে তিনটি গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েছিল। দোতলার হাজতঘর থেকে লালবাজারকে স্তব্ধ মনে হচ্ছিল, তবু তখন আর-একটা বন্দী জীবনের নানান পীড়া, গ্লানি, অস্বস্তি, অশান্তি আমাকে কাতর করছিল। এবং আবার নতুন করে একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের কথা আমার মনে হচ্ছিল, যে-দুর্যোগ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে, আর আমার নিজেরই জীবনের কার্য-কারণের গতিপ্রকৃতির দরুন নিরুপায় অবস্থায় দুর্যোগ পার হয়ে যেতে হয়।

রাজনৈতিক মতবাদ যেমন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নীরাকে ভালোবাসাও তেমনি এবং পার্টিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো মেনে নেওয়া একটা অসৎ দুর্বলতা, ভীরুতা, তেমনি এই সমাজের বৈবাহিক বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণগুলোকেও মেনে নেওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে। তাই নীরার আর আমার মাঝখানেও শাসন, সন্দেহ, আইন, জেলখানা, পুলিশ-সুপার, ইন্সপেক্টর, ইনভেস্টিগেশন, স্বীকারোক্তি, জিজ্ঞাসাবাদ, ভয়-দেখানো, স্নায়ুকে খোঁচানো, সবই আছে। এবং সেখানেও নানান প্রক্রিয়ায় উত্ত্যক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

অতএব সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় আমার অস্তিত্ব নিয়োজিত, তাই বহুবিধ কল্পনা আমার আশ্রয়।

তার পরে গতকাল সকালবেলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অত্যধিক পান খেয়ে খেয়ে ছুঁচলো মোটা ঠোঁট, দাঁত নোংরা হয়ে গিয়েছে, কালো মুখ, মোটা লেন্সের চশমা, এইরকম মাঝবয়সী একজন অফিসার কতগুলি মামুলি প্রশ্ন করেছিল—যার জবাব আমি বহুবার দিয়েছি। নাম, ধাম, পেশা, পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয়, পার্টিতে কত সালে এসেছি (পার্টিতে কোনোদিন আসিই নি, এই আমার জবাব ছিল), কোন্ কোন্ নেতাকে আমি চিনি, তারা কে কোথায় আছে (আমি জানি না, এই আমার জবাব) ইত্যাদি। কিন্তু অফিসারটি নিতান্ত যেন কর্তব্য করেই যাচ্ছিল, এমনিভাবে প্রশ্ন করছিল, অন্যমনস্কভাবে ফাইল উলটেপালটে দেখছিল, আর এক-একটা প্রশ্ন করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কন্যাদায়গ্রস্ত।

ঘণ্টা-দুয়েক পরেই আমাকে সেন্ট্রির পাহারায় আবার লক-আপে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখন সেই ছেলে তিনটে আর ছিল না। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। আধ-ঘণ্টা বাদেই তালা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, সেই অদ্ভুত চরিত্রের বন্দীকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল—যাকে আমার উন্মাদ বলেই মনে হয়েছিল, যদিও উন্মাদ অপরাধীদের জন্যে আলাদা গারদ আছে। লোকটার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয় নি। কথা বলবার যোগ্য পাত্র সে ছিল না। এমনও হতে পারে, পাগলামিটাই লোকটার ভান, হয়তো স্পাই, কাছ থেকে আমাকে নিরীক্ষণ করা বা অনুধাবন করাই তার কাজ। শুধু যে সরকারী গোয়েন্দাই হতে পারে তা নয়, পার্টির স্পাই হওয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো পার্টিই এই লোকটিকে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে আমার সান্নিধ্যে আসার নির্দেশ দিয়েছে, আমার

গতিবিধি, মানসিক অবস্থা, স্বীকারোক্তি করি কিনা এইসব জানতে। কারণ পার্টির পরিচালকেরা জানে তাদের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমার মতভেদ আছে। সরকারীই হোক আর পার্টিরই হোক স্পাইমাত্রকেই আমার যেন সরীসৃপ-জাতীয় জীব মনে হয়, আমি এদের কাছে কখনোই স্বচ্ছন্দ বোধ করি নে, কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে, ভয় ও ঘৃণা হয়। আবার এমনও হতে পারে একটা পাগলকে সারা দিনরাত্রির জন্যে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করেই আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যে, আমাকে উত্ত্যক্ত করে মানসিক ভারসাম্য হারাবার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

লোকটার ভাবভঙ্গি ব্যবহার, মাঝে মাঝে কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, ফিসফিস করা, বিড়বিড় করা, ধপাস করে আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়া এবং হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শের উদ্যোগ করা, হঠাৎ হেসে ওঠা সব মিলিয়ে বিশ্রী উত্ত্যক্ত করেছিল। আমি চোখ বুজতে পারি নি সারারাতে। নানান রকম ভেবেছিলাম। লোকটা যদি আমাকে কামড়েই দেয় বা খামচে দেয়। কত কা-ই করতে পারত! গতকাল সন্দেহ আর উৎকণ্ঠায় আমার রাত্রি কেটেছে। মনে মনে আমি একটা দুর্যোগের কল্পনা করেছিলাম।

আজ ওরা আমাকে এস বি সেল-এ নিয়ে এল। আজ বাইশে ডিসেম্বর। আসন্ন বড়দিনের উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে কলকাতায়, লালবাজার থেকে জীপে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল। যদিও কলকাতাকে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। এমনিতেই কলকাতাকে আমার নীরক্ত মনে হয়। তার ওপরে আমার মনের মধ্যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আমার দু-পাশে সশস্ত্র প্রহরী। ড্রাইভারের পাশে একজন যুবক অফিসার, যে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি, ভালো করে তাকিয়েও দেখে নি। সে লুব্ধ দু-চোখ ভরে চৌরঙ্গি এলাকাকে যেন গিলছে। আসন্ন বড়দিনের স্বপ্ন তার চোখে। আর, বিশেষ করে কলকাতার এই অংশটাকে আমার সব থেকে বেশি নীরক্ত ও প্রাণহীন বলে মনে হয়।

যদিও প্রশ্ন ও জবাব বিধিবহির্ভূত, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছি?'

প্রায় এক মিনিট বাদে, যখন জবাবের প্রত্যাশা প্রায় নিঃশেষ, তখন অফিসার মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'এস বি অফিস।'

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস। জিগ্যেস করলাম, 'আবার আমি ফিরে যাব?'

জবাব: 'না, এস বি সেল-এ থাকতে হবে।'

লালবাজারেরটা লক-আপ। সেল শুনে জিগ্যেস করলাম, 'সেখানেও কি লাল-বাজারের মতোই?'

রাস্তায় একঝাঁক মেয়ের দিকে অফিসার তাকিয়ে ছিল। অন্য সময় হলে হয়তো আমিও মেয়েদের তাকিয়ে দেখতাম, খুশী হতাম। মেয়েদের ঝাঁকটা হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে চলেছে। হয়তো বেড়াতে কিংবা বড়দিনের বাজার করতে চলেছে। কিন্তু ওদের নিয়ে আমার চিন্তা বিস্তৃত হলো না। জবাবের প্রত্যাশায়

অফিসারটির ঘাড়ের দিকেই আমার দৃষ্টি।
মেয়েদের দলটা পার হয়ে যাবার পর জবাব এল, 'না, সেখানে এক-একজনের এক-একটা ঘর।'
কথাটা শোনামাত্রই মনটা খুশী হয়ে উঠল। এক-একজনের এক-একটা ঘর। সেখানে আর কেউ থাকবে না। কয়েকদিন লালবাজার লক-আপ-এ নানান ধরনের অচেনা লোকদের সঙ্গে থেকে, সবসময় বাতি জ্বালানো, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ আর দেওয়ালের অশ্লীল লেখা, 'ও ছুঁড়ি, তোর দাঁড়কাকে গাল খাবলে খাবে' (সম্ভবত এটা কোনো গানের কলি), অনেক নাম, তারিখ, প্রধানত যৌন-বিষয়ক আনন্দের ব্যাখ্যা, অনেক গানের কলিও তাই এবং আনাড়ী হাতের একই বিষয়ের ছবি, দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, দেয়ালের অনেক লেখা এবং ছবিই পেন্সিলে বোলানো। অথচ পেন্সিল কোনো কয়েদীর কাছেই থাকা উচিত নয়। হাজতে থাকার সময় লজ্জা নিবারণের জামাকাপড় ছাড়া বন্দীর কাছে আর কিছুই থাকবার নিয়ম নেই। ধূমপান নিষিদ্ধ। লক-আপ-এর বাইরে গিয়ে খেতে হয়। ভিতরে কিছুই থাকবে না। এমনকি নিজের ঘড়ি আংটি টাকা-পয়সা সবই জমা দিয়ে দিতে হয়। এক টুকরো কাগজ থাকাও নিষেধ। বন্দী যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা না করতে পারে, সেজন্যেই নাকি এত বিধিনিষেধ। এরকমই আমি শুনেছিলাম।
আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, সেই একলা ঘরটায় আমি ধূমপান করতে পারব কিনা, খবরের কাগজ দেখতে পাব কিনা—নিদেন কোনো বই, ছাপার অক্ষরে যে-কোনো জিনিস, যা পড়তে পারা যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের শাস্তি এবার শেষ হবে কিনা।
কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই গাড়িটা লর্ড সিন্‌হা রোডের একটা বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ল। একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই আমাকে নামতে বলা হলো। নামতেই প্রকাণ্ড পুরনো ধরনের বাড়িটার ভিতরে আমাকে অফিসারটি নিয়ে গেল। দিনের বেলাও সব ঘরেই আলো জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যায়, দেয়াল খুব মোটা। উঁচু ছাদ আর বড় বড় ঘর। বাড়ির ভিতরটা বেশ কর্মমুখর। য়ুনিফর্ম আর সাদা পোশাক পরা অনেক লোক চলাফেরা করছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছে বা বসে বসে কাজ করছে। কারুর হাতে ফাইল, কেউ খালি হাতে। কোথাও তেমন সাজানো-গোছানো কিছু নেই। নিতান্তই যেন কাজ চলা গোছের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ কোনো কোনো ঘরে রয়েছে। কোনো কোনো ঘর ফাঁকা। অবিশ্যি কোনো কোনো ঘরের দরজায় দামী পরদা, ভিতরে উজ্জ্বল আলোর ঝলকও দেখতে পেলাম। সম্ভবত বড় অফিসারদের ঘর সেগুলো।
একটা বাড়ি পেরিয়ে আবার একটা বাঁধানো উঠোন এবং সেখানেও কয়েকটা গাছ। গাছে পাখিরা জটলা করছে। আমার ভালো লাগল। লালবাজারের সেই দোতলার হাজতঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে আমার মনটা খুশী হয়ে উঠল। সেখানে ঘরের ভিতর থেকে বারান্দার দিকে ঘিঞ্জি জালে ঘেরা ফাঁক দিয়ে একটা উঁচু বাড়ির মাথায় দু-তিন ফুট আকাশ দেখতে পেতাম মাত্র। ঘরের অন্যান্য বন্দীদের জন্যে

সেই ছোট্ট জালের হিজিবিজি-আঁকা আকাশ দেখবার অবকাশও কম হতো।
এখানে উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে-ওখানে পাখির বিষ্ঠা। আমি এ-সবই দু-চোখ ভরে দেখলাম। চোখ তুলে গাছের দিকে তাকালাম। শুধু কাক শালিক নয়, কয়েকটা পায়রাও রয়েছে। যদিও উঠোনের ওপারেই পুব দিকে আর-একটা তিনতলা প্রকান্ড বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তবু নীল আকাশ অনেকখানিই দেখা যায়। আর আকাশটার দিকে চোখ রাখতে আমার অবস্থা যেন ব্রীড়াময়ী সলজ্জ প্রেমিকার মতো হয়ে উঠলো। হয়তো আমার চোখে ঠান্ডা লেগেছে বা যে-কোনো কারণেই হোক, এত ঔজ্জ্বল্য আমার চোখে সইছে না, তাই চোখের পাতা বুজে যাচ্ছে। অথচ প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এস বি সেল কি এই তিনতলা বাড়িতেই? আমি কি এখানেই থাকব?
—এই দিকে।
তিনতলা বাড়ির একটা দরজার কাছ থেকে অফিসারটি আমাকে ডাকল। বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম। এ-বাড়িটাও পুরনো। হয়তো শতাধিক বছর বয়স হবে। ভিতরটা কনকন করছে ঠান্ডায়। বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। মেঝের ঠান্ডা যেন আমার জুতোর সোল ফুঁড়ে স্পর্শ করছে। গায়ের চাদরটা আমি আর-একটু ভালো করে জড়ালাম। প্রায় আধো-অন্ধকার এক-একটা ঘর দিয়ে অফিসারকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম।
এখানেও সশস্ত্র ও নিরস্ত্র, য়ুনিফর্ম ও সাদা পোশাক পরা কর্মচারীরা চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। আগের বাড়িটার মতো ভিড় এখানে নেই। আর একমাত্র বৈশিষ্ট্য, এখানে কোনো কোনো ঘরের দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ দরজার সামনে একজন করে বন্দুকধারী প্রহরী। আগের বাড়িটাতে আমাকে কেউই তাকিয়ে দেখে নি। এখানে অনেকেই আমাকে তাকিয়ে দেখল। আমার মনে হলো, এই তাকিয়ে দেখার মধ্যে একটা শিকারীর তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রয়েছে। আমাকে দেখার পর প্রত্যেকেই যুবক অফিসারটির সঙ্গে চোখাচোখি করছে। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে তাদের যে কী নিঃশব্দ কথার আদান-প্রদান হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না। একটা-কিছু কথা আদান-প্রদান হচ্ছে, সেটা অনুমান করা যায়।
এ-বাড়ির আবহাওয়া একটু যেন অন্যরকম। ঠিক নিশ্চুপ নয়, অথচ একটা স্তব্ধতা যেন বিরাজ করছে। এক-একজনের মুখ কেমন একটা ক্রুর উত্তেজনায় ঝলকাচ্ছে। কেন কে জানে। যেতে যেতে আমার সামনেই হঠাৎ একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে। সান্ত্রী দরজাটা টেনে দেবার আগেই চকিতে আমার চোখে পড়ল, ঘরের মাঝখানের টেবিলে একজন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু-হাত ছড়িয়ে, আর একটা কালো কম্বল টেবিলের ওপর থেকে মেঝেয় লুটোচ্ছে। আমি দরজাটা পার হয়ে যেতেই অন্য দিক থেকে আর-একটি লোককে তাড়াতাড়ি আসতে দেখলাম। তার চোখে চশমা, গায়ে ওভার-কোট, কোটের পকেট দুটো যেন অনেক মালপত্রে মোটা হয়ে আছে। আর হাতে স্টেথিস্কোপ। মনে হলো, লোকটা ডাক্তার। দেখলাম, সে ওই ঘরটাতেই গিয়ে

ঢুকল।

আমার গতি সম্ভবত শ্লথ হয়ে এসেছিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। আমার কাঁধে একটা ঠেলা লাগতেই দেখলাম, অফিসারটি আমাকে আঙুল দেখিয়ে পথনির্দেশ করছে। ভ্রূকুটি বিরক্তি তার মুখে।

আমি তাকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে টেবিলের ওপর সেই মূর্তিটা ভাসছে। আর ডাক্তারের দ্রুত আগমন ভুলতে পারছি না। কোনো অসুখবিসুখের ব্যাপার নাকি? না কি স্বীকারোক্তির জন্যে···? দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া সেই লোকটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলাম। প্রকাণ্ড চেহারা, উসকোখুসকো চুল, হাতা গোটানো, লোমশ-বুকখোলা শার্ট, আর হাতে ঝোলানো কোট। লোকটা কি স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে ওকে মেরেছে? যাকে এক মুহূর্তের জন্য খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে? বেত দিয়ে মেরেছে, না কি কম্বল চাপা দিয়ে ভারী রুল দিয়ে পিটিয়েছে? কারণ একটা কালো কম্বলও টেবিল থেকে মেঝেতে লুটোতে দেখলাম। আর কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি কলকাতা পুলিশের আছে। শুনেছি তাতে দেহে কোনো দাগ হয় না। অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধে হয়।

বন্দীর আঘাত কি খুব বেশি হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিল?

—দাঁড়ান।

আমাকেই বলা হলো। ওপরে উঠেই বাঁ দিকে টেবিলের সামনে চেয়ারে একজন ফর্সা মোটা মাঝবয়সী লোক বসে ছিল। আমাকে যে নিয়ে এলো সেই অফিসারটি নিচু হয়ে নিচু গলায় কী যেন বলল মোটা মাঝবয়সীকে। মোটা মাঝবয়সী একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার হাতের পেন্সিল দিয়ে এক দিকে নির্দেশ করল। অফিসারটি আমাকে ডাকল, 'আসুন'।

অনুসরণ করলাম। সামনেই ডান দিকে পর পর কয়েকটি দরজা। একটা ভেজানো দরজা ঠেলে আমাকে ভিতরে যেতে নির্দেশ করে সে বলল, 'আপনি একটু বসুন।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এটা কি সেল?'

'না।' বলেই সে চলে গেল।

একজন সান্ত্রী এসে দাঁড়াল এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। এটা সেল নয়। একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, এই মাত্র আসবাব। ঘরের মেঝে পুরনো, দেয়ালও তাই। ঘরের মধ্যে যেন দলা দলা শীত জমে ছিল। ঢোকা মাত্রই তারা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল, এবং হঠাৎ শিরদাঁড়া শিউরিয়ে ছলাৎ করে যেন এক-ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মাথায়। স্বীকারোক্তি! আবার স্বীকারোক্তি!

এটা জিজ্ঞাসাবাদের ঘর। অবিকল সেই নিচের ঘরটার মতোই, যে-ঘরে সেই বন্দী পড়ে আছে। আমার শীতের কাঁপুনিটা বোধহয় এই কারণেই, ওই একটি মুহূর্তের

দৃশ্যের জন্যেই। আমাকেও হয়তো স্বীকারোক্তির জন্যে…
একটাই মাত্র জানালা আছে ঘরটিতে। দেয়ালের অনেক উঁচুতে আমার মাথা ছাড়িয়ে। শুধু আকাশই দেখা যায়। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। দাঁড়াতে পারছি না, ভীষণ শীত করছে, কাঁপুনিটা বুকের কাছে উঠে এসেছে। হাতে পায়ে তেমন যেন বল নেই। পা তুলে টেবিলটা চেপে ধরে, শক্ত হয়ে, গুটিশুটি হয়ে বসলাম।
তার পরে প্রথমেই আমার মনে পড়ল, আমার চুলের মুঠি আমার বাবার হাতে, ভীষণ লাগছে। গাল দুটো জ্বালা করছে থাপ্পড়ের ঘায়ে। বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলায় হিংস্র জিজ্ঞাসা : 'বল্, ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকো বাইতে? মাছ ধরতে? বল্ বল্ বল্। তা নইলে খুন করব আজ তোকে।'
তার পরেই মনে পড়ল, ঢাকা শহরের সেই প্রায়ান্ধকার গলিটার কথা, যেখানে মাত্র একটি কেরোসিনের লাইটপোস্ট ছিল, এবং তিনজন বন্ধু আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি। তিনজনেরই চোখমুখ ভীষণ নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সকলেই আমরা সমবয়সী, ষোলো সতেরো আঠারোর মধ্যেই সকলের বয়স। বন্ধু তিনজনের জিজ্ঞাসা, আমি রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের বাড়ি বেড়াতেই যাই কি না, কেন যাই এবং বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে আমি সমিতির কথা বলেছি কি না।
'আমরা জবাব চাই।' ওরা তিনজনেই রুদ্ধশ্বাস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল।
বিরাজমোহনকে আমি কোনোদিনই দেখি নি, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে যাই। এই যাওয়াটা নিষিদ্ধ, কারণ বিরাজমোহন পার্টির বিচারে বিশ্বাসঘাতক, শত্রু। আমি তাঁর কাছে যাই না, তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে যাই, কারণ ভালো লাগে, তারা সকলেই খুব ভালো। বিরাজমোহনের নাতি-নাতনী বলে তাদের কোনো দোষ নেই, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। আর অলকার সঙ্গে আমার প্রেম (অন্তত সেই বয়সে, সেটাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। অলকার বয়স তখন বারো, দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, আমরা হাতে হাত ধরতাম, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়ক-নায়িকার মতো চুমো খাবার চেষ্টা করতাম, ইত্যাদি), তাকে আমার জীবনের সব গোপনীয়তাই প্রকাশ করে দিই। বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। পার্টির বন্ধুরা ঠিক প্রশ্নই করেছিল, তারা ঠিক সন্দেহই করেছিল। কিন্তু ওরা আমার এবং অলকাদের ওপর অবিচার করছে, অন্যায় করছে, তাই আমি অস্বীকার করলাম, 'এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।'
প্রথমে নরেশ দুম করে একটা ঘুষি মারল আমার চোয়ালে। বলল, 'এখনো সত্যি কথা বল্।'
'জানি না।'
সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই মারতে আরম্ভ করল। বলতে লাগল, 'ট্রেইটার! স্পাই। ওকে খুন করে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।'
আমার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এমন সময়ে কারা যেন গলিতে

ঢুকল। লোকজনের সাড়া পেয়ে বন্ধুরা অন্ধকারে দৌড়ে কে কোথায় চলে গেল। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে একদিকে চলতে লাগলাম। লোকজনের কাছে বাইরে আমি কিছু জানাতে চাই না। যদিও ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ রেখেছিল, আমি কোথায় যাই। আমি বুড়িগঙ্গার ধারেই গেলাম। কারণ জল দিয়ে মুখ-চোখ ধোবার দরকার ছিল।

এর পরেই আমার মনে পড়ল, আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে। হিংস্র রাগে ওর চোখ, ওর মুখ জ্বলছে। আমি সিঁড়ির কাছে, অদূরেই বাড়ির ঝি ঘর মুছছে ন্যাতা বুলিয়ে, যদিও তার হাত ঠিক কাজ করতে পারছে না, নত মুখ, নত চোখের দৃষ্টি, এদিকে এবং আমার মা ঘরের ভিতর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। স্বীকারোক্তির জন্যে ও আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠল, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওর চেহারাটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাকে একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'বল, ওকে তুমি ভালবাসো? কেন ভালবাসো? বল বল বল।'

ওর কষ্ট, কষ্টের জন্যে হিংসা, হিংসা থেকে রাগ, রাগ থেকে ঘৃণা এ সবই আমি বুঝতে পারছি, এবং নীরাকে আমি ভালবাসি, নীরার সঙ্গে দেখাও করে থাকি। কিন্তু কেন, এর জবাব, ছেলেবেলায় ইস্কুল পালানোর মতোই, অলকাদের সঙ্গে মেশার মতোই, এবং আজকের এই বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেবার মতোই অপ্রতিরোধ্য ও কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমি চুপ করেই রইলাম, জামাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম।

ও একটা অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, আর দু-হাত দিয়ে আমার জামাটা ছিঁড়ে ফালা করে দিল।

এবার আমার মনে পড়ল, পার্টির লোকাল অ্যাকশন কমিটির তলব। মাত্র মাস-দুয়েক আগের কথা, অ্যাকশন কমিটি আমাকে ডেকে পাঠাল। অ্যাকশন কমিটি মানে, পার্টির আর্মস অ্যামুনিশন যাদের তত্ত্বাবধানে, যারা শত্রুকে চিহ্নিত করে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় আর কর্মীদের অপরাধের বিচার করে।

সেই এক জনবিরল লোকালয়, পুরনো বাড়ির দোতলা, প্রায়ান্ধকার ঘর। পাথরের মূর্তির মতো নিরেট শক্ত মুখ নিয়ে পাঁচজন বসে আছে। অ্যাকশন কমিটি। ক্যুরিয়র আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। আমি অ্যাকশন কমিটিকে পার্টির নিয়মতান্ত্রিক অভিবাদন করলাম। কিন্তু কেউই প্রত্যভিবাদন জানাল না। আমাকে শুধু তাদের মুখোমুখি বসতে ইঙ্গিত করা হলো।

মিহির, অ্যাকশন কমিটির নেতার এই ছদ্ম নাম, যার স্মার্টনেস, সাহস, চেহারা, বাক্‌ভঙ্গির খুবই নাম আছে পার্টির মধ্যে। বোনাপার্ট বলে সবাই যাকে আদর করে, কারণ তার চেহারার সঙ্গে নাকি নেপোলিয়ানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, এবং জিমনাসিয়ামের ক্রীড়ায় বেশ পটু ও স্বভাবতই তার শার্ট-খোলা বুকের ও চলা-

বসার ভঙ্গি দৃষ্টি-মুগ্ধকর, যার চোখ তীক্ষ্ণ ঈগলের মতো, আর একদম হাসে না, যেটা নিয়ে সবাই বিস্মিত প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ, কারণ মিহিরকে কেউ হাসতে পর্যন্ত দেখে নি। আমার ধারণা, মিহির আত্মসচেতন, অনেকটাই ভঙ্গিসর্বস্ব অ্যাডভেঞ্চারার। সে-ই আমাকে জিগ্যেস করল, 'উম্-ম্ম্—হ্যাঁ, কমরেড! অ্যাকশন কমিটি আপনার কাছে জানতে চাইছে, ধ্রুবকে আপনি কোনো শেলটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিনা। তার আগে জানতে চাই, পি সি এগারো-শো বাই বারো আট উনপঞ্চাশ নম্বরের সার্কুলার আপনাদের সেল-এ পেঁছেছিল কিনা, এবং আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা।'

মিহিরের চোখ থেকে যেন একটি ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের ঝিলিক আমাকে হানল, এবং বাকি সকলেরই তাই।

মিহির যা-যা জিগ্যেস করল, সবই সত্যি। গোপন সার্কুলারে ঘোষণা করা হয়েছিল: 'ধ্রুবকে কতকগুলি বিশেষ কারণে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পার্টির বিশেষ স্বার্থে কারণগুলি এখন ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সভ্যদের সবাইকে জানানো যাচ্ছে, ধ্রুবর সঙ্গে যেন কেউ কোনোরকম সম্পর্ক না রাখেন, এমনকি বাক্যালাপ না করেন, করলে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে তাঁকেও শাস্তি পেতে হবে, ইত্যাদি।' আমি সে-সার্কুলার পাঠ করেছিলাম, কিন্তু ধ্রুবকে আশ্রয়ও সত্যি দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী সৎ পার্টি-জান, চিন্তাশীল, বিবেকবান ধ্রুবর সঙ্গে জেলার একজন নেতা ও অ্যাকশন কমিটির মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে তাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছিল। তাকে স্পাই আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল, এবং সেটা কার্যকরীও করা হয়েছে। অথচ ধ্রুব একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী, পুলিশ তার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে। এ-অবস্থায় তাকে পার্টি থেকে বের করে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো, আন্ডার-গ্রাউন্ড থেকে সে বেরিয়ে পড়ুক। অর্থাৎ পুলিশের হাতে চলে যাক। পার্টি থেকে বহিষ্কার মানেই আন্ডারগ্রাউন্ডের আশ্রয় তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলেই পুলিশ তাকে ধরতে পাববে, এবং ধরলেই, যেহেতু ধ্রুব একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার আগে যে প্রকৃতই একজন জননেতা ছিল, তাকে পুলিশ নানানভাবে পীড়ন করবে কথা আদায় করবার জন্যে। এক দিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার, অন্য দিকে পুলিশের পীড়ন, দুইয়ে মিলে স্বভাবতই মানসিক শক্তিতে ভাঙন ধরতে পারে, স্বীকারোক্তিও করে ফেলতে পারে।

এ-অবস্থায় ধ্রুব আমার কাছে এসেছিল। পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডের আশ্রয় ছেড়েই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল, এবং বলেছিল, 'আমি আত্মহত্যা করতে পারি, তবু পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারব না। মিহির আর যতীন (জেলা কমিটির নেতা) প্ল্যান করে আমার এই সর্বনাশটা করছে, তারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছে। অথচ বিশ্বাস কর, কোনোরকম নেতৃত্বের মোহ আমার নেই, আমি শুধু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছিলাম। ওরা সেটা সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাকে এভাবে বের করে দিচ্ছে।'

সৎ ধ্রুবকে আমি দেখলাম, সে অসহায়। আমি তাকেই বিশ্বাস করি। মিহিরের অতীতকে আমি জানি না, তাকে ওপর থেকে আমাদের এলাকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বাইরে থেকে এসেছে। আমি ধ্রুবকে চিনি, বুঝি, বিশ্বাস করি এবং তাকে এভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মুখে এক-টুকরো মাংসের মতো আমি ছুঁড়ে দিতে পারি না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু আমার উপায় নেই, অ্যাকশন কমিটির কাছে আমাকে অস্বীকার করতেই হবে। স্বীকার করলে আমার ওপর নির্দেশ অমান্যের শাস্তি নেমে আসবে তো বটেই, ধ্রুবকেও বাঁচানো যাবে না। এখন এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললাম, 'সেই সার্কুলার আমি পড়েছি। ধ্রুবকে আমি আশ্রয় দিই নি।'

অ্যাকশন কমিটির নিরেট মুখগুলো পরস্পরের দিকে একবার চোখাচোখি করল। মিহির তার বাক্যবাণ প্রয়োগ করল। হেসে ঘাড় কুঁচকে বলল, 'আপনার মতো একজন খাঁটি কমরেড পার্টির কাছে মিথ্যে কথা বলবে এটা আশা করা যায় না।'

মিহির জানত তার এই ভঙ্গিটা অপরের পক্ষে খুবই ক্রোধের উদ্রেক করে। আমি শান্তভাবেই বললাম, 'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'যদি প্রমাণ হাজির করা যায়?'

'তাহলে তো কোনো কথাই নেই।' আমি জবাব দিলাম।

অ্যাকশন কমিটির পাথুরে মুখগুলো তীক্ষ্ণ ধারে ঝলকাতে লাগল, চোখগুলো অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগল। ঘৃণায় হিংস্র দেখাল। সব থেকে কমবয়স্ক যে, যার টেক্ নাম পি পি, সে শাসিয়ে উঠল, প্রমাণ হলে মনে রাখবেন, আপনাকেও ধ্রুবর মতোই পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

'জানি।' আমি দৃঢ়তা প্রকাশ করলাম।

বিকাশ (ছদ্মনাম) নিষ্ঠুর মুখে, কঠিন গলায় বলল, 'শুধু বের করেই দেওয়া হবে না, তার চেয়েও কঠিন শাস্তি—'

বাকিটা তার চোখের আগুনে ও দাঁতে দাঁত ঘষাতেই বোঝা গেল। ওরা অ্যাকশন কমিটির লোক, হয়তো ওদের প্রত্যেকের কাছেই রিভলভার রয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলে আমাকে—

'গত শুক্রবার—' মিহিরের দৃঢ় গম্ভীর ও নাটুকে গলা বেজে উঠল, 'গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ধ্রুব আপনার কাছে যায় নি?'

কথাটা মিথ্যে নয় এবং খবরটা কমরেড রেবার (আমার স্ত্রী, পার্টির সভ্যা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্ত্রীলোক মাত্রেই যা'হয়ে থাকে ভালবাসা ও ধর্মের বিষয়ে যুক্তিতর্কহীন, যদি ধর্ম মানে, এবং বর্তমানে পার্টি, আমার মতে ধর্মীয় দল ও আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পেঁছেছে, যুক্তি তর্ক বোধ বুদ্ধিহীন অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মদানে উন্মুখ, আমার স্ত্রী একজন সেইরকম বিশ্বস্ত কমরেড, এবং বিশ্বস্ততার মূলেও ভালবাসায় যেহেতু আহত, সে ফণিনীতুল্য) কাছ থেকে শুনেছে।

আমি তবু বললাম, 'না।'

'তাহলে কমরেড রেবা মিথ্যে বলেছেন?' মিহির বলল বেশ বিদ্রূপের ঢেউ দিয়ে,

একটু অ্যাসিড-হাসির জ্বালা ছিটিয়ে। যেন এর পরে আর আমার স্বীকারোক্তি না করে উপায় নেই। আমি অবশ্য রেবাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন সে এ-খবর পার্টিকে না দেয়। কিন্তু দিয়েছে।

বললাম, 'যদি তিনি বলে থাকেন তবে মিথ্যেই বলেছেন।'

মিহির গর্জন করে উঠল, 'কমরেড, সাবধান, আপনি আর-একজনকে মিথ্যেবাদী করছেন।'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'শাট্ আপ্ লায়ার।' পি পি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল, নিজের উরুতেই একটা ঘুষি মারল।

আর তার মাঝখান থেকে আহত বাঘের মতো গর্জিত গোঙানি ভেসে উঠল মিহিরের গলায়, 'আপনি সেই রাত্রেই একটা চিঠি লিখে, টাকা দিয়ে ওকে কোথাও পাঠিয়ে দেন নি?'

'না।'

'এই ঘৃণ্য মিথ্যে বলার পরিণাম আপনি জানেন?'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

মিহির অসহায় আক্রোশে কী করবে ভেবে পেল না। তার সবল পেশল হাত, মস্ত বড় থাবা অন্ধশক্তিতে কয়েক মুহূর্ত মোচড়াল। তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ডিসল্ভ্ দিস্ মিটিং, একে আজ চলে যেতে দিন। আমাদের সিদ্ধান্ত একে পরে জানানো হবে।'

পি পি বা বিকাশের চলে আসতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। তবু সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমি বললাম, 'যেতে পারি?'

মিহির বলল, 'নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত।'

আমি চলে এলাম। তখনো আমার ছেলেবেলার কথাই মনে পড়েছিল, কৈশোরের যৌবনের ইস্কুল পালানো, অলকাদের সঙ্গে মেশা, নীরাকে ভালবাসা, ধ্রুবকে আশ্রয় দেওয়া এবং—

দরজাটা খুলে গেল। স্বীকারোক্তি। কালো গগল্স্ পরা রাশভারি লোকটি পিছন ফিরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বগলে একটা ফাইল। এবার জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু সেই শিরদাঁড়া-শিউরনো শীতটা এখন আমার আর নেই। ঘাড়ে গর্দানে স্থূল পেশল লোমশ লোকটি এক টানে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। ফাইলটা টেবিলে রাখল। মোটা স্বর শোনা গেল, 'এখানে এসে আপনার বডি সার্চ হয়েছে?'

'না।'

'দাঁড়ান।'

দাঁড়ালাম। লোকটা আমার শূন্য পকেটগুলো, কোমর, পেট, চাদর ঝেড়ে দেখে নিল।

'বসুন।'

বসলাম। গগল্‌স্‌টা খুলল সে। চোখের পাতায় লোম নেই, কোলগুলো রক্তাভ, অনেকটা কাঁচা ঘায়ের মতো। চেয়ারে বসে ফাইলের পাতা উলটে যেতে লাগল, আর মোটা স্বরে হুম্‌ হুম্‌ করতে লাগল। তার পরে আচমকা জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবেন, না বলবেন না?'

'কোন্‌ বিষয়ে?' আমি বললাম।

লোকটা শব্দ করল, 'হুম্‌!'

মোটা ঠোঁট দুটো চেপে বসল ওর। তার পরে সেই রক্তাভ চোখ দুটি তুলে নিষ্পলক তাকাল আমার দিকে। লোকটার মুখটা যেন ফুলে উঠছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ধলেশ্বরীতে ঝড় উঠব-উঠব করছে, আকাশ কালো হয়ে উঠছে, বায়ুকোণে চিকুরহানা বাজের দূর গর্জন। ছোট নৌকো, আমি আর মা যাত্রী, গন্তব্য মামাবাড়ি, একমুখ দাড়িওয়ালা মাঝি পবন। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে বুকের কাছে। চোখে আতঙ্ক। ডাক দিল, 'পবন।'

পবন তখন হাঁক দিচ্ছিল, 'রও হে, আর দশ ঠেলা।'

সে ঝড়কে বলছিল, আর দশবার হাল ঠেললেই তীরে পেঁছুবে। নৌকোটা অসম্ভব দুলছিল বাতাসে নয়, পবনের হালের চাড়ে।

'গুরু গুরু গুরু!' মা বলছিল।

'কোন্‌ বিষয়ে, অ্যাঁ?' লোকটা গোঙানো সুরে উচ্চারণ করল। ঘেয়ো রক্তাভ চোখগুলো অপলক।

একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে এল ধলেশ্বরীর তীর থেকে, আর গাছগুলো নুয়ে পড়ল। ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর আর্তনাদ ওটা।

'আর একটুখানি, আই দ্যাওয়া!' পবন চিৎকার করল আবার।

লোকটা ভ্যা-ভ্যা করে হেসে ফেলল।

পবন ঝপাং করে লাফ দিল জলে। চিৎকার করল, 'ডরাইয়েন না মা, বুক জলে।' নৌকোর কাছি পবনের হাতে।

লোকটা বলল, 'আমরা যেমন জিগ্যেস করি, আপনারা সবাই সেরকমই জবাব দেন। সত্যি বলছি, আমি টায়ার্ড, টায়ার্ড। কোনো মানে হয় না, রোজ রোজ সেই একই কথা। জানা কথাই তো বাপু, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না। নিন, সিগারেট খান।...কোনো জীবনেই সুখ নেই মশাই। বিপ্লব করেই বা কী সোনার রাজত্ব তৈরি করবেন আপনারা! ইংরেজ আমলে আমরাও অনেক কিছু ভেবেছিলাম। বসুন, আসছি।' কোটটা তুলে নিয়ে ফাইলটা হাতে করে লোকটা চলে গেল। দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা দুর্যোগ গেল। হয়তো আর-একটা দুর্যোগ আসবে, তার পরে আর-একটা, তার পরে...। জীবনব্যাপী দুর্যোগ। তাকে রোধ করা যায় না। যে-বিশ্বে বাস, সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দুর্যোগের নানান কার্যকারণ ইন্ধন, এবং আমি কেন দুর্যোগের মাঝখানে, এর একমাত্র কারণ, আমি যে-কারণে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলাম, আরও কৈশোরে চৌদ্দ বছর বয়স হবে তখন, বিধবা বীণাদির

গোপন চিঠি অমরদাকে পেঁছে দিয়েছিলাম, সেই বিষণ্ণ যুবতী বীণাদি পাড়ার ক্লাবের নেতা লাইব্রেরি-স্রষ্টা অমরদাকে ভালবাসতেন, এবং দু-জনের দেখা-সাক্ষাৎ বারণ হয়ে গিয়েছিল, বীণাদির অভিভাবকেরা বীণাদিকে বেরুতে দিতেন না, পাড়ার সব বয়স্ক মানুষেরাই যেন এই দু-জনের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, একটা স্কুল তৈরি করেছিল, পাহারা দেওয়া, গোয়েন্দাগিরি করা, নোংরা রসিকতা ও কুৎসিত কথা বলা, আর স্বভাবতই আমাদের অভিভাবকেরাও ক্লাবে যেতে নিষেধ করেছিল, অমরদার সংস্রব বিষবৎ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেটা অন্যায় মনে করেছিলাম, এবং ওই বয়সে হৃদয়ের সকল আবেগ ও সমর্থন অমরদা ও বীণাদির পক্ষে ছিল। আমি বীণাদির চিঠি অমরদাকে পেঁছে দিয়েছিলাম এবং অমরদার চিঠি বীণাদিকে, আর সেই পেঁছে দিতে গিয়েই ধরা পড়েছিলাম, যদিচ বামাল নয়, তার পরেই আমি রক্তাক্ত, দাদার একটি ঘুষিতেই কষের দাঁত নড়ে গিয়েছিল, বাবার ছড়ির দাগ আমার শরীরটাকে চিতাবাঘ করে তুলেছিল, আর মায়ের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন, এখনো বল্, অমরের চিঠি বীণাকে…?'

'না।'

'উঃ ভগবান, এই ছেলেটাকে কেন আঁতুড়েই মুখে নুন পুরে দিই নি।' দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় মা চিৎকার করে উঠেছিল।

আর আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'হে ভগবান, বীণাদি আর অমরদা যেন ধরা না পড়ে।' এবং তখনো সেই একই দুর্যোগ…

দরজাটা আবার খুলে গেল। অন্য একজন ঢুকল। সেই ফাইল হাতে। ধুতি পরা, শার্টের ওপরে কোট। চেয়ারে এসে বসল। পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বের করে দেখল। একবার আমাকে তাকিয়ে দেখে বলল, 'আমি যা পড়ে যাচ্ছি, সেগুলো আগে শুনে যান, কোথাও না মিললে আমাকে বলবেন।…সালে পার্টিতে জয়েন, সময়ে লোকাল কমিটিতে উত্তীর্ণ, সন্দেশখালির কৃষক সম্মেলনে যোগদান, মেটিয়াবুরুজে…তারিখে উত্তেজক বক্তৃতাদান, গান ফ্যাক্টরিতে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা, রেলওয়ে ছাব্বিশ নম্বর গেটের ওপারে পার্টির আর্মস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া…'

লোকটা একটা কথাও মিথ্যে বলছিল না, তারিখ বা সময়, একটাও ভুল বলছিল না। যেন আমারই কোনো সহকর্মী, সর্বক্ষণের সঙ্গী, কতগুলো গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা বলে চলেছে। বলে চলেছে, 'অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল।…তারিখে, এবং…তারিখে ও…তারিখে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তারিখে গণপৎ সিং-এর কাছ থেকে এক ব্যাগ ক্র্যাকার নিয়ে সাত নম্বর সেলকে দিয়েছেন (আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! লোকটা হয়তো এর পরে বলবে রেবার সঙ্গে আমার কবে ঝগড়া হয়েছে, নীরার সঙ্গে আমি কোথায় কখন দেখা করেছিলাম), প্রাদেশিক কমিটির আরতি দত্তকে নিয়ে…তারিখে রাত্রে ফিটনে করে পার্কসার্কাস থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন (অসম্ভব ! এই বিষম সত্যি শুনে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে

ইচ্ছে করছে), এবং সেখান থেকে···ইত্যাদি।'
লোকটা সত্যি ঘটনা বলে যেতে লাগল, আর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি সেই যে ভাবলেশহীন মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কথাগুলো শুনতে শুনতে আর আমার কোনো ভাবের সঞ্চার হলো না। বিস্ময়কে যথাসম্ভব রোধ করে আমি ধরেই নিলাম, আমার মুখের সামনে একটা আয়না ধরা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, দেখুন আপনার ঠোঁটের ওপর ডান দিকে একটা তিল, বাঁ কানের পাশে ছোট একটি কাটা দাগ, নাকটা···চোখ দুটো—ইত্যাদি। আর আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, না, না, না। ওটা আমি নয়, ওটা আমার মুখের ছায়া নয়; না না না—
'তাহলে সবই মিলছে, সবই সত্যি ?'
'কিসের ?'
'এই আমি যা যা বললাম ? আপনি যখন কিছুই বললেন না, তখন সবই মিলে গেছে নিশ্চয়।'
আমি বললাম, 'এসব আমি কিছুই জানি না।'
'লায়ার ! একটা আচমকা গর্জনের সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত পড়ল। মনে হলো, গত শতকের পুরনো ঠাণ্ডা ঘরটা কেঁপে উঠল। একটা জ্বলন্ত মুখ, ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্ত। চোয়ালের হাড় কঠিন।
আমি অনেকটা অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। একটাই মাত্র মন্ত্র জপ করতে লাগলাম, না না না, না না না, না না না। এবং লর্ড সিন্‌হা রোডের এই ঘরে আমি ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেলাম।
ভীষণ স্তব্ধ মনে হলো কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই লোকটির নিচু স্বর শোনা গেল। নিচু কিন্তু অনেক বেশি হিংস্র। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল সে, 'বাট আই উইল নট স্পেয়ার উই। আই উইল রীড এগেন, হিয়ার অ্যাটেন্‌টিভ্‌লি অ্যান্ড দেন আনসার।'
লোকটা আবার সেই কাগজ পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবার আমি আর শুনছিলাম না। ওর পড়ার চেয়ে দ্রুত এলোমেলো বহু ঘটনা ও গলার স্বর আমাকে ঘিরে ধরল। অ্যাকশন কমিটি ; মিহির : 'এই দেখুন কমরেড রেবার চিঠি, তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ধ্রুব কী ভাবে, আপনার কাছে কখন এল, কী বলল, আপনি কী বললেন, কী করলেন। আপনি এখনো স্বীকার করুন।'
রেবা : 'এই যে সেই চিরকুট, নাম না থাকলেও নীরার হাতের লেখা আমি চিনি। মিথ্যুক। এখনো বল, তাহলে তুমি ওর সঙ্গে বাসুলি বিলের ধারে দেখা করেছিলে ?' ছেলেবেলা ; বাবা : 'সত্যি কথা বল্‌ ইস্কুল পালিয়ে নৌকা বাইতে গেছিলি ?' কৈশোর ; সমিতির বন্ধুরা : 'বল্‌ অলকাকে কি তুই সমিতির কথা বলেছিস ?' '···অ্যান্ড দেন আনসার।'···
'আনসার, আই স্যে আনসার।' আবার একটা ঘর-কাঁপানো ক্রুদ্ধ গর্জন এবং টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।
আমি আমার সামনে দেখলাম, একটা রক্তাভ অঙ্গার মুখ, চিতার ক্রুদ্ধ চোখ। এবং

আমি দেখলাম, ঘর কাঁপছে। ভেজা বিছানা থেকে আমি ঘুমন্ত লাফ দিয়ে উঠলাম। দশ বছরের আমি, জলে ভেসে যাওয়া মেঝেয়, অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বাবার চিৎকার শুনলাম' 'ঘরের বাইরে চল ফেলু (আমার মায়ের নাম), ছেলেদের নিয়ে ঘরের বাইরে চল, পশ্চিমের চাল উড়ে গেছে।'...আমার বুকের মধ্যে ভীষণ কাঁপছিল। ঝড়ের গর্জন আর তার দাপটে টিনের চাল যেন ভয়ে ককিয়ে কাঁদছিল। বিদ্যুৎঝলকে চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মায়ের আঁচল ধরে আমি খোলা দরজা দিয়ে নতুন পাকা ঘরের দিকে চললাম। মস্ত বড় উঠোনটা বাতাসে বৃষ্টিতে বিজলী-হানাহানিতে তোলপাড় হচ্ছিল। মায়ের একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল। সেইদিকে চোখ রেখে আমার সামনে আমি অঙ্গার-মুখ আর চিতা-চোখ ভেসে উঠতে দেখলাম। তার গর্জনের জবাবে, আমি ভিজতে ভিজতে নতুন পাকা ঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'জানি না। আমি এসবের কিছুই জানি না।'

আমার মুখে থুতু ছিটকে লাগল, আর কানের কাছে গর্জন শোনা গেল, 'কী করে জানতে হয় আমি শিখিয়ে দেব। আই উইল টীচ ইউ, ইউ লায়ার, কাওয়ার্ড। একটা সত্যি কথা যে বলতে পারে না, সে করবে বিপ্লব! কাপুরুষ দখল করবে রাষ্ট্র ক্ষমতা! থু থু...'

সম্ভবত লোকটা পান খায়, আর সুগন্ধি জর্দা, কারণ ছিটকানো থুতুতেই তা অনুমেয়। আমার গা টা ঘুলিয়ে উঠল। তবু হাত পা শক্ত করে, ঝড়ের দাপটের মধ্য দিয়ে কাঁচা উঠোনের কাদা মাড়িয়ে, মায়ের হাতের স্পর্শে, নতুন পাকা ঘরের দিকে এগিয়ে বললাম।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার সামনের চেয়ারটা শূন্য। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভিতরটাও শূন্য বোধ হলো। অবসাদের নিঝুমতায় যেন ডুবে গেলাম। কিন্তু শীতবোধ আর একটুও ছিল না। এবং হঠাৎ আমার হাসি পেতে লাগল গর্জিত গালাগালগুলোর কথা মনে করে, লায়ার, কাওয়ার্ড! তবু লোকটা অশ্চর্যজনকভাবেই, সন্দেহজনক বিস্ময়করভাবেই আমার পার্টিজীবনের গোপন খবরগুলো জেনেছে যা দিয়ে ভিতরের সত্যটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। ভিতরের সত্য যা আপেক্ষিক অথচ ধ্রুব, যা কোনো নিয়মাধীন নয় অথচ একটা সুকঠিন নিয়মের প্রেমে আবদ্ধ, যা অথৈ, ছোঁয়া যায় না।

কতক্ষণ একলা বসেছিলাম জানি না। আমার ভিতরে ভিতরে একটা প্রতীক্ষা ছিল সেই লোকটা আবার আসবে।

দরজাটা খুলে গেল। আবার—। না, একজন য়ুনিফর্ম পরা লোক। আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

উঠে আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার চললাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্য দিকে গেল লোকটা। পুরনো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আবার একটা সুন্দর সাজানো বাগানে এসে পড়লাম রঙিন ফুল সবুজ ঘাস খোলা আকাশ শীতের রোদ সব মিলিয়ে আমার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি টনটনিয়ে উঠল। জল এসে পড়ল।

বাঁ দিকের উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে আমি লোকটাকে অনুসরণ করছিলাম। সব দিকেই

পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরে কাঁটাতারের ফেন্সিং, তাতে লতা জড়ানো। সবুজ ঘন লতায় কাঁটাতার ঢাকা। সত্যি, শিল্পীদের দোষ নেই, যারা কাঁটাতারকে বইয়ের মলাটে ফুলের মতো আঁকে। ওতে বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত থাকলে লতাগুলো বোধহয় মরে যেত।...কিন্তু রোদটা কি নিবিড় সুখের মতো গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতরে ঢুকছে। চাদরটা আলগা করে দিলাম, বুকে যদি একটু রোদ লাগে। আর এই সবুজ, এই ফুল, হোক পাঁচিলে ঘেরা (পাঁচিল কোথায় নেই ? একমাত্র সেই অথৈ সত্য ছাড়া, যে আমার অস্তিত্ব, যার নিষেধের কোনো সীমা নেই, অথচ সীমাহীন স্বাধীন), তবু তাদের চরিত্র বদলায় নি। তারা যা, তাই আছে।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়ালাম। বাগানটা শেষ, পাঁচিলটা কাছেই দেখলাম, বাঁ দিকের পাঁচিলের পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠে একটা গলি চলে গিয়েছে। বাইরে থেকে সহসা কিছুই বোঝা যায় না। সরু গলি, অন্ধকার, কিন্তু মাথা-ঢাকা ছাদে আলো জ্বলছে। দুটো ধাপের ওপরেই গলির মুখে লোহার গরাদের দরজা। দরজায় একজন বন্দুকধারী সান্ত্রী। আমার সঙ্গের লোকটির নির্দেশে সান্ত্রী লোহার গরাদ খুলে দিল। লোকটি আমাকে ভিতরে অনুসরণ করতে বলল। আমি ঢুকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র দিন অন্তর্হিত, আমি যেন রাত্রির বুকে প্রবেশ করলাম।

বাঁ দিকে দেয়াল, মাথাটা ছাদ-আঁটা, ডান দিকে লোহার গরাদ দেওয়া পর পর কয়েকটা খাঁচার মতো ঘর। একেবারে শেষ ঘরটার কাছে গিয়ে আমার সঙ্গের লোকটি দাঁড়াল। সান্ত্রী আমাকে ডিঙিয়ে খাঁচার গরাদের তালা খুলল।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল আর গলিটার শেষ দেয়ালের গায়ে জলভরা চৌবাচ্চা দেখিয়ে বলল, 'এখানে চান করে নিতে হবে। সেলের মধ্যে খাবার দিয়ে যাবে। একটা সিগারেট যদি ইচ্ছে হয়—'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল সে। সেলে ঢোকবার আগেই ধূমপান করে নিতে হবে। বুঝলাম, এগুলো এস. বি. সেল। সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে, আমি পিছন ফিরে গলির বাগানের দিকে তাকালাম। এখনো সবুজ, এখনো সিগারেটের নিবিড় নেশা। ভেবেছিলাম, লালবাজারের লক-আপ থেকে এস. বি. সেল ভালো হবে। ভালো হবে! কোথায় গেল সেই পাগলটা, সেই উদ্ধত ছেলে-গুলো। ওরা এখানে আসবে না।

মনে হলো, মুহূর্তেই সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সেলের গরাদ খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম। সান্ত্রী তালা বন্ধ করে দিল। তার পর দু-জনেই চলে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল, গভীর নৈঃশব্দ্য।

সামনে দেওয়াল, পিছনে ডাইনে বাঁয়ে দেওয়াল। মাথার ওপরে একটি অকম্পিত স্থির আলো। লোহার খাট, একটা তোশক আর কম্বল। খাটের বাইরে ফুট-তিনেক ঠান্ডা মেঝে। চওড়ায় ফুট-তিনেক, লম্বায় আট কি দশ।

আমি খাটের ওপর বসলাম। কোনো শব্দ হলো না। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম কাত হয়ে। কোনো শব্দ হলো না। হলদে আলোয় তাকিয়ে থাকতে পারছি নে। চোখ বুজলাম। নৈঃশব্দ্য, গভীর গাঢ় নৈঃশব্দ্য আর

অন্ধকার।

এ সবই আমার চেনা, আমার জানা, এই দুয়ারবন্ধ বন্দিত্ব, এই একাকিত্ব, এই নৈঃশব্দ্য, এই অন্ধকার। একমাত্র তফাত, এটা এস. বি. সেল। এসব ঘোচাবার জন্যেই কি একদা ইস্কুল পালাই নি? ছেলেবেলায় এই বন্দিত্ব এই একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যেই কি দুঃসাহসী অবোধ মন নিয়ে ছোট ডিঙিতে করে বর্ষার দুরন্ত নদীর বুকে ভেসে যাই নি? তার পরে সমিতিতে অলকাদের সঙ্গে মিশতে যাই নি? তার পরে রেবাকে বিয়ে করি নি? তার পরে বিপ্লবী পার্টিতে আসি নি? তার পরে নীরার কাছে ছুটে যাই নি? সারাজীবন ধরে এই বোধই কি রূপান্তরের পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না?

আরো কি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে না? এই বোধই কি সমষ্টির সঙ্গে জীবনকে ভাগ করে ভোগ করার বাসনাকে বাধ্য করে নি? যারা কোথাও ঠেকে গিয়েছে তাদের বোধ একটা কোথাও নিঃশেষে মুছেছে। আর মিথ্যুকেরা উত্তরণের কথা বলে, কারণ একাকিত্ব কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না, বন্দিত্ব কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

এই এস. বি. সেলের থেকে সেই একাকিত্ব কি আরো ভীষণ নয়? আরো ভয়ংকর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক নয়? এবং আরো সুন্দর ও মধুর? জ্ঞান মুক্তি ও মৈত্রীর নতুন নতুন চাবিকাঠির সন্ধান যে দিয়েছে। এই তো আমার জপ, আমার আহ্নিকের আচমন।

লোহার গরাদ ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি তাকালাম। সান্ত্রী। সে আমাকে নাইতে বলল। তালা খুলে দিল। স্নান করার দরকার ছিল কিন্তু কোনো সরঞ্জামই ছিল না। অথচ নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন শুকিয়ে ড্যালা পাকিয়ে রয়েছে। স্নান না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া গলির বাইরে সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখতে পাব স্নান করতে গেলে। তাই অগত্যা নগ্ন হয়ে চৌবাচ্চার কাছে গেলাম। জল তোলবার কোনো পাত্র ছিল না। সান্ত্রী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আর খইনি বানাতে লাগল। আমি সেই দিকেই মুখ করে আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়ে মাথায় ঢালতে লাগলাম। নইলে বাইরেটা, দিনটা দেখা যেত না। দৈহিক প্রশান্তি আমার দেহে সংগীত করতে লাগল যেন।

আবার গরাদ বন্ধ। গা শুকোবার আগেই জামাকাপড় পরে নিলাম। তার পরে একটা লোক এসে গরাদের নিচের কয়েক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে খাবার দিয়ে গেল। মাছ ভাত দই। বোধহয় কাছেই কোনো হোটেলের সঙ্গে অফিসের ব্যবস্থা আছে। এখানে যে-ক'জন বন্দী থাকতে পারে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল এই গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কী-একটা শব্দের প্রতীক্ষা যেন আমার ভিতরে মাথা কুটছে। কী সেটা? গরাদের তালা খোলার শব্দ? আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকতে আসবে তাই?

না। কেউ আর এদিকে অনেকক্ষণ এল না। আমি উঠে পায়চারি করতে যেতেই থমকে গেলাম। বাজছে, সেই শব্দটা বাজছে। যার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি, সেই

ঝিঁঝি ডাকছে। মানুষ যাই বলুক নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে বিশ্বনিরন্তরতার একটা সম্পর্ক সে খোঁজে।

পরদিন আমাকে সেই বাড়িতে দোতলার সেই ঘরটায় ডেকে নিয়ে গেল। সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চারজন জিজ্ঞাসাবাদ করল। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দু-জন।
তার পরের দিন একই নিয়মে আটজন।
তারও পরের দিন, সারাদিন কেউ আমাকে ডাকতে এল না। অবাক হলাম, ছুটিও অনুভব করলাম। সন্ধ্যা সাতটাতেই রাত্রের খাবার দিয়ে দেয়। আমি তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু গরাদের তালা খুলতে দেখে অবাক হলাম। কারণ খাবার তলা দিয়েই দেয়। তালা খোলার পর দেখলাম একজন য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার, কোমরবন্ধে রিভলভার। বাইরের থেকেই তর্জনী নেড়ে আমাকে মোটা গলায় ডাকল, 'আসুন।'
আমি চাদরটা জড়িয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। গলির বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার নেমেছে। বাগানে কোনো আলো নেই। সবুজ লন বা ফুল বা কেয়ারি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সেই পুরনো দোতলা বাড়িটাকে অন্ধকারই মনে হলো। রোজকার দেখা বাড়িটা এখন যেন স্তব্ধ দৈত্যপুরীর মতো মনে হলো।
দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটায় স্তিমিত আলো দেখতে পেলাম। অফিসারকে অনুসরণ করে আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। সিঁড়িতেও তেমনি স্তিমিত আলো, নিজের ছায়াতেই অন্ধকার লাগে। ওপরের আলোও সেই-রকম। এবং সেই একই ঘরের মধ্যে আমাকে ঢুকতে বলা হলো। রাত্রে আমি কখনো এই ঘরে ঢুকি নি। দেখলাম এই ঘরের আলো একটু জোরালো। আমাকে বসতে বলা হলো। বসলাম। অফিসার দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
জিজ্ঞাসাবাদ! নতুন পদ্ধতি। এই কথা আমার মনে হলো। কিন্তু আমার শীত করছে না একটুও। আমি প্রস্তুত হবার জন্যে বসলাম।
দরজা খুলে গেল। দেখেই চিনতে পারলাম সেই লোক। একটা কম্বল তার হাতে আর কম্বলের মধ্যে একটা-কিছু, মোটা ডান্ডা হতে পারে, সবসুদ্ধই সে টেবিলের ওপর রাখল। ডান হাতে সেই ফাইল, রিপোর্টস। এ সেই লোক যাকে আমি প্রথম দিন একটা ঘর থেকে রেগে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, যে-ঘরের মধ্যে একজনকে হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।
পরমুহূর্তেই লোকটা আমার চোখে হারিয়ে গেল। অনেক দৃশ্য ও স্বর আমার দৃষ্টি ও শ্রবণকে ঘিরে ধরল। এবং অ্যাকশন কমিটির শেষ আহ্বানের দৃশ্য ও ঘটনা আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কখনো এক জায়গায় বারে বারে দেখা করে না। সেই অন্য জায়গা। কমিটির সকলের চোখেই দেখলাম নিষ্ঠুর ক্রূর বিদ্রূপের হাসি।
মিহিরের হাসিটা প্রকৃতই নায়কোচিত। চেহারাটিও। আমি যদি ওকে না চিনতাম

তবে সেদিনের মূর্তি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতাম। একাধারে বিজয়ী যোদ্ধা ও দার্শনিকের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। অথচ করুণা ও দয়া দেখাবার অঙ্গীকারও রয়েছে যেন চোখের হাসিতে।

ওর হাতে একটা চিঠি ছিল। বলল, 'আজ আমি শুধু এই চিঠিটাই পড়ব, তার পরে আপনার যা বলবার থাকে বলবেন।'

আমার মনে হলো চিঠিটা ধ্রুব লিখেছে, সে স্বীকারোক্তি করেছে আমার সাহায্যের কথা। দেখলাম, সকলের চোখগুলোই বিদ্যুৎঝলকে আমাকে যেন তড়িতাহত করতে চাইছে। কিন্তু যদি ধ্রুব লিখেই থাকে—

মিহির বলল, 'পড়ছি।' বলে সে পড়তে আরম্ভ করল :

মাননীয়েষু—

মিহিরবাবু, একটু ভেবে আপনাকে সব সত্যিকথা জানাতে পারব কিনা বলেছিলাম। যদিও আপনাকে আমি আগে কখনো দেখি নি, শুনেছি মাত্র আপনার কথা। আপনাদের পার্টি সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। একমাত্র অনলের (আমার নাম) মুখেই যা শুনেছি। সে একজন বিশেষ কর্মী তাও জানি। আপনার সঙ্গে রেবাদিকে (আমার স্ত্রী) দেখে অবাক হয়েছিলাম ; ভয় পেয়েছিলাম, রেবাদি বোধহয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন।

যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছি। পার্টির প্রতি, তার বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাকে আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি অনল ভুল করেছে। সে আমাকে ভালোবাসে, তাই কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ধ্রুবর মতো লোককে ক্ষমা করা যায় না। পার্টির, বিপ্লবের এবং অনলের মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে আমি তাই জানাচ্ছি অনল সত্যি ধ্রুবকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে অনল নিজেই সেকথা বলেছে। আমার সঙ্গে তার সব কথাই হয়। আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না কার আশ্রয়ে ধ্রুবকে ও পাঠিয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদে কোনো বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছে এই পর্যন্ত মনে আছে। অনল ধ্রুবকে অনেকগুলো টাকাও দিয়েছে। এবং একদিন পার্টির এই সন্ত্রাসবাদী নীতির পরিবর্তন হবে অনল এই বিশ্বাসেই ধ্রুবকে আবার ফিরিয়ে আনবে বলেছে।

আপনার কথায় আমার সম্যক উপলব্ধি হয়েছে অনলকে আমার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি—

নীরা

নীরা, নীরা লিখেছে। চিঠিটা আমার হাতে নেবার দরকার ছিল না। ওই কাগজ এবং হাতের লেখা আমার রক্তের সঙ্গে পরিচিত।

চিঠিটা পড়ার পর অ্যাকশন কমিটি নিষ্পলক তীক্ষ্ম চোখে তাকাল। মিহির হেসে বলল, 'বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

বোধহয় বজ্রপাত হলেও ওরা এত চমকাত না। মিহির বলে উঠল, আপনি নীরাকেও অস্বীকার করছেন ? সে আপনার—

আমি চুপ করে রইলাম। আর আমার প্রেমে আদুরে হয়ে ওঠা সেই মুখখানি মনে পড়ল।

মিহির গর্জে উঠল, আপনি নীরাকে এসব বলেন নি?'

'না।'

'তাহলে নীরাও মিথ্যে বলছে?'

'তাই দেখছি।'

মিহিরের 'লায়ার' চিৎকারটা আমার কানে বেজে ওঠবার আগেই টেবিলের ওপর কম্বলটা নড়ে উঠল, ভিতরের ডান্ডাসহ সেটা একটা মোটা থাবায় উঠল এবং মোটা গোঙানো স্বরের কী-একটা কথার সঙ্গে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কী শুনতে পেলাম বুঝলাম না, খালি বললাম, 'আমি জানি না।'

তারপর···

শহীদের মা

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হলো, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণারমা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিঙিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসি সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। সেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে

একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়িতে আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে, এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মতো। তার দুদিন আগে, আঠারো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচে নি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।' উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবল্ ধ্বনি দেয় নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল, জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন।'...কিন্তু বিমলা আর ভালো করে কাঁদতে পারেন নি। ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরি হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোনো দলের সভা, বাদলের না। সেখান

থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিস এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দু দিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের ষোলটা ইঁট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'...ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আচ্ছন্নের মতোই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। কৃপা দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল, তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনো কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমধ্যেই ওই কথাটা বলেছেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে

পাওয়া যাবে না।'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেন নি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। কৃপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা-তেল-সাবান, চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথাই নেই।

বিমলা জবাগাছের গা ঘেঁষে ভাঙা বেদীর দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিষ্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে উপরঝাপ্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনোরকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপিচুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ' সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হতো না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে।

কিন্তু তার শেষ গোঙানির সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত, বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি, আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটে নি। ছোটখাটো এক-আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে প্রথম গম্ভীরস্বরে কেঁদে উঠেছিল, ওঁয়া ওঁয়া।

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।

মাতৃমুখী। বিমলা তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে হোক, নাড়ি ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।

বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগৎ ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এলো।' জগৎ-সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈথৈ করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপটপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে, মাস্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথা মনে পড়েছিল। অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলা-ই জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভালো থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতি ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতী মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় করার কিছুই নেই। ভালোভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাকপক্ষীতেও টের পায় নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে, আশেপাশে কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায় নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়? কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে

আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুরমা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেইরকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন? বড় হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারে নি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল!

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। আঁতুড় মানতে চায় নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল, বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেন নি। হারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিলেন, 'হুম্।' তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মতো হয় নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিলেন, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিলেন। বিমলা একটু গর্ব বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখে নি।

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়ে-

ছিলেন। নামটা তখনই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবাগাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর, অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে! তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল।'

'মা! ও মা!'

কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে, বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি, ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল-দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট্ট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হতো না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগেছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হতো। হরপ্রসাদও শাসন করতেন। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন যুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'একফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতেন। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে

পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে। কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতেন আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতেন। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতেন। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসে নি। পুরুষমানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না। বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদ বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক বাইরে বাইরের মতো, সংসারে সংসারের মতো। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে, গরীব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে বাদল যত বড় হয়ে উঠতে লাগল সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সঙ্গ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সেসব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগৎ খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধুলো ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেন নি। বরং মনে হয়েছে, এরকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে কৃপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছে শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। কৃপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব রাজনীতির নামে গুন্ডামি। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলেছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজে কর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হতো, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হতো না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠতেন। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতেন। কৃপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে

চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না!'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপর খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওঁর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু শুনলে সেইরকমই মনে হতো। কেবল কৃপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয় নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে, আর বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে—ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তাই বুঝি ছোড়দার মতো হবি!'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলতো না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানবো।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাস নি। দেখছিস্ না, বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। কৃপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড় বয়সে কোনো সন্তান তাঁকে হারাতে হয় নি। এমন ভারী রোগও কারোর হয় নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করাবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলের বিছানার সামনে বসে থেকেছেন।

তখন তো বাদল কোনো পার্টি করে না। করলে কী চেহারা হতো, কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায় নি। বোধহয় দাঁড়াতে পারে নি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে

কেউ একটা কথা বলে নি। তিনিও বলেন নি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কী হতো কে জানে। শ্মশানযাত্রার মতোই হয়তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে অ্যাঁ? শুনছ।'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল, হরপ্রসাদ কেউ-ই কাজে যায় নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল, তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো, ওকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক, তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেইরকম হতো। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কান্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেন নি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মতো স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মতো। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাকে দেয় নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল, কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটে পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও-পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এলো, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে

যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয় নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েন নি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছেন, তেমনি করেই বাদলকে বকেছেন, ধমকেছেন। বলেছেন, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিলেন, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছেন, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুন্ডা বদমাইস লোচ্চা ছাড়া ও-পার্টিতে কোনো ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীরভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মতো গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলে নি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ব বোধ করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দুরকম কথা জানতেন না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিলেন, তেমনিভাবেই বাদলকে বলেছিলেন, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনো ভালো লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয় নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিলেন, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে…।' এমনি অনেক কথা বলেছিলেন। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠান্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেইরকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষপর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষপর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবিদাবি খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি-টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি-টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারবে না।'
বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।'
বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'
মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলেছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'
কিন্তু বাদলের সে-কথা টেকে নি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে, বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমতো পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।
প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোন্‌দিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'
বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'
'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে!'
বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'
কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'
সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন একরকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'
বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পার না? তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'
হরপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি ওসব বুঝবে না। আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মতো গুন্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে,

ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'
বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'
বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, 'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্‌কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে।'
বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছেন। কৃপাল দয়ালের কথাতেও বলেছেন, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই? পার্টি কি তার ওপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেন নি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা গড়তে পারতো না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।
বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'
বাদল বলেছে, 'বিপদ-আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে, আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে এলে, আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'
বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্‌?'
বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'
'কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারিস না?'
'বাবা দাদারা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল-মিশ হবে না।' একটু চুপ করে থেকে, আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'
বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েন নি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'
বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'
বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেন নি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি

কথা বলতো না। কলের পুতুলের মতো সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।
'মা। মা কোথায় গেলে?'
এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেন নি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি ছাটের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। জবাগাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে, বাদলের ওই আঁতুড়ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে।
বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারে নি। পুলিস যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারে নি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করে নি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।
যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন্ পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে? তা ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।
বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছেন। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।
'মা, ও মা।'
'মা কোথায় গেলে?'
'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে?'
বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে।

বৃষ্টির ছাটে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'
কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'
'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?'
'না তো। সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল তোর মা?'
'কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে, কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নাবান্না কিছু হয় নি।'
কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কি রে। তোর মায়ের তো এরকম কখনো হয় না। দ্যাখ্ খুঁজে, কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'
কোথাও যান নি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল, তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসে নি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে। বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।
বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।
'বড়বৌ!'
হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তাঁর ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড়বৌ বলেই ডাকা হতো। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাকে ওই নামে ডাকেন। বিমলা কোনো জবাব দিলেন না।
হরপ্রসাদ বললেন, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'
সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন্ ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে, ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে, বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।
হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ তিনি বিমলার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বলেই চলেছেন, 'রান্নাবান্না কিছু কর নি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে

গেছে। কী ব্যাপার তোমার ?'
হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবেন না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।
হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।
কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ ?'
দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ?'
সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।
হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'
বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'
তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করো নি, আমরা খাব কী ?'
বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'
তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী করব এখন ?'
বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'
অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণি-মনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।
তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।
বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'

সমুদ্র

সেই রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি। বা বলা যায় আমি ঘুমোতে চাইনি। যেন দু-তিনবার আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি। তাতে ফল হয়েছে। আর ঘুম আসেনি। জেগে থেকে রাত্রির ভয়ংকর শব্দ শুনেছি, অন্ধকারের গর্জন। যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে একটা মেঘ দূরে কোথাও মাটির কাছে নেমে এসে সারাক্ষণ গুরগুর করে ডাকছিল। কান পেতে গভীর গম্ভীর শব্দটা শুনেছি। বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হয়তো সেই শব্দ শুনতে আমি জেগে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরী করছে ; ঢালাই গড়াইয়ের কাজ চলছে ; বা অদৃশ্য কোন শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙে দিচ্ছে—দূর থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙতে ভাঙতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল ; আবার আশ্চর্য এক সুখ একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। নতুন সৃষ্টির শব্দ শুনতে, নতুন ধ্বংসের গর্জন শুনতে কার না ভাল লাগে। কষ্ট হচ্ছিল, হেনার জন্য। বেচারা সেই শব্দ শুনছে না। অথবা যদি সন্ধ্যার দিকে শুনে থাকে বুঝতে পারেনি এই শব্দ কেন, কোথায়। না হলে তখন আলোর নীচে বসে ভাত খেতে খেতে দুবার চমকে উঠে ও আমার মুখের দিকে তাকাবে কেন? তারপর এক সময় ওর চোখের ঝিলিক নিভে গেছে, ভুরুর বাঁক সোজা হয়ে গেছে ; হেসে বলছিল : 'প্লেন!' উত্তর দিইনি প্রশ্নের। অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে ওর থুতনির রেখা চোয়ালের ঢালুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল হেনাকে এখানে না আনলেই ভাল হত। বেচারাকে এখন কত ছোট দেখাচ্ছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও। হাত-পা গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেছে। তারপর ওকে ভুলে গেলাম। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম এখানে এসে হেনাকে আমি কত সহজে ভুলে থাকতে পারছি। এখানে, রাত দুটো যখন, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভাবলাম, স্ত্রীকে একলা ঘুমোতে দিয়ে কেমন সুড়সুড় করে বিছানা ছেড়ে আমি জানালার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি। অন্ধকার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দূরের শব্দ শুনছি কাছের শব্দ শুনছি। ভাত খেতে খেতে হেনা বলছিল :

'বিচ্ছিরি বাতাস! ঘরের পিছনে বুঝি ঝাউগাছ আছে। তাই এত সোঁ সোঁ।' দ্বিতীয়বার ওকে অনুকম্পা করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, মনে মনে বললাম, এমন চট করে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি জেগে থেকে দূর-সমুদ্রের গভীর নিস্বন, নিকট-সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস শুনব। আমরা যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল। বলতে কি প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে আমি বড—অনেক বড; সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই; তুমি ছোট—অনেক ছোট; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না। প্লেনের শব্দ বাতাসের সোঁ সোঁ—তা বটে! কেবল কান পেতে শোনা নয়, জানালার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আমি বিরাটের আশ্চর্য রূপ দেখে নিলাম। তারাখচিত আকাশের নীচে দিগন্তবিসারী অন্ধকারের সে কী ভয়ংকর আলোড়ন! দূরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না, দেখা যায় না—এখানে, তীরের কাছে, না আরো দূরে, যেন স্পন্দমান কম্পমান অন্ধকার ফেটে ফেটে রাশি রাশি ফুলের স্তবক হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসতে চাইছে। কিন্তু আসে কি? আসে না। আমাদের কাছে আসবার আগে তারা মিলিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন মানুষকে ভয়, অভিশপ্ত মানুষের নিশ্বাসকে ভয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে অগাধ উত্তাল ফেনোচ্ছল ভয়ংকর সুন্দরকে প্রণাম করলাম। সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোসের মতো দেখাচ্ছিল, ও যে মানুষ—কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোনো ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরের এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোসের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রবাস সরিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছি, কান পেতে থেকেছি! দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র! কত মূঢ় উচ্ছ্বাস বিবর্ণ ইচ্ছার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখে জল এল। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে কে জানতো। ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল। ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জেলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম—দেখতাম হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে কি দুঃখের। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সেসব কিছুই করলাম না। বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাঁটকাবার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রিয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে

ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে; সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে—একটা এল ভাঙল, আবার একটা; আবার, আবার, আবার···কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারে। মনে পড়ল, এই সেই অশান্ত উদ্দাম—স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যেতে রামচন্দ্র নিষ্ঠুর তীর মেরে একে শাসন করতে চেয়েছিল। সীতা-উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু শান্তি পেয়েছিল কি শ্রীরাম? কেন পায়নি, কোথা থেকে অভিশাপ এসে লাগল সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে? বার বার মনে হতে লাগল প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের। হেনার জন্য এমন কাজ করতে পারব কি আমি? শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি থাকলেও আমি এ-কাজ করব না। বরং ওই রুদ্রের কাছে নিজেকে কীটাণুকীট—প্রায় একটা বুদ্বুদের মতো ক্ষীণায়ু কল্পনা করতে ভাল লাগছিল। ইচ্ছা করছিল, ঘরের বাইরে ওই বালির বিছানায় একটা ঝিনুক হয়ে আমি অনন্ত-কাল শুয়ে থাকি। হেনা নেই, সংসারে আর কেউ নেই। যেন এমনও ইচ্ছা করছিল, সকাল হতে সরাসরি ওকে জানিয়ে দেব তুমি ফিরে যাও, আমি এখানে থেকে যাব। বলব, তুমি যতক্ষণ কাছে আছ আমার সমুদ্রদর্শন হবে না, সাগরে অবগাহন অসম্পূর্ণ থাকবে। তোমার উপস্থিতি পীড়াদায়ক, একটা অতিরিক্ত বোঝা-বিশেষ। তা তো বটেই, সমুদ্র থেকে হেনা আমার কাছে বেশি প্রিয় না, আমি রাম নই। শুনে হেনা কী বলবে, অভিমানে মুখ কালো হয়ে যাবে—না কি ঠাট্টা ভেবে উচ্চকিত হেসে উঠবে? চিন্তা করতে পর্যন্ত সে-রাত্রে আমার খারাপ লাগছিল।

পরদিন সকাল হতে আবার মামার দর্শন পাওয়া গেল। চোখে সাংঘাতিক পুরু লেন্স, গায়ে আধময়লা খদ্দরের হাফ-শার্ট, পায়ে টায়ারের মোটা চপ্পল। মানুষটাকে দেখেই মনে হল রাত্রে ঘুমোয়নি। চোখের কোলে কালি, কপালে অসংখ্য রেখা, হাঁটা ও কথা বলার মধ্যে ক্লান্তি। আমাদের দুজনকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসছে; মনে হল দাঁতের মাথাগুলি এসিডে খেয়ে ফেলেছে, তার ওপর পান দোক্তার কালো লালচে ছোপ। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, অল্পসল্প যা আছে, মাস ছয়েকের মধ্যে সে-কটাও অদৃশ্য হবে অনুমান করতে কষ্ট হল না। মানুষ উপোস থাকলে বা আধপেটা খেয়ে খেয়ে দিন কাটালে যে চেহারা ধরে মামাকে দেখে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয়। ভাতের অভাব মামার নেই, একটা হোটেলের কর্মকর্তা সে—হয়তো অসুখবিসুখ কিছু থাকতে পারে চিন্তা করলাম। আর এদিকে আমার সব দুশ্চিন্তা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে যেন

মামা কাছে এসে হেসে আমার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিল : 'কি মশাই, কেমন ছিলেন, রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন ?'

'চমৎকার ঘর হয়েছে আমাদের—আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলা চোখ বুজেছি আর এই সকাল হতে চোখ খুললাম।' হাতের বটুয়া দুলিয়ে হেনা হাসছিল। আমি নীরব। যেন হেনার দিকে চোখ পড়তে মামা একটা হোঁচট খেল। অসম্ভব না। কাল গাড়ির রাস্তায় আসতে আসতে বেশবাস প্রসাধনের দিকে নজর দেবার সময় ও সুযোগ ছিল না—বরং ধোঁয়ায় কালিতে কাপড়চোপড় ময়লা হবে আশঙ্কা করে হেনা আধময়লা শাড়ি ও ব্লাউজ পড়ে এখানে এসে নেমেছিল। বলতে কি, ও যখন রিক্সা থেকে নেমে মামাদের হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ওর আলুথালু চুল ও শুকনো মুখখানা দেখে আমার মনে হচ্ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে ; না কি সেই চেহারা ওর আসল চেহারা সেই বয়স ওর আসল বয়স ধরে নিয়ে মামা এখন কচিকাঁচামুখ সুবেশিনী হেনাকে দেখে এমন থমকে গেল। যেন ওর কাজল-বুলানো চোখের উজ্জ্বল ধারালো দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মামা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরাল। কাজেই আমাকে মুখ খুলতে হল—জানি না, হয়তো অপরিচ্ছন্ন চেহারার রুগ্নদেহ ছোটখাটো মানুষটাকে খুশী করতে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, 'আমি মোটেই ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন, কেন মশাই ঘুম হল না ?' মামা আমার চোখ দেখল। 'এমন ভাল ঘর দেখে দিলাম—একেবারে সমুদ্রের ওপর !'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। অপাঙ্গে হেনাকে দেখলাম। তারপর, যেন হেনা শুনতে না পায় এমন নীচু গলায় বললাম, 'ঢেউ—ঢেউয়ের শব্দে ঘুম হয়নি !' বস্তুত আমার ও মামার কথা শুনতে হেনা এদিকে তাকিয়ে নেই, একটু দূরে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর ঝিনুক ও শঙ্খের দোকান নিয়ে বসেছে লোকটা—একটু একটু করে সেদিকে এগোচ্ছে ও। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবং অবাক হলাম মামার গলার স্বরটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'সমুদ্রের শব্দে ঘুম হয়নি, কেমন না ?' পুরু লেন্সের ওপারে দৃষ্টিটা ঝিকিয়ে তুলে মামা অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমিও রাত্রে ঘুমোতে পারি না।'

'কোন দিন না ?'

'কুড়ি বছর !'

চুপ থেকে মানুষটার চোখের কোলের কালি, গালের গর্ত, কপালের কুঁচকানো চামড়া, এমনকি হাত-পায়ের মোটা শিরাগুলি পর্যন্ত নতুন করে দেখলাম।

'অবাক হয়ে গেলেন !' মামার ভাঙাচুরা ময়লা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল, বেশ বড় করে হেসে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে বলল, 'কুড়ি বছর রাত জেগে জলের গুরু-

ওর ঢেউএর আছাড় শুনে আসছি।'

হেনা বটুয়া খুলে টাকা বার করছে। যেন এর মধ্যেই দুটো বড় শঙ্খ ও কিছু ঝিনুক শামুক কিনে ফেলেছে ও।

'যাক গে, আর কোন কষ্ট হয়নি তো।'

'না—' মৃদু গলায় বললাম, 'আর ঘুম হয়নি বলে যে কষ্ট হচ্ছিল বা এখন হচ্ছে তাও না। ভাল লাগছিল শব্দগুলি শুনতে। আমি ইচ্ছা করে জেগে ছিলাম।'

'হুঁ।' মামা আর হাসল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেল; পাছে ঘাটের দিকে চোখ ফেরালে আমার স্ত্রীকে দেখতে হয়, তাই সেদিকে না তাকিয়ে ডান দিকের বালির ওপর চোখ রাখল লোকটা, আর কেমন জানি অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'প্রথম প্রথম ইচ্ছা করে জোর করে রাত জাগতে হয়—তারপর আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে থাকে—তখন সমুদ্রের ডাক ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আর তখন…'

শেষের কথা কয়টা বোঝা গেল না। দূরে একটা রিক্সা দাঁড়িয়েছে। বেডিং স্যুটকেশ দেখে মামা টের পেল নতুন যাত্রী। যেন পড়িমরি করে যাত্রী ধরতে সেদিকে ছুটেছে। অবশ্য একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, আবার দেখা হবে। ঘাড় কাত করে আমি হাসলাম। মামা আবার ছুটছে।

'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

'কেন?' অবাক হয়ে হেনার মুখ দেখলাম। হাতের শামুক শঙ্খগুলি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে ও, কিন্তু উৎসাহ নেই এমন ভান করে আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই।

'বাজে লোক, ঐ শাঁখওয়ালা বলছিল; যেমন ওর চেহারা তেমনি চরিত্র।' একটু চুপ থেকে হেনা আবার বলল, 'কেমন বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল তখন।'

'কিন্তু একবার তাকিয়েই তো সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে'—আমার বলতে ইচ্ছা করল, 'তা ছাড়া আমাদের ঘর খুঁজে দিয়েছে যখন লোকটা—কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে।' বললাম না কিছু। আস্তে আস্তে এগোই। হেনা আমার সঙ্গে হাঁটছে হঠাৎ ভুলে থাকতে চাইলাম। এত বড় সাগরবেলায় দাঁড়িয়েও একটি পুরুষের তাকানোর সমালোচনা করতে, তার চরিত্রের নিন্দা করতে হেনার বাধছে না ভেবে মনটা বিষিয়ে উঠল। যা আশঙ্কা করেছিলাম। মেয়েরা কখনই মনের ক্ষুদ্রতা ঢাকতে পারে না। বিরাটের কাছে এসে তোমার কি লাভ হল মেয়ে। দাঁতে দাঁত ঘষে ভিতরের রাগ চেপে রাখলাম। আর, যেন ঈশ্বরের

দয়া, যেন আমার সব বিদ্বেষ রাগ ধুইয়ে দিতে বড় মেঘের টুকরোটা সরে গিয়ে আকাশ মাটি জল সোনার রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল। হাতঘড়ি দেখলাম। দেড়ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগদ্দল পাথর হয়ে মেঘটা পুবাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদ্‌পিণ্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে, আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'আমি স্নান করব না। ভীষণ ভয় করবে জলে নামতে।'

'না-ই বা করলে।' হেনার দিকে মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর করলাম।

'হাঙর-কুমীর কত কী আছে কে জানে!' হেনা বিড়বিড় করছিল। আমি নীরব। দূরে কালো কালো ফুটকি। এই ডুবে যাচ্ছে এই ভেসে উঠছে। 'ডিঙি নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে, তাই না?' হেনার অবাক চোখ জোড়া দেখতে আমার একটুও ইচ্ছা করছিল না। একটু থেমে থেকে পরে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে কিন্তু তোমার মামার হোটেলে সমুদ্রের মাছ খেতে দেয়নি।'

'না, ওটা চিল্কার চিংড়ি ছিল।' গম্ভীর গলায় বললাম। 'সমুদ্রের মাছ খেয়ে কাজ নেই, পেটের অসুখ করবে।'

'ঠাট্টা করছ!' হেনা হাসল। তার বটুয়ার ভিতর ঝিনুকগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠল। 'অথচ সবাই সমুদ্রের মাছ খেতে চায়, খুব মিষ্টি।' ওর গলায় আদুরে সুর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন গলায় বললাম, 'তা সমুদ্রে নেমে স্নান করলেও তো ভাল লাগে। কিন্তু হাঙর-কুমীরের ভয়ে সবাই কি নামতে সাহস পায়।'

হেনা চুপ করে গেল। আহত হল। বিস্তৃত বিস্ফারিত জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করতে পেরে আমার যে কী ভাল লাগছিল। তখন ভিড় বেড়ে গেছে জলের কিনারে। হাঁটু জলে, কোমর জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে—ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর হুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে; বেগোচ্ছল বিশাল ঢেউ হা-হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ

বুজল আর সেই মুহূর্তে নুলিয়া ওর বেণীসুদ্ধ ছোট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল কি ও, না ঢেউ সরে গেছে—নুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফর্সা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজা সপসপে শায়া ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল—নুলিয়ার হাতের ঝাঁকুনি? ঢেউয়ের একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। ত্রস্ত হাতে শুকনা শাড়ি ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বোধ করি হেনা সেই মুহূর্তে ফিসফিসে গলায় কিছু একটা মন্তব্য করছিল; আমি অন্যদিকে চোখ সরিয়েছি, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম মোটা ভুঁড়ির ভদ্রলোক হাঁটুজলে কেমন ভয়ে ভয়ে একটা ডুব দিয়ে পাকা চুলে একরাশ বালি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে এল। সমুদ্রকে এত ভয়! ভদ্রলোককে চিনলাম। আমাদের কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যারিস্টার যেন। ডাঙ্গায় তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ; রাস্তার মানুষকে হতচকিত করে দিয়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলে—সমুদ্রের কাছে শিশু, অসহায় শিশু।

'আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

'তাই যাও।'

ঝিনুক খুঁজতে লেগে গেছে ও। শরীর বেঁকিয়ে লম্বা ঘাড় নুইয়ে হেনা বালু খামচাতে খামচাতে এগিয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করি। লবণগন্ধী হাওয়ায় ওর বেণী দুলছে, আঁচল উড়ছে। উড়ুক। চিন্তা করলাম, সমুদ্রের ধারে এসে একবার যার ঝিনুক শামুক কুড়োবার নেশায় পেয়ে বসে, সারাক্ষণ বুঝি তাকে বালুর ওপর চোখ রেখে চলতে হয় ছুটতে হয়; ঢেউয়ের নাচ জলের রং ফেরা তার আর দেখতে হয় না। মন্দ কি! মনে মনে হাসলাম। সমুদ্র অনেক ছোট জিনিস ঠেলে ঠেলে তীরে তুলে দিচ্ছে। যাদের ছোট মন তারা ওসব নিয়ে মেতে থাকুক। হেনা, তোমার জন্য শামুকের খোলস, মাছের কাঁটা, জলের নীচে মরা গাছের শিকড়—কি জলের অন্ধকারে নিহত ভক্ষিত আর কোনো জীবের নখ দাঁত হাড়, যা সমুদ্রের কাছে অপবিত্র উচ্ছিষ্ট অনাবশ্যক। দু-হাতে সব কুড়িয়ে আঁচল ও থলে বোঝাই করে নিয়ে এস। কাল রাত্রির মতো আজ আবার স্বচ্ছ দিনের আলোয় ঝামাপুকুর লেনের মেয়েটিকে অনুকম্পা করতে করতে ওপরে উঠে এলাম।

মামা আমাকে দেখতে পেয়ে চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খর্বকায় মানুষটি। না কি আমাকে এখানে পাবে আশা করে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলতে গেলে প্রায় ঢেউয়ের বাড়ি এসে লাগে এখানে। জলের

এত কাছে আর একটিও চায়ের দোকান নেই বলে কাল দুপুরে হেনাকে নিয়ে এখানে প্রথম চা খেতে ঢুকেছিলাম। দোকানের আটপৌরে চেহারা দেখে হেনা নাক সিঁটকিয়েছিল। অথচ এ-দোকানে না ঢুকলে কাল মামার সঙ্গে পরিচয় হ'ত না। এবং হোটেলে ঘর পাওয়া শক্ত হ'ত।

'কি মশাই, এর মধ্যেই উঠে এলেন?'

হেসে ঘাড় কাত করলাম।

'চায়ের পিপাসা পেয়েছে।'

'তাই বলুন, চা-খোর মানুষের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই।' দোকানে ঢুকে মামা হাঁকডাক শুরু করে দিল: 'কইরে, বাবুকে ভাল করে চা বানিয়ে দে। বসুন।'

একটা বেঞ্চির ওপর আমি বসলাম। মামা পাশে বসল।

'এই চায়ের দোকানও আমার ভাগ্নের।

কথা শুনতে আমি তার চোখের দিকে তাকাই। কোটরগত রাতজাগা চোখ দুটো কুঁচকে মামা মিটিমিটি হাসে।

'হোটেল করার পরামর্শ দিয়েছিলাম আমি। মামার পরামর্শ মতো কাজ করে লাভ হয়েছে কিনা একবার বীরেনকে জিজ্ঞেস করুন না। সাত বছরে দু'খানা বাড়ি কিনেছে বীচের ওপর। তার আগে অবশ্য এই চায়ের দোকান, চামড়ার দোকান ছিল একটা। হরিণ আর সাপের চামড়ার জুতো ব্যাগ তৈরী করে বেচত ব্যাটা। যুদ্ধের সময় চামড়ার টান পড়ে। আসলে পুঁজি কম ছিল মুচির। না হলে তখনই তো ফেঁপে ওঠার সময় গেছে। চার টাকার ব্যাগ চৌদ্দ টাকা, দশ টাকার জুতো বত্রিশ টাকায় বিকিয়েছে। তা ক্যাপিটাল না থাকলে কি দিয়ে কি হবে। দোকান ফেল পড়ল। আমি বীরেনকে বললাম দোকানটা রেখে দিতে—চমৎকার চায়ের দোকান হয়—কিছুতেই শুনবে না কথা, শেষটায় রাজী হল যদিও; কি, এই দোকানই তো ভাগ্নের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। হুঁ, চায়ের দোকানের টাকায় হোটেল—আর হোটেল খুলে সাত বছরের মাথায় বীচের ওপর দু-দুখানা পাকা বাড়ি।'

মামা চুপ করল। চা এসে গেল। আমার জন্য পুরো কাপ, মামার জন্য 'একটুখানি'।

'লিভারটা একেবারে গেছে। চা সহ্য হয় না। দেখলেই অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে, তাই, অই এক চুমুক—আমার কড়া অর্ডার আছে চা চাইলে কখনই এর বেশি দিবিনে।' কাপে চুমুক দিয়ে মামা বলল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম, আজ বড়লোক হয়ে বীরেন আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না; না বলুক, আমি চিরকাল তোমার উপকার করে এসেছি—তোমার ভালটা দেখে এসেছি যখন

আজও করব, করছি, দেখছি—তখন দেখলেন তো, চেঞ্জার এসে নামল আর অমনি খপ্ করে ধরে ফেললাম—দিলাম পাঠিয়ে প্যারাডাইজে।'

হেসে মৃদু গলায় বললাম, 'দেখেছি।' এখন বুঝতে পারলাম সবাই একে 'মামা' ডাকে কেন। হোটেলের মালিকের মামা কাজেই বোর্ডারদেরও মামা—তারপর বুঝি সেই ডাক আস্তে আস্তে এখানকার রিক্সাওয়ালা, মুদি, পান-বিড়ির দোকানের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর স্থির দৃষ্টি মেলে সামনের উত্তাল অশান্ত জল দেখছিলাম, শব্দ শুনছিলাম। 'দূরের সমুদ্র সুন্দর কি কাছের—কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে?'

চমকে উঠলাম। আমার মতো কথা বন্ধ রেখে মামাও হঠাৎ জল দেখছিল। লেন্সের ওপিঠে ফ্যাকাশে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। প্রশ্নটা অতর্কিত। কিন্তু এত ভাল লাগল। মৃদু মৃদু হাসছে রোগা মানুষটা; এবার আমার চোখ দেখছে।

'বলুন, ষোল ঘণ্টার বেশি এখানে কাটিয়ে দিলেন তো। দূরের সমুদ্র টানছে আপনাকে, না বালির ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা ঢেউ—সেগুলো?' চুপ করে রইলাম। যেন নতুন করে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কাল অন্ধকারের সমুদ্র দেখে ঢেউয়ের শব্দ শুনে যেমন হয়েছিল। যেন ঠিক করতে পারছিলাম না, আকাশের কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকা শান্ত গম্ভীর নীল রহস্যে ভরা দূরের সমুদ্রকে আমি বেশি ভালবাসব, কি এখানে তীরের কাছের তরল হাস্যোচ্ছল শুভ্র ফেনবিকীর্ণ খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত মুখর তরঙ্গমালা।

'ঠিক করতে পারছি না।' অসহায়ের মতো মামার দিকে তাকাই।

'তাই বলুন।' মামা তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। 'চট্ করে এর উত্তর দেওয়া যায় না। যারা দেয় তারা না বুঝে বলে। হুঁ—পুরো দু বছর লেগেছিল আমার এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে—হা-হা।'

কিন্তু আমি তার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম সমুদ্র নিয়ে রোগা মানুষটা তা হলে রাতদিনই অনেক কিছু ভাবছে। কুড়ি বছর রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনছে তখন বলছিল না?

'কৈ রে, আর একটুখানি দিবি।' দোকানের প্রৌঢ় কর্মচারীটির দিকে মামাকে সকাতরে তাকাতে দেখে অবশ্য আমার হাসি পেল। লিভারের রুগী এইমাত্র চা খেয়ে আবার চা চাইছে। হাসলাম এবং এ-ও লক্ষ্য করলাম কর্মচারীর চেহারা নিদারুণ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ফিনাইলের ন্যাতা বুলিয়ে সে ওপাশের টেবিলটা মুছছিল। ওখানকার যত মাছি তাড়া খেয়ে আমাদের কাছে চলে এল।

'কি, তুই যেন রাগ করলি নীলাম্বর!'

কর্মচারীর মনের ভাব বুঝে ফেলে মামা গলাটাকে আরো করুণ করে ফেলল। 'দে দে—পয়সা দেব, আমি তোদের ক্ষতি করব না। তোর মনিব দু-বেলা দু-কাপ বরাদ্দ করে দিয়েছে আমার জন্য—কিন্তু অতিরিক্ত যেটা খাচ্ছি তার জন্য কি আমি দাম দিই না।'

হাতের খাতা ফেলে রেখে নীলাম্বর গজগজ করে উঠল। 'আপনার কাছে পয়সা চাইছে কে—আপনার ভাগ্নের দোকান—যত খুশি খেয়ে যান। কিন্তু সময়-অসময় আছে তো—এখন বেলা দশটা বাজে, ধোয়া মোছার কাজ করব কি চা বানাব।'

মামা আমার চোখ দেখল।

'বুঝলেন তো। আসলে বীরেন বারণ করে: চা চাইলেই মামাকে চা দিবি নে। আমি বুঝি—সাতচল্লিশ বছর বয়স হল এমন সাদা কথাটা বুঝব না! বীরেন এখন আমাকে পছন্দ করে না। না করুক। কিন্তু আমি তার উপকারই করে যাব, তার ভালটাই দেখব, আমি হোটেলের যত বোর্ডার যোগাড় করি—'

কথা শেষ হল না। নীলাম্বর ঠক্ করে পেয়ালাটা মামার সামনে রাখল। চা পেয়ে মামার মুখ উজ্জ্বল হল, তৎক্ষণাৎ একটা চুমুক দিয়ে সরস গলায় বলে চলল: 'হ্যাঁ, বলছিলাম, তা বলে তোমার এদিকের বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে বা কি পরিমাণ হার্ড ক্যাশ আছে সে-সবের খোঁজ আমি রাখি না—দরকার নেই আমার রাখবার—আমি ভিখিরি আছি, আছি—আমার যদি ওসবের দিকে নজর থাকত, লোভ থাকত তো নিজে একটা হোটেল বা রেস্টুরেন্ট খুলে বসতে পারতাম না কি? কুড়ি বছর হল এখানে আছি—না, কিছুই আমাকে টানল না, কিছুই আমার দরকার নেই—খাই না খাই, ছেঁড়া কাপড় পরলাম, একবার চিন্তা করি না—' ক্লান্ত শীর্ণ হাতটা সমুদ্রের দিকে তুলে ধরে মানুষটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আছি আর সে আছে—আর কিছু চাই না, দরকার নেই।'

হাসলাম আর কেমন যেন একটু শ্রদ্ধার চোখে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কবি বা দার্শনিকের দিকে মানুষ যেমন তাকায়, রোগা মানুষটাকে আর একবার দেখে নিয়ে তার মতো আমিও স্থির দৃষ্টি মেলে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

দূরের গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র বুকে নিয়ে সমুদ্র এখন অন্য রূপ ধরেছে, যেন কিছু গলানো সীসা, কিছু রূপা হয়ে গিয়ে ওদিকের রাশি রাশি জল গর্জন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। 'লক্ষ্য করেছেন—রূপা ও সীসার সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে।'

মামার দিকে চোখ না ফিরিয়ে আমি ঘাড় কাত করলাম। 'রোদের তেজ যত বাড়ছে তত তার বিক্রম বাড়ছে।' হাসল মামা।

'তাই।' বললাম, 'মেছো ডিঙিগুলো আর দেখছি না।'

'সব উঠে এসেছে।' নাকের একটা শব্দ করে নোংরা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা বুঝি ভিতরের উল্লাস প্রকাশ করল। 'আর কতক্ষণ—এখন ওখানে থাকলে আছাড় মেরে ডিঙি ফাটিয়ে ফালা ফালা করে দেবে না! ওর সঙ্গে কি আর চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলে।'

কথাটা বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। 'চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলবে না বলে তো এখন আর দূরে-কাছে একটা মানুষকে জলে নেমে স্নান করতে দেখছি না।' চিন্তা করলাম। বালুতট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। বালুর ওপর ভেঙে পড়া শব্দের ঝড় খরতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তটের গায়ে আঘাত করেও সে শান্তি পাচ্ছে না, যেন তৎক্ষণাৎ এতটা করে ভালবাসার ফেনা সান্ত্বনার শুভ্র প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এক-একটা ঢেউ জল ছেড়ে কতদূর পর্যন্ত উঠে আসছে। মহতের যা গুণ! কাউকে আঘাত দিতে নেই, হিংসা করতে নেই; প্রেম-ভালবাসা যত পার বিলিয়ে যাও। বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে সাদা সাদা ফেনার আবেগময় চুম্বন এঁকে দিয়ে ঢেউগুলি আবার নেমে যায়।

'আমার মনে হয়, কাছের জল দেখছেন, বালু ছিটানো ঢেউ।'

মনের কথা লোকটা কি করে টের পেল; অবাক হয়ে ঘাড় কাত করে হাসলাম। 'তাই ফেনাগুলো দেখছি—জুঁইফুলের মতো সাদা।'

'এখন কিছুকাল ফেনা দেখেই কাটবে, আর ঘোলা জলের মাতলামি।' মামা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তারপর আর এখানে চোখ থাকবে না, আর ক'দিন পর আপনার চোখ আর কোথাও সরে যাবে।'

দূরের সমুদ্র! আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেননা, পাশের মানুষটির গাঢ় দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল যে, কথা বা হাসি কোনটাই যেন তখন মানাত না। চুপ করে দিগন্তে ধূসর নীল বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর গুরুগুরু শব্দ শুনলাম। না, কেবল দেখা নয়, শোনা নয়, বুকের ভিতর কি যেন হাহাকার করে উঠল। যেন আমার কি নেই, হারিয়ে গেছে—না কি সারা জীবন যা চেয়েছি তা আজও পাইনি বলে হৃদ্‌পিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। আমার কানের কাছে অপরিচ্ছন্ন রেখাসংকুল মুখটা সরিয়ে এনে মামা ফিসফিস করে উঠল, 'আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে—মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে—আজ না, ক'দিন তাকিয়ে থাকুন—তখন আর কোনো কাজকর্ম ভাল লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে, ক্ষুধা কমে যাবে—'

'ভয়ংকর নেশা।' বিড়বিড় করে বললাম। ভাল লাগছিল, আবার ভয়ও করছিল শুনতে। অত্যন্ত আস্তে কথা বলছিলাম দুজন। যেন এসব জোরে

বলতে নেই, অন্যকে শুনতে দিতে নেই।

'কদিন আছেন এখানে ?'

'সাতদিন—তারপর ছুটি ফুরিয়ে যাবে।' মামার চোখের দিকে তাকাই। যেন বিশ্বাস করতে পারল না আমার কথা, এমনভাবে মানুষটা মাথা নাড়ল।

'হুঁ, ওই সাতদিন চৌদ্দদিন হয়ে যাবে—চৌদ্দদিন দেখতে দেখতে মাসে গিয়ে দাঁড়াবে—মাস বছর।' একটু থেমে মামা শেষ করল: 'আমি চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছিলাম সমুদ্র দেখতে—চব্বিশ ঘণ্টা আজ কুড়ি বছর হতে চলল।'

অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। ফ্যালফ্যাল করে মানুষটাকে দেখছিলাম। একদিন চাকরি করত তা হলে, বিয়ে-থা করেছিল কি ? কিন্তু সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হল অবান্তর—শুধু সমুদ্র আর সমুদ্রের ধারের রুগ্ন জীর্ণ মানুষটাই সত্য—মাঝখানে আর কিছু নেই, থাকা উচিত নয়; কি, আমারও কি কাল প্রথম রাত্রেই মনে হয়নি যদি আমিও এই গর্জমান স্পন্দমান ভয়ংকর সুন্দরের সামনে হারিয়ে যাই—হারিয়ে যেতে পারতাম—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মামা। চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন। একটু আগের মুগ্ধ আবিষ্ট ভাবটা কেটে গেছে।

'কি হল ?' আস্তে শুধাই। কথার উত্তর দিচ্ছি না বলে কি রাগ করল, ভাবলাম—

'নাঃ, মশাই, আর দেখা হল না—ভাল লাগছে না।'

'কেন,' জলের দিকে চোখ ফেরাই, তারপর আবার মানুষটার মুখ দেখি। বুঝতে পারি না।

'আপনার ওই জুঁই ফুলের মতো সাদা ফেনার দিকে এখন আর চোখ রাখা যায় না।'

'কেন ?' একটা বড় ঢোক গিললাম। একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

'কেন আবার কি, ফুলের ওপর যদি একটা মাছি বসে থাকে আপনার ভাল লাগবে ?' অসমান ময়লা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা রীতিমত ভেংচি কাটল: 'কতক্ষণ সেই ফুলের দিকে আপনি তাকাবেন বলুন—ঐ, ঐ দেখুন।' আঙুল তুলে মামা আমাকে সামনের রৌদ্রখচিত সুন্দর বালুতট দেখাল; বালুর ওপর ছুটে ছুটে আসছে দুধরং ফেনা; নির্জন শূন্য—আর কেউ নেই ওখানে স্নান করতে, ঢেউ দেখতে; না, আছে—একজন, একটি মেয়ে। মেঘের টুকরো হয়ে সিল্কের আঁচল উড়ছে, বেণী দুলছে। একটা বেশ বড়মতন ফেনা পর পর দুবার ছুটে এসে ওর আলতা ছোপানো পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে। খিলখিল করে হাসছে হেনা। ঢেউ সরে যেতে আবার একটু এগোয়, নুয়ে ঝিনুক কুড়ায়;

এবার আগের চেয়েও বড় হয়ে রামধনুর মতো বেঁকে দ্রুত ধাবমান ফেনার উচ্ছ্বাস ওকে আক্রমণ করে—কিন্তু ছুঁতে পারে না, ছুটে হেনা শুকনা বালুর ওপর উঠে আসে আর খিলখিল করে হাসে। যেন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে ভেঙে কুটিকুটি হতে চাইছে ও।

'ইয়ার্কি করা হচ্ছে, তামাশা চলছে সমুদ্রের সঙ্গে।' আমার দিকে তাকায় না মামা, ওদিকে চোখ রেখে রাগে গজগজ করে। আমি নীরব। লজ্জায় চোখ তুলতে পারছি না। সত্যি তো, এত হাসবার কি আছে, মনে মনে বললাম, সমুদ্র দেখে মানুষ যেখানে বিমূঢ় বিস্মিত সেখানে হেনার এই চাপল্য কত অশোভন, কেমন অসংগত ঠেকছিল! ফুলের গায়ে মাছি—ঢেউয়ের মাথার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার গায়ে আলতা পরা পা ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার তুলে আনা আর ছুটে পিছনে সরে আসা! উপমাটা মনে প্রাণে আমাকে অনুমোদন করতে হল। রাগে দুঃখে ছটফট করছিলাম। আমার মনের অবস্থা মামা বুঝতে পেরেছিল কি, নিশ্চয় চেহারা দেখে অনুমান করতে তার কষ্ট হয়নি, মুখটা কানের কাছে সরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এমন সেজেগুজে জলের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু ঠিক না মশাই,—তখনই আপনাকে আমি বলব ভেবেছিলাম।'

যেন একটা সতর্কবাণী, একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ইশারা। পুরো লেন্সের ওপিঠের বিবর্ণ চোখ দুটোর দিকে আমি একবার মাত্র দৃষ্টি বুলিয়ে আবার জলের দিকে চোখ ফেরালাম। 'চলি, দেখা হবে।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল। একটু স্বস্তিবোধ করলাম বৈকি তখনকার মতো। সিল্কের আঁচল উড়িয়ে বেণী দুলিয়ে সমুদ্রকে সামনে রেখে হেনার ছুটোছুটি, নির্বোধ হাসি আর-একজন না দেখুক, তৃতীয় একটি প্রাণীর চোখে না পড়ুক, মনে মনে আমি তাই চাইছিলাম। একটা বিজাতীয় ক্রোধ, অপরিসীম ঘৃণা বুকের মধ্যে চেপে রেখে চিন্তা করছিলাম রং-করা ঠোঁটের বিচ্ছুরিত হাসির বিদ্রূপ ছড়িয়ে, কাজল বুলানো চোখের কুটিল কটাক্ষ হেনে প্রমত্ত ভয়ংকর সমুদ্রকে অপদস্থ করার ধৃষ্টতা চিরদিনের মতো থামিয়ে দিতে হেনাকে কী শিক্ষা দেওয়া যায়!

'বুঝলেন মশাই, সুবিধের লোক নয়—ওর সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন।' নীলাম্বর। মামা দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে টেবিলের কাপ সরাতে লোকটা এসে পাশে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে ওর চোখ দেখি।

'কে, কার কথা বলছ?' প্রশ্ন করতে করতে অবশ্য বুঝে গেলাম কর্মচারীটির এই আক্রোশ কার উপর। যখন-তখন চা করে দেওয়ার দুঃখ সে কিছুতেই ভুলতে পারে না নিশ্চয়। অল্প হাসলাম।

'কেন, আমার তো মনে হয় বেশ ভাল লোক, দিনের বেলা সমুদ্র দেখে আর

রাত জেগে ঢেউয়ের শব্দ শোনে—ওই তো কাজ ওর।'

'পাজী মশাই, মহাপাজী—বীরেনবাবু ভালমানুষ বলে দু'বেলা দু'মুঠ ভাত দেয়—অন্য লোক হলে ওকে ঘাড়ে ধরে কবে বার করে দিত।'

'কেন, হোটেলের বোর্ডার-টোর্ডাব যোগাড করে দেয় তো শুনি।' প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চুপ করে রইলাম। বিষয়ী ব্যবসায়ী বীরেনবাবুর কাছে—তার কর্মচারীর কাছে মাঝে মাঝে দু-একটি খদ্দের বা বোর্ডার যোগাড করে দেওয়ার মূল্য কতখানি! যে লোক সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রেব ঢেউ গুণে সময় কাটায, সে লোক তাদের চোখে মহা অপদার্থ বা পাজী হওয়া বিচিত্র নয়। 'শালা মাতাল, শালা নেশাখোর।' টেবিল সাফ করতে করতে নীলাম্বর নিজের মনে গজগজ করে। কিন্তু বলতে কি, এইমাত্র যে আমার পাশে বসে ছিল—কাছের সমুদ্র আর দূরের সমুদ্রের রহস্য ব্যাখ্যা করতে যার জুড়ি নেই, যার কথা শুনে সমুদ্রকে আরও নিবিড করে চিনতে চলেছি, ভালবাসতে আরম্ভ করেছি, সে মাতাল নেশাখোর জানতে পেরে আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। বরং চিন্তা করলাম, মদ বা গাঁজা টেনেও যদি সে নেশা করে, মাতলামি করে, সেই নেশা তার কতক্ষণের। বরং বলা যায়, যে-নেশার টানে আজ কুড়ি বছর মানুষটা সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে সেটাই তার আসল নেশা; সেই ভয়ংকর নেশা বুঝতে পারার ক্ষমতা বীরেনের নেই, চায়ের দোকানের কর্মচারী টাকপড়া নীলাম্বরের নেই, হয়তো আর কারোরই নেই, আমি ব্যতিক্রম এবং এইজন্য ভিতরে গৌরববোধ করলাম। কবি শিল্পী সাধকের সংখ্যা এই জগতে খুব বেশী কি? চিন্তা করে নীলাম্বরের চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সফেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উন্মুক্ত সমুদ্র দেখতে, ঝড়ো লোনা হাওয়ায় বুক পুড়ে নেশায় আতুর হতে ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হুঁ, একসময় শাড়ির আধখানা ভিজিয়ে বালি মাখানো পা দুটো টেনে টেনে হেনা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমি ঘৃণায় অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আঁচলেব খুঁটে আবার এতগুলি ঝিনুক বেঁধে এনেছিল ও; ঘাম-তেলতেলে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের কোলের কাজল ফিকে হয়ে গিয়ে সেখানে বুঝি চাপ চাপ ক্লান্তি ঝুলছিল। শিউরে উঠেছিলাম। নারীর এই দলিত মথিত ক্লান্ত বিপর্যস্ত রূপের সঙ্গে কি আমি পরিচিত ছিলাম না, বড বেশী পরিচিত ছিলাম বলে রৌদ্রালোকিত প্রশান্ত বালুবেলার পবিত্র পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার কবে দিয়ে ঝামাপুকুরের বাড়ির গাঢ রাত্রির নৈঃশব্দ্যগুলি আমার আমার চোখের সামনে ঝুলছিল, বিছানার ছবিটা মনে পড়ছিল। ভয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম; এক মায়াবিনী ডাইনী সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আমাকে

ধাওয়া করে ছুটে এসেছে !

'তুমি যাও, ঘরে ফিরে যাও !' কণ্ঠস্বরের বিকৃতি নিজের কানেও লাগল, কিন্তু তখন উপায় ছিল না।

'তুমি যাবে না ? বেলা হল, কখন খাবে।' চমক নেই ভয় নেই কুণ্ঠা নেই। সেই পরিমিত সংক্ষিপ্ত নিস্তরঙ্গ ধূসর দিনগুলির ডাক। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। এখানে এসেও খাওয়ার ডাক !

'তুমি যাও, কাপড়-চোপড় বদলাবে তো, না কি ?' কোনোরকমে উত্তর সেরে গরম বালুর ওপর জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। ঢেউয়ের শব্দে ওর কণ্ঠস্বর চাপা পড়বে চিন্তা করে দূরে সরে গেলাম।

ওর সাধ মিটেছিল। সমুদ্রের মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিটোল ঘুমের ভিতর দিয়ে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিতে পেরেছিল। ঢেউয়ের শব্দে ঘুম ভাঙবে ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবাদ করিনি। কেননা, চোখে জল দেখতে না পারলেও জলের গর্জন আমার রক্তের মধ্যে বাজছিল, জলের ছবি মগজের ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিল। শিয়রের পাশে ঝিনুক শামুকগুলি ছড়িয়ে রেখে ঘুমোচ্ছিল হেনা। ইচ্ছা করছিল সবগুলি তুলে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কি, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না এগুলিও ওর সঙ্গে ট্রেন চড়ে খুব শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাবে, হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি চাপবে। তারপর এক ছুটে ঝামাপুকুর লেন। তারপর কাচ-পরানো আলমারীর তাক। না, তখন আর হেনার সময় নেই ওদের দিকে তাকাবার। অফিসের রান্না নামছে না। আর একবার একটু জোরে ছড়ছড় শব্দ করে কলের জলটা বন্ধ হয়ে গেল। ছাইরঙা আকাশ। মানুষের গরম নিশ্বাস আর ঘামের গন্ধের মধ্যে ট্রামের এক কোণায় একটু জায়গা। তারপর লিফ্‌ট-এর সোঁ সোঁ। তারপর ? তারপর আর কিছু নেই। সমুদ্র অনেক দূরে। ঢেউয়ের গভীর নিস্বন স্তব্ধ। ঝক-ঝকে বালির বিছানায় রূপালী ফেনার উচ্ছ্বাস অতীতের স্বপ্ন হয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। যেন কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। হেনার মাথার কাছে দেওয়ালের ছবিটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে ও খোঁজ করে চিরুনির, চুলের কাঁটার।

'আমি জানি না।'

'পাউডারের কৌটো গেল কোথায় ?'

'আমি দেখিনি।'

'বা—রে, আমার লিপস্টিক কাজললতা বা কে সরালে।'

'সত্যি আমি বলতে পারব না।' অনুনয়ের চোখে স্ত্রীর মুখ দেখি। একটু

বেশী গম্ভীর থেকে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চোখ ফেরাই।

'অবাক কাণ্ড তো! ঘরে কি চোর ঢুকেছিল।' হেনা বিড়বিড় করে; আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গলা টান করে উঁকি দিয়ে দেওয়ালের তাক দুটো দেখল ও, তারপর হাঁটু মুড়ে পিঠ বেঁকিয়ে খাটের নীচ দেখে শেষ করল। 'না, কোথাও নেই—ওখানে আলতার শিশিটা ছিল—নেই। বিচ্ছিরি কাণ্ড তো।'

ঘুরে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুখের পেশী কঠিন করে আমি মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখি, চামড়া দেখি।

'কি হল, তুমি চুপ করে যে?'

'আমি কি জানি?' ভয়ে ভয়ে চোখ তুললাম।

'তুমি লুকিয়েছ, নিশ্চয় তুমি।'

'সত্যি না।'

'উঁহু, আর কে আসবে এ-ঘরে—দরজার ছিটকিনি আটকানো—তুমি চেয়ারে বসে ঢুলছ। শোবার সময় আমি কানের রিং দুটো খুলে টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম—ছাখো, ঠিক ওখানে রয়ে গেছে। আর চোর এসে কিনা সোনা রেখে আলতা লিপস্টিক নিয়ে গেল। আর, চোর ঢুকবেই বা কি করে।' হেনা আমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়: 'তুমি তুমি—দুষ্টামি করে—' কাজটা কাঁচা হয়ে গেছে। আর গম্ভীর হয়ে থাকাও অর্থহীন, বরং হেসে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। হাসলাম।

'কোথায় রেখেছ, কি আশ্চর্য—এমন কাজ করে তুমি এতক্ষণ চুপ থাকতে পার!' হাসির ঝলক তুলে হেনা আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তার আগেই আমি শার্টের নীচে লুকানো কোলের ওপর জড়ো করা চিরুনি চুলের কাঁটা আলতা লিপস্টিক বের করে দিই। এবার হেনা হাসতে হাসতে মেঝের ওপর ভেঙে পড়ল, এলোখোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলের রাশ কালো কালো ঢেউয়ের মতো সাদা নরম পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চট করে চোখটা সরিয়ে নিই, বুকের ভিতর ধাক্কা লাগে, অপরাধী মনে হয় নিজেকে; সেকেণ্ডের জন্যও কি আমি আমার ঘরের কাছের প্রচণ্ড প্রমত্ত যুগ যুগান্তের বিস্ময় ভয়ংকর সুন্দর পবিত্র সমুদ্রতরঙ্গকে ভুলতে চেয়েছিলাম। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলি খুলে দিলাম। হেনা ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঁচল সামলে নিয়ে চিরুনি দিয়ে ও চুল আঁচড়ায়। টের পেয়ে আমি আর ওদিকে তাকাই না।

'হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'এমনি।'

'এসব লুকিয়েছিলে কেন ?'

'এমনি।'

'এখানে এসে মাঝে মাঝে তোমার কী যে হচ্ছে—তখন বীচ্-এ কত বড় এক ধমক—'

'ধমক দিইনি তো, বলছিলাম তুমি যাও আমি আসছি।'

'ও, তাই নাকি—আমি ভাবলাম—' হাসির শব্দ।

'কি ভেবেছিলে শুনি।' সমুদ্রকে পিছনে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে হল ; ঢেউয়ের শব্দ ওর হাসির শব্দে চাপা পড়ে যায় অনুভব করে মাথাটা আবার গরম হতে থাকে। এমন আর কতকাল চলবে যেন ঠিক করতে না পেরে হতভম্বের মতো ওর মুখ দেখি, ভুরু দেখি। সুযোগ বুঝে নারী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে। 'তাকিয়ে কী দেখছ ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে : 'তা আমায় দেখে দরকার কি—ঘুরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'

এরপর আর আঘাত করা চলে না চিন্তা করে অনুকম্পার হাসি দু চোখে ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, 'অত সেজেগুজে কোথায় বেরোনো হচ্ছে।'

'আমি সেজেগুজে বেরোই তুমি চাও না—কেমন, তাই তো এসব লুকিয়েছিলে।' দাঁত দিয়ে ফিতা কামড়ে ধরে ও বেণীর গলায় ফাঁস পরায়, তারপর ফিতাটা মুখ থেকে আলগা করে দেয় : 'না কি এটা কলকাতা না বলে আমার সাজতে-গুজতে মানা—এখানে কেবল তুমি আছ আর জল আছে আর তোমার ঐ কুৎসিতদর্শন মামাটি আছে, তাই যথেষ্ট—' একটু চুপ করল ও, হাতের আরশি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সদ্যরচিত খোঁপাটি দেখল, তারপর : 'আমি ভাবতেই পারি না বেছে বেছে তুমি ঐ বাজে চরিত্রের ছোটলোকের মতো দেখতে মানুষটার সঙ্গে কি করে মিশে যেতে পারলে—একটা ঘণ্টা ওর সঙ্গে বসে চায়ের দোকানে গল্প করে কাটালে, আমি কি লক্ষ্য করিনি।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে গেলাম। যেমন তখন চায়ের দোকানের নীলাম্বরের কথা শুনে চুপ থেকেছি। কিন্তু নীলাম্বর না বুঝুক হেনা বুঝত, পৃথিবীর যে মানুষ প্রথম ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়েছিল সে বাজে চরিত্রের ছিল, ছোটলোক ছিল, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের রহস্য যে বোঝাতে চেয়েছিল সে উন্মাদ ছিল, অপরাধী ছিল—হোটেল-রক্ষক বীরেনবাবুর মামার মুখে সমুদ্র ছাড়া কথা নেই, অগাধ বিস্তৃত ধূসর নীল ছাড়া চোখে আর কোনো রং নেই,

স্বপ্ন নেই, কাজেই—

'আমি এখন মন্দির দেখতে যাব, বুঝলে, মন্দির দেখা হয়নি—এ-বেলা আর বীচ্-এ যাব না।'

'তাই যাও।' অস্ফুটে বললাম। আমাব গাযে যেন দক্ষিণের হাওযা লাগল। এখানে এসে ত্রিশ ঘণ্টা পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করতে লাগলাম।

আকাশেব আলো নিভে যাচ্ছে, সমুদ্র সীসার রং ধরেছে, কাছের সীসা গলে গলে তরল রূপা হযে সোঁ সোঁ শব্দ করে অবিশ্রাম ছুটে আসছে। ম্রিয়মাণ বৌদ্রের গন্ধ লবণের গন্ধ গায়ে মেখে ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু-হু বাতাস বইছে, আমি নডছি না, আমার পিছনের শুকনা বালু উডছে। সামনের বালু লোনাজল খেয়ে ভারি হযে শুযে আছে, বাতাস তাকে নডাতে পারে না। সেই ভারি ভিজা বালুর ওপর পায়ের দাগ নেই, কোনো দাগ নেই—মসৃণ গাঢ অকলঙ্ক নিটোল; জল সরে গিয়ে এই বুঝি পৃথিবীর প্রথম মাটি দেখা দিতে আবম্ভ করেছে মনে করা যায, আর আমার ঠিক পিছনে কত কোটি পাযের চিহ্ন পডে বালু ক্ষত-বিক্ষত—যুবকের পায়ের দাগ যুবতীর পায়ের ছাপ, কত লক্ষ বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু কিশোর কিশোরী না হেঁটে গেছে এর ওপর দিয়ে। মনে হতে পারে সব মানুষ বুঝি এখানে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে, মনে হতে পারে সব মানুষ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল, তারপর যার যেখানে যাবার চলে গেছে। আসলেও কি তাই নয়, ভাবলাম মানুষ আসে মানুষ যায়, আর নগ্ন নির্জন সমুদ্র একভাবে ফুঁসে চলেছে। তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিরবয়ব অন্ধকার অতলস্পর্শ গর্ভ জুডে লক্ষ ষডযন্ত্রের আবর্ত তৈরী করে চলেছে।

'কি দেখছেন, কাকে খুঁজছেন?

'আপনাকে।'

'আমি তো এখানেই আছি মশাই,' হালকা শীর্ণ হাত দুটো আমার কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বীরেনবাবুর মামা হাসল। 'লক্ষ্য করছিলাম সব চলে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল, 'আপনি একলা, ঘুরে ঘুরে জল দেখছেন কেবল।'

'ভাল লাগছে, আবার ভয়ও করছে।' অল্প হাসলাম।

'তা করবে, আরো কিছু দিন যাক, আমার মতো যেদিন আর পিছুটান থাকবে না সেদিন আব ভয়ডর থাকবে না।'

গাঢ নিশ্বাস ফেললাম। একটা কি পায়ে লাগল।

'ডাব—' মামা নাকের শব্দ করে হাসল, খুব ভাল লাগল না হাসিটা, কিন্তু তা হলেও কথাগুলি শোনার মতন: 'কেউ নিবেদন করেছিল আর কি—সমুদ্র দেখতে এলেই তো ফল ফুল ছুঁডে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়।'

'কিন্তু রাখল না তো উপহার, সমুদ্র আবার ওটা বালুর ওপর রেখে গেছে।' বিড়বিড় করে বললাম।

'সমুদ্র এসব রাখে না—কিন্তু মানুষ কি তা বোঝে!' একটু চুপ থেকে লোকটা আস্তে আস্তে বলল, 'কেন রাখবে আপনিই বলুন—ডাবটার মধ্যে কি আছে—না শাঁস না জল, সবে ফুল কেটে বেরিয়েছিল হয়তো, ওই ফল আপনি খাবেন না—আমিও না। খাওয়া যায় না। কাজেই সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়েছে। ফুল? ফুল বেলপাতা, আপনি চিবিয়ে খান, না আমি খাই? কিন্তু মূর্খের দল এসবই ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিয়ে ভাবে অনেক কিছু দিলাম।'

'তা তো বটেই।' সায় না দিয়ে পারলাম না।

'পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না—সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।'

চুপ করে শুনলাম। তারা-ছড়ানো আকাশের নীচে কালো জলের অশ্রান্ত গর্জন একথাই কি মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভাবলাম। আমি জীবন্ত, আমি ভয়ংকর—

'আমি যখনই বালুর ওপর বেড়াতে আসি পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক্ পাউরুটি বা আর-কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

হাসছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত জোরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি লাগল যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হল রোগা মানুষটার শরীরে এত বল!

'কি, বিশ্বাস করছেন না? আমার আপনার মতো তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব-কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।'

হাসি মিলিয়ে গেল, বুকের ভিতর দুব-দুব করছিল। গাঢ় জমাট অন্ধকার কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে ভয়াল বিশাল ঢেউ এত বড় এক-একটা হাঁ নিয়ে ছুটে আসছে, অস্বীকার করবে কে?

'আপনি তখন বলছিলেন জুঁইফুল—সাদা জুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালবাসতে আসে। তা তো বটেই—একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।'

অস্বস্তি বোধ করছিলাম। না, আমি মেনে নিতে পেরেছিলাম রূপালী ফেনা না, কোমল ফুল না; ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর কঠিন দাঁতের সারি মেলে ধরে ওরা আসছে, একটার পিছনে আর-একটা, আর-একটা, আর-একটা—আমার পাশের মানুষটা আবার নাকের শব্দ করে হাসছে। যেন ঘিনঘিনে হাসিটা আমার মগজের ভিতর আটকা পড়ে যাবে। মেরুদাঁড়ায় শিহরণ অনুভব করলাম। আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে না, কেন, মুহূর্তের জন্য তা-ও

চিন্তা করলাম।

'কি মশাই, একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, মুখে রা নেই—খামকা কথা বলছি?'

'না না না।' প্রতিবাদের স্বর তুললাম, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। 'তা তো বটেই। তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, সাধ রুচি সব—।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম, ধানদূর্বা বেলপাতাও খাবে না সে—ফুলকচি ডাব পেয়ারাও খাবে না—আমি যখনই বীচ্-এ আসি, পকেটে করে মাছভাজা, সিঙ্গাড়া, রুটি, কেক্, ডিমের বড়া নিয়ে আসি।' চুপ করল মামা। এবার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় বলে ভাল লাগে। কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবছিল মানুষটা। বালু পার হয়ে দুজন আস্তে আস্তে শক্ত উঁচু তীরের দিকে এগোই। আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাত হলে হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিরুক্তি না করে মামা উঠে আসতে রাজী হয়। অথবা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে এবং আমাকে সেটা বলতে হবে ভেবে যেন চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আর ঢেউয়ের শব্দ পিছনে রেখে রাস্তার আলোর কাছে এসে গেছি যখন, মামা বলল, 'ওই আমার নেশা, সমুদ্রকে খাওয়ানো—ওরা ধান দূর্বা ফুল বেলপাতা দেয় বলে আমি ওদের মূর্খ বলি, পাগল বলি—উল্টে আমাকে ওরা বলতে ছাড়ে না, হুঁ আমি বাজে—সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ; পাজী বদমায়েস, কেউ কেউ বলে—'

'কেন আপনি তো—' হঠাৎ কি বলতে থেমে গেলাম। আশ্চর্য অনুভব-শক্তি লোকটার। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। আলো-অন্ধকারে কপালের ভাঁজগুলি খরতর হয়ে ফুটে উঠছিল।

'ঠিক বলেছেন, কারো তো অনিষ্ট করিনি—নিজের খেয়াল নিয়ে নিজে চলি। কিন্তু কি করবেন মশাই, মানুষ তাতেও আপনাকে রেহাই দেবে না। ঠিকই বলেছেন। আমার ভাগ্নে বারেন। আজ সে অনেক পয়সার মালিক আর সেই গরমে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা, হুঁ, আমার ওপর সে চটে আছে কেন জানেন—জানেন না।'

'কাল শুনব।'

'আরে মশাই এ কি সমুদ্রের গর্জন—আজ কাল পরশু, সারাজীবন শুনলেও শেষ হবে না। আমার কথা একটুখানি, ওই বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে, শুনুন। কলকাতা থেকে অ্যাল্‌সেসিয়ানের বাচ্চা কিনে এনেছিল বীরেন—কত আদর যত্ন পয়সা খরচ কুকুরের জন্য। হঠাৎ বাচ্চাটা একদিন হারিয়ে গেল! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হল, পাওয়া গেল না—এখন বীরেন সন্দেহ করছে আমাকে—

হুঁ, তার মামাকে।'

'কেন? আপনি কুকুর দিয়ে কি করবেন?'

'আর কি।' ঘিনঘিনে নাকের হাসিটা আবার কানের কাছে, মুখের কাছে ছড়িয়ে দিল লোকটা: 'ওই ওখানে দিয়ে দিয়েছি।' গর্জমান অন্ধকার সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে মামা শেষ করল: 'বীরেন আমাকে দিয়ে বিশ্রী সন্দেহটা করছে—আজ চার বছর—অথচ সে জানে, ভাল করে জানে, মাছটা ডিমটা রুটি-কেকটা ছাড়া অন্য কিছু আমি কোনো দিন ওকে খেতে দিইনি। আচ্ছা চলি মশাই, কথায় কথায় অনেক রাত হল।'

আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে, একটা কিছু আমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে পেরেছিল লোকটা। আবার সারা রাত জেগে কাটালাম। বাইরে অন্ধকার বালুর ওপারের শব্দের ঝড় যত না শুনেছি, লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্ত ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ংকর চেহারা যত না দেখেছি, তার চেয়ে আমি বেশি দেখেছি আমার বিছানা: কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর। আলোটা জ্বলছিল। ইচ্ছা করে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তা নিয়েও অবশ্য রাগারাগি হয়ে গেছে। আমি আমার ভাতের থালা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হেনার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল ও। মন্দির দেখতে বিস্তর হাঁটতে হয়েছিল: 'ক্লান্ত।'

'তুমি খেয়ে নাও।'

'তুমি?'

বিরক্ত হয়ে হাত তুলে তাকে চুপ করতে বলেছিলাম। যেন কথা বললে আমার বাইরের সোঁ সোঁ শব্দ শোনার ব্যাঘাত হবে। হাসছিল ও। 'রাত বারোটা পর্যন্ত বীচ্-এ কাটিয়ে এসে এখনো তোমার জানালায় দাঁড়িয়ে জল দেখতে হবে, ঢেউয়ের গর্জন শুনতে হবে। উঃ, আমার তো একদিনেই ক্লান্তি লাগছে—জল কত দেখা যায়—ওই একঘেয়ে শব্দ কত শোনা যায়।'

'চুপ চুপ—তুমি খেয়ে নাও।'

অগত্যা ও খেয়ে নিয়েছিল। খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আলোর জন্য চোখ বুজতে কষ্ট হচ্ছিল, টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার তখনো খাওয়া হয়নি, ঘর অন্ধকার করতে বলতে পারে না। ওর একটা পা বিছানার ওপর টান করে ছড়িয়ে দেওয়া। আর একটা পা তুলে রেখেছিল। শায়ার লেস্ হাঁটুর কাছে উঠে গিয়েছিল। হাঁটুটা একটু একটু করে আন্দোলিত করছিল ও, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর ডুমটা দেখছিল, আমাকে দেখছিল। হাঁটু তুলে রাখার

দরুন পায়ের নরম মাংসল ডিমের ছবিটা আমার চোখে পড়েছে, দুবার চোখে পড়েছে ; কি, তখন থেকেই আমার মাথাটা গরম হচ্ছিল। আমার মগজের ভিতর সমুদ্র ফুঁসে মরছে, সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁতের হাঁ নিয়ে অসংখ্য ঢেউ ছুটে আসছে, আর সাদা ধবধবে শায়ার নীচে হেনার পায়ের নরম মাংস কাঁপছিল। আর ঠিক তখনই কিনা ও হাই তুলে ঘুমের ছোপলাগা লালচে চোখ দুটো করুণ করে আমার দিকে মেলে ধরে বলছিল, 'ওই বাজে লোকটার সঙ্গে মিশে মিশে তোমার এমন হয়েছে—জলের নেশা ধরে গেছে।'

উত্তর করিনি। মহৎকে ভালবাসতে, বিরাটের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে সংযম অভ্যাসের দরকাব, যেন চিন্তা করছিলাম ; তাই হেনাব কথায় কান দেব না বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ও চুপ থাকেনি, আবার কথা বলছিল। ঘুমের জলে ভিজে ওঠা ভার-ভার কথা, 'ভয়ংকর নিষ্ঠুর ওই মামা লোকটা, পাশের ঘরের মহিলা বলছিলেন, ওর সঙ্গে আপনার কর্তাকে মিশতে দিচ্ছেন কেন।'

আমার সংযম আর রইল না। পাশের কামরার মহিলার সঙ্গে হেনা মন্দির দেখতে গিয়েছিল মনে পড়ল।

'তোমার ঘুম পেয়েছে তাই আবোল তাবোল বকছ, আমি খেয়ে আলো নিবিয়ে তোমার পাশে শুয়ে পড়ি তাই চাইছ।'

ধমক দিয়ে উঠেছিলাম। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলাম।

'কেন নিষ্ঠুর কেন, কি করেছে ও!' ছুটে বিছানার কাছে চলে গেছি। ধমক খেয়ে, আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল ও। না কি সমুদ্র-পাগল সৃষ্টিছাড়া লোকটার নিষ্ঠুরতার কথা আমার কানে তুলতে নেই, পাশের ঘরের মহিলার সে-রকম কিছু নির্দেশ ছিল ? কথাটা পরে চিন্তা করেছি। হেনা আর চোখের পাতা খুলছিল না। আমি রাগ করে ভাতের থালা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছি। আলোটা তেমনি জ্বলছিল। গজগজ করছিলাম : 'এটা কলকাতার বাসা না—সকাল সকাল খেলাম আর ঘর অন্ধকার করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তবে আর বাইরে বেড়াতে আসা কেন।' শেষের কথাটা নরম গলায় বলেছিলাম। কিন্তু বেচারা আর চোখ খোলেনি। তাই চাইছিলাম। আলো জ্বলছিল। জানালার বাইরে অন্ধকার সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল। আমার মাথায় তখন একটা কুকুরছানা, নরম মাংস। আমি পরিষ্কার দেখছিলাম হোটেল থেকে ওটাকে চুরি করে নিয়ে বীরেনবাবুর মামা সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। অট্টহাস্য করে সকলের বড় ঢেউটা ছুটে এসে ওটাকে তুলে নিয়ে গেল। তাই বলছিলাম, রোগা মানুষটা আমার রক্তের মধ্যে কি যেন সংক্রামিত করে দিয়েছিল, না হলে বাইরের উন্মত্ত অশান্ত গর্জন শুনতে শুনতে নেশাতুরের মতো আমি একসময় বিছানার কাছে সরে

যাব কেন। হেনার পায়ের নরম মাংসল ডিমটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম, যেন কতটা নরম নখ বসিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যেই যন্ত্রণায় ও উঃ করে উঠেছিল, তখনি হাত সরিয়ে এনেছি যদিও।

পরদিন খুব সকালে উঠে হেনা কোন্ এক সাধুবাবার আশ্রম দেখতে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত পাশের ঘরের মহিলাও সঙ্গে গেল। মনটা হালকা লাগছিল। রাত্রির ওই ঘটনার পর কেমন করে ও আমার দিকে তাকাত, আমি ওর দিকে তাকাতাম—সেই সমস্যা ভোরের নরম আলোয় ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। ঘরের দিক থেকে মন হালকা লাগছিল, কিন্তু বাইরের ছবি দেখে মন ভার হয়ে রইল। আকাশের চেহারা মেঘে মেঘে মন্থর বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙেরও পরিবর্তন নেই। কোথায় সেই সবুজ ছোপ, নীল নয়নাভিরাম ময়ূরকণ্ঠী রং, রূপালী ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জাফরান ছটা! দূরের জল কাছের জল এক রং—ছাই রং। যেন সেইজন্যই সমুদ্রকে আরো ভয়ংকর লাগছিল। হাসি-উচ্ছ্বাসের বালাই নেই—কেবল ক্রোধ, কেবল গর্জন আলোড়ন ছাড়া আর কিছু জানে না সে। কিন্তু আমার মন আরো খারাপ লাগছিল লোকটাকে একবারও কোথাও দেখতে পেলাম না বলে। না কি সমুদ্র যেদিন এই চেহারা ধরে সেদিন মামা তার ধারেকাছে থাকে না—কেবল রৌদ্রের দিনে মুহুর্মুহু রং ফেরার রহস্য দেখতে, কি রাত্রির অন্ধকারের হিংস্র উন্মত্ত কোলাহলের অর্থ খুঁজে বার করতে তার উৎসাহ? কোথায় গেল! বালুর ওপর অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। একবার পুবে, আর একবার পশ্চিমে অনেক দূর হেঁটে গেলাম। কেউ নেই। সমুদ্র আজ মেজাজ খারাপ করে আছে দেখে স্নান করবে দূরে থাক, মানুষ যেন জলের কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাচ্ছে না—একটি দুটি মুখ দেখা গেল, ঢেউয়ের অবস্থা দেখে দূরে থেকেই তারা বিদায় নিয়েছে। মাছ ধরতে জেলেরা আসেনি। মামাকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে এক সময় সেই চায়ের দোকানে ফিরে এলাম। না, সেখানে নেই। আজ চা খেতেই আসেনি বীরেনবাবুর মামা। 'হয়তো রাত্রে খুব টেনেছিল এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।' চা তৈরী করতে করতে নীলাম্বর বলছিল, 'নেহাত মামা—তাই পারছে না, না হলে কবে বাবু জুতো পেটা করে বেটাকে তাড়িয়ে দিত।' কান ছিল না তার কথায়; উদাস শূন্য চোখে বিবর্ণ ঢেউগুলির মাতামাতি দেখছিলাম। আমার পাশে একটা লোক নেই—কানের কাছে মুখ এনে এসিডে খাওয়া ময়লা দাঁত বের করে কথা বলছে না। তাই সমুদ্রকে অপরিচিত ঠেকছিল, দুর্বোধ ঠেকছিল। দুদিনেই মানুষটা আমাকে সমুদ্রের কত কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একটা সকালের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। যেন আর পাঁচজনের চোখ

দিয়ে আমি জল দেখছি, জলের একঘেয়ে শব্দ শুনছি। যেন আর একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব। হয়তো আর যে ক'দিন আছি বীচ্-এ বেড়ানোর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মঠ-মন্দির-আশ্রম দেখব। মুখের ভিতরটা তেতো-তেতো ঠেকছিল। দূরের ধূসর রেখাটা ক্রমে কালো হয়ে আসছে। গুরগুর শব্দটা, গভীর—মন্থরতর হয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, ওপরের মেঘ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। ঝড় উঠল কি? কিন্তু বললে কেউ বিশ্বাস করত না, আমি চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে তখন ঢুলছিলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কে জানে; বোধ করি নীলাম্বরের পেয়ালা-পিরিচ ধোয়ার শব্দে এক সময় ধড়মড় করে জেগে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম, আর তখন চোখের পাতা টান টান করে মেলে ধরে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে আমি বাইরেটা দেখলাম; স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল; এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, হাওয়ায় সব ঝেঁটিয়ে কোন্‌দিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে; তারা কলরব করছে, ছুটছে; ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রূপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল; যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওধারের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।

এখন হয়তো মামাকে দেখতে পাব। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বালুব ঢালু বেয়ে খানিকটা ছুটে আর এগোতে পারলাম না, পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের চোখ দুটোকে আবার যেন বিশ্বাস করতে বাধছে; ওপরে রৌদ্র-গাঢ় স্তব্ধ আকাশ, সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি—আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না; কেবল একজন—একটি মূর্তি। বেণীটা দুলছে, শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার আমার মনে হল সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগ্ন নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না—মানান উচিত না।

হেনা খিলখিল করে হাসছে। এত বড় একটা ফেনার ঝলক ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে; আলতা-পরা পায়ের পাতা ভিজে যায়। যেন ইচ্ছা করে

ফেনার দুধে ও পা ডুবিয়ে রাখছে। কাল তা করেনি, পারেনি, সাহস পায়নি —ঢেউ ছুটে আসার আগে ও ছুটে পালিয়ে এসেছে, ভ্রূকুটি করেছে সমুদ্রকে, ঢেউ সরে যেতে ঝিনুক কুড়িয়েছে ; আজ অন্যরকম। ঝিনুক কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে, অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাত্রে আমার স্পর্শ—পুরুষস্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। শায়াশাড়ি কুচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবলিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন, বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে, আমাদের ঘরের বিছানায় তার হাজার ভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্যযুক্ত মনে হয়েছে কোনোদিন। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার আশ্চর্য রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।

'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও ফিক করে হাসল।

'ভয় করে।'

'আমি আছি ভয় কি।'

'তুমি আমার হাত ধর।'

আমি ওর হাত ধরলাম।

'ইস কত বড় ঢেউ!' ভয়ে চোখ বোজে ও।

'ঢেউ এখানে আসছে নাকি।' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই। মুঠ আলগা করি না যদিও, কেননা আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলি দিয়ে আমি বার বার ওর বাহু ও গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিলাম, অনুভব করতে ভাল লাগছিল। বালুর শেষ প্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে ধূধূ সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই, সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা···

'এই করছ কি!'

ভয়ে আঁতকে ওঠে ও, যেন হৃদ্‌পিণ্ডের ধাক্কা আমার হাতে এসে লাগে। 'একেবারে ছেলেমানুষ।' নরম গলায় ধমক দিলাম, 'আমি তো ধরে রয়েছি, ভয় কি—'

'না না'—যেন হেনার হঠাৎ কি মনে পড়ে, বিদ্যুতের মতো শরীরে ক্ষিপ্র

মোচড দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ায়, আমার চোখ দেখে, তারপর বুঝি আমার পিছনের বালুর দিকে চোখ পড়তে ও রীতিমত আর্তনাদ করে ওঠে: 'যা ভেবেছি তাই, ওই তো শয়তান দাঁড়িয়ে হাসছে—ওর পরামর্শ শুনে তুমি এমন কাজ করতে চাইছ—'

'কি রকম—' অস্ফুট ভয়ের গলায় বলতে গেছি, তার আগেই হাতের মুঠ ছাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হেনা ওপরে উঠে গেল; এবার আমি ঘুরে দাঁড়াই। হেনা কাঁপছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, যেন চোখে জল এসে গেল। আর তখন লক্ষ্য করলাম কালো রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারার সেই মানুষটা—বীরেনবাবুর মামা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমাদের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে হেসেছিল কি? জানি না। দেখলাম দড়ি দিয়ে বাঁধা একতাল কাঁকড়ার মতো কি যেন হাতে ঝুলিয়ে লোকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

মনে আছে সেই সন্ধ্যায় ট্রেন যখন সাক্ষীগোপাল স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি স্বাভাবিক হতে পেরেছিলাম, সহজ হতে পেরেছিলাম। হেনার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি আমায় বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে লোকটা এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর—স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।'

হেনা হঠাৎ উত্তর করল না, জানালার বাইরে অন্ধকার দেখল, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল: 'বলিনি—বলতে ভয় করছিল—কি জানি যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বসে—' একটু থেমে পরে ও বলল, 'সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'

চুপ থেকে জানালার বাইরে চোখ রাখলাম। অস্বীকার করব কেমন করে। সত্যি কি আমার মধ্যে একটা কিছুর সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল না। আর ঢেউয়ের গর্জন নেই। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঝিঁঝির ডাক ও নারিকেল পাতার মৃদু মর্মর শুনতে শুনতে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

সস্তা টিনের ঘর হলেও বাড়িটা তার ভাল লাগে। লোকজন একরকম নেই বললেই চলে। মোটে আর-একঘর ভাড়াটে। তা-ও ঠিক পাশাপাশি ঘর না। উঠোন পার হয়ে বাঁ দিকের ভাঙা জিরজিরে, একটা দেওয়াল ঘেঁষে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালার একটা খুপরি নিয়ে বুড়ো মানুষটা ওধারে পড়ে আছে। ওর থাকা না-থাকা সমান কথা। সারা দিনের মধ্যে এক-আধবার যদি কাশির শব্দ কি যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে,—আসে না। ডুমুর গাছ পেঁপে জঙ্গল ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিল সামনে নিয়ে ঐটুকুন ডেরার জং-ধরা পুরোনো টিনের দরজার আড়ালে বসে দিনরাত বুড়ো ভুবন সরকার কি করে দেখবার তিলমাত্র কৌতূহল বা ইচ্ছাও অবশ্য তার হয় না। বরং যদি কেউ এখন মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তারপর একসময় নিজের নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ের জামায় বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর দু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ, আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘষবে। খসখসে গালের ঘষায় মায়ার থুতনির ছাল উঠে যায় যেন। কিন্তু তা

কি আর কোনদিন গেছে। দু'বছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ ক'রে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা। তুলনাটা মনে করে মায়া হাসল। অথচ দু-দুটো বর্ষায় না জানি কত সহস্র গাছের পেয়ারা বড় হল পাকল কি পাকবার আগেই পোকা কি বাদুড়ের কামড়ে নষ্ট হয়ে নিচে ঝরে পড়ল। আনন্দের আতিশয্যে মায়া বাঁ হাতের দুটো আঙুল দিয়ে নিজের সুন্দর থুতনিটা একবার স্পর্শ করল। তারপর আরশির কাছ থেকে সরে এসে এধারের দেওয়ালের ব্রাকেটে কুঁচিয়ে রাখা খয়েরী-পাড় বুটিদার শাড়ি, আটপৌরে একটা ব্লাউজ ও শুক্‌নো তোয়ালেটা টেনে নামাল। সাবানের কেস্ ও দাঁতন নিতে ভুলল না। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে তখনি কি ও কুয়োতলায় গেল? না। এ-বাড়ির সুবিধা এই। কানে শুনতে খারাপ লাগে যে কল নেই। কিন্তু তাতে কি। দু'জন তো ওরা মানুষ। অফিসে যাবার আগে রাস্তার কল থেকে প্রণব দু'বালতি জল ধরে নিয়ে আসে। তাতেই তাদের রান্না আর খাওয়া কুলিয়ে যায়। বিকেলে এক-আধ বালতি আনতে হয়। তা-ও রোজ না। কোনো কোনো দিন। এদিকে স্নান হাত-মুখ ধোওয়া বাসনকোসন ধোওয়া কাপড় কাচাকাচি সব, সব পাতকুয়োর জলে। কত সুবিধে। সারাদিন বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে যত খুশি জল টেনে তোল কেউ কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া ঘড়িধরা সময় নিয়ে কলে জল এলো কি চলে যাচ্ছে বলে যে তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ সারতে হয় না এটাই মায়ার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রচুর সময় নিয়ে আলসেমির নৌকোয় গা ভাসিয়ে দিয়ে এক-এক সময় এক-একটা কাজে হাত লাগালেই হল। আর বড় কথা ভিড় বলতে কিছু নেই এখানে। মায়া ছাড়া আর কারোর কুয়োতলায় কাজ আছে বলেও মনে হয় না। প্রণব সেই সাতসকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেল পাঁচটায়। আর কে? ওপাশের ঘরের বুড়ো? লোকটাকে মায়া কোনোদিন কুয়োতলায় দেখল না। ও আসলে স্নান করে কিনা খায় কিনা মায়ার সে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। খায় নিশ্চয়ই। না হলে আর বেঁচে আছে কি করে। কিন্তু রান্না করে কি? তা হলে তো অন্তত এক-আধ বালতি কুয়ো থেকে কি কল থেকে হোক,—আর রান্না না করলেও এমনি তো জল খেতে হয়—সেইটাই বা কোথা থেকে আসে। রাত ন'টায় আর একবার রাস্তার কলে জল আসে। যদি তখন? কিন্তু তা-ও মায়ার চোখে পড়েনি। অবশ্য মাঝে মাঝে রাত বারোটায়ও জল আসে। তখন কি? তা অবশ্য মায়া বলতে পারে না। বা-রাস্তার কল থেকে এত রাত্রে জল ধরে তার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে

কি না দুপুর রাত অবধি জেগে বসে থেকে লক্ষ্য করার মায়ার ইচ্ছা ধৈর্য কোনোটাই নেই। বড় কথা এখানে এ-বাড়ির উঠোন যেমনি ফাঁকা তেমনি কুয়োতলাটাও সারাক্ষণ ফাঁকা থাকে বলে মায়ার যখন ইচ্ছা তখন যতটা খুশি সময় নিয়ে কাজ করার সুবিধা আছে। এই চেয়েছিল ও, এমনটি সে চাইছে। শাড়ি শায়া ব্লাউজ এক হাতে, আর-এক হাতে দাঁতন সাবানের বাক্স নিয়ে ও উঠোনের ডান পাশের নিম গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এখন বর্ষা ঋতু। পাতা ও ফলে ফলে গাছটা বোঝাই হয়ে আছে। দুটো-একটা নিমফল পাকছে। একটা-দুটো মাটিতে পড়ছে। আর পাকা নিমফলের লোভে রাজ্যের বুলবুলি উড়ে এসে কিচিরমিচির করছে উড়ছে ছুটোছুটি করছে ডাল থেকে ডালে। মায়া ওর সুন্দর থুতনি তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে পাখিদের নিমফল খাওয়া দেখল। নির্জন কুয়োতলার মতন নিমগাছটাও এ-বাড়ির একটা সম্পদ, অন্তত মায়ার কাছে, ভাবে ও। অবশ্য বাড়িওয়ালা বরদাসুন্দর বটব্যাল জল্পনা করছে, এপাশের নিমগাছ, ওপাশের ডুমুর আর পেঁপের জঙ্গল সাফ করে ফাঁকা উঠোনের সবটা জুড়ে বড় দোতলা পাকা দালান তুলবে। টিনের ঘর রাখবে না। কিন্তু সেটা কবে হবে আজকালই হচ্ছে কিনা শোনা যায়নি। অবশ্য তাই নিয়ে মায়া কি তার স্বামী প্রণব মাথা ঘামায় না। টিনের ঘর ভেঙে দিলে সস্তা ঘর খুঁজতে তারা কোন দিকে যাবে, না কি এখানেই দোতলার পাকা ঘরে একটু 'সুবিধামতন' ভাড়া হলে থেকে যাবে তা-ও তারা কিছু ঠিক করেনি। বরং সেসব না ভেবে মায়া সবুজ চকচকে চিকরিকাটা নিমপাতাগুলোর নাচানাচি দেখতে লাগল। আকাশের থমথমে মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে একটু সময়ের জন্যে রোদ উঠতে পাতাগুলো যেন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে একটাল ইঁট কবে থেকে পড়ে আছে। মখমলের মতন পুরু নরম সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ সবগুলো ইঁটকে যেন জমিয়ে এক করে দিয়েছে। আগুনে রঙের দুটো ফড়িং সবুজ ইঁটের পাঁজা ঘিরে নাচানাচি করছে। ওপাশের ডুমুরের ডালে এত বড় একটা গিরগিটি স্থিরচোখে তাকিয়ে ফড়িং দুটোকে দেখছে। যেন কোথাও একবার একটু শান্ত হয়ে ওরা বসলে সে লাফিয়ে পড়ে ওদের ঘাড় কামড়ে ধরবে। করুণ চোখে ফড়িং দুটোকে আর একবার দেখে মায়া আস্তে আস্তে কুয়োতলার দিকে চলল।

কুয়োতলার এখানে-ওখানে লম্বা ঘাস গজিয়েছে। জায়গাটা সিমেণ্ট করা নেই। গোড়ার দিকে মায়ার অসুবিধা হত। জল কাদা আর আগাছার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দড়ি বাঁধা বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে জল টেনে তুলতে ওর এমন গা ঘিনঘিন করত। কিন্তু আশ্চর্য, ক'দিনে এটা সয়ে গেছে। প্রণব খানছয়েক

পুরনো ইঁট বিছিয়ে দেওয়ার পর থেকে মায়া আর কোনো অসুবিধাই বোধ করে না। বরং কুয়োতলার এই মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকের চিকচিকে জল কাদা আর অগুণতি কিলকিলে মশার বাচ্চা দেখতে ওর এখন ভাল লাগে। যেন এগুলো না থাকলে খারাপ লাগত। বিয়ের পর থেকে এতকাল ওরা শহরের মাঝখানে যে বাড়িতে ছিল সেখানে সিমেণ্ট করা শক্ত ঠনঠনে কলতলার বাঁধানো চৌবাচ্চার পাশে বসে একদঙ্গল মেয়েছেলের কাপড় কাচাকাচি কলরব আর তাড়াহুড়োর চাপে পড়ে মায়ার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। মাটি আকাশ ঘাস পোকার গন্ধ ছিল না। ছিল দেওয়াল আর দেওয়াল, আর কটকটে ফিনাইলের গন্ধ আর সস্তা সাবান হেয়ার-অয়েলের মিঠে পচা গন্ধে ভরা বদ্ধ বাতাসের গুমোট। কলতলায় যতক্ষণ থাকত মায়ার গা-বমি করত। এখানে খোলা হাওয়া আর ঘাসের শিসের দোলানি আর নিমগাছ থেকে ভেসে আসা পাকা নিমফলের গন্ধ আর বুলবুলির কিচিরমিচিরের এক আশ্চর্য নির্জন জগতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে মায়া যতক্ষণ খুশি প্রণবের কিনে দেওয়া ভাল সাবানটা মাখতে পারে,—যে-ভাবে খুশি। বাপস্, আগের বাড়িতে ইচ্ছামতন খোলা-গা হয়ে বসে মায়া একদিন সাবান মাখতে পারেনি। হ্যাঁ, মেয়েরাই,—একটি মেয়ের গায়ের কাপড় সরে গেলে কি খুলে ফেললে এমন সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে তাকায়? আর চোখ টেপাটেপি ঠোঁট টেপাটেপি। এখানে সেসব বালাই নেই। মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে এক পাশে ও-দুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। এমনি জল দিয়ে কেচে দেবার ইচ্ছা। এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপ্টায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা বুক পিঠ পেট কোমর তলপেট উরু হাঁটু হাঁটুর নিচে পায়ের মাংসল ডিম দুটোকে সতেজ স্নিগ্ধ করে দেয়। আঁচলটা আর গায়ে রাখে না ও। কোমরে জড়ায়। তারপর কুয়োপাড়ের উঁচু সিমেণ্টের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কোমর থেকে থুতনি পর্যন্ত সবটা শরীর সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিচের অন্ধকার জলের দিকে তাকায়। জলের আয়নায় নতুন করে সে নিজেকে দেখে। যেন চিনতে পারা যায় না এ-মায়া সেই মায়া, এই কপাল সেই কপাল, এই থুতনি সেই থুতনি, এ-বুক সেই বুক।

কি, ঘরের আরশিতে এইমাত্র সে যা দেখে এসেছে—। যা সুন্দর শক্ত জমাট আর এখানে জলের অন্ধকারে তা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে। এ-অবস্থা দেখে মায়া প্রথমটায় চমকে ওঠে, ভয় পায়। তারপর অবশ্য কারণটা বুঝতে পেরে নিজের মনে ও হাসে। সামনের দিকে অতটা ঝুঁকে থাকলে নিজের ঐ চেহারা দাঁড়াবেই। সুতরাং ভয় মিছে। আসলে ওর—চট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ওপর চোখ রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। তেমনি নিটোল মসৃণ জোড়া ফুলের স্বপ্ন হয়ে কার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা সারাক্ষণ? কি দেখছে? মায়া আবার নিজের মনে একটুখানি হাসল। আবার জোরে হাওয়া বইছিল আর ওর সারা শরীর শিরশির করছিল এমন সময় হঠাৎ ও চমকে উঠল। শুকনে পাতার ওপর দিয়ে কে হেঁটে এল না। ব্যস্ত হয়ে আঁচলের খুঁটটা কোমর থেকে টেনে খুলে তাই দিয়ে ও কোনরকমে বুক ঢেকে তারপর ঘাড় ফেরাল। ঘাড় ফিরিয়ে মানুষটার চেহারা দেখে মায়া নিশ্চিন্ত হয়। ভয় পাওয়ার কিছু না। একটা হাঁড়ি হাতে করে ভুবন সরকার অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁড়ি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন জল নিতে এসে কুয়োতলায় স্ত্রীলোক দেখে বুড়ো লজ্জা পেয়ে আর পা বাড়াচ্ছে না। মায়া কিন্তু ততটা লজ্জাবোধ করল না। কোনোদিনই করে না। পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মত পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ জোড়া নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনও লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায় কি পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ, একজন পুরুষ। ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনও কখনও ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙা পাঁচিলটা কি পেঁপে-জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে। এর বেশি না। অথচ এ-ও যে বরদাসুন্দর বটব্যালের সাড়ে বারো টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্য-গণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মায়া ভুলে যায়।

একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে মায়া অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভুবন জল নিতে অগ্রসর হচ্ছে না। যেন সাহস পাচ্ছে না।

'নিন, আপনি জল নিয়ে যান।' মায়া ডাকল।

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল ভুবন। ডাক শুনে চোখ তুলল।

'আপনি চান সেরে নিন। আমার পরে হলেও চলবে।' কথা বলল না লোকটা। যেন পোকায় খাওয়া একটা শুকনো ডুমুরপাতা খসখস শব্দ করে উঠল।

'আমার চান সারতে দেরি হবে।' কথাটা বুড়োকে বুঝিয়ে বলা দরকার, না হলে বুঝবে না, টের পেয়ে মায়া রাগ না করে বরং শব্দ করে হাসল। 'আপনাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার চান করা চলবে কি ?'

হাঁ করে তাকিয়ে ভুবন তার একমাত্র প্রতিবেশিনীর হাসি দেখছিল। না কি কচি সবুজ চিকরিকাটা নিমপাতার গায়ে বর্ষা-দুপুরের রৌদ্রের ঝিলিক দেখছে বুড়ো, ভাবল মায়া। তার ঠোঁটে চোখে সত্যি তখন মেঘ-ভাঙা এক আঁজলা হলুদ রোদ ঝিলমিল করছিল।

পেয়ারা পাতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুকনো কাঠের মত মানুষটা যেন আরো কালো হয়ে উঠল।

'না, আপনার চান সারা হোক। আমি ঘুরে আসছি, হাতের একটু কাজও বাকি আছে বটে।' বলে বুড়ো আর দাঁড়ায় না, সরে যায়। কষ্ট লাগে মায়ার। হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যদি দাঁড়িয়ে থাকত ওখানে তো দোষ ছিল কি। তা ছাড়া জল নিতে ও বড-একটা আসে কই। নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখন। গায়ে জল ঢালার আগে বুকের আঁচলটা আবার কোমরে জড়াতে জড়াতে মায়া ভাবে। এ-বাড়ির ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কি ছাতাপড়া পুরোনো ইঁটের পাঁজার সঙ্গে যে-লোকটার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মায়া পরিতৃপ্ত ছিল আজ তাকে হঠাৎ আলাদা করে দেখতে যাওয়া কি তার পায়ের শব্দে গা ঢেকে ফেলার মধ্যে কি একটা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল না? মায়ার বুকের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। এক টুকরো অনুশোচনা গলার কাছে আটকে থেকে যেন জায়গাটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল। স্নান করার আনন্দ তেমন করে ও অনুভব করতে পারল কই। সাবান-গোলা জল দুধের ধারা হয়ে ওর উষ্ণ কোমল ঝকঝকে চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হ্যাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এবাড়ির নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপেগাছগুলো, এপাশের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো পর্যন্ত, ইঁটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে নাভি দেখে স্তন দেখে জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ সুন্দর শিরদাঁড়া ঘেঁষে একটা মশা হুল ফুটিয়ে দিয়ে এতটা রক্ত খেয়ে পেট মোটা করে একসময় উঠে গেল। যেন মায়া টের পেল না। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতে আজ তার হাত উঠছিল না। ভাবছিল ও মানুষটাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করা আর ডুমুরের মরা ডালটাকে এদিকে উঁকি দিতে

বারণ করা এক কথা। যেন সেই অভিমানে ফড়িং দুটো এল না, পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো নেই, পেঁপে গাছগুলো ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকেছে, নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে ব্যস্ত। মায়ার স্নান দেখতে কারো উৎসাহ নেই। ওদের একজনকে সরে দাঁড়াতে বলায় বাকি সবাই রাগ করেছে দুঃখ পেয়েছে। অথচ এদের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরা খুলে দেওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে পাঁচ বালতির জায়গায় পনেরো বালতি জল ঢেলেছে ও, প্রণবের কিনে দেওয়া সাবানটাকে বার বার ঘষে কদিনে ক্ষয় করে এনেছে।

মৃদু একটা আঘাত বুকে নিয়ে কোনো রকমে ও স্নান শেষ করল। ভাল করে মাথা মোছা হল না তোয়ালে বা কাপড়ের জল নিংড়ানো হল না। মন্থর ভারি পায়ে কুয়োতলা ছেড়ে ও ঘরে ফিরে এল। তখনি আবার তার আরশির সামনে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু তা সে করল না। ভেজা কাপড়গুলো মেলে না দিয়ে দলা করে সেভাবেই দরজার পাল্লার ওপর রেখে দিল। টস্‌টস্‌ করে জল ঝরছিল সেগুলো থেকে। মায়া এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে তা দেখল কিন্তু সে-সম্পর্কে ও কিছু ভাবছে বলে চোখ দেখে মনে হল না। চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে ও আবার উঠোনে নামল। আবার এক সেকেণ্ড কি ভাবল, তারপব ওপাশের ডুমুর-জঙ্গল ও ভাঙা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে ডেকে বলল, 'আমার হয়ে গেছে আপনি যান।

কেউ সাড়া দিল না। টিনের ডেরা থেকে বেরোলো না কেউ। মায়া আর একটু সময় অপেক্ষা করল। একটা শালিক ওর পায়ের শব্দে উঠোনের ঘাস ছেড়ে উড়ে পেয়ারার ডালে গিয়ে বসল। এক পা এক পা করে মায়া ডুমুরতলার দিকে এগোয়।

টিনের চাল প্রায় মাথায় ঠেকে। ভিতরে ঢুকল না ও। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখল। অবাক হল না, বরং মায়ার দুঃখ হল। মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের কাছে মাটিতে দুটো একটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। কোনোটা জং ধরা। কোনোটার হাতল নেই, কি মাথা ভেঙে গেছে। ওধারে দুটো গোল মতন কি যেন পড়ে আছে। ইলেকট্রিকের কলকব্জা কিছু হবে মায়া অনুমান করল। পাশেই আর একটা জিনিস দেখে মায়া চিনল। টেবিলফ্যান্‌। দুটো ব্লেডই ভেঙে গেছে, একটা আছে। ওটা ইলেকটিক স্টোভ না হয়ে যায় না। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সব দেখা শেষ করে মায়া আবার বুড়োর মুখটা দেখতে লাগল। দুটো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা মোটা শিরা বেরিয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন দুটো চোয়াল। নাকটা উঁচু, গাল কপাল শুকিয়ে যাওয়ার দরুন

আরো বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। গলায় বুকে ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিয়রের কাছে শূন্য এল্যুমিনিয়মের ডেকচিটা পড়ে আছে। দেখে মায়ার দুচোখ আবার ছলছল করে উঠল। একটু সময় ইতস্তত করে তারপর ও আস্তে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন কি? ঘুমোচ্ছেন?'

'হুঁ হুঁ কে?' বুড়ো চমকে উঠে চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাল তারপর ব্যস্ত হয়ে পা দুটো গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে অল্প হাসল, হাই তুলল একটা। 'ভাবলাম আপনার চানটা হোক, হাতের কাজটা সেরে ফেলি, আর এর মধ্যে কিনা চোখটা লেগে গেল।'

'আমার হয়ে গেছে, যান।' বলল মায়া, বলে চলে আসত চৌকাঠ ছেড়ে কিন্তু পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রথম ওর মুখোমুখি দাঁড়ানো। শুকনো মরা গাছ দেখে যেমন ভয় বা লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন মনে জাগে না এখানেও তাই। শূন্য হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ভুবন ওর চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে যেন কি বলি-বলি করছে। মায়া মাটির দিকে চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'এইবেলা বুঝি রান্নাবান্না হবে?' কোণার দিকে একটা উনুন ও কিছু ভাঙা বাঁশ কাঠের টুকরো মায়ার চোখে পড়েছে।

'হুঁ, দিদি, ইচ্ছা ছিল সেরকম, তা শরীরটা যেন এখন আর নড়াতে ভাল লাগছে না।' বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল ভুবন, চুপ করে রইল একবার, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বেলা এখন কটা ঠিক বাজবে দিদি?'

'বারোটা হবে।' মায়া মাটি থেকে চোখ তুলল। 'অনেক বেলা হয়েছে।' যেন মানুষটার চোখের রং এখন আর তেমন ফ্যাকাশে না থেকে একটু চকচকে হয়েছে দেখে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের রোদ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। শুকনো পাতার খসখস শব্দের মত নিশ্বাসের আর একটা শব্দ কানে এল ওর।

'আহা, কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। 'দিদি আমার কষ্ট করে খবর দিতে এল কুয়োতলা অবসর হয়েছে, তুমি যাও।'

মায়া কথা বলল না। চোখের একটা প্রসন্ন ভাব নিয়ে বুড়োর হাতের শূন্য হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। যেন বুড়ো আবার একটা কি বলি-বলি করছিল। টের পেয়েও মায়া চোখ তুলল না। দুটো লাল ফড়িং-এর একটা ইঁটের পাঁজা ছেড়ে এখানে উড়ে এসে ওর হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করছে দেখে মায়া অবাক হয় খুশী হয়।

'ইচ্ছে করেছে অনেকদিন, সাহস হয়নি কথা বলতে, কিন্তু দিদি যে এত

ভাল মানুষ আমি কি জানতাম। ভাঙা অসমান নোংরা দাঁত বার করে ভুবন অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেমন ভাল লোকের সংসর্গে বাস করছি আমি। আহা!'

'বুড়োমানুষ আমার সঙ্গে কথা বলবেন তাতে—' বাকিটা বলল না মায়া, সুন্দর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিল।

'বুঝতে পেরেছি বুঝতে পারি।' ভুবন খুশী হয়ে মাথা নাড়ল। 'সকল লোক কি আর সমান। সংসারে সব মানুষ একরকম হলে সৃষ্টি অচল হত।'

মায়া নীরব। ফড়িংটা এখন তার কানের কাছে খোঁপার পাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

'সকল লোক সমান না।' ভুবন আবার বলল, 'সেদিন রাস্তার কলে এই হাঁড়ি দিয়ে জল ধরতে গিয়ে কি কম নাকাল হতে হয়েছিল, দিদি, বড় বেশি অপমান হয়ে ফিরে এসেছিলাম।'

'কে অপমান করল?' মায়া বুড়োর চোখের দিকে তাকায়।

'দিদির বয়সী একটা মেয়ে, বৌ, কার বৌ জানি না, রাস্তার ওধারের একটা টালির ঘরে যেন থাকে।' বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার বয়সের একটি বৌ বুড়োকে অপমান করেছে শুনে মায়ার দুঃখ এবং কৌতূহল হল। 'কি বললে বৌটা, কি বলছিল আপনাকে?'

'আমি হা করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি হা করে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছি। ওকে দেখতে আমার কলের কাছে দাঁড়ানো। জল ধরতে যাওয়াটা কিছু না, ছুতো।'

'ছি ছি ছি।' মায়া সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। 'এমন একটা বুড়ো মানুষকে এভাবে বলতে কি ওর—'

বাকিটুকু বলল না মায়া। কিন্তু তার চোখের বেদনা ভুবনকে অভিভূত করল। 'সব মানুষ সমান না সকল চোখ এক না।' একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে ভুবন মৌচাকের মতন মস্ত কালো খোঁপা ঘিরে লাল ফড়িং-এর নাচানাচি দেখল। গাল ঘুরিয়ে মায়া আবার একটু সময় পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আষাঢ় আকাশের হলদে আলো দেখছিল।

'অনেক বেলা হল, এইবেলা রান্নাবান্না আরম্ভ করুন।' ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে মায়া চুপ করে গেল। ফ্যাকাশে মরা চোখ দুটোতে যেন অন্যরকম রং লেগে আবার চকচক করছে। ডান হাতের হাঁড়িটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ভুবন আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়ছে, যেন কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

আর দাঁড়াল না, চৌকাঠ ছেড়ে মায়া উঠোনে নামল।

শুকনো ডুমুর পাতার খসখস শব্দ শুনে আর একবার ও ঘাড় না ফিরিয়ে পারে না। না, ভুল দেখেছে সে, মরা মাছের চোখ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। রুক্ষ জীর্ণ অস্থিসার একটি মানুষ। মৃত পত্রহীন মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ল মায়ার।

'আমায় কিছু বলছেন ?'

'না,' ভুবন মাথা নাড়ল। 'বলিনি কিছু। দিদিকে দেখে ভাবছিলাম। দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে।'

'কোথায় ডালিম চারা, কোন্‌দিকে!' যেন খুব বেশি চমকে উঠল মায়া। আঙুল দিয়ে ভুবন উঠোনের একটা পাশ দেখিয়ে দিতে মায়া সেদিকে তাকায়। অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন করে ও ডালিম চারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেক-গুলো আঙুল! আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলিমিলি। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতার মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে। আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়ল মায়ার।

'চারা না, গাছ।' ঘাড় ঘুরিয়ে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকায়। ভুবন মাথা নাড়ল।

'নতুন গাছ। যৌবন লেগেছে গায়ে।'

মরা মাছের মত চোখদুটো আবার চকচক করছে কিনা দেখতে মায়া আর মুখ ফেরায় না। যেন কি ভাবছিল ও। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কি, অপরের চোখে সে নিজেকে দেখছে? কে সেই পর? কেউ না। মানুষ না পুরুষ না। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাতদিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়া এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর কোনো পুরুষের চোখেমুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল না শুনল না। যদি দেখত শুনত তবে কি সে

রাগ করত? মায়া ঠিক ভেবে পেল না। বুঝতে পারছিল না ও। হাজার পাতার চোখ মেলে নিম গাছটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, পেঁপে গাছগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কাক শালিক বুলবুলির ঝাঁক যখন-তখন মায়ার হাত দেখছে পা দেখছে হাঁটু দেখছে পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ সব। রাগ করে না ও, বরং খুশি হয়। যদি ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে না থাকত তো তার মনে হত না সে বেঁচে আছে। সুতরাং—

দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসেনি। শুতে গিয়ে শোয়া হল না। এক আশ্চর্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি তো। মরা মাদার গাছ কি নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠে, 'চমৎকার! কত সুন্দর তুমি,' অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের,' তো সে কি খুব অবাক হবে? হয়নি। এখনও হল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে মিষ্টি রিমঝিম একটা শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে একসময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশিতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত সব দেখতে পায়। না, আরশি-মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। সব বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিলে ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল, টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ করে তখন বেজে উঠল ঝম্ ঝম্ ঝম্। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল, বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙে জোরে বৃষ্টি নামল, আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।

অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এটা। একদিন দু'দিন তিনদিন। এবং সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস ও লক্ষ্য করল। অবশ্য তাতে প্রথম দিন ও ভয়ই পেয়েছিল, দ্বিতীয় দিন আর ভয়টা রইল না, মনটা একটু খারাপ লাগল। কিন্তু অবাক হল মায়া, তৃতীয় দিন তার মনে হয় এ-ই স্বাভাবিক। প্রণবের কথা হাসি ওঠা বসা খাওয়া বিশ্রাম, তার জুতোর শব্দ সিগারেটের গন্ধ অফিসের গল্প বা মায়া রাঁধতে বসেছে আর পাশে ব'সে স্বামী তার গলায় কি পিঠের ঘামাচি খুঁটছে কি

বিড়বিড় করে বাজারের হিসাব বলছে ইত্যাদি সব কেমন যেন মায়ার কাছে পুরোনো, বড় বেশি একঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় এল। এমনকি রাতটাও। আদর চুমু আবেগ উচ্ছ্বাস কোনো কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধরে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয়। বিছানার গন্ধ প্রণবের গায়ের গন্ধ চটচটে ঘাম আর গরম নিশ্বাসের হল্কা থেকে রেহাই পেতে সত্যি ও এক সময় উঠে পড়ে। 'এর মধ্যেই তোমার জলতেষ্টা পেয়ে গেল!' ঠাট্টার সুরে প্রণব বিড়বিড় করে। কিন্তু মায়া উত্তর দেয় না। গম্ভীর থাকে। সবটা আবহাওয়া তার কাছে অশ্লীল কুৎসিত ঠেকে। বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে কুৎসিত মনে হয়। বেশবাস ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়। অথচ—অন্ধকার জানালায় একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও ভাবে।

প্রশ্নের জবাব দেয়নি ভুবন। ঘাড় গুঁজে মাছ কুটছিল। জলপচা শাদাটে ক'টা পেটফোলা ট্যাংরা মাছ। একটা ভোঁতা কাটারির বুকে পুঁছিয়ে পুঁছিয়ে পেট আলগা ক'রে মাছের কালচে তামাটে রঙের নাড়ি-ভুঁড়ি বার করতে করতে ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যেন লোকটার নিশ্বাসের ঝাপটায় মাছির ঝাঁক ভনভন ক'রে ওঠে। কিছু তার নাকের সামনে কিছু ঘাড়ের কাছে পিঠের ধারে উড়ে বেড়ায়।

'আপনার বুঝি বঁটি নেই?'

ভুবন শুধু মাথা নাড়ল কথা বলল না বা চোখ তুলে চৌকাঠের দিকে তাকাল না।

মায়া একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বঁটি থাকলে সুবিধে হত। ছোট মাছ কাটারি দিয়ে কুটতে কষ্ট।' ব'লে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আজকের দুপুরের চেহারাটা অন্যরকম। বৃষ্টিও পড়ছে আবার রোদও উঠেছে। সিল্কের মত শাদা নরম মেঘে মোড়া আকাশ থেকে কে যেন একটা রূপালি জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রূপার সুতোর মতন শাদা ফিনফিনে বৃষ্টির ছাট এসে থেকে থেকে মায়ার পায়ের কাছে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাটি ঘাস গাছের পাতা ভাল ক'রে ভিজতে না ভিজতে আবার দেখা যায় ঝকঝকে রোদের হাসি। লাল ফড়িং না। ঘাস-ফুলের মত ছোট্ট শাদা একটা প্রজাপতি ওর থুতনির কাছে উড়ে উড়ে বেড়ায়। মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে ভুবনের দিকে তাকায়। এবার ও খুশি হল। ফ্যাকাশে হলদে

চোখ জোড়া মেলে মানুষটা হা ক'রে তাকে দেখছে। মায়া বাঁ পা নামিয়ে ডান পা-টা চৌকাঠের ওপর রাখল।

'তা কারখানার কাজ কি করে গেল বললেন না তো?'

শুকনো মরা পোকায় খাওয়া গাছের বাকলের মতন বুড়োর ঠোঁটের চামড়া ঈষৎ বিস্ফারিত হল। বোঝা গেল হাসতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতের পিঠটা কপালে ঠেকিয়ে আবার হা করে সে মায়ার মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ অদৃষ্টে নেই তাই চাকরি গেছে। বুঝতে পেরে মায়া একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যাক, হাতের কাজটা যখন শেখা আছে কোনো-রকমে চলে যাচ্ছে—যাবে। ঘরে বসে টুকিটাকি সারাইয়ের কাজ করছেন মন্দ কি।'

কিন্তু চোখ দেখে মনে হল না ভুবন তা ভাবছে। কি ভাবছে চিন্তা না করে মায়া আবার উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। ভিমরুলের চাকের মতন প্রকাণ্ড খোঁপার পরিবর্তে অল্প বয়সের একটি মেয়ের মতন চেরা বেণী আজ ও ঘাড়ের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হাওয়ায় দুটো বেণী নড়ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বেণী করত ও। বৌ হবার পর আজ এই প্রথম। আর এই বেণী তৈরী করার সময় অনেকদিন পর এক ধরনের বনজ লতার কথা বার বার মনে পড়ছিল তার। প্রণব এভাবে চুল বাঁধা পছন্দ করবে না এটাও মায়া চিন্তা করেছে এবং স্বামী বাড়ি ফেরার আগেই ওটা ভাঙতে হবে ভেবে তার বুকের মধ্যে বেশ একটু টনটন করছিল। খসখস শব্দটা শুনে মায়া চমকে ঘাড় ফেরাল। ভুবন এবার দাঁত বার করে রীতিমত হাসছে।

'কি হল? মাছ কোটা তো শেষ হয়েছে, এবার রান্না চাপান।'

'তা চাপাব, এক সময় চাপালেই হল।' হাত নেড়ে মাছের গায়ের মাছি তাড়ায় ভুবন। 'রান্না আর খাওয়ার কথা এখন বড় একটা ভাবি না, দিদি, কেমন যেন ইচ্ছাই করে না, হি-হি। একটা কাজ ছিল শেয়ালদার। বুঝিয়ে দিয়ে ফেরার সময় এই তো আজ আট দিন পর দুটো মরা ট্যাংরা আনলাম। রান্নাই বা আর রোজ হয় কোথা,—'

মায়া চুপ করে রইল।

হাওয়াটা একটু বেশি জোরে বইছিল ব'লে পিঠের বেণী দুটো একজোড়া সাপের মতন পরস্পর জাপ্‌টাজাপটি করে আবার কোমরের দু'দিকে সরে গিয়ে হিলহিল করছিল। যেন সাপের খেলা দেখতে বুড়ো চোখ বাঁকা করে ঘাড় কাত করে মায়ার পিঠের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোলা জলের ওপর রোদ পড়লে যেমন একটা চিকচিকে শাদাটে আভা জাগে, বুড়োর চোখে আজ

আবার সেই রং দেখল মায়া। কিছু বলল না ও, বরং ক্ষুদে প্রজাপতিটা এইবেলা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, উড়ে উড়ে এসে ওর গলায় বুকে বসতে চেষ্টা করছে দেখে মায়া সেটাকে একসময় খপ্ করে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলে পরে ওটাকে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিতে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ভুবন তার সবটা পিঠ ও কোমর দেখতে পাবে মায়া অনুমান করছিল। বাচ্চা প্রজাপতিটা বাইরে ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মরার মতন শুয়ে থেকে পরে একসময় নড়েচড়ে উঠে দিব্যি উড়তে উড়তে পেয়ারা গাছের দিকে চলে গেল। মায়া খুক্ করে হাসল। ভুবনও হাসল। মায়া ঘুরে দাঁড়াল।

'মরেনি। ভাবলাম হাতের চাপে চটকে শেষ হয়ে গেছে।'

'কেন মরবে?' ভুবন ঘাড় নাড়ল। 'নরম মুঠো। এই চাপে কি আর ও মরে!'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শাদা প্রজাপতিটাকে আর দেখতে পেল না। পেয়ারা পাতার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

'ভারি সুন্দর ছিল, এই এতটুকুন!'

ভুবন ঘাড় নাড়ল। ফাটা শুকনো রোদ পোড়া গাছের বাকলের মতন পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আরো সুন্দর লাগছিল দিদির থুতনির চারপাশে যখন ও ঘুরঘুর করছিল। মাছ! মাছ কুটব কি ছাই। আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোন্ ফুলের সঙ্গে কোন্ ফলের সঙ্গে এই থুতনির তুলনা চলে। মচ্‌কা ফুল—না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে,—অবিকল সে রকম। দিদির থুতনি দেখলে তাই মনে পড়ে। মিছে বলছি? আর একবার যখন আরশিতে মুখ দেখবেন কথাটা সত্য কিনা বুঝবেন।'

মেরুদাঁড়ায় একটা শিহরণ অনুভব করত মায়া, কিন্তু তা করতে গিয়েও সে ওটা আর টের পেল না। তাই আগের চেয়েও শান্ত স্থির চোখে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকাল। একজন পুরুষের মুখে ও রূপের প্রশংসা শুনছে কি? না না, যা-ও একটু হাসির রোদ লেগে ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিক করছিল এখন আবার মরা মাছের চোখের মতন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন শুকনো হাঁটুর সঙ্গে দুটো হাত ঠেকানো। বরং ক্ষীণ একটা বেদনার ঢেউ বুকের মধ্যে অনুভব করল মায়া। অল্প হেসে বলল, 'তা দেখব আরশিতে, দেখা যাবে সত্যি আমার থুতনি অত সুন্দর কিনা। আপনি এইবেলা উঠুন। আসুন। আমি জল তুলে দিই আপনি মাছটা ধুয়ে ফেলুন। অনেক বেলা হল।'

দু'জনের পায়ের শব্দে গিরগিটিটা ওধারের পাঁচিলের মাথা থেকে লাফিয়ে

ডুমুরজঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। মায়া থমকে দাঁড়ায়। পিছন থেকে ভুবন বলল, 'তা আমি না-হয় এতকাল কোণার দিকের ভাঙা ঘর নিয়ে ছিলাম, এখন উঠোনের এধারে নতুন ঘর তুলেছে বটব্যাল। আর ঘর তৈরির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাড়াটেও পেল, এখন তো জঙ্গলটঙ্গলগুলো একটু সাফ করে ফেলা উচিত ওর, কিন্তু শালা কি এদিকে একবার উঁকি দিতে আসে? মাসকাবার হলে ভাড়া গুণতে হাজির হবার বেলায় ঠিক আছে।'

'না খুব বেশি জঙ্গল কি।' মায়া বলল, 'আমার কিন্তু এই গাছটাছগুলো বেশ ভালই লাগছে। সস্তার মধ্যে বাড়িটা চমৎকার।'

একটা নিশ্বাস ফেলল ভুবন।

'আমার ইচ্ছা করছে এই আগাছাগুলো তুলে ফেলে এধারটায় কিছু ফুলের গাছ করি।'

মায়া কথা বলল না।

'তা এ-বছর আর হয় না।' পিছন থেকে ভুবন পরে বলল, 'আরো আগে পুঁতলে তবে ঠিক হ'ত। এখন বীজ পুঁতলে শালার জলেই সব পচে ভূত হয়ে যাবে, গাছ বেরোবে না। আর গাছ বড় হতে হতে শীত এসে যাবে। শীতে আর দোপাটি তেমন ফোটে কই। উঁহুঁ।'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' ঘাড় ফিরিয়ে মায়া বলল, 'দোপাটি ফুল আমি খুব পছন্দ করি। ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের স্কুলের বাগানে,—এমন দিনে গাছগুলো শাদা হয়ে থাকত।'

'শাদা লাল গোলাপী অনেক রঙের হয়।' ভুবন আস্তে আস্তে বলল, 'আমার ইচ্ছা লাল দোপাটি করার। লাল ফুল দিদির বেণীতে মানাবে ভাল।'

মায়া হঠাৎ আবার কথা বলতে পারল না। ভুবনও চুপ করে রইল। কিন্তু কুয়োতলায় গিয়ে সে মুখ খুলল। মায়া জল ঢালছে আর দু'হাতে রগড়ে মাছের গায়ের ছাই ময়লা সাফ করতে করতে কি ভেবে সে বলল, 'ছোটবেলার কথা ইস্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা দিদির খুব বুঝি মনে পড়ে।'

প্রথমটায় উত্তর দিল না মায়া, তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বলল, 'মনে পড়লেই আর কি করা যায়। দেখতে দেখতে বড় হলাম, স্কুল ছাড়লাম, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।' একটু থেমে পরে বলল, 'হাজারবার মনে পড়লে কি ইচ্ছা করলেও এখন আর সেদিন ফিরে পাব না।' নিজের মনে কথাটা বলে শেষ করে বিষণ্ণ চোখ দুটো ও আকাশের দিকে তুলে ধরল। রোদের আভা মুছে গিয়ে কালো বড় বড় মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল এবার। মাছ ধোয়া শেষ করে ভুবন সেগুলো রং-চটা ফুটো লোহার থালাটায় তুলে রেখে লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আর জল ঢালতে হবে না?' মায়া চোখ নামাল।

'না, আমার হয়ে গেছে।' ঘাড় তুলে ফ্যাকাশে চোখে ভুবন ওর আপাদ-মস্তক দেখে। কুয়োর বাঁধানো কার্নিশের ওপর একটা পা, এক পা নিচে ইঁটের ওপর রেখে মায়া হাতের শূন্য বালতিটা একটু একটু আন্দোলিত করছিল বলে ওর বুক কোমর উরু মন্থর ঢেউয়ের মতন থেকে থেকে দুলছে কাঁপছে।

'মন, দিদি। ছোটবেলার মনটা যদি আমরা কোনোরকমে ধরে রাখতে পারি তো বুড়িয়ে গিয়েও মাঝেসাঝে সে-দিনের নাগাল পাই। মিছে বলছি?'

আকাশে চোখ তুলল মায়া। চমকে ওঠার মতন কাউকে দেখছে না ও, কি কারো কথা শুনছে না। নিম গাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে খাওয়াতে সারা দুপুরই এই বুলি আওড়ায়। উঠোনের চড়ুইগুলো, ওধারের ফড়িং দুটো, ডুমুর-জঙ্গলের ছায়ায় ঝিঁঝির দল সারাক্ষণই কি ডেকে ডেকে মায়াকে একথা শোনাচ্ছে না? আর, এটা ও বেশ বুঝতে পারে ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এ-বাড়ির শ্যাওলা-ধরা ইঁটের পাঁজা, নড়বড়ে ভাঙা দেওয়াল, হয়তো মৃতপ্রায় হলুদ রঙের পেঁপে গাছটাও ফিসফিসে গলায় কেবল এই বলছে। এখন?

শান্ত সহানুভূতির চোখে মায়া ভুবনকে আবার দেখল।

'যান, এইবেলা গিয়ে উনুনটা ধরিয়ে ফেলুন—অনেক বেলা হল।'

ভুবন স্থির। নির্বাক।

একটা বেণী ঘাড় ডিঙিয়ে ওর বুকের ওপর লুটোয়। চোখ বাঁকা করে মায়া তাই দেখে। এমন সময় হঠাৎ এক আঁজলা রোদ ওর বুকের সামনে দিয়ে থুতনি ঘেঁষে উড়ে গেল। এক ঝাঁক প্রজাপতি। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ। হাতের তেলোর মত বড় এক-একটা। ওরা ডালিম গাছটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। যেন দিশেহারা হয়ে হাতের বালতিটা ঠক্ করে একদিকে ছুঁড়ে ফেলল মায়া। ছুটল। পেয়ারা গাছের ডালে আঁচল বেধে গেল, নিচের দিকেও কি একটা কাঁটায় শাড়ির পাড় আটকে ওর মোরগফুল আঁকা শায়া বেরিয়ে পড়েছে। কোনোমতে সামলে নিয়ে আবার এগোয়। ধরল একটাকে। বাঁ হাতের লম্বা সরু দুটো আঙুলের মাঝখানে আলতো করে একটা পাখা চেপে ধরে ও কুয়োতলায় ফিরে এল। ডান হাতের মুঠোয় আঁচলটা। বুকের ওপর চেপে রেখেছে কোনোরকমে। শ্বাস-প্রশ্বাসে জায়গাটা কাঁপছে।

এই প্রথম ভুবন শব্দ ক'রে হাসল। যেন জং-ধরা খসখসে গলায় নতুন ধাতুর ধার শোনা গেল।

মায়া মুখ কালো ক'রে ফেলল।

প্রজাপতিটাও হাত থেকে উড়ে গেল।

আঁচলটা অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে বুকে জড়ালো, গলায় তুলল ও এবং অন্য দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু কতক্ষণ?

এদিকে আবার ওকে তাকাতেই হয়।

তাকিয়ে অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়। কাঠ। মরা কাঠ চুপ ক'রে বসে আছে। দুটো হাত শুকনো নিষ্পত্র গাছের ডাল। জীর্ণ বাকল। ভিতরের শাঁস পুড়ে গেছে। অঙ্গার দেখা যায়।

'উঠে ঘরে যান। সেই কখন তো মাছ ধোয়া হল। খাওয়া-দাওয়া করবেন না!'

'আমি হা ক'রে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

'খুব বড় প্রজাপতি! এত বড় প্রজাপতি এখানে এসে আর আমি দেখিনি।' মায়া বলল।

'আমি প্রজাপতি দেখছিলাম না।'

মায়া বুড়োর চোখের মধ্যে তাকায়।

ঘোলা ফ্যাকাশে চোখ স্থিরভাবে ধ'রে রেখে ভুবন হাসে। 'দিদির ছুটে যাওয়া দেখছিলাম। আহা রাজহংসীর গতিভঙ্গি। কথাটা মিছে বলছি? আয়নায় দেখবেন। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি সম্ভব হয়। আমি এমন সুন্দর ছাঁদের পিঠ কোমর আর কারো দেখিনি।'

'দেখব আয়নায়, রোজই তো দেখছি।' ধমকের সুর বাব করতে গিয়ে ও কোমল গলায় হাসল। 'এইবেলা উঠুন, চলুন আমি উনুন ধরিয়ে দিই। আষাঢ়ের বেলা তা-ও হেলতে শুরু করেছে।' মায়া নুয়ে হাত বাড়িয়ে মাছের থালাটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি।' পিছনে চলতে চলতে ভুবন বলল। 'দিদির মন কত নরম!'

ডুমুরতলার নিচু চালার ভিতরে ঢুকল দু'জন আর সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। কয়লার ব্যবহার নেই বুঝতে কষ্ট হয় না। কবে যেন কয়লা আনা হয়েছিল। দু-চার খণ্ড এক কোণায় পড়ে আছে। তার ওপর উইয়ের ঢিবি মাথা জাগিয়েছে।

ভুবন বলল, 'মাঝে-মধ্যে রান্নাবান্না যে না করি দিদি তা না, ওই ওধারের পুরোনো বেড়ার বাঁশ কাঠ কিছু কিছু ভেঙে এনে কাজ চালাই আর কি।' একটু থেমে পরে বলল, 'তা কাঁচা ঘর বটব্যাল এমনিও রাখবে না। আস্তে আস্তে সবটাই পাকা ক'রে ফেলবে। তখন আমাকেও উঠতে হবে বৈকি।'

'পরিবার সংসার কোনোদিনই ছিল না নাকি?' উনুন সাজিয়ে আগুন দিতে তৈরি হবার আগে মায়া একবার ঘাড় সোজা করল। তার গলার বুকের

উদ্ধত পেশীর সুন্দর ভঙ্গি দেখতে ভুবন ফ্যাকাশে চোখে আবার রং আনতে চেষ্টা করছে টের পেয়ে মায়া ঘাম মুছবার অছিলায় আঁচলটা নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো করল। তারপর একটা পোকা বা মাকড়ের দিকে স্থির সতর্ক দৃষ্টি রেখে টিকটিকি যেমন চুপচাপ বসে থাকে কতক্ষণ ও সেভাবে বসে রইল। কেনই বা থাকবে না। কুয়োতলায় যখন ও স্নান করে খোলা গায়ে সাবান মাখে পাশের মুমূর্ষু মাদার গাছটা পিটপিট চোখে তাকিয়ে থেকে থেকে পরে হঠাৎ এক সময় যখন ওর সঙ্গে কথা বলে শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে তখন কি ও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সতর্ক সন্দিগ্ধ চকিত হয়ে ওঠে না! ধারালো দৃষ্টি হেনে গাছটাকে পরীক্ষা করার পর মায়া নিশ্চিন্ত হয়। চমক ত্রাস জয় ক'রে আবার স্বাভাবিক গলায় গানের গুনগুনি তুলে বুকে পিঠে সাবান ঘষে। এখনও তাই হল। বাদলা দুপুরের পচা ভ্যাপসা গরম তার ওপর ভুবনের পুরোনো ছোট্ট আবর্জনায় ঠাসা ঘরের অস্বস্তিকর গুমোটে ঘেমে ও স্নান ক'রে উঠছিল। কপালে গলায় ঘাম। গলার নিচে বুকের স্তনের পাশে পাশে মুক্তাবিন্দু হয়ে মুহুর্মুহু ঘাম জমছে আর পরমুহূর্তে তারা ভেঙে গলে ঝরে পড়ছে। সবল সুস্থ হাতে আঁচল ঘষে ঘষে মায়া ঘাম মুছল। ভুবনের দিক থেকে চোখ সরাল না। যেন শরীরটাকে আরও একটু স্বস্তি দিতে শাড়ি শায়া গুটিয়ে হাঁটুর খানিক নিচে পর্যন্ত তুলে ধরল। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা নরম গলায় প্রশ্ন করল, 'লঙ্কা পেঁয়াজ ঘরে আছে? পচা মাছ রসুন ছাড়া চলবে না কিন্তু।'

'দেখি, হয়তো আছে।' যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায় নধর সুডৌল পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভুবন ঘরের এদিক-ওদিক দেখে। 'রসুন থাকতে পারে, পেঁয়াজ যেন ফুরিয়ে গেছে।'

'নিয়ে আসুন, আমি উনুন ধরিয়ে দিলাম।'

ভুবন লঙ্কা পেঁয়াজ খুঁজতে উঠে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখল উনুন ধরেনি, কেবল গলগল ক'রে ধোঁয়া উঠছে। আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এক জোড়া চোখ ছুরির ফলার মতন চকচকে ঝকঝকে হয়ে গেছে।

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হল।

'দিদির চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।'

'কেন, কিসের ভয়।' মায়া নরম গলায় হাসল।

'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে-রকম দৃষ্টি, সেই চোখ।' খসখসে গলায় ভুবন হাসে। 'মিছে বলছি না কিন্তু।'

মায়া কথা বলল না।

। আরো জোরে চেপে এল।

কিন্তু জলের ঝমঝম ছাপিয়ে বাইরে অদ্ভুত একটা ডাক শোনা গেল। যেন ঘরের পিছনে অসহ্য উল্লাসে একটা ভুতুম পাখি গলা ছেড়ে ডাকছে।

আর সেই মুহূর্তে দপ্ ক'রে উনুনে আগুন জ্বলে উঠল।

ভুবন খুশী। কালো চোখের মধ্যে আগুনের নাচ দেখতে পেয়ে মুখটা মুখের কাছে সরিয়ে আনল। 'দিদির চোখ জোড়া আরো সুন্দর আরো ভয়ানক লাগছে এখন।'

'কি রকম, কিসের মতন শুনি?' গর্বে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত করল মায়া।

'যেন বাঘিনী শিকার ধরেছে। খুশীর রক্তে দু' চোখ লাল।' খসখস ক'রে ভুবন হাসে।

মায়া কথা বলে না। কি ভাবে। তারপর আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার ঘরে আরশি আছে?'

ভুবন মাথা নাড়ল। 'ছিল। ভেঙে গেছে।'

'তবে আর কি।' যেন তাচ্ছিল্যের শীতলতা দিয়ে মায়া চোখের আগুন নিভিয়ে দিল।

'নিন পেঁয়াজটা ছাড়িয়ে ফেলুন। বসে থাকলে রান্না নামবে কি। শিলনোড়া থাকলে দিন চট্ ক'রে লঙ্কা দুটো বেটে নিই। হলুদ কোথায়?'

মরা মাছের ফ্যাকাশে চোখ তুলে ভুবন ঘরের এদিক-ওদিক দেখে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে যায়। কাঠ। মরা গাছ চোখের সামনে হাঁটছে। বিদ্যুৎশিহরণ মেরুদাঁড়ার অর্ধেক পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল টের পেয়ে মায়ার কান্না পায়। বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে ভাবে।

অফিস থেকে প্রণব সকাল সকাল ফেরে।

ফজলি আম নিয়ে এল, এক ডিবি পাউডার কিনে আনল।

মায়া হাসল। তা বিকেলে ও সেজেছিল ভাল। সুন্দর খোঁপায় এতবড় একটা নীল অপরাজিতা গোঁজা। সিঁদুরের ফোঁটাটা টকটক করছে সিঁথিমূলে। অপরাজিতা রঙের ব্লাউজ। ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে হাল্কা কমলা রং শাড়ি। ঠোঁটে রং আছে কি না প্রণব বুঝতে পারল না। তোয়ালের কোণায় আলতা লাগিয়ে ঠোঁট ঘষা হতে পারে। প্রণব অনুমান করল। তার ঘরে লিপ্‌স্টিক নেই।

'নাও, এইবার পাউডারটা মেখে ফেল। পাউডার তো ফুরিয়েছিল।'

'ব্‌বা। অফিস থেকে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ কি! আমার সুন্দর মুখের কথা ভেবে? বিকেলে কতক্ষণে পাউডার মেখে সাজব বলে!'

'তো, তুমি কি মনে কর। তোমার কি মনে হয় না সারাক্ষণই আমি একটি মুখের কথা ভাবি ? অফিসে যেতে, অফিসে বসে, অফিস থেকে বেরিয়ে ?'

'বাড়াবাড়ি। তুমি যে আমার কথা মনে কর না তা আমি কখনো মনে করি না। বরং দুঃখ, একটু বেশি মনে রাখো বলে। একটু কম ক'রে যদি রাখতে আমি সুখী হতাম। আমার জীবন সুখের হ'ত।' মায়া একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল।

আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে প্রণব চুপ ক'রে গেল। কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধোয়। পাউডার ও আম সরিয়ে রেখে মায়া চা করতে বসে।

ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল।

বাদলা দুপুরের পর রোদ-লাগা বিকেল বড় চমৎকার। ভালয় ভালয় চা খাওয়াটিও হল। এক সঙ্গে বসে। মুখোমুখি হয়ে বসে গল্প করল দু'জন।

একটা হলদে প্রজাপতি দু'জনের মুখের সামনে ওড়াউড়ি করল। সেই দুপুরের ডালিম-ডালে-বসা প্রজাপতি। দেখে তখনকার ছবিটা মনে হতে মায়া চুপ ক'রে রইল।

'কত বড় পতঙ্গ !' একবার ইচ্ছা করছিল তার প্রণবকে বলে। বলে : 'সুন্দর আরো কত জিনিস পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে একবার চোখ মেলে দেখো।' কিন্তু একটা জরুরী কথা এসে যাওয়াতে মায়ার আর তা বলা হয় না। ইচ্ছা করেই চুপ ক'রে রইল। তারপর অবশ্য ও কাজের কথায় মুখ খুলল : 'তা তোমার যখন বন্ধু তখন ওটা ক'রে ফেল না। একটু কমিয়ে টমিয়ে দেবে খরচ। এ-বয়সে প্রিমিয়াম চালাবার সাহস যদি না-পাও তবে আর কবে পাবে, আর হবে কি।'

প্রণব চুপ ক'রে মায়ার মুখ দেখে কথা শোনে।

'আমি তোমায় এটুকুন বলতে পারি। তিন হাজার টাকার ইন্সিওর করেও এই আয়ে আমরা সুন্দর চালিয়ে যেতে পারব। দুটি তো মুখ। তুমি আর আমি। কিচ্ছু কষ্ট হবে না প্রিমিয়াম চালাতে।' মায়া চুপ করল।

প্রণব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। মায়া মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। মনের ভাব বুঝতে পেরেছে আশঙ্কা ক'রে প্রণব চুপ করে রইল। খরচ চালাতে পারবে কি পারবে না। ভবিষ্যতে এই সংসারে তিনটি মুখ হবে কি চিরকাল তারা এমনি দু'জন থাকবে। পলিসির চাঁদা চালাতে অসুবিধাটা কি ইত্যাদির আলোচনা আপাতত চাপা দিতে প্রণব হঠাৎ শব্দ করে হাসল।

চমকে উঠল মায়া।

'খুব খুশী দেখছি !'

'একটা মজার গল্প তোমাকে বলা হয়নি। আজ শুনলাম।'

প্রণব ঝুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু গল্প শুনতে স্ত্রীর খুব আগ্রহ নেই চোখের রং দেখে সে টের পেয়ে আবার গম্ভীর হয়। সোজা হয়ে বসে।

'উঠি, উনুনে আঁচ দিতে হয়।' হাই তুলে মায়া বাইরে উঠোনে গাছের মাথায় সোনার পাতের মতন রোদের শেষ ঝিকিমিকি দেখে। প্রজাপতিটা উড়ে বেরিয়ে গেছে। কোন্‌দিকে গেছে মায়ার চোখে পড়ছিল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক জোড়া বুলবুলি প্রাণপণে যত পারছিল ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে নিমফল খেয়ে নিচ্ছিল। পাখার ঝাপটায় পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নিচে ঝরছিল। ডুমুরজঙ্গলের দিকে চোখ গেল মায়ার। এ বাড়িতে ওখান থেকে অন্ধকার নামে, সন্ধ্যা শুরু হয়। এর মধ্যেই দুটো জোনাকি এসে জুটেছে ওধারে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল মায়া।

'গল্পটা শুনবে?' ভয়ে ভয়ে প্রণব প্রশ্ন করল।

'কার গল্প কিসের গল্প!' মায়া ঘাড় ফেরালো না।

'অফিসে সুকুমার আমাকে বলল, সুকুমার ভঞ্জ।'

মায়া নীরব।

'সুকুমারদের পাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছে।'

কিন্তু ও-পক্ষের কোনোরকম উৎসাহ নেই লক্ষ্য করে প্রণব আবার দমে যায়। চুপ করে থাকে। মায়া উঠে দাঁড়ায়। 'চলি—উনুনে—'

যেন শেষ উদ্যম নিয়ে প্রণব বেশ বড় গলায় হাসল: 'গল্পটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তুমি বিশ্বাসই করবে না যে—'

'আহা বলো না, এতক্ষণে তো বলা হয়ে যেতো।' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। যেন গল্পটা অগত্যা শুনতেই হবে, না হলে আর একজন ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে চোখ-মুখের এমন ভাব প্রকাশ করে মায়া ধপ ক'রে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'কি গল্প শুনি?'

'সুকুমারদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক তার বাড়ির ঝিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পরশুর ঘটনা। এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি। বেশ বড় বড় দু-তিনটি-ছেলেমেয়ে। স্ত্রী, হ্যাঁ, ভদ্রলোকের স্ত্রীও যে অসুন্দরী এমন না। দিব্যি দেখতে-শুনতে মহিলা। সুকুমার দেখেছে। কাল চার-পাঁচবার নাকি ফিট্ হয়েছে। মহিলার দাদা এ জি অফিসের বড় চাকুরে। খবর শুনে ছুটে এসে কাল তিনি থানায় খবরও দিয়েছেন—কিন্তু তাতে কি আর—হা-হা।' শব্দ করে প্রণব হাসল। 'সুকুমারদের পাড়ায় সে এক বিশ্রী হৈ-চৈ—'

কিন্তু স্ত্রীর ভুরু দেখতে দেখতে প্রণবের হাসি মিলিয়ে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি সে গম্ভীর হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সে নির্লজ্জের মত হেসেছে।

'কী রুচি তোমার, কী বিশ্রী স্বভাব!' মায়া চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'এই গল্প শোনাতে তুমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছ ঘরে।' একবার থামল, উঠোনের ঘাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল একটুক্ষণ, তারপর প্রণবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল মায়া।

'তুমি কি জান না যে এসব গল্প আমি কোনোদিনই ভালবাসি না। তোমায় কি আমি একদিন বলিনি যে এসব কুৎসিত ঘটনা ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে আর কাউকে শোনাবে। আর কাউকে যতক্ষণ খুশি বসে থেকে রসিয়ে ফেনিয়ে বলে শেষ করে তবে ঘরে ফিরবে। আমাকে না, আমার কাছে এসব—'রাগে মায়া কাঁপছিল। 'ছিছি,—কোন্ ভদ্রলোক বাড়ির ঝির সঙ্গে পালালো, কোন্ লোক অফিসের টাইপিষ্ট মেয়ে দেখে ভুলেছে, কোন্ ছেলে বাসে-দেখা মেয়ের কাছে প্রেমপত্র লিখল, এসব ছাড়া কি পৃথিবীতে আর গল্প নেই, ঘটনা ঘটে না? আমি অন্য রুচির মানুষ। আমি কক্ষনো এসব কুৎসিত বাজে ছাইভস্ম কথাবার্তা ভালবাসি না, শুনি না। যদি ভাল কথা, সুন্দর কথা অফিসের বন্ধুদের কাছে শোন বাড়ি এসে বোলো, সারারাত বসে কান পেতে শুনব, শুনতে রাজী, বুঝলে।'

'হিতে বিপরীত হল।' একলা চুপ করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা বারান্দায় বসে প্রণব ভাবল। স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য এই গল্প না করে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলা উচিত ছিল। কি প্রসঙ্গ, এমন কোন্ বিষয় আছে যে, শুনলে মায়া খুশী হ'ত। প্রণব তার দু' বছরের বিবাহিত জীবনকে আর একবার সূক্ষ্মভাবে জরীপ করল। করে কিছু দেখতে না পেয়ে পেয়ারাতলার অন্ধকারের দিকে চেয়েছিল। অন্ধকারে একটা বিড়াল ঘুরঘুর করছিল। প্রকাণ্ড ধুমসী বিড়াল। ছাই রঙের। ধোঁয়া রঙের। যেন এই জন্যই দৃশ্যটা আরো খারাপ লাগছিল। তাকাতে ইচ্ছা করছিল না প্রণবের। অস্পষ্ট এলোমেলো চঞ্চল ঘোলাটে। বোঝা যায় না কোনটা বিড়াল কোনটা অন্ধকার। গুলিয়ে যায়। যেন এই ধরনের বিবাহিত জীবন তার। পুরুষের কাছে নারী এর চেয়ে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরা দেয় না। দেবে না! এক খাবলা অন্ধকার। হঠাৎ নড়েচড়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তারপর আবার চলন্ত ধূর্ত শিকারী মুখের গরম রক্ত মুছে চোখের নিমেষে জমে অন্ধকার হয়ে যায়। পেয়ারা-তলার চাপচাপ অন্ধকারের কিছুটা। নিরবয়ব নির্বোধ। অস্তিত্বকে রেণু রেণু করে রহস্যের অতল অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে, নিশ্বাস ফেলার শব্দটি না করে সংসারের সাত কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে মায়ার জুড়ি আর কেউ আছে কিনা চিন্তা করে প্রণব যেমন ক্রুদ্ধ হল তেমনি হতাশ হল। হতাশই বেশি হল। যা

স্বাভাবিক। সুখী না, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না। বন্ধুরাও বলে বটে। কেন সুখী না, কি দিয়ে সুখী না তার চুলচেরা হিসাব অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। প্রণব তার নিজের সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য হিসাব কারো কাছে তুলে ধরতে পেরেছে কি। পারল না। পারে না বলেই বুকের মধ্যে এক টুকরো কান্না নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। একটি মোটে তারা সেখানে। কিন্তু তা হলেও ঘোলাটে অন্ধকারের চেয়ে সূচের আগার মতন সূক্ষ্ম উজ্জ্বল এক বিন্দু আলোর মধ্যে অনেক বেশি শান্তি অনেক আশা লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়লে আলোর ফুটকি বাড়ে আশার ইশারা আকাশে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। কোন্ এক বন্ধু তাকে পরামর্শও দিয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি বাধলে কথায় কাজে না বনলে চুপচাপ বসে রাত্রির অপেক্ষা করবে। আর একমুঠ অন্ধকার তোমার চারপাশে নামুক আরো কিছু তারা মাথার ওপর ঝিকিমিকি করুক। তারপর। তাই চুপচাপ একলা অন্ধকারে মশার কামড় সহ্য ক'রে বসে থেকে প্রণব গাঢ় গূঢ় রাত্রির অপেক্ষা করে। এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

মায়া ?

প্রণবের মত বাজে ভাবনাচিন্তা তার কোনোদিনই নেই।

আজও করল না।

বরং ততক্ষণ ক্ষিপ্র সুন্দর হাতে ও নতুন করে ঘর ঝাঁট দিল। বিছানা পাতল। আলো জ্বালল। আরো যা কিছু শোবার ঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ করে শেষবারের মতন দেয়ালের আয়নায় মুখখানা একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে চলল। শোবার ঘরের পিছনে ছোট্ট চালা।

কিন্তু সেখানে পা দিয়ে তখনি তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা হল না। অন্ধকার চালার নিচে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ও বাইরের দৃশ্যটা দেখে। কাদের বাড়ির একটা লিচু চারা, একটা নারকেল গাছ ওধারে। তারপর আকাশ। আকাশের কিনারে শাদা এক পোঁছ আলোর ইশারা জেগেছে। তার অর্থ চাঁদ উঠছে। এখনি উঠবে। একটা অদ্ভুত সময়। বৃষ্টির ভিজে হাওয়া মায়ার চোখেমুখে লাগল।

আর ঠিক তখন ও শুনতে পেল কোন্‌দিকে গাছের পাতার আড়ালে একটা পাখি যেন ঠোঁট ঘষছে। হয়তো পাখি পাখির ঠোঁট ঘষে দিচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে মায়ার রোমাঞ্চ হল। ইচ্ছা করে ও খোঁপাটা খুলে ফেলল। ঘাড়ের কাছে বেণীটা একটু সময় সাপের মতন প্যাঁচ খেয়ে লেগে থেকে তারপর হঠাৎ লাফিয়ে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর এসে ঝুলতে লাগল।

একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় মায়া। একটু ঝুঁকে ঈষৎ বাঁকা হয়ে।

আঁচলটা আর ঘাড়ে লেগে থাকে না, লুটিয়ে নিচে পড়ে।

বস্তুত তখন মায়ার সৌন্দর্য যে দেখেছে সে বলবে!

কিন্তু কে দেখবে।

কেউ দেখবার নেই বলে ভিজে হাওয়ার মতন একটা ভারি নিশ্বাস তার বুক ঠেলে গলার কাছে উঠে এসে যন্ত্রণা করতে থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণ। খুব অল্প সময়ই প্রণবের জন্য ও দুঃখ করে। কেননা মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। পারে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁট ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই। কেন নেই, আর কি নেই স্বামীর ভাবতে মায়া আজ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ভুলে থাকে। একটু একটু করে দু' বছরের অভ্যাসের পর এখন, আজ, নিজেকে ও বেশ সবল শক্ত মনে করছিল। আর এই জন্যই প্রণব কাছে ছিল না বলে তার এত ভাল লাগছিল।

ডুমুর-জঙ্গলের মধ্যে গিরগিটিটা হঠাৎ কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। মায়ার বুকটা কাঁপল। একবার। পরমুহূর্তে ও সহজ স্বাভাবিক হয়ে বরং মনের স্ফূর্তিটাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে উড়ন্ত জোনাকিটাকে ধরে ফেলল। জোনাকি ছুঁলে কি হয় ছেলেবেলায় শোনা কথাটা মনে হতে ও ঠোঁট টিপে হাসল। এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, রাত্রে বিছানায় সেটি করার ভয় অবশ্য নেই ভেবে মায়া নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ বিস্ফারিত করে যেন প্রায় শব্দ করে আর একবার হাসল, তারপর পোকাটাকে দেখতে লাগল। হাতের মুঠ খুলে আবার বন্ধ করল ও। আবার খুলল। খুঁটিতে আর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে পা ছড়িয়ে বসল। ইঁট দিয়ে এক চিলতে বাঁধানো জায়গা। পা ঝুলিয়ে বসলে নিচের ঘাসে পায়ের গোড়ালি ঠেকে। মায়ার এটা ভাল লাগে। সাপের আস্তানা হবে ভয় দেখিয়ে প্রণব সব ঘাস কেটেছেঁটে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতে চেয়েছিল,—মায়া দেয়নি। সাফ করতে হয় সাপের ভয় থাকে সামনের দিকের উঠোন পরিষ্কার কর। এটা নয়। রান্নাঘরের পিছনের এই ছোট্ট ঘাস লতা আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মায়ার। তার নিজস্ব জগৎ। এখানে আর কারোর হাত লাগানো কি হাত বাড়ানো ও বরদাস্ত করে না। বলতে কি, ঘাসের মাথায় পা ঠেকলে পায়ের তলা যখন খসখস করে মায়ার খুব ভাল লাগে। চোখ বুজে ও এই খসখসটা অনুভব করে। যেন হাল্কা পাতলা মেয়েলি পা পেয়ে ঘাসের শিষগুলো ইচ্ছামতন সুড়সুড়ি দিতে থাকে। না, প্রণব একদিন ছোট্ট একটা পালক (সম্ভবত পায়রার) দিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু মায়ার তা ভাল লাগেনি। বরং তার রাগ পেয়েছিল। মুখে বলেনি

যদিও কিছু।. কিন্তু চোখমুখের ও এমন ভাব করেছিল যে, তারপর আর একদিনও প্রণব এ ধরনের রসিকতা করতে সাহস পায়নি। কেন ভাল লাগেনি কেন খারাপ লাগল তা নিয়ে মায়া মাথা ঘামায় না। শুধু ঘটনাটা তার মনে আছে। এখানে এখন ঘাসের শিষে পা ঠেকিয়ে সেদিনের কথা ভেবে ও হাসল। বস্তুত প্রণবের অধিকাংশ কাজই কেন ভাল লাগে না একদিন ঠাণ্ডা-মেজাজে বসে ভেবে দেখবে মায়া ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু বসা আর হয় না, যেন সময়ই পাচ্ছে না ও। বস্তুত যে জিনিস ভাবতে গেলে মন প্রফুল্ল না হয়ে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত হয় তাকে নিয়ে বসতে তার জন্য কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করতে যেন প্রকৃতিই তাকে দিচ্ছে না। প্রণবকে নিয়ে ও যে কী মুশকিলে পড়েছে তা যদি ঈশ্বর জানত।

চমকে উঠল মায়া। হাতের মুঠ আলগা করে আলোর পোকাটাকে দেখতে না পেয়ে ও অবাক হল, হতাশ হল। একটু ভাবতে গেছে আর তখনি এমন সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে ফেলল! এদিক ওদিক তাকাল ও, হাতের পিঠ দেখল, পা, পায়ের নিচের ঘাস—কোথাও নেই। তা ছাড়া উড়ে যেতেও তো পারে না। যা-ই ভাবুক, যতক্ষণই ভাবুক মায়া চোখ বুজে ছিল না। উড়ে যাবার সময় পোকাটাকে ও দেখতে পেত। না, আছে! এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুষ্টু এসে বসবে মায়ার স্বপ্নের বাইরে। কখন এল? চোখ ফেরাতে পারছিল না মায়া। ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেতে এখানে এসেই ও ব্লাউজের বোতাম খুলে দিয়েছিল। প্রণব না থাকলে খালি-গা হয়েই বসত। (গায়ে জামা না-রাখা প্রণব পছন্দ করে না। দিনের বেলা এমনকি রাত্রেও। দরজায় খিল না দেওয়া পর্যন্ত, আলো নিভিয়ে বিছানায় না ঢোকা পর্যন্ত মায়া বুক পিঠ ঢেকে রাখবে—হ্যাঁ, দাবি ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেবে মায়া, স্বামীর দাবি? ভাবতে মায়ার বিশ্রী হাসি পায়, করুণা করে ও লোকটাকে মনে মনে। যাক সেসব।) এখন ও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিজের বুকের দিকে চেয়ে রইল। সরু ঢালু জায়গা-টুকুতে একটা সবুজ মুক্তা হয়ে স্থির হয়ে বসে আছে জোনাকিটা। মুক্তার গা থেকে ঠিকরে পড়া হাল্কা সবুজ আলোয় তার বুক এখন সত্যিকারের কাঁচা ফলের মতন দেখাচ্ছে। বিদ্যুৎশিহরণ খেলা করে গেল মেরুদাঁড়ায়। মায়া অনুভব করল নিজের বুক দেখে এত বেশি মুগ্ধ অভিভূত ও আর কোনোদিন হয়নি। আর একদিনও না। ওকি? উড়ে যাচ্ছে! উড়ে গেল? হা করে চেয়ে রইল মায়া। হাত উঠল না। হাত বাড়িয়ে আবার ওটাকে ধরবার তিলমাত্র চেষ্টাও করল না ও। বরং চরম তৃপ্তির পর দারুণ আলস্য ও অবসাদ নিয়ে মানুষ যে চোখে কোনো একটা কিছুর চলে যাওয়া দেখে ঠিক সেভাবে ও চুপচাপ ডুমুরতলার অন্ধকারের দিকে আলোর পোকার উড়ে যাওয়া দেখল। কতক্ষণ এমনি স্থির

হয়ে একভাবে বসে কাটাল মায়ার খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল দেখল গাছের পাতা চুঁইয়ে জল পড়ার মতন বর্ষারাত্রির নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তার নরম শরীরের ওপর একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। আলস্য-ভঙ্গের হাই তুলে ও উঠে দাঁড়াল। ওধারে পেঁপে গাছের কাণ্ড আর নোনাধরা দেয়ালের মাঝখানে এক টুকরো মাকড়সার জালে কখন জানি দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল লেগেছিল, জ্যোৎস্না পড়ে এখন চিকচিক করছে অল্প হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে। না, উত্তরদিকে শাদা একটা ডেলা ছাড়া আকাশে আর কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। ঘাড় উঁচিয়ে মায়া সবটা আকাশ দেখতে চেষ্টা করল, তার নিজের ঘরের চালের জন্য বাকিটুকু দেখা গেল না যদিও। তা হলেও মায়ার মনে হল আজ রাত্রে আর বৃষ্টি হবে না। কী যে ভাল লাগছিল ওর। যেন শরতের রাত ভেবে একটা টিয়া পাখি কিচমিচ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের চাল ঘেঁষে একদিকে উড়ে গেল। কোনো আতাগাছে গিয়ে বসবে হয়তো, মায়া ভাবল, না কি কামরাঙা গাছে ?

হ্যাঁ, হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল তার কথাটা মনে হতে। এখন উনুন ধরাতে হবে। যদি উনুন না ধরায় ও যদি রান্না না করে, আজ, একটা রাত কি চলে না। খুব চলে। কেন চলবে না। অন্তত মায়ার কোনো অসুবিধা হয় না। আম আছে। প্রণব ফজলি আম এনেছে। একটা আস্ত আম যদি খায় ও তো ভাতের দরকার হয় না। তাই খেয়ে দিব্যি শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু প্রণব পারবে কি ? ভাত না হলে ? প্রস্তাবটা দেবে ভেবে মায়া ইতস্তত করতে লাগল। এক পা অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়াল ও। প্রণব কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছিল তার বারান্দার চেয়ারে বসে প্রণব ঘুমোচ্ছে।

বরদাসুন্দর বটব্যালের শহরতলির (ধরুন না টালা) এক জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বাড়ির ভাড়াটে দম্পতির রান্নাখাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে গল্প দীর্ঘ হয়ে যাবে। কেবল এইটুকু বললে চলবে যে, মায়াকে রান্না করতে হল। প্রণব চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েনি। পায়চারি করছিল সিগারেট টানছিল। চিন্তামগ্ন। কিছু ভাবছে বুঝতে পেরে মায়া কাছে ঘেঁষেনি।

আয়োজন সামান্য। ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল। চট্ করে রান্না হয়ে গেল। দু'জনে খেতে বসে কথা হল না।

যেন দু'জনেই ভাবছিল এখন কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না। ভালয় ভালয় খাওয়া-দাওয়াটা শেষ হোক্।

খাওয়া সেরে লবঙ্গ মুখে দিয়ে প্রণব পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল।

এঁটো বাসন জড়ো করে রেখে হাত ধুয়ে মুখ মুছে মায়া ঘরে এল।

প্রণব হাত বাড়িয়ে হারিকেনের আলো চড়িয়ে দিল।

মায়া চিরুনি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শোবার আগে চুল আঁচড়ানো তার চিরদিনের অভ্যাস। মায়া পান খেয়েছে। ইলিশমাছ খেয়ে মুখে আঁশটে গন্ধ লাগছে ব'লে পান খেয়েছে। এমনি অভ্যাস নেই। প্রণব পান খায় না। কাকে দিয়ে মায়া পানের খিলিটা কিনিয়ে এনেছে প্রণব জিজ্ঞেস করল না। কেবল লাল টুকটুকে এক জোড়া ঠোঁটের দিকে সে চেয়ে রইল।

'ব্লাউজটা খুলে ফেল না হয়, খুব ঘামছ।'

মায়া শব্দ করল না বা প্রণবের দিকে তাকাল না।

সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে প্রণব চুপ করে রইল।

চিরুনি চালাবার সময় মায়ার হাতের চুড়ির রিনঠিন শব্দ হয়। মায়ার হাত মাথা চুলের ছায়া এই এত বড় হয়ে দেয়াল ও সিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ছায়ার দীর্ঘ ঢেউ হয়ে চুলটা উঠছে নামছে দুলছে। আর সেই ঢেউ-এর বুকে চিরুনির ছায়াটা একটা ছোট্ট নৌকো হয়ে নেচে নেচে চলেছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রণব দৃশ্যটা দেখল। একটা পোকা ঘরে ঢুকেই আলোর কাছে ছুটে এসে হারিকেনের চিমনির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে নিচে ছিটকে পড়ল। মেঝের আবছা অন্ধকারে পোকাটাকে আর দেখা গেল না।

'আলো নিভিয়ে দেব?' মায়া ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার হয়ে গেছে?' উৎসাহের চোখে প্রণব স্ত্রীর মুখ দেখল ও পিঠ টান ক'রে সোজা হয়ে বসল।

'হওয়া আর কি।' তেমন ভাল ক'রে কথার উত্তর দিল না মায়া। চিরুনি রেখে দিয়ে চুলে প্যাঁচ তুলে কোনোরকমে একটা এলোখোঁপা করে রাখল।

'আলো নিভিয়ে দিই?' মায়া আবার বলল।

'যা ঘামছ জামাটা খুলেই ফেল।' প্রণব ঈষৎ ঝুঁকে বসল।

মায়া আলোটা দেখতে লাগল।

প্রণব ইচ্ছা করে সামান্য হাসল।

মায়া নীরব।

হামাগুড়ি দিয়ে প্রণব বিছানার লাগোয়া জানালার পাল্লাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুরে বসল।

মায়া মুখ তুলছিল না।

ভুরু পর্যন্ত হারিকেনের আলো লেগেছিল ওর। কপালটা অন্ধকার ছিল বলে অসংখ্য কুঞ্চন প্রণব দেখতে পেল না তাই সাহস করে গলাটা একটু ভিজিয়ে

মোলায়েম সুরে বলল, 'না না আমি তো বলছি, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে দেখছি। অন্য কাউকে না।'

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া ক্ষীণ হাসল। হাসির মধ্যেও দুটো চোখ জ্বলছিল। প্রণব ঢোক গিলল।

'না না রিয়্যালি বলছি। আমি যে অন্যায় কিছু করছি না; আমি যে, আমিও যে তোমার মতন বাইরের এত লোকের এত সব কীর্তি কত বেশি অপছন্দ করি এটা তোমার কাছে প্রমাণ দিতে তোমাকেই দেখতে চাই। এর চেয়ে পবিত্র কাজ আমার পক্ষে আর কি আছে তুমিই তার রায় দাও।'

একটা টিকটিকি ঘরের চালে ডেকে উঠল।

একটা ভীষণ আপত্তি আঙুলের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে মায়া ব্লাউজের বোতামে হাত দিল।

প্রণব একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমার চেয়ে ভাল রুচি যে আর কারোর নেই তুমি কি আজ দু'বছর বিয়ের রাত থেকে কালকের রাত পর্যন্ত টের পাওনি? রিয়্যালি আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি সুকুমারদের পাড়ার সেই ভদ্রলোকদের ক্লাসের লোককে। ছি ছি ছি, শেষ পর্যন্ত ঝি! আমার উচিত হয়নি জঘন্য খবরটা এনে তোমার কানে তোলা।'

'যাক আর বেশি বকতে হবে না। এইবার আলো নিভিয়ে দিই। শুতে দাও।'

একটু সময়ের জন্য প্রণব নিশ্বাস ফেলল, 'কেন?'

'লজ্জা করে, ভাল লাগে না।'

প্রণব একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'লজ্জা করে।' একটু থেমে পরে সে বলল, 'বলো ভাল লাগে না, আমাকে তোমার ভাল লাগে না, তাই এরকম করছ।'

'কি রকম?'

প্রণব কথা বলল না।

'দু' বছর আমায় দেখে কি তৃপ্ত হওনি।'

'হইনি হইনি।' যেন প্রবল ক্রোধে প্রণব এবার ফেটে পড়ল। তৃপ্তি পাই না শান্তি পাই না বলে এখন বাতির আলোয় তোমার রূপ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিছুটা ক্ষতিপূরণ হোক।'

'ও সেইজন্যেই ক্ষোভ।' মায়া আঁচলটা তুলে বুকের ওপর জড়ো করল। একটু পায়চারি করল। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে প্রণবের সামনে ফিরে এল।

'সেই চিন্তা সেই ধ্যান তোমার। এই জন্যেই ঘরে আলো রেখে নিজেকে আমি দেখাতে চাই না।' মায়া খুব আস্তে বলল না। তাতে অবশ্য ক্ষতি হল না। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আকাশ মেঘে মেঘে কালো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। এখন ঝমঝম ক'রে বর্ষণ শুরু হল। যেন হুতুম পাখিটা অসময়ে দু'বার ডেকে উঠল।

আলো নিভিয়ে মশারির ধারগুলো টেনে দিতে দিতে মায়া বলতে লাগল, 'সেই পাপ চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরতে লজ্জা করে বৈকি। ভালও লাগে না।'

'বেশ তো, যাকে ভাল লাগে তাকে দেখাও তার সামনে সব খুলে মেলে দাঁড়িও।' প্রণব দেয়াল ঘেঁষে বিছানার একপাশে শুয়ে রইল। 'আমি আর দেখতে চাইব না।'

'কে দেখছে কাকে দেখাচ্ছি যদি জানতে তো তোমার মন একটু উন্নত হ'ত। রোজ রাত্রে আমার জন্যে তুমি এমন হ্যাংলামো করতে না।'

'অ, তা হলে কেউ দেখছে,' শ্লেষের সুর বার করল প্রণব। 'তা হলে বলো এমন কেউ আছে যাকে সব দেখিয়ে সব দিয়ে তৃপ্তি পাও, আমাকে না?'

'হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ে গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।'

'কখন দেখাও,' যেন একটু হাসতেই চেষ্টা করল প্রণব। 'আকাশের নিচে কোথায় ব'সে সব খুলে দাও আমাকে বলতে পার?'

'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' মায়া শুয়ে ছিল। রাগ করে উঠে বসল। 'নিশ্চয়ই আমাকে একসময় স্নান করতে হয়, কাপড় বদলাতে হয়। ইতর অভদ্র কোথাকার!'

কিছুক্ষণ আর কথা শোনা গেল না প্রণবের। যখন শোনা গেল মনে হল ঘুমে কথাগুলো গাঢ় ভারি হয়ে গেছে। অভিমানেও হতে পারে, মায়া ভাবল।

'তাই তো বলি তোমার মতিগতি বোঝা ভার। তাই তো বন্ধুরা বলে নারী-চরিত্র। আর এদিকে সারাক্ষণ আমি ভেবে ভেবে মরি। পাউডার ফুরোতে পাউডার নিয়ে এলাম। ফজলি আমের চালান এসেছে এক টাকার আম কিনে আনলাম।'

'সস্তা জিনিস দিয়ে সস্তা জিনিস আদায় করো। আমার কাছে পাবে না। তেরো বছরের খুকির কাছে গিয়ে এই কান্না কেঁদো—পাবে। আমি আর

তোমার কান্নায় গলে যেতে রাজী নই, যত খুশি চোখের জল ফেলো।'

সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিশ ভিজে যাচ্ছে।

একটা বিশ্রী গুমোটে মায়ার মাথা ধরছিল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে তার ভাল লাগল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ আবার বৃষ্টিটা থেমে গেছে। টের পাচ্ছিল ও। আস্তে আস্তে বিছানার দিকের, না, উল্টোদিকের জানালায় সরে গিয়ে দুটো পাল্লা খুলতে বাইরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল ও। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। 'মেঘের পর রৌদ্রের মতন।' মায়া মনে মনে বলল। রাত্রেও চাঁদের আলো আর বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলছে। যেন কোনদিকে কদমফুল ফুটেছে। ভিজে হাওয়ায় টাটকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

এক পা এক পা ক'রে ও আর একবার বিছানার কাছে সরে এল। নাক ডাকছে, কাঁদতে কাঁদতে এইবেলা প্রণব ঘুমিয়েছে। কান খাড়া ক'রে রাখল ও একটু সময়। আর ঠিক তখন মায়া শুনল বাইরে পাতার ঝোপে একটা পাখি ডানা ঝাড়ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো জলের ফোঁটা ঝরে পৃথিবী আবার চুপচাপ। নিঝুম।

চিকরিকাটা আলপনায় ভুবনের পৈঠা ভরে গেছে। ডুমুরপাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে পড়ে এই কাণ্ডটি হয়েছে। এক সঙ্গে এত আলোছায়ার ঝিলিমিলি দেখে মায়ার চোখের পলক পড়ছিল না। আর তাকেও অপরূপ দেখাচ্ছে। অজস্র জ্যোৎস্না ছায়া বুকে মুখে মেখে খুঁটি ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে মায়া বসে আছে। একদৃষ্টে ভুবন তাকিয়ে দেখল!

'নিন ধরুন।'

'ছি, এতগুলো ফুল নিয়ে এলেন—মালা! দোপাটির মালা। কোথায় পেলেন?'

'বৌবাজার।' খসখসে গলায় ভুবন উত্তর করল। স্টোভটা সারিয়ে পার্টিকে বুঝিয়ে দিতে ওদিকে যেতে হল কিনা। বাজারের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল।'

মায়া কথা বলল না।

'নিন, পরুন মালাটা, গলায় আটকে দিন। একবার চেয়ে দেখি কেমন লাগে।'

'এলোখোঁপা,' ভুবনের হাত থেকে মালাটা তুলে নিয়ে মায়া ক্ষীণ গলায় হাসল। 'ভাল দেখাবে কি।'

'সবরকম খোঁপাতেই ভাল দেখাবে। দিদির এই চুলে দোপাটি গুঁজলেই হল।'

'শাদা ফুল।'

'রাত্রে খুলবে ভাল। রাতের চুলে শাদা মানায়।'

খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়া বাইরের উঠান দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রূপালি জল ঝরছে।

'সেই দুপুর থেকেই মগজে দোপাটি ফুল ঘুরছিল। কপাল ভাল পেয়ে গেলাম, দিদিকে সাজাতে পারলাম।'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শব্দ না করে হাসল। কি একটু চিন্তা ক'রে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'সাজাবার, সাজ দেখবার এত শখ। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম পরিবার সংসার কি কোনোদিনই নেই, ছিল না?'

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হয় ভুবনের গলায়।

'ছিল, তা সেসব ইচ্ছা করে বলিনি, কি হবে বলে।'

'তা, শুনি?'

'একবার না তিনবার। তিন-তিনটে পরিবার ঘরে আনলাম, একটাও থাকেনি।' ভুবন চুপ করল।

'কোথায় ওরা?'

'প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হুঁ মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তাও তো ক'বছর হয়ে গেল।'

কথা শুনে মায়া চমকে উঠল না, মরা কাঠের জীর্ণ কাঠামোটার দিক থেকে বিস্ময়ে ও চোখ ফেরাতে পারছিল না। কিন্তু কথা তখনও শেষ হয়নি, একটু থেমে ভুবন বলে, 'এখন আবার আমাদের উল্টাডাঙ্গার শশী বায়না ধরেছে। আজ ছ'মাস ধরে ঝোলাঝুলি করছে। হুঁ, একটা মেয়ে আছে ওর হাতে। বিধবা ভাগ্নীর মেয়ে। সোমত্থ মেয়ে কাঁধে নিয়ে মাগি ভারি বিপদে পড়েছে, তাই শশী ঘুরঘুর করছে।'

জলতরঙ্গের মিষ্টি বাজনার মতন মায়ার নরম হাসির ধ্বনিতে চারদিকের আলোছায়া কাঁপে। আবার কোনদিকে পাতার আড়ালে পাখি ডানা ঝাপটায়। হাসি থামতে মায়া বলল, 'বলেন কি, এই বয়সে আবার! আপনি সাহস পান?'

'পাই না, সাহস পাচ্ছি না বলে তো শশীকে কথা দেওয়া হচ্ছে না।'

'না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না।' ব্যস্ত হয়ে মায়া বলল, 'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।'

'তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি।' মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। 'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'

পাথরের মতন স্থির শক্ত হয়ে গেল মায়া। এক মুহূর্ত তারপর অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড থেকে নিজেকে মুক্ত করল, ক'রে সোজা হয়ে বসল। ফ্যাকাশে ঘোলা চোখে কতটা রক্তের জোয়ার এসেছিল আবছা অন্ধকারে বুঝতে না পেরে কেমন একটু অসহায়বোধ করল ও। তা হলেও সেই ভাবটা কাটাতে ওর দেরি হয় না, আস্তে আস্তে বলল, 'শশীকে বারণ ক'রে দিন, বুঝলেন, শশীকে বলে দিন যে এ বয়সে আর—'

'বলব, আমি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছি, শশীকে শেষ কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।'

হঠাৎ আর কথা বলে না মায়া। ঘাড় ফিরিয়ে উঠোন দেখে। যেন নিজের ঘরের দিকে চোখ যেতে কি ভাবে।

'কি, কর্তাবাবু কি জেগেছেন, এইবেলা জাগবেন?' ভুবন গলা বাড়িয়ে দেয়। মায়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, থুথু ফেলল, যেন থুথু ফেলতেই উঠোনের দিকে মুখ বাড়িয়েছিল ও। তারপর ঘুরে বসে শান্ত মোলায়েম গলায় বলল, 'এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে?'

খসখসে গলায় ভুবন হাসল।

'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নড়াচড়া করছে। চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির।'

'তাই নাকি, ঘরে গিয়ে আয়নায় দেখব তুলনাটা ঠিক হল কিনা।'

'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না?' যেন এই প্রথম ভুবনের গলায় দুঃখের আওয়াজ বেরোলো। 'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক'রে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।'

যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠেছিল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হতে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। 'বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?'

ইঁদুর

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে যতীন।

আর-একটু হলেই ডান হাতের আঙুল ক'টা ওর ইঁদুর-মারা কলে থেঁতলে যেত। র‍্যাশন-আনা ক্যাম্বিসের থলেটা বার করতে হাত বাড়িয়েছিল বেঞ্চির তলায়। কে জানত, ওরই তলায় ওত পেতে বসে আছে সর্বনেশে কলটা। লোহার ধারালো দাঁত আঙুলে ফুটতেই চট করে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তাই না রক্ষে।

সাবধানে কলটাকে বাইরে টেনে আনে যতীন। তীক্ষ্ণদন্ত ইস্পাতের যন্ত্রটা হাঁ করে রয়েছে; সদ্য-ধার-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকার দুটি করাতের ফলা শিকার ধরার সম্ভাবনায় তখনও অপেক্ষমান।

'কই শুনছ, শীগ্রি একবার এস তো এখানে!' রুক্ষ গলায় হাঁক পাড়ে যতীন।

সামনে দালানে বসে বাসী রুটিগুলো দালদায় ভেজে নিচ্ছে মলিনা। বসে বসেই উত্তর দেয়, 'আমার হাত জোড়া। কি বলছ বলো?'

'এখান থেকে বললেই যদি হবে তবে তোমায় সোহাগ করে ডাকছি কেন? ঘরে এসে স্বচক্ষে তোমার কাণ্ডটা একবার দেখে যাও।'

যতীনের তাগিদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না মলিনা। পরিপাটি করে স্বামীর জল-খাবারের থালা গুছোয়। দালদায় লালচে করে ভাজা খান চারেক বাসী রুটি, দু টুকরো বেগুন ভাজা, একটু গুড়।

স্বামীর দিকে জলখাবারের থালাটা এগিয়ে দিয়ে মলিনা বলে, 'অমন করে হাঁক পাড়ছ কেন, হয়েছে কী?'

'হয় নি, তবে আর-একটু হলেই মোক্ষম একটা কিছু হত—!' মুখ চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে যতীন কলটার দিকে ইঙ্গিত করে।

মেঝের দিকে তাকিয়ে মলিনা একটু অবাকই হলো হয়ত।

'ওটা আবার টেনে বের করতে গেলে কেন?'

'না' বাব করব কেন, ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দি—তারপর আমার আঙুল ক'টা উড়ে যাক, না হয় তোমার পায়ের গোড়ালি—!' রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে যতীন ভুরু কুঁচকোয়।

'আহা, কি আমার বাক্যি রে—' মলিনা স্বামীর প্রতি ভ্রূভঙ্গি হেনে মেঝেতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলে, 'ধান ভানব মরণকালে, দাঁড়িয়ে থাকি ঢেঁকিশালে। কবে তোমার হাত কাটবে, পা কাটবে, তাই ভেবে কলটাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরে রাখি!'

আহার-পর্ব শুরু হয়েছে। তবু চটেমটেই উত্তর দেয় যতীন, 'মেয়েলি শ্লোক

মরণকাল পর্যন্ত তোমায় আর ঢেঁকিশালে অপেক্ষা করতে হত না !'

ইঁদুরকলে হাত দিয়েছিল মলিনা ; স্বামীর কথাটা কানে যেতেই হাত সরিয়ে নিল। তাকাল যতীনের মুখের দিকে।

'বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়েছিলে কেন ?'

'থলে বের করতে।'

'একটু আর তর সইছিল না, যত রাজ্যির জিনিসপত্র হাঠকাতে লাগলে !' উচ্চস্বরে বলে মলিনা ; ইঁদুরকলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

বেঁকা চোখে যতীন স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করছিল। কলটা সম্পর্কে এতটা তাচ্ছিল্য তার মনঃপূত নয়।

'আবার, আবার সেই—কথাটা গ্রাহ্যি হল না ?'

'না, হল না।' মলিনা উঠে দাঁড়ায়। কথা দিয়েই ও যেন ধমক দেয় যতীনকে, 'অযথা তুমি সর্দারি ক'রো না তো ! আমার সংসার, আমি যা ভাল বুঝব করব !'

'কোথায় ইঁদুর তার ঠিক নেই কল পেতে বসে আছে !' যতীন বিড়বিড় করে।

'কোথায় ইঁদুর তুমি তার কি জান ? আমি বুঝি, তাই কল পেতে বসে থাকি ! তুমি মাথা ঘামাও কেন ?' পালটা জবাব দেয় মলিনা। কথার শেষে ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্ত্রীর অহেতুক একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে যতীন।

চায়ের কাপ হাতে করে একটু পরেই মলিনা আবার ঘরে ঢোকে।

'টাকা নেবে না ?' স্বামীকে লক্ষ করতে থাকে মলিনা।

'নেব না তো টাকা পাব কোথায় ? মুফতিতে র‍্যাশন দেবে, অফিসটা আমার শ্বশুরবাড়ি কিনা !' এঁটো থালাটা মেঝেতে রাখতে রাখতে মেজাজী গলায় বলল যতীন। চায়ের কাপটাও উঠিয়ে নিল।

'আবার সেই কথা ? কতদিন না বলেছি আমার বাপ-মা নিয়ে যা মুখে আসে বলবে না !' চট করে চটে ওঠে মলিনা।

'আমার বয়েই গেছে তোমার বাপ-মা নিয়ে কথা বলতে !'

'ও ! শুনি তবে শ্বশুরটা তোমার কে ?'

মলিনার কথার কোনো জবাবই দেয় না যতীন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের কাপটা শেষ করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ও যেন বাঁচে।

মলিনা নিরুত্তরে র‍্যাশনের থলে গুছোয় ; বাক্স খুলে টাকা বের করে তক্তপোশের ওপর রাখে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে যতীনের। পায়ের মোজাটা ঠিকঠাক করে হাঁটুর নিচে দড়ি বাঁধে। তাক থেকে পেন্সিল আর নোট-খাতাটা উঠিয়ে নিয়ে বুকপকেটে গোঁজে। তারপর একটা বিড়ি ধরায়।

'টাকার গাছ আছে নাকি আমার—যা ছিল দিলুম। দুটো টাকা আর বাজারের আছে। ভালো কথা, বাজার করে দিয়ে যেও!' মলিনার গলায় বেশ ঝাঁঝ।

একটু বুঝি হতভম্ব হয়ে পড়ে যতীন, চট করে জবাব খুঁজে পায় না। সামলে নিয়ে বলে, 'পনেরো দিনের র‍্যাশন পাঁচ টাকায় হয় নাকি? ফি বার দিচ্ছ।'

'এবার নেই তো দেব কোত্থেকে? চুরি বাটপাড়ি করব?' ফিরতি প্রশ্ন মলিনার।

এক মুহূর্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যতীন বলে, 'বেশ! পাঁচ টাকায় যা হয় নিয়ে আসব।' কথার শেষে নোটটা খাকি হাফ-প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

যতীন বেরিয়ে যাচ্ছিল মলিনা বলল আবার, 'বাজার করে দিয়ে যাও।'

'সময় নেই। আটটায় ডিউটি, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।'

'ভালোই তো, আমার আর কি, ডালভাত রেঁধে রেখে দেব। আমার মুখে সব রোচে।'

'আমারও।' যতীনের জবাব।

'কিন্তু তোমার বন্ধুটির? তাঁর ত আজ সকালেই ফিরে আসার কথা। সন্ন্যাসী মানুষ, তায় আবার প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলী। ফল চাই, মূল চাই, কলা চাই। কোনো ত্রুটিটুটি হবার জো নেই। হলে তোমার মাথা কাটা যায় আর আমার বাপ ঠাকরদাকে সগ্‌গে থেকে টেনে এনে হেলাফেলা করা হয়—।' তাকের ওপর অযথা খুঁটিনাটি কি একটা গুছোতে গুছোতে ভাবী গলায় বলল মলিনা।

'বাসু আজই কল্যাণেশ্বরী থেকে ফিরছে নাকি? যতীন ঘুরে দাঁড়ায়।

'কি জানি, বলে তো গেছে—'

'হুঁ।' যতীন মাথা নাড়তে নাড়তে টানা একটা শব্দ করে মুখ বুজেই তারপর মুখ খোলে, 'আমার আর সময় নেই। যা হয় ক'রো।'

দালানে নেমে যতীন তার ঝড়ঝড়ে সাইকেলটার চাকা পরখ করছে, দেখছে পাম্প আছে কি না—শুনল ঘর থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মলিনা বলছে, 'করব আবার কি? আমি কিচ্ছু করব না, রোজ রোজ পরকে পায়ে ধরে সেধে বাজার আনাব? আমি আর কাউকে সাধাসাধি করতে পারব না—যা আছে ঘরে তাই ফুটিয়ে রেখে দেব। এতে কার পেট ভরল না, মন উঠল না, অত আমার দেখার দরকার নেই।'

যতীন চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে দেখল মলিনা—সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে সেই একইভাবে স্বামী তার প্রস্থান করল। ওর চলে যাবার ভঙ্গিটাই এমন—যা থেকে মনে করা যায় সকালবেলার দাম্পত্যকলহের জের সবটুকুই স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ও নিজে খালাস পেল; চলে গেল।

চারপাশটা লক্ষ করল একবার। পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল এঁটো বাসন আর কাপ দুটো নিয়ে দালানে রেখে এসেছে। আবার একবার বিছানা ঝাড়ল; ঘর ঝাঁট দিল। জলের ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগল ঘরের মেঝে।

বসে বসে উবু হয়েই ঘর মুছছিল মলিনা। বেঞ্চির কাছে আসতেই ইঁদুরমারা কলটা আবার তার চোখে পড়ে। ঠিক আগের মতোই মুখব্যাদান করে বসে আছে যন্ত্রটা। হাতের কাজ থামিয়ে মলিনা একমনে তাই দেখে।

এই নিয়েই তো যত গণ্ডগোল, মলিনা ভাবছিল: অফিস যাবার আগে অযথা কথা কাটাকাটি। যতীন হয়ত রাগ মনেই পুষে রাখল। অফিসে একটা কেলেঙ্কারীও বাধাতে পারে—চাই-কি দুপুরে হয়ত খেতেই আসবে না বাড়িতে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েছে বইকি। বাড়িতে কিছু বলে নি যতীন, ওর মুখ দেখে বোঝবারও উপায় ছিল না, রাগের আঁচে তেতে আছে তার মন, মলিনা বসে আছে তো বসেই আছে—দুপুর গেল, বিকেল গেল—সেই সন্ধ্যের গোড়ায় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ফিরল যতীন। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, চোখ বসে গেছে। কোথায় ছিলে, কেন দুপুরে খেতে আস নি, কি খেয়েছ? জানো, তোমার জন্যে আজ একটু ইলিশ মাছ আনিয়ে ঝাল রেঁধেছি, বড়ি ভেজেছি, টক করেছি লাউয়ের। আর হ্যাঁ মশাই, আমিও দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে আছি সারাদিন। থাক থাক, সেহাগ দেখাতে হবে না। কতই তো বউয়ের ওপর টান। তাই তো—! মলিনা অভিমানে কেঁদে ফেলেছে। তখন যতীন ওর কান্না থামিয়েছে—চোখের জল দিয়েছে মুছে। বলেছে, আর কখনও এমন গর্হিত কর্ম করব না, লক্ষ্মীটি; সত্যি বলছি, মলিনা, তোমার দিব্যি।...আবার ওরা জোড় বেঁধে থালা সাজিয়ে খেতে বসেছে, গল্প করেছে হিজিবিজি, হাসিতে হাসিতে ছোট্ট ঘরখানাও যেন হেসে উঠেছে।

আনন্দে, খুশীতে, পরিচ্ছন্নতায়, নিবিড় সাহচর্যে এই ছোট্ট ঘরখানা হেসে উঠুক, খুশীতে টইটম্বুর হয়ে থাক ওরা দু-জন, দুটি মন—মলিনা তো তাই চেয়েছে। তাইতো এত! কিন্তু এটা বাড়ি নয়, বস্তি। তবু বাড়িই বল। এমন বাড়িতেই তাদের মত গৃহস্থরা থাকে। খোলার চালের ঘর একখানা আর একফালি দালান। সামনে একটু মাটির উঠোন। ভাড়া কুড়ি টাকা। তাও অনেক ধরা-কওয়া করে; নয়ত এই বাড়িরই নাকি ভাড়া ছিল চব্বিশ।

অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে মলিনা এ বাড়িতে পা দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনই ঘরে ঢুকে সমস্ত উৎসাহ যেন হঠাৎ উবে গেল। কেমন যেন ফ্যাকাশে, ভয়-পাওয়া মুখে প্রশ্ন করল, 'কু-ড়ি টাকায় এই বাড়ি?'

বিছানা খুলছিল যতীন। লণ্ঠনের আলোয় মলিনার মুখভাব তেমন ভালো করে দেখতে পেল না

কুড়ি টাকা একরকম তো সস্তাই। সে আসানসোলে আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেল। আর বাড়ি—তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা—চোখের পলকে এক-একটা রাজত্ব বনে গেল। এই শালার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও ভাড়া হত না। আর এখন—। বিছানা খোলা শেষ করে যতীন হাঁফ ছাড়ল।

লণ্ঠন নিয়ে মলিনা তখন ঘরের ইতি-উতি দেখছে। ইস, মাগো, ঘরের মেঝের কী ছিরি! সিমেণ্টের একটা পাতলা প্রলেপ না থাকলে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরই তারা দাঁড়িয়ে থাকত। সিমেণ্টেও কি আছে নাকি—ফেটে ফুটে একাকার। ঘরের এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত—দেওয়ালে চিড় ধরেছে। আর ঘরের মাথা! কোন্ যুগের ছেঁড়া চট দিয়ে সিলিং করা এখনও তাই টিঁকে আছে। তবু রক্ষে যেমন-তেমন করেও ঘরে সদ্য একবার কলি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বাড়িঅলা। এখনও চুনের গন্ধ ভাসছে। নয়তো দুর্গন্ধেই প্রাণ যেত।

'ও, মাগো—' হঠাৎ বিশ্রী রকম ককিয়ে উঠল মলিনা। ধড়মড় করে চৌকির ওপর লাফিয়ে উঠতে গেল। লণ্ঠনটা চৌকিতে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। দপ দপ করে লণ্ঠনের কাঁপা, অসম, এলানো শিষটা কাচের মধ্যে কিলবিল করল, ধোঁয়া, জমল খানিকটা আর তারপরই সব অন্ধকার। নিকষ কাল রঙে সবকিছু ডুবে গেল, মুছে গেল।

'কি হলো? এ্যাঁ—?' যতীন উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'ইঁদুর!' মলিনার গলার স্বর দ্রুত, হ্রস্ব, আতঙ্কভরা।

'ইঁদুর!' যতীন প্রথমে বোবা, আরপর তাচ্ছিল্যমাখা তরল সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে, 'বাব্বা! যেমন করলে তুমি, আমি চমকে উঠেছিলুম। ভাবলাম না জানি সাপ-খোপ হবে।'

লণ্ঠন জ্বালাল যতীন। মলিনাকে দেখল। ওর মুখচোখে তখনও ভয় লেপ্টে রয়েছে।

'আরে, অমন মুখ করে বসে আছ কেন? মনে হচ্ছে যেন—'

যতীনের কথায় বাধা দিয়ে মলিনা বলল, 'কই, দেখি, তোমার হাত দেখি। দেখ আমার বুকটা এখনও ধকধক করছে।' যতীন হাত দিয়ে অনুভব করল; সত্যিই মলিনার হৃদপিণ্ড দ্রুততালে বেজে চলেছে।

'আশ্চর্য, এত ভয় তোমার ইঁদুরে!'

'তা বাপু ভয়ই বলো আর ঘেন্নাই বলো, ও বিদিকিচ্ছি জন্তুগুলো দেখলে আমার গা গুলিয়ে আসে।' আস্তে আস্তে জবাব দিল মলিনা বিকৃত মুখভঙ্গি করে, স্বামীর চোখে চোখ রেখে। একটু থেমে বলল আবার, 'এ বাড়ির চৌকাঠে পা

দিয়েই আমার জন্মশত্তুরগুলো চোখে পড়ল। তখন থেকেই গা বিড়োচ্ছে। তার ওপর পড়বি তো পড়, হতভাগা একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গা।'

'আজব কাণ্ড তোমার!' যতীন বললে, 'ইঁদুর কোথায় না থাকে?'

'থাক্, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে থাক; আমার ঘরে থাকা চলবে না। দু চোখের বিষ আমার। পাজি, নোংরা, কুচ্ছিত—' মলিনার ঠোঁট, চোখ, নাক, মুখ ঘৃণায় কুঁচকে কুশ্রী হয়ে উঠল।

মুখে যা বলেছিল মলিনা—সেইদিন সেই প্রথম এ বাড়িতে পা দিয়ে, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলিয়ে ছেড়েছে। প্রথম দিন থেকেই, মলিনার সে কী অসাধ্য-সাধন। মেঝেতে কোথায় গর্ত, দেওয়ালে কোন্ কোণে ফাটল, দালানে জঞ্জাল জড় করা কেন—এ সবের মধ্যেই তো ইঁদুরের রাজত্ব। ইঁটের গুঁড়ো, কাঁকর, বালি, পাথর-কুচি যা পায় ঠেসে ঠেসে গোজে, ভরাট করে গর্তের ফাঁক, তারপর মাটি দিয়ে লেপে দেয়। যতীনদের ডিপোতে শেডের কাজ হচ্ছে, অফিস-ফেরতা যতীন ভোলাবাবুর কাছ থেকে সিমেণ্ট চেয়ে রুমালে বেঁধে আনে। একটা কর্নিক কিনে আনল একদিন। সারা দুপুর কোমরে কাপড় জড়িয়ে মিস্ত্রিগিরি করে মলিনা।

একটু হয়ত বাড়াবাড়িই হবে এই ইঁদুর-ভীতি। তবু কে অস্বীকার করবে ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে মলিনা ঘরের শ্রী পাল্টে দেয় নি? আসলে তাই। কুড়ি টাকার খোলার ঘর মলিনার হাতে পড়ে শ্রী পেল। শৌখিন না হোক শোভন হলো। যতীন মনে মনে ভাগ্যবান মানল নিজেকে। লক্ষ্মীমন্ত বউ তার; দেখতে না দেখতে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিল।

ঝকঝকে, তকতকে করে ঘর সাজাল মলিনা। কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশ, একটা বেঞ্চি, দুটো জলচৌকি, কেরোসিন কাঠের তেথাকা—এমনি সব টুকিটাকি জিনিস। প্রথম ক'টা মাস খুবই টানাটানি চলে সংসারে। মাইনের একশোটা টাকা থেকে বাঁচিয়ে এটা-ওটা কেনা কি সহজ।

যতীন একদিন ঠাট্টা করেই বলেছিল, 'ভাগ্যিস ভগবান আমায় রাজা করে নি গো। বেঁচে গেছি!'

'কেন?' জানতে চেয়েছে মলিনা অবাক হয়ে।

যতীন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, 'তা হলে তো তুমি প্রাসাদ বানাতেই ব্যস্ত থাকতে। এ অধম তোমার প্রসাদ পেত না!'

যতীনের কথায় হেসে ফেলেছে মলিনা; স্বামীর গলা জড়িয়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছে কানে, আধো-আধো স্বরে বলেছে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমার অত কাব্যি কি বুঝি—! তুমি যদি রাজা হতে আমি কি আর রানী হতাম!'

'রানী হতে না—? তবে হতেটা কি! চোখ বড় বড় করে রহস্য করেছে যতীন।

'দাসী!' ছোট করে উত্তর দিয়েছে মলিনা।

'বল কি, এত থাকতে দাসী ?

'হুঁ দাসী-ই। যা ময়লা বং আমার, বাপ-মা দেখে শুনেই নাম দিয়েছে মলিনা, রানী কি ময়লা হয় !' মলিনার গলার স্বরে আশ্চর্য জড়তা এসেছে কথাগুলো বলতে গিয়ে।

যতীন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠেছে, 'বয়েই গেছে ; হোক না গায়ের বং ময়লা—মন তো আর মযলা নয়।'

তাই, মলিনার মন ময়লা নয়। অন্তত মলিনা যেন সেই কথাটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ময়লার উপর তাই কি ওর অত বিজাতীয় ঘৃণা। নোংরা যা কিছু, কুৎসিতদর্শন যেখানে যা আছে, বিকৃত, বীভৎস যা—চোখকে যা পীড়া দেয়, মনকে অস্থির করে, মলিনার কাছে তা অসহ্য। সেখানে তার এতটুকু দয়া নেই, ক্ষমা নেই।

ইঁদুরকে ঠিক এইজন্যেই বুঝি এত ঘেন্না মলিনার। দেখতে যেমন, থাকেও তেমনি অন্ধকার নোংরা আবর্জনার স্তূপে। একটু ভালো করবে তোমার—বয়েই গেছে, বরং ক্ষতির বহরটা একবার হিসেব করে দেখ। চাল, ডাল, তরিতরকারি, কাপড়, বই—সর্বত্র ওর সমান গতি। আর নষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই।

তালপুকুরের ঘরে অত যে ইঁদুরের উৎপাত, সে উৎপাতও বন্ধ করল মলিনা। এল ইঁদুর-মারা কল, তারপর এল বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুর মারা বিষ।

মলিনার সংসার থেকে একদিন দূর হল এই নোংরা জীবগুলো। একেবারেই। চিরকালের মতই।

তারপর ? তারপর তো বেশ ছিল মলিনা। হঠাৎ আজ ক'দিন থেকে কেমন করে যেন একটা ইঁদুর আবার এসে পড়েছে। শব্দ শুনছে মলিনা, বুঝতে পারছে। কিন্তু কই দেখতে তো পায় না ? কিছুতেই ধরতেও পারে না।

কে ! মলিনা চমকে উঠল। কে যেন ডাকল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মলিনা। হাতে তার ইঁদুরকল। দরজার কাছে সরে আসতেই উঠোনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল মলিনার। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বাস, দীর্ঘদেহ এক মূর্তি। সর্বাঙ্গে রোদ আর তপ্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'ফিরলাম কল্যাণেশ্বরী থেকে, উঠোন থেকে স্বর ভেসে আসে : 'সব যে বড় চুপ-চাপ। যতীন কই ? অফিস বেরিয়ে গেছে ?'

বাসুদেব উঠোন থেকে দালানে উঠে আসে।

মলিনার হাত থেকে কলটা পড়ে যায়। একেবারে পায়ের কাছেই। শব্দ কানে যেতে ও সম্বিত ফিরে পায়। পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখে মাটিতে কলটা

ড়ে রয়েছে—করাতের ফলার মত মুখ দুটো বন্ধ। তাড়াতাড়ি মাথায়
মলিনা বলে, 'আসুন। আপনার বন্ধু তো অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে

দুপুর বেলায় খেতে এল যতীন ; রোজ যেমন আসে।
ঘরে পা দিতেই বাসুদেবের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন যেন আকাশ থেকে পড়ল।
'করেছিস কি রে—এ্যাঁ—! মাথা কামিয়ে এলি কল্যাণেশ্বরী থেকে ?'
নিজের মাথায় নিজেই হাত বুলিয়ে বাসুদেব হাসল, 'খারাপ দেখাচ্ছে ?'
'না, খারাপ কেন হবে ? একেবারে মঠের মহারাজের মত দিব্যি দেখাচ্ছে, ঠাট্টা করে যতীন।
'দীক্ষা নিলুম কি না—তাই !'
গায়ের জামাটা আলনায় টাঙিয়ে যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, 'দীক্ষা—!'
আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বাসুদেব। চুপ করে থাকে, হাসে মুচকি মুচকি। বন্ধুর হাসির অর্থভেদ করতে না পেরে যতীন বলে, 'দাঁড়া, মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নি—তারপর তোর দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনছি।'
স্নান সেরে খেতে বসল যতীন ; পাশে বাসুদেব। মলিনা বাসুদেবের সামনে থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল পরিপাটি করে। তারপর স্বামীর। আর-এক দফা অবাক হবার পালা যতীনের।
'ব্যাপার কি ? আমি ভাত, তুই রুটি ?' যতীন বাসুদেবের পাতের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রশ্ন করল।
'আমি নিরামিষ আর তুই আমিষ ! আমার পাতে দুধ কলা, তোর পাতে কিন্তু ভাই কাঁচকলা।' বাসুদেব উচ্চগ্রামে হাসে।
ততক্ষণে মলিনা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
খেতে খেতে বাসুদেব বলে, 'আজ পূর্ণিমা ; ভাত খাওয়া নিষেধ।'
'কার নিষেধ, তোর গুরুদেবের ?' যতীন চোখ তুলে তাকায়।
'না। নিজে থেকেই খাই না।' বাসুদেব আড়চোখে মলিনার দিকে তাকাল।
খেতে বসে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে যতীন। বাসুদেবেরও মুখে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে। মলিনা চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। যতীনের খোলা গায়ে ঘামের প্রাবল্য একটু বোধহয় দৃষ্টিকটুই হবে। অথচ তারই পাশে বসে বাসুদেব। ধবধবে ফরসা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার। কপালটাও তেমন চওড়া নয়। ভরাট গলা। ঘাম জমেছে ফোঁটা ফোঁটা, সারা মুখ ভরে। ভিজে চন্দন দিয়ে মুখে তিলক আঁকলে বুঝি এমনই দেখায়।

'তোমার পাখা নেই ?' যতীন মলিনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।
কি যেন ভাবছিল মলিনা। স্বামীর কথা কানে যায় নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে।
'কি ? নেই পাখা ?' যতীন আবার জানতে চায়।
মলিনা ঘর থেকে পাখা নিয়ে আসে।
'জোরসে একটু বাতাস কর তো। খাব কি ঘেমেই মলুম। যা ভ্যাপসা গরম।' ভিজে গামছায় বুক মুছে যতীন বললে।
'কাল কল্যাণেশ্বরীতে বৃষ্টি হল !' বাসুদেবও কপালের ঘাম মোছে।
'পাহাড় জায়গা তো ; ওখানে তুই এত গরম পাবি না।'
'কই, দিনের বেলায় এমন আর কম কি ? রাত্তিরে অবশ্য ঠাণ্ডাই।'
'কোথায় ছিলি রাত্তিরে ?'
'মন্দিরে। বেশ লাগল। এক সাধুর সঙ্গে দেখা ; কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁর। আশ্রম আছে দেওঘরের দিকে। গৃহী অথচ সাধু। আশ্চর্য !' বাসুদেব কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে।
'ব্যাস, আর কি ! সাধু মানুষ, বয়স হয়েছে, আশ্রম আছে, তুই একেবারে গলে গেলি !' যতীন জোরে হেসে উঠল, 'দীক্ষাটাও চট করে নিয়ে নিলি, কি বল ?' বাসুদেব ওর স্বভাবমত মুচকি হাসি হেসে মাথা নাড়ল।
'ওঁর আশ্রমে আপনার একটা জায়গা হল না ?' মলিনা ঠোঁট কুঁচকে হাসল।
মলিনার মুখের হাসি তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্নতা ঢাকতে পারল না। বাসুদেব আবার আড়চোখে তাকাল। তেমনি ভাবেই মাথা নাড়ল আবার, 'না। আমি তো জায়গা খুঁজি নি।'
'খুঁজলেই পারতেন। আশ্রম না হলে সন্ন্যাসীদের মানাবে কেন ?' হাতের পাখা জোর হয়ে ওঠে মলিনার।
আশ্চর্য, এত জোরে বাতাস করছে মলিনা তবু যতীন ঘামছে। বাসুদেবের মুখের ঘাম কিন্তু শুকিয়ে গেছে।
'আমি তো সন্ন্যাসী নই, বাসুদেব আস্তে আস্তে বলল।
'সন্ন্যাসী নন তো গেরুয়া পরেন কেন ?' মলিনার রুক্ষ দৃষ্টি বাসুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে যায়।
'এমনি। ভাল লাগে তাই। সুবিধেও কম নয়। বিনি টিকিটে ট্রেনে চড়ি—কারুর বাড়িতে গেলে দু'বেলা অন্নও জুটে যায়। এ ও প্রণাম করে—দু'চার পয়সা দেয়। মন্দ কি ! দিন তো চলে যাচ্ছে !' বাসুদেব যেন কৌতুক করছে—এমনি ভাবে কথাগুলো বলে। পরিহাসের তরলতা তার গলায় ! পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বাসুদেব এবার যতীনকে বলে, 'কি রে, ঠিক বললুম না ?'

'উঁহুঁ। নেহাতই বাজে কথা!' যতীন উত্তর দেয়।

'কি রকম?'

'ওর আর কোনও রকম নেই! ঘরে মা নেই, থাকলে তোর বিয়ে দিত। তখন বউয়ের ভেঁড়ুয়া হতিস। বউ নেই তাই গেরুয়া ধরেছিস।' যতীন বললে মুরুব্বি চালে। তাকাল মলিনার দিকে।

ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে যে ভারী আবহাওয়া জমে উঠেছিল যতীনের কথা আর হাসিতে তা অনেকটা ফিকে হয়ে এল। সশব্দে হেসে উঠল বাসুদেবও।

মলিনাও হাসল। তবে তার হাসি শব্দবহুল নয়—এমন কি কৌতুক-স্নিগ্ধ সহজ সাদা হাসি যে—তাও নয়। বরং মলিনার ঠোঁটের কোণে যে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল তার জের টেনে ও কথা বলল বাঁকা সুরেই, 'বেবাগী লোকের বউতে কি যায় আসে? কথায় আছে না তাই—থাকলে সর, না থাকলে পর।'

বেফাঁস কথাটা মলিনার মুখ থেকে কেমন করে যে বেরিয়ে গেল সে বুঝতেও পারল না। জিভকে রাশ বেঁধে সব সময় কি রাখা যায়—কখনো-সখনো আলগা হয়ে যায় বই কি!

কথাটা কারও কান এড়ায় নি। যতীন ভাতের থালা থেকে হাত উঠিয়ে তাকাল মলিনার দিকে। সোজাসুজি চোখে তাকাল বাসুদেবও।

ক'টা মুহূর্ত। নিঃশব্দে তিনটি প্রাণী মনের ফেনা মাখল নিজেদের মনেই; বিমূঢ়, বিব্রত হয়ে। শেষ পর্যন্ত মনের ফেনায় মলিনার চোখের কোণে কেমন করে যে জল এসে পড়ল, করকরিয়ে উঠল দুই চোখ, কে বলবে, কে জানে!

পাখা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল মলিনা। দালান থেকে ঘরে এসে ঢুকল। বুকটা অযথাই ধড়ফড় করছে! ব্যথার মোচড়ে বুকের হাড় ক'টাও কনকনিয়ে ওঠে।

বিকেল হতে না হতেই মলিনা ঘর-দোর পরিষ্কার করে উনুন ধরিয়ে দিলে। আনাজের ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে বসল দালানে। দমকে দমকে ধোঁয়া আসছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল মলিনা। ভিতরে বিছানায় বসে বাসুদেব 'সদ্‌গুরু-সঙ্গ' পড়ছে।

দালান ভরে কটু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল—আর সেই ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকল মলিনা অনেক—অনেকক্ষণ। ধোঁয়া যখন সরে গেল, বাতাসে চোখ মেলে মলিনা দেখে উনুন তার ধরে উঠেছে দাউ দাউ করে। চোখের জলে মনটাও থিতিয়ে গেছে। মলিনা মরমে মরে যাচ্ছে এখন।

তাড়াতাড়ি চা তৈরী করল মলিনা। ধবধবে কাচের গ্লাসে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল; 'কই, নিন, চা নিন!' হাত বাড়িয়ে চা দিল মলিনা।

বই থেকে মুখ তুলে বাসুদেব আনমনা-চোখে তাকাল। 'সদ্‌গুরুসঙ্গে'র সঙ্গী

মন যে নিঃসঙ্গ নয়—এ কথা মনে করতে বাসুদেবের খানিকটা সময় লাগে। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বাসুদেব প্রশ্ন করল, 'বিকেল হয়ে গেল নাকি?'

'ত কি আপনার আমার জন্যে বসে থাকবে?' মৃদু হাসল মলিনা। শাড়ির আঁচলে 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' ঢেকে নিয়ে বলল, 'চা খেয়ে আমার একটা কাজ করে দিন তো দেখি।'

'কি কাজ?' জানতে চায় বাসুদেব।

'একটু বাজার যেতে হবে।' মলিনার স্বরে লজ্জা।

'তা বেশ তো।'

নিজেকে আরও স্পষ্ট, ব্যক্ত করার আশায় মলিনা বলে, 'আপনার বন্ধু ফিরে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে ততক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার আর যাওয়া হয় না—হাড়ি আগলেই বসে থাকতে হবে। রান্নাবান্না শেষ করে রাখি। উনি এলেই আমরা আজ আপনার সঙ্গে আশ্রমে বেড়াতে যাব।'

একটু হয়ত অবাকই হয়েছিল বাসুদেব। কিন্তু সবাক হল যখন, তখন তার গলার স্বরে সহজ একটা প্রশ্নই শোনা গেল। 'আশ্রমে যাও নি কখনো?'

'একটিবার শুধু। ঠাকুরের আরতি হয় শুনেছি—দেখি নি। আজ চলুন, দেখে আসি।' উৎসাহ জানাল মলিনা।

'বেশ তো চল।'

বেশ খুশীই হয়েছে মলিনা। ওর মুখ দেখে তাই অন্তত মনে হয়। তাবের ওপর 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' তুলে রেখে মলিনা এবার বলল, 'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, যা ভয় হচ্ছিল।'

'কেন?'

'আমি ভাবলাম আপনি বুঝি খুব রেগে রয়েছেন—' মলিনা নতচোখে বলল হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে, 'তখনকার কথায় রাগ করেন নি তো?'

বাসুদেব তার অভ্যাস মতো নীরবে হাসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মলিনার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। ক্লান্ত কপালে ফিকে সিঁদুরের টিপ; আরও যেন কিছু—একটু মমতা, হয়ত বা করুণা। সব মিলে-মিশে মনমরা একটি মুখ।

'পাগল, রাগ করব কেন?'

সবেমাত্র গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে মলিনা ভব্য হচ্ছে, ওদিকে সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার দালান পেরিয়ে জুড়ে বসছে, ঘর, উঠোনে তুলসী গাছের চারার তলায় প্রদীপটা জ্বলছে তখনও কেঁপে কেঁপে, হঠাৎ দমকা ঝড় এল যেন।

হুড়মুড় করে সদর দরজা পেরিয়ে যতীন উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিল, 'কই গো, শীঘ্রি তোমার রান্না সারো।'

উঠোনে বেতের মোড়া টেনে বসেছিল বাসুদেব। মলিনা ঘরে প্রসাধন সারছে

তখনও।

'এই যে তুই বাড়িতেই আছিস ? ভালোই হল।' বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল যতীন, 'ভাগ্যিস তুই ছিলি, না হলে আচ্ছা এক বিপদে পড়া যেত।'

স্বামীর ডাক শুনে মলিনা দালানে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর দিকে এক লহমা তাকিয়ে যতীন বলল, 'চট করে তোমার রান্নাটা সেরে নাও তো। দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারা রাত ট্রেনের ধকল সইতে হবে। ভাল কথা, আমার ধোয়ানো কাপড়-চোপড় বাক্সে আছে না কিছু ?'

মলিনা অবাক হয়ে স্বামীর পানে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ ধকল সওয়ার কারণ কি ঘটল। একটু ভয়ই হয়। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে নাকি।

'হঠাৎ ট্রেন ? যাবি কোথায় ?' প্রশ্ন করে বাসুদেব।

'কলকাতা।' দ্রুত, উত্তেজনা-ভরা গলায় বলতে থাকে যতীন, 'অফিসে চিঠি এসেছে আমাদের পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস বেড়েছে এপ্রিল মাস থেকে। গত এপ্রিল থেকে এই এপ্রিল। পাক্কা এক বছর পাঁচটাকা করে পাব—মানে তোর ষাট টাকা। অনিলবাবুকে দিয়ে আজই বিল করিয়ে নিয়েছি। সাহেবও সই করে পাস করে দিয়েছে। কাল হেড অফিসে পেঁছে বিলটা দেব ; আমাদের টাকাটি নেব আর ব্যস রাত্রে ট্রেনে উঠব ! ভাগ্যিস তুই ছিলি, নয়ত কি আর একা বউ ফেলে যাওয়া যেত !...কই গা একটু চা খাওয়াবে না ? আর হ্যাঁ, কথা বলছ না যে, কাপড়-চোপড় নেই ?'

'আছে।' মলিনা থমথমে গলায় বললে।

ফিরে গিয়ে নিবে আসা উনুনে চায়ের জল চড়াচ্ছে, শুনল—বাসুদেব বলছে 'দেখ্ তো কাণ্ড। আমি কোথায় ঠিক করে রাখলাম কাল সকালে যাব তো তুই সব ভেস্তে দিলি !'

'কাল সকালে তুই যাবি ? কোথায় যাবি ?'

'কোথায় তা কি ঠিক করে রেখেছি ? তবে কালই বেরিয়ে পড়ব ঠিক করে রেখে-ছিলাম। এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল, প্রায় তিন হপ্তা।'

'আরে নে তোর তিন হপ্তা। যাবি, যাস না। আমি তোকে আটকাচ্ছি ? কালকের দিনটা থেকে যা। পরশুদিন সকালে আমি ফিরে আসছি, তারপর যাস।'

স্বামীর জন্যে চা ঢালতে ঢালতে মলিনা সব শুনল, প্রত্যেকটি কথা। মনটা তার হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠেছে আবার।

যতীনের হাতে চা তুলে দিয়ে মলিনা বলল, 'বাক্স থেকে কাপড়-জামা কি বেছে নেবে, নাও এসে।'

কাপড় জামা বেছে নেওয়ার কিছুই ছিল না। এ শুধু একটা অজুহাত। যতীন ঘরে এল। বাক্স খুলে হাঁটু গেড়ে বসল মলিনা। এক হাতে তুলে ধরল লণ্ঠন।

'বা, বেশ দেখাচ্ছে তো তোমায় আজ।' স্ত্রীর গম্ভীর অথচ সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বলল।

'দেখাক্ তোমার কি! আমার মুখ দেখবার জন্যে তো আর তুমি বসে থাকবে না। নাও, তাড়াতাড়ি করো, আমার কাজ আছে।'

মলিনা যে চটে উঠেছে সে কথা বুঝতে যতীনের দেরি হয়নি। আমতা আমতা করে যতীন অফিসের সব কথা বুঝিয়ে বলল আবার। শেষে মলিনার গাল ধরে বলল, 'ছিঃ, অবুঝ হয়ো না। গরিব লোক আমরা। যে ক'টা টাকাই পাই না কেন হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুম হবে না। কত লোকের কত দরকার, এই টাকাটা পেলে কাজে লাগবে সকলেরই।'

'তা যাও না কলকাতা, আমি কি বাদ সাধছি!' বলে মলিনা অভিমানভরে মুখ সরিয়ে নিলো।

'বাদ না সাধলেও বাধা দিচ্ছ।'

'মোটেই নয়।'

'বেশ, তবে বলো তোমার জন্যে কি আনব কলকাতা থেকে?'

'কি আর আনবে! বেশ মোটা দেখে দড়ি কিনে এনো খানিকটা।' থমথমে গলায়, চোখে জল ভরে বললে মলিনা, খুব আস্তে আস্তে!

কাজকর্ম সেরে মলিনা যখন ঘরে ঢুকল রাত তখন খুব বেশি নয়। তবু পাড়াটা নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে গেছে। রোজই যায়। রোজ তবু এ বাড়িটা অন্তত আরও খানিকক্ষণ সজাগ থাকে। কথায়, চিৎকারে, হাসিতে এতটুকু বাড়ি সরগরম করে রাখতে যতীনের জুড়ি নেই। খাওয়া সারতেই একঘণ্টা। মলিনার সঙ্গে যত রাজ্যের অফিসের গল্প করবে যতীন। তারপর বন্ধুদের কথা—কি হয়ত বাড়ির। শুতে এসে দুজনায় কত যে খুনসুটি করে তার কি শেষ আছে। রাতি নিবিয়ে বকবকমের শেষ হতে কি-বা এমন কম রাত হয়। আজ সব চুপ। অনেকক্ষণ হলো যতীন চলে গেছে। এতক্ষণে গাড়িই হয়ত স্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

মুখে দু'চার কুচি সুপুরি পুরে মলিনা দরজা ভেজিয়ে দিল। একবার শুধু দেখে নিল বাসুদেব শুয়েছে কি না। না, বাসুদেব এখনো শোয় নি। উঠোনে দড়ির খাটিয়ার ওপর চুপ করে বসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে কি যেন গাইছে। কীর্তনের সুরের মতই কানে লাগে। চাঁদের আলোয় সারা উঠোন ভেজা। বাসুদেবের চোখ মুখ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে দেয় মলিনা। খিল আঁটে। হঠাৎ কি যেন খেয়াল হয় তার, আবার খিল খোলে। মেঝে থেকে লণ্ঠন তুলে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে থাকে। খিল আঁটে

হয়ত ভেঙেই যাবে। যা ফাঁক দরজায়—পেরেক কী পাতলা লোহার শিক গলিয়েই তো খিল খোলা যায়। মলিনার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। দুর দুর করতে থাকে বুক। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দরজা ভেজিয়ে খিল এঁটে দেয় তাড়াতাড়ি।

এত ভয় কিসের তার—কে আসবে ঘরে, রাতদুপুরে? মলিনা ভাববার চেষ্টা করে। কে আসবে তা ভাবতে গেলে প্রথমেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে যে—সে ওই উঠোনে বসে। আর কারুর কথা তো মনের কোণেও উঁকি দেয় না। তবে? এ ভয় কি বাসুদেবের জন্যে? কিন্তু বাসুদেব—!

স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হয় মলিনার। এ কি? বন্ধু, তোমার বন্ধু—আমার কি! পা ফেলতে জায়গা নেই এমন এক ফালি ঘর—সেই ঘরে—দিনের পর দিন বন্ধুকে শুতে খেতে বসতে ঠাঁই দাও। কি অসুবিধেই যে হয়! আড়াল আবডাল বলে কিছুই নেই—বাইরের লোকের কাছে নিত্যি ওঠা, বসা, কথা বলা।

বাসুদেবও যেন কেমন। সেই এসেছে তো এসেইছে; যাবার নামটি করে না। হঠাৎ এল, যতীনের খোঁজখবর নিয়ে। একই গ্রামে নাকি ওদের বাড়ি, একই সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ। বাড়িতে বাড়িতে জানা-শোনা—দহরম-মহরম। বাসুদেবের মা মারা যাবার পর ঘরে তালা দিয়ে ছেলে বিবাগী হয়ে যায়। আর গ্রামে ফেরে নি। যতীনের বিয়ের কথা কার মুখে যেন শুনেছিল—ঠিকানা জেনে নিয়েছিল—তারপর হাজির হয়েছে উটকো ভাবেই।

স্বামীর কাছে কথায় কথায় মলিনা শুনেছে বাসুদেবের নাকি কোনো এক ডানা-কাটা পরীর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। সব ঠিকঠাক, হঠাৎ বাসুদেবের মা শুনলেন—মেয়েটি বালবিধবা। বাসুদেব জানত। বিয়ের ইচ্ছেটা তারই। তবু মা গোপন কথাটা জানতে পেরে আঁতকে উঠলেন। হ'লই বা সুন্দরী—সমাজ ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্দরী ঘরে আনতে হবে এমন কথা কেউ কি শুনেছে? না—তা হবে না। বাসুদেবের মার দৃঢ় আপত্তি। ওদিকে বাসুদেবেরও গোঁ। হ্যাঁ-না-এর টানা-পোড়েন চলছে, এমন সময় হঠাৎ বাসুদেবের মা মারা গেলেন; ছেলেও গৃহত্যাগ করলে।

কি যে ত্যাগ করেছে বাসুদেব—মলিনা তাই ভাবে। কে বলবে ও ঘর ছেড়েছে? এই কি ঘর ছাড়ার লক্ষণ? নিজের ঘর ছেড়েছে বটে কিন্তু জুড়ে বসেছে অপরের ঘর, অপরের ঘরণী।

কথাটা মনে হতেই মলিনার চোখদুটো কপাটের খিলে আটকে গেল। আবার দুরু দুরু করতে লাগল বুক। সত্যি, লোকটা যেন কেমন! প্রথম যে দিন এল, ওর চেহারা আর কাঁধ-পর্যন্ত চুলের বহর দেখেই মলিনার মন বিষিয়ে গিয়েছিল।

হাসা, আস্তে-আস্তে ওর নাম ধরে ডাকা—মলিনা, ও মলিনা।...আর এমন ভাবে লোকটা তাকাত যেন মলিনা ওর কত জন্মের চেনা, কতই না আপনজন।

প্রথম দর্শনেই যাকে দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল তার গেরুয়া-বসনের ঘটাপটায় ভেকভড়ং ছাড়া আর কিছু যে আছে মলিনা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। আজও পারে না। কেনই বা না হবে ? সবল সুস্থ মানুষ, এ সংসারে তার কোনো কাজ নেই গা ? বন্ধুর ঘাড়ে বসে খাবে আর তার বউয়ের দিকে চোরা-চোরা তাকাবে ? তাও যদি বন্ধু বড়লোক হত। একে তো নিজেদেরই চলে না ; আনতে, খেতে, পরতে শুধু নেই, তবু পরের জন্য ধার করো আর মরো।

রাগ শুধু নয়, যতীনের ওপরেও মলিনার মন বিষিয়ে ওঠে। এ কি ! কোথাকার কে—তার জিম্মায় ঘর ছেড়ে, বউ ছেড়ে দিব্যি তুমি চলে গেলে ! কিছু যদি একটা হয় !

মাঝরাতে মলিনা হয়ত কখন ঘুমিয়ে পড়বে—আর হঠাৎ যদি দরজা খুলে ওই—। ...ভয়ে মলিনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাম জমতে থাকে ঘাড়ে, কপালে।

হঠাৎ কি মনে হতে মলিনা ইঁদুর-মারা কলটা বেঞ্চির তলা থেকে বের করে নেয়। প্রাণপণে তার তীক্ষ্ণধার ফলা দুটি খোলে। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ইঁদুরকলটা দরজার চৌকাঠের ঠিক মাঝখানেই রেখে দেয়।

বাতির শিখা কম করে বিছানায় শুয়ে পড়ে মলিনা। চোখের দৃষ্টি মেলা থাকে দরজার ওপর—আলকাতরা-রাঙানো কালো কাঠ পুরু একটা যবনিকার মতন ভাসতে থাকে।

কখন যেন চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমেছিল—হয়ত শেষ রাতেই, কিসের একটা খুট্ করে শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে বসল মলিনা। কই, কিছু না তো ? তবে ? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মলিনা অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে উঠোনে চোখ মেলে তাকাল।

ভোর হয়ে আসছে। ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাসুদেব ঘুমিয়ে।

পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এল মলিনা। বাসুদেব ঘুমোচ্ছে। তার চোখের পাতায় ভোর বেলার প্রগাঢ় ঘুম, ঠোঁটের কোলে একটু মিষ্টি হাসি। হয়ত স্বপ্নই দেখছে। কার স্বপ্ন ? মলিনা হঠাৎ চমকে ওঠে, শিরশিরিয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গ। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়—কাল আশ্রমে বেড়াতে যাবার জন্যে মলিনা যা সাজগোজ করেছিল, এখন সে সবই তার দেহে। সেই শাড়ি, ব্লাউজ, সেই কুমকুমের টিপ, পায়ের আলতা। এখনো গায়ে সেন্টের ফিকে গন্ধ।

আশ্চর্য, রাতে শোবার আগে শাড়ি ব্লাউজটাও খুলে রাখে নি ? কেন এমন ভুল ? আঁচলটা আঙুলের পাকে জড়াতে জড়াতে মলিনার কেমন যেন মনটা ফাঁকা হয়ে

ফাঁকা মন নিয়েই মলিনার সারা দিন কেটে যায়। আনমনা উদাস। টুকটাক কাজ-কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায় ; পারে না। দুপুরে গরম পড়ে—অসহ্য গরম। মলিনার মনের জ্বালাও মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়ে। বার দুয়েক গা ধুয়ে নেয়। একটু যদি জুড়োয় শরীর।

দুপুরের একটু পর থেকেই মেঘ জমতে থাকে। বিকেলের গোড়ায় ঘোর হয়ে আসে আকাশ। ধুলো বালির ঘূর্ণি ওঠে, তারপর জল নামে অঝোর ধারায়। ক'দিন ধরে যা গরম পড়েছে তাতে বৃষ্টি হবে এ এমন কিছু অশ্চর্য নয়—কিন্তু এই বৃষ্টি দেখে মলিনার মুখ আরও কালো হয়ে ওঠে।

আবার রাত। নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে আসে তালপুকুরের পাড়া। সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কখন ঝিমিয়ে আস, কখন জোর হয়ে ওঠে। ছেদ নেই। ছন্নছাড়া এলোমেলো বৃষ্টির ছাঁট আলুথালু করে মলিনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যায় ; ভিজে জলে থই থই করতে থাকে দালান। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে যায়।

এমন ভাবনায় আর কখনো পড়ে নি মলিনা—সমস্যাটা খুবই কঠিন। তবু সে সমস্যা তেমনি ভাবেই সমাধান করতে হয়—ঠিক যেমন ভাবে বাসুদেবের মা ছেলের বিয়ের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। জলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাক বাসুদেব, দালানে দাঁড়িয়ে থাক—তবু এক ঘরে মলিনার সঙ্গে তার শোয়া চলে না।

মুখ ফুটে বলতে হয় নি মলিনাকে, বাসুদেব নিজেই দালানের একটু কোণ ঘেঁষে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল।

আজ যেন আরও ভয় করছে মলিনার। আকাশই শুধু কালো নয়, বৃষ্টির জলই শুধু জল নয়, মলিনার মন রাতের প্রতিটি প্রহরে প্রহরে যত রাজ্যের কালি শুষে শুষে কালো হতে লাগল ; আর চোখের জলে সেই কালো গলে গলে ওর সর্বাঙ্গে কালি মাখাল।

কে ? কিছু না, বাতাস !—কে যেন হাঁটছে দালানে ; জলে পা পড়ার শব্দ, পা টানার আওয়াজ। কার চোখ বুঝি দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে ! কি দেখছে ও ? মলিনাকে ? অষ্টাদশী মলিনা ভয়ে লজ্জায় আঁট হয়ে থাকে। ধুকধুক করে বুক, হাত-পা কাঁপে, অবশ হয়ে আসে।

কত রাত এখন ? গভীর রাত নিশ্চয়। যতীন নেই। কলকাতায়। না, কলকাতায় নয়, গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে যতীন। পকেটে টাকা। মলিনা আরও ক'টা টাকা জমাবে এবার। বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে লুকিয়ে এ ক'মাসে প্রায় গোটা তিরিশেক টাকা জমিয়েছে। এবার যদি আর কিছু জমায়—ভারী দুটো কানবালা গড়াবে মলিনা। বড় শখ তার। কিম্বা একটা সেই শাড়ী কিনবে—পূর্ণিমার মতন। কিন্তু যতীন

যদি তাকে টাকা না দেয়—যদি পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেয় তার বাবাকে, গলসীতে। না, কখনই তা হবে না। পাঠিয়ে দেখুক যতীন; যাচ্ছে-তাই ঝগড়া করবে মলিনা এবার। বিয়ে করেছ, কচি খোকাটি নও, তবু বউয়ের জন্যে দরদ নেই তোমার। শুধু দুবেলা দুটি ডাল-ভাত আর মিষ্টি কথা? একটা পয়সাও যদি হাতে তুলে দিয়ে থাকে কখনো; একটা কিছু কিনে থাকে নিজে শখ করে! কষ্টে-সৃষ্টে যা বাঁচাবার মলিনাকেই বাঁচাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। চুরি? কথাটা মনে হতেই মলিনার বুকটা ধক করে ওঠে। চুরি ছাড়া কি? চুরি-ই বলে একে। যতীন জানে না, মলিনা লুকিয়ে টাকা জমায়; লুকিয়ে এটা-ওটা কেনে। হোক না তা দু'চার আনা, কী দু'এক টাকা। কালও যাবার সময় যতীন চেয়েছে; চেয়েছে র‍্যাশন আনতে, চেয়েছে কলকাতা যাবার সময় দু-চার টাকা, ট্রেনে হাত খরচের জন্যে। মলিনা দেয় নি। বলেছে 'টাকা কই, কোথায় পাব?'

শেষ পর্যন্ত যতীন বাসুদেবের কাছ থেকে ক'টা টাকা নিয়ে গেছে। বাসুদেব! এই লোকটাকেও আজ তিন হপ্তা ধরে চর্ব্যচুষ্য খাওয়াতে হচ্ছে। কোথাকার কে, তার জন্যে গতর দাও, নিজেদের মুখের ভাত তুলে দাও। এক পো দুধ পেলে যতীনের হাড়ভাঙা খাটুনির খানিকটা যেন পূরণ হয়—কিন্তু তার কপালে এক ঝিনুকও দুধ জোটে না, অথচ বাসুদেবের বেলায় দুধ চাই। কেন? কে তার বাসুদেব?

যতীনই বা কে, যতীনের বাবা মা-ই বা কে মলিনার? মলিনা কি তার স্বামীকে দুধ খাওয়াতে পারে না? একটু ঘি বা একটু বেশি মাছ। কানবালার জমান টাকা, ব্লাউজের ছিট, পাড়াপড়শীর সঙ্গে মাঝদুপুরে সিনেমা যাওয়া। মাসে এই ক'টা টাকাও তো বাঁচিয়ে স্বামীর জন্যে ব্যয় করতে পারে মলিনা। শ্বশুর শাশুড়ীর ওপরেই বা এত রাগ কেন?

মলিনার মাথা গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। এমন ভাবে কোনোদিন সে ভাবে নি। এত ভয় হয় নি তার নিজের জন্যে। আজ যেন সব একে একে খুলে যাচ্ছে—মনের যত গ্লানি, জট। স্বামী তার, স্বামীর সংসার তার, কর্তৃত্ব তার। সব পেয়েছে মলিনা, কিন্তু পেয়েও মন কি তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে? না! স্বামী আর সে ছাড়া আর কিছুই তার সহ্য নয়। আর যা আছে সবই তার চিন্তার গণ্ডী থেকে দূরে।

কে ডাকল না! মলিনা ধড়মড় করে উঠে বসল। সম্বিত ফিরে পেয়েছে এতক্ষণে। কান পেতে শুনল—বাইরে আবার অঝোর ধারায় জল নেমেছে; আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। ঘরের বাতিও প্রায় নিবু-নিবু।

কে যেন দরজায় ঠেলা দিচ্ছে! একটু পরেই আধো-আলো অন্ধকারের একটা মুখ ভেসে উঠবে। ইঁদুর-কলটা পাতা আছে তো দরজার গোড়ায়? আছে।

বিবর্ণ মুখে বসে থাকে মলিনা দরজায় চোখ রেখে রুদ্ধ নিশ্বাসে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়—কই কেউ তো আসে না। কেউ না।

আজও এল না তা হলে!

জানলা দিয়ে আকাশ দেখল মলিনা। শ্লেট-রঙের আকাশ। ভোর হল এই, বৃষ্টি থেমেছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে দালানে পা দেয় মলিনা। জলে ভেসে যাচ্ছে দালান। এক কোণে সিক্তবাস সিক্তদেহ বাসুদেব গালে হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। যেন সপাং করে একটা চাবুক কষিয়ে দিলে মলিনাকে। জ্বালা ধরে গেল সর্বাঙ্গে! হাত পা অসাড় হয়ে এল ক্ষণেকের জন্যে। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে যে লোকটা পাথরের মতো বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মলিনার মনে হলো—বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংরা মন। ইঁদুর কি!

বাসুদেবের পাশে এসে মলিনা ডাকে, 'একি? এমনি ভাবেই বসে আছেন সারারাত?'

বাসুদেব চোখ তুলে তাকায়। চোখ দুটো তার জবা ফুলের মতো লাল। বাসুদেবের হাত ধরে মলিনা।

'ছি ছি। আপনি কি বলুন তো! সারা রাত এ ভাবে বসে থাকলেন? একবার তো ডাকতে হয়। আমিও মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছি।'

বাসুদেব তেমনি ভাবেই তাকায়। মলিনার চোখে মুখে কোথাও কি ঘুম লেগে আছে?

'গাটাও খুব গরম মনে হচ্ছে। উঠুন। আসুন আমার সঙ্গে।' মলিনা বাসুদেবের হাত ধরে টানে।

সেদিনই মাঝরাতে যতীনের পাশ থেকে উঠে মলিনা দরজার খিল খুলতে গেল নিঃশব্দে। কে জানত আজও দরজার গোড়ায় ইঁদুরকল পাতা আছে। মনেও পড়েনি ঘুণাক্ষরে মলিনার। ইঁদুর-কলে পা পড়ল ওর। করাতের দাঁত কামড়ে ধরেছে মলিনার পা। কঠিন কামড়। পায়ের পাতা যেন থেঁতলে গেল। কী তীব্র যন্ত্রণা! কঁকিয়ে উঠল মলিনা। যতীন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

কেমন করে যে মলিনা বাতি জ্বেলেছে; অসহ্য যন্ত্রণা সম্বরণ করেছে দাঁতে দাঁত চেপে, কেউ তা জানতে পারল না।

পরের দিন একটু বেলায় গম্ভীর মুখে যতীন একটা রিকশা ডেকে আনল। গায়ের মোটা চাদরটা জড়িয়ে কাঁধের থলে কাঁধে ফেলে বাসুদেব বললে, আসি রে! বেশ কাটল কটা দিন। আবার আসবো কখনো।'

'খবরদার! এ বাড়িতে জীবনে আর পা দিবি নে, তোর গুরুর দিব্যি। আমি তোর কে?'

বন্ধু,' ম্লান হেসে বলে বাসুদেব।

থাক-থাক শালা, আর বাক-ফট্টাই করিস নে। অনেক ভড়ং দেখলাম।

া ভর্তি জ্বর। বাড়ি ছেড়ে চললেন উনি। কেন রে? এতদিন কাটল, আর ক'টা দন তোর এখানে কাটত না?'

রাগ করিস কেন? আমার হয়ত বসন্ত হবে। তোদের বাড়িতে বিষ ছড়াব। তাই।

কটু থামল বাসুদেব, তারপর বললে আবার, 'যাই দেওঘরের গাড়ি চলে গেলে ফবে আসতে হবে।'

দেওঘরে যাচ্ছ? যাও—' ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে তাকাল যতীন, 'কোথায় উঠবে? সই আশ্রমে তো! যদি না উঠতে দেয়?'

পাগল, তিনি আমার গুরু। আচ্ছা আসি। মলিনা কই—ঘরে? থাক থাক, আসতে বে না। চললুম—আবার আসব।'

াসুদেব গিয়ে রিকশায় উঠল। বড় রাস্তা পর্যন্ত বাসুদেবকে এগিয়ে দিয়ে যতীন ফরে এল। উঠোনে, দালানে কোথাও মলিনা নেই।

বে ঢুকে যতীন দেখে মলিনা জানলার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

কি গো, কি হল, দাঁড়িয়ে যে?'

বামীর গলার স্বরে মুখ ফেরাল মলিনা। চোখ দুটো তার লাল; ছল ছল রছে।

াবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতীন বলে, 'কি ব্যাপার, কাঁদছ কি?'

লিনার খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললো, 'পা'টায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'

লিনার পায়ের দিকে যতীনের এই প্রথম নজর গেল। ছেঁড়া কাপড়ে মলিনার পা ড়ান। বেশ ফুলেছে। কি হয়েছে জানতে চায় যতীন।

লিনা বলে, 'ইঁদুর কলে কেটে গেছে।'

মেষে যতীনের মেজাজ চড়ে যায়।

কাথায় সেই সর্বনেশে যন্তরটা? আজ আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করব।'

াটের তলায় ইঁদুরকল খুঁজতে বসে যতীন।

ামীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মলিনা ধীরে ধীরে বলে 'খাটের তলায় ই।'

কাথায় তবে?'

ফেলে দিয়েছি জানলা দিয়ে।'

ক লাগে যতীনের। দাঁড়িয়ে উঠে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'সত্যি?'

াস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মলিনা। বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি?'

া হলে তোমার ইঁদুর—?' স্ত্রীর অবোধ্য চোখে চোখ রেখে যতীন থতমত খেয়ে

বলে।

স্বামীর কথার জবাব দেয় না মলিনা। মনে মনে ভাবে : ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই—ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত—কত যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা-জোখা আছে—না থাকবে কোনও দিন। আরও কত হয়ত করবে। কিন্তু যতীন একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্যি।

লজ্জা পেয়ে গগন যেন নয়নের বউকে দেখাচ্ছে এমনভাবে কল্পনায় সাইকেলের পিঠে লাফ মেরে চেপে বসল। তারপর প্যাডেল ঘুরোতে লাগল।

না। গগন পারল না। গগন বালিশের মাথার পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে তার রুমাল স্পর্শ করতে পারল। রুমালের পাশে কবেকার একটা পুরোনো মাসিক পত্রিকা। গগন পত্রিকাটা কতবার জানলার বাইরে ফেলে দিতে চেয়েছে, পারে নি। ওর মধ্যে নয়নরা আছে, নয়ন, নয়নের বউ, বাবা, মা, লতু, ছোটমামা। শুধু গগন নেই।

গগন এ-ঘরে আছে। এখানেই থাকবে গগন। শীত আসবে, শীত যাবে ; আবার শীত আসবে। গগন জানে তার ছোটমামা নেই, তার ছোটমামা তাকে শীতের পর নিয়ে যেতে আসবে না।

গগন চোখ বুজতে বুজতে নয়নদের কথা ভাবল। নয়নরা থাকলে, গগন পরম দুঃখীর মতন ভাবল, তার গগন এত শূন্য হত না।

জননী

আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল। সবার বড় ছিল বড়দা, মা-র উনিশ বছর বয়সের ফল। প্রথম বলে বড়দা মা-র সেই বয়সের রূপ যতটা পেরেছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জগতে এসেছিল। শুনেছি, ঠাকুরমা বলত, অত রঙ অমন চোখ নিয়ে যদি এলি, তবে দাদু, মেয়ে হয়ে এলি না কেন?

ঠাকুরমার ক্ষোভ বছর দুয়েক পরে মা মিটিয়ে দিল। এবার এলো বড়দি। বড়দা পুরুষমানুষ বলে ওপর-ওপর থেকে মা-র রূপ চুরি করেছিল, বড়দি মেয়ে বলে আমাদের মা-র অন্তর থেকে সব যেন শুষে নিয়ে ঠাকুরমার কোলে এসে পড়ল।

নয়নের মণির মতন করে ঠাকুরমাবুড়ি বড়দিকে তিনটি বছর আগলে রেখে, লালন-পালন করে, ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা গেল। বুড়ি মারা যাবার সময় আমাদের তিন বছরের বড়দিকে মরণের ঘোরে রাধাকৃষ্ণর গল্প শোনাচ্ছিল। শোনাতে শোনাতেই স্বর থেমে গেল।

আমরা এ-সব গল্প মা-বাবার কাছে শুনেছি। বাবাই বেশী বলত। বাবারই অতীত-মোহ অতিরিক্ত ছিল।

বড়দির পর আমাদের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল বাবার মুখের আদল তার। সেই রকম লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।

ছোট আর আমি মাত্র দেড় বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছি। ছোটকে আমি দিদি বলি নি কোনোকালে, আজও বলি না। ছোট আমাকে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত, মানে কনিষ্ঠ; তার খেপানো ডাক থেকেই আমার ডাক-নাম কড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক-ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে এসেই নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন্ রোগের পোকা বংশবৃদ্ধি করেছে, ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এলো, আর স্বামী-গৃহে যায় নি।

বড়দির পর দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ হওয়া। মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্য জানলা খুলে পানঅলাকে ডাকছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে

গোলমালের ভয়ে কাচের জানালা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানলার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কী বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে একটা লোক তার টিনের সুটকেশ জানালায় ছুঁড়ে মারল। কাঁচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে সর্বাঙ্গ লাল হল।...হাসপাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারা মেজদা ফিরে এলো বাড়িতে, তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।

আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু। বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল। মা-র কাছে বাবা স্নান করছিল। অল্প অল্প জ্বর ছিল গায়ে। মা ঈষদুষ্ণ জলে বাবার গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছিল; বাবা মা-র কোলের ওপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে কী বলতে গেল, পারল না; মৃত্যু এসে বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা থামিয়ে দিয়েছিল। বাবা তৈরী ছিল, চলে গেল।

বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ শোকও এলো। ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।...আমার কথা ছোট গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল, সে চেষ্টা করলে সব পারে। ছোট এ-সব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণীপনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।... একদিন ছোট বুঝতে পারল, তার বয়সে যতখানি জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশী সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করেছে। এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা! ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা-চলা নয়, বেশী কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকশান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা। ছোট বলল, তা হলে আমি মরে যাব। জবাবে ডাক্তারবাবু বলল, দেখা যাক...।

সেই থেকে ছোট বিছানায়। বছর পুরো হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য। মা মারা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মার মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়ানো সরের মতো কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা

বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।

তখনও সকালে হিম পড়ে। আমাদের দোতলার বড় বারান্দা শিশিরে ভিজে রয়েছে। সূর্য ওঠে নি, রঙ ধরেছে সবে। মার বিছানার চারপাশে আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে, মা চলে গেল।

বড়দা আগেই বলেছিল, আমরা বারোয়ারী শ্মশানে মাকে নিয়ে যাব না, আমাদের বাড়ির বাগানে দাহ করব, পরে সেখানে একটা বেদী করে রাখব।

বিঘে খানেকের ওপর জমি নিয়ে আমাদের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

উত্তরের দিকে, যেখানে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মর রাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল—সেই দিকটা মাকে দাহ করার জন্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করে কদমগাছটাকে মাথার কাছে রেখে মা-র চিতা তৈরী হল, পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল—আমাদের বাবার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। তারপর মা-র দাহ হল।

যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল, তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক রোদ খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়েছিল, মাঝে মাঝে কী বলছিল ; বড়দি কদমতলায় মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল ; মেজদা বড়দির পাশে আসন পা করে বসে, দু'হাত বুকের কাছে—তার অন্ধ চোখ চিতার দিকে ; কাঠচাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা-ফোলা মুখ করে বসে ; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

ছোট এক সময় বলল, 'এখন কি জল খেতে আছে রে, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

আমি কিছু জানতুম না। বললাম, 'এখন না। আর খানিকটা পরে খাস।'

এখন চৈত্র মাস। চৈত্রের শুরু সবে। মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। যে জায়গায় আমরা আমাদের মাকে দাহ করেছিলাম, সেই জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশটা যেন নিকোনো। শ্রাদ্ধর পর-পরই আমরা ওখানে সুন্দর করে বেদী করেছি। কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া। এখনও যেন কাঁচা গন্ধ লেগে আছে ওর গায়ে। হাত রাখলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে ; নরম মসৃণ স্পর্শ।

মাসান্তে আমরা এই বেদীতে বসেছিলাম। বেদীর মাথার দিকে ছোট কুলঙ্গির মতন, বড়দি সেখানে প্রদীপ এবং ধূপ জেবলে দিয়েছিল। বাতাসে ঝাপটা লাগছিল না বলে দীপের শিখাটি জ্বলছিল, অগুরুচন্দনের ধূপ পুড়ে খুব ফিকে একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। আর চৈত্রের পূর্ণিমা বলে চাঁদের আলোয় সাদা বেদীটা ধবধব করছিল।

আমরা পাঁচজনে বেদীর ওপর বসে।

বড়দা বলল 'আমরা যতদিন বেঁচে আছি, মাসের এই দিনটিতে সবাই একসঙ্গে এখানে এসে বসব।' বলে একটু থামল বড়দা, বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আবার, 'এই পরিবারের নিয়ম হল। কি বলিস, অনু।'

অনু বড়দির ডাক নাম। পুরো করে অনুপমা। ছোটর নাম নিরুপমা, বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা। বড়দি মাথা নেড়ে বড়দার কথায় সায় দিল ; বলল, 'বাবার বেদীটাও যদি আমরা করে রাখতাম !' বড়দির গলায় আক্ষেপের সুর।

বড়দির আক্ষেপ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তখন তো আমাদের মাথায় এ-বুদ্ধি আসে নি। মাও কিছু বলে নি।

বড়দা কয়েক দণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর নিশ্বাস ফেলল মুখ নামিয়ে। বলল, 'খুবই ভাল হতো। তবে মা রাজী হত কিনা কে জানে !'

'রাজী হত না !' বড়দি বেশ অবাক হয়েছিল যেন, 'কেন ? মা কেন রাজী হত না ?'

'হত না হয়তো।' বড়দা সন্দেহের গলায় বলল। 'সবাই এসব পছন্দ করে না। সংস্কার। আমরা বোধহয় অনেক কিছু পুরোপুরি অগোচরে রাখতে চাই।'

মেজদা হঠাৎ কথা বলল। আমরা তাকালাম। তার অন্ধ চোখ একদিকে স্থির রেখে মেজদা বলল, 'শ্মশানে পুড়িয়ে আসার সময় আমরা কি ভাবি জান, দিদি ?'

'কি ?'

'অনেকের মধ্যে দিয়ে এলাম। যেন সঙ্গীসাথীর মধ্যে।'

'মরার পর আবার সঙ্গীসাথী কী ?' ছোট বলল।

'কিছু না। মানুষ তবু ভাবে।' মেজদা উদাস গলায় বলল। 'তুই জানিস না ছোট, কত মানুষ মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থাকে তীর্থ-যাত্রা কল্পনা করে নেয়।'

আমরা সকলে মেজদার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মেজদার গলার স্বর গোল ও নিটোল। বাঁশের আড়-বাঁশির মতন মোটা। এই স্বর শুনলে অনুভব করা যায়, মেজদার গলার সবটুকু অন্তর থেকে এসেছে। মেজদার কথাবার্তাও অন্যরকম। আমরা মনে মনে অহরহ কথা বলি, মুখে নয়। মনের সেই শব্দহীন বাক্যস্রোত যদি শব্দময় হয়ে ওঠে এই রকম শোনাবে হয়ত, মেজদার কথার মতন।

বড়দি বলল, 'তুই স্বর্গের কথা বলছিস, দীনু !'

মেজদার নাম দীনেন্দ্র, ছোট করে দীনু। বড়দির কথায় মেজদা আলগা করে মাথা নাড়ল। বলল, 'না দিদি ; স্বর্গ তো শেষ কল্পনা। আমি এই মর্ত্যের পর স্বর্গের আগে যে-পথ তার কথা বলছি।'

'সেটা আবার কী ?' ছোট বলল অবাক হয়ে, 'মাঝপথের কথাও মানুষ ভাবে ?'

'ভাবে। যত ভাল করে ভেবে নিতে পারা যায় ততই ভাল রে, ছোট।...আমি রাঁচির দিকে মুণ্ডা না মুণ্ডরীদের গ্রামে এক বাড়িতে ছবি দেখেছিলাম একটা।'

'ওদের কথা বাদ দাও।' ছোট বলল।

'বাদ কেন, শোন না।' মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল। বলল, 'মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম ; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা।...ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'

'আ-হা—' বড়দি দুঃখ পেল।

মেজদা বলল, 'মানেটা তুমি, শোন দিদি। বড় অদ্ভুত লাগে। ভাবতো ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে একা একা অনেক দূরে যেতে হবে। তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটলিতে বোধহয় চিঁড়ে গুড়, আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।'

স্নেহ মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা—সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল। আমি অভিভূত হলাম। জ্যোৎস্নার ধারার মতন আমার কল্পনা সেই ছবির গায়ে আলো বর্ষণ করছিল।

অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া; পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম জাফরি তৈরী হয়েছে। চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতনই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। মা-র বেদীর মাথার কাছে সেই বৃন্দাবনের কদম্বগাছ। মার পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা।

কদম্বগাছটার বয়স আমার সমান। বৃন্দাবন থেকে এনেছিল বাবা। এখনও বর্ষায় ফুল ফোটে।

বড়দি প্রথমে নিশ্বাস ফেলল। বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার গাটা একটু দেখ তো, দাদা।'

'কেন রে, কি হল ?' বড়দা উদ্বেগের গলায় বলল।

'আমায় যদি কেউ মা-র হাতে কিছু দিতে বলে, কি দেবো রে !' বড়দি আমাদের প্রত্যেকের মুখে একে একে তাকাল, তারপর কেমন করে যেন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কী দেবো মা-র হাতে কে জানে !'

কথাটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সহসা অনুভব করলাম বিহ্বল হয়েছি।

'মা-র হাতে কী দেব—' এই প্রশ্ন আচমকা বড়দি আমাদের সামনে যবনিকার মতন নিক্ষেপ করল। আমরা অসংবিত ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। তারপর ক্রমশ বড়-দির কথার পরিপূর্ণ মর্ম আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারলাম।

সমূলে সচকিত হবার মতন আমরা শিহরিত ও কম্পিত হয়ে দেখলাম, এই প্রশ্ন যেন আমাদের সমস্ত বোধ অধিকার করেছে। আমরা কী দেবো, কী দিতে পারি

মাকে ?···মনে হল, এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা, আমাদের সম্মিলিত বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। যেন কোনো ভয়ঙ্কর পর্বতচূড়ায় এনে কেউ আমাদের পরস্পরের দেহের সঙ্গে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছে, আমরা সবাই চূড়ার অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো কদমগাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে। কবরীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে যাচ্ছিল, শব্দ হচ্ছিল পাতার। আমরা আমাদের ছায়ার নকশা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্য দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।

বড়দাই প্রথমে কথা বলল। মা-র কোলে বড়দাই প্রথম এসেছিল, বড়দাকে দিয়েই মা-র মাতৃত্ব শুরু, হয়তো তাই বড়দা এই নীরবতা এবং অপেক্ষা প্রথমে ভাঙল, যেমন করে মা-র সন্তান-কামনার অপেক্ষা ভেঙেছিল।

'অনু কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।' বড়দা ধীরে সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগছে, আমাদের মা দীনুর গল্পের মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে। আমরা মা-র জন্যে কে কী দিতে পারি ?'

আমরা প্রকৃত পক্ষে ওই একই চিন্তা করছিলাম। মা-র সেই দীর্ঘ অন্তহীন পথ-যাত্রায় আমরা মাকে কী সম্পদ দিতে পারি ?

বড়দা দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল, কদমছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কী যে দেবো, আমিও ভেবে পাচ্ছি না।' বড়দার গলার স্বর বিষণ্ণ উদাস। বড়দিকে দেখল বড়দা, কাঠচাঁপার বুড়ো গাছটাকে অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ করল। 'মা-র অনেক দুঃখ ছিল, অনেক। আমি সব দুঃখের কথা জানি না। একটা দুঃখ জানি, আমায় নিয়ে।'

আমার মনে হল, বড়দা ঠিক আমার মতন করেই ভাবছে। এ-সংসারে মা কী পায় নি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধহয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারি নি।

'সে রকম দুঃখ তো আমার জন্যেও মা-র ছিল।' ছোট বলল বড়দাকে লক্ষ করে।

'আমাদের সবায়ের জন্যই ছিল।' বড়দা জবাব দিল।

'তাহলে কি আমরা মা-র হাতে সেই দুঃখগুলো আর দিতে চাই না ?' ছোট অসহায়ের মতন শুধালো।

'তা ছাড়া আমরা আর কী দিতে পারি!···' বড়দা ছোটর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাল কলা জল আমাদের মা-র দরকার নেই। মাকে যদি আমরা সেই মনের জিনিসগুলো দিতে পারি, এখানে যা পারি নি—মা-র কাজে লাগবে।' 'কাজ' শব্দটা বড়দা টেনে

বড় করে উচ্চারণ করল।

আমি মনে মনে বড়দার কথায় সায় দিলাম। মাকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারি না।

'তুই তো জানিস অনু—' বড়দা বড়দিকে লক্ষ করে কথা শুরু করল, 'আমি বিয়ে করি নি বলে মা-র মনে বড় দুঃখ ছিল। অভিমানও। মা-র কী সাধ ছিল আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।...আমার জন্যে মা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিল, বাবা সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, আমি অমত করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি।'

'তুমি অমত করলে কেন?' আমি বড়দার ওপর যেন অপ্রসন্ন হয়ে বললাম।

'কেন করলাম—!' বড়দা আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলল না। তারপর অতিশয় স্নিগ্ধ হয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল।'

'তা হলে সন্দেহ?' ছোট যেন বিরক্ত হল।

'না রে সন্দেহ নয়। মেয়েটিকে অবনী ভালবাসত।' বড়দা শান্ত গলায় বলল, 'মাকে আমি বলেছিলাম। মা বলেছিল, কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী। এ মেয়ে এলে আমার বংশধররা কত সুন্দর হবে ভেবে দেখ।' কয়েক দণ্ড থেমে বড়দা যেন মা-র সঙ্গে তার সেই কথোপকথন স্মরণ করল, তারপর বলল, আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি।' অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'মা এই কথাটা কেন যে বুঝল না!' বড়দা আক্ষেপের গলায় বলল, মনে হচ্ছিল তার কোনো পুরনো প্রদাহ সে আজ অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে আবার অনুভব করছে। অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, 'আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।'

বড়দা নীরব হলে সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য।

আমরা নির্বাক বসে থাকলাম। চৈত্রের বাতাস করবীঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছে, টাঙাঅলার পায়ে-টেপা ঘণ্টি বাজছিল। কদমগাছের ছায়া একটু যেন হেলে গেছে।

'তা হলে আমিও বলি—' বড়দি বলল। বড়দার পর বড়দিরই বলার কথা। আগে বড়দি দিশেহারা হয়ে বলেছিল, সে কি দেবে জানে না; এখন বড়দার কথার পর বড়দি মন স্থির করতে পেরেছে।

বড়দি কি দেয় শোনার জন্যে আমরা সকলে মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। জ্যোৎস্না আবার স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন নরম মসৃণ

দেখাচ্ছিল। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি, তার হাতে সরু দুগাছা করে সোনার চুড়ি। সাদা হাতে মিনের কাজের মতন চুড়ি দুটো চকচক করছিল।
অল্প সময় ইতস্তত করে বড়দি বলল, 'আমি অমন করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি বলে মা কোনোদিন খুশি হয় নি। তুই তো জানিস দাদা, মা তোকে কতবার সেই লোকটার কাছে যেতে বলেছে। কেন বল্ তো? বলত যাতে তুই তাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে পারিস।' সোজা হয়ে বসে নিল বড়দি, বাঁ-হাত গলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার মটর-হারে আঙুল রাখল। 'বাবাকেও মা বুঝিয়েছিল, আমি ওখান থেকে চলে এসে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। বরং চেপে বসে থাকলে তাদের জামাইকে শুধরে নিতে পারতাম।...মা আমায় বলত, এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন পুড়বে।'
'তুমি তো আজও মাঝে মাঝে কাঁদ, বড়দি।' ছোট আচমকা বলল।
বড়দি ছোটর দিকে তাকাল। ভাবল যেন। বলল, 'কাঁদি—' আস্তে মাথা নাড়ল বড়দি, 'কাঁদি, মা কেন আমায় আবার বিয়ে করতে বলল না।'
'তোমার কি আবার বিয়ে করার সাধ ছিল?' আমি অবাক হয়ে বড়দিকে দেখছিলাম।
'হ্যাঁ, মা-বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম।...চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু তো পাই নি।'
'তোমার আবার বিয়ে করা খুব সহজ ছিল না, বড়দি।' ছোট বলল।
'না হয় কঠিনই ছিল। তাতে কি!...বড়দি যেন দ্বিধাবোধ করে থামল, তারপর বলল, 'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।...মা-র সাহস হল না।...একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ, নোঙরামি, কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই; আপত্তি, সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বলেছিল—এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেবো না।...মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম।' বড়দি সামান্য থামল, তার সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু, মাটির ওপর ভর-করা হাত: নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, 'মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারি নি। মা যেন সেই সাহস পায়।'
কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস এসে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল, চাঁদের আলোয় একটা কাঠবেড়ালি কাঠচাঁপার ডাল বেয়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে পালাল।
বেদীর কুলঙ্গীর মধ্যে প্রদীপটা অকম্পিত জ্বলছে। ধূপধুনো ফুরিয়ে গেছে আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না।

এবার মেজদার পালা। আমরা মেজদার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মেজদা কিছু বলছিল না।

ছোট মেজদার গায়ে হাত দিল। 'মেজদা—তুমি ?'

মেজদা মাথা নাড়ল। 'এখনও কিছু ভেবে পাইনি। তোরা বল্। তুই বল্, ছোট।'

ছোটর স্বভাবই আলাদা। তার অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা নেই। ছোট একবার প্রদীপের দিকে তাকাল, এবার আকাশের দিকে। খুক খুক করে কাশল কবার ; তারপর বলল 'এত অল্প বয়সে আমার এমন একটা বিশ্রী অসুখ করল বলে মা বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছিল। ভাবত, আমি আর বাঁচব না। আমিও প্রথম প্রথম সেই রকম ভেবেছি। মা বলত, তুই নিজে ইচ্ছে করে এই অসুখ বাধালি। কী বোকার মতন কথা বলত, বড়দি। অসুখ কি কেউ ইচ্ছে করে বাধায়—! না অসুখে সুখ আছে—!' এক দমকে কথা বলছিল ছোট, বলতে বলতে থামল। মনে হল, সে কোনো কিছু না ভেবেই কথা শুরু করেছিল, তারপর খেই হারিয়ে ফেলেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমরা চুপ করে থাকলাম। ছোট একটু যেন অপ্রস্তুত হল। মাথার বেণী বুকের কাছে টেনে আঙুলে জড়িয়ে দুচার বার দোলাল। ছোটর গায়ে হালকা রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অর্ধেকহাত জামা। ছোটর কপাল ছোট ; দু পাশের চুল তার প্রায় সবটুকু কপালই ঢেকে ফেলেছে। নাকটি লম্বা ; চোখ দুটি খুব কালো, ছোটর হঠাৎ থেমে যাওয়া, হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করা এবং এই আপাতত চাঞ্চল্য থেকে মনে হল ছোট যেন খেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে।

আরও একটু সময় নিল ছোট। সে তার কথা খুঁজে পেল। বলল, 'অসুখ কেউ ইচ্ছে করে বাধায় না, অসুখে সুখ নেই—তাও ঠিক। তবু আমি এই অসুখে পড়ে একটা সুখ পাচ্ছিলাম।...তুমি তো জান বড়দি, অসুখের সময় আমার বন্ধুবান্ধবরা খোঁজ-খবর নিতে আসত। বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ অসুখ কিছুই না।... মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়।' ছোট তার দীর্ঘ বেণী কাঁধের ডান পাশে রাখল, আকাশের দিকে তাকাল আবার, তাকিয়ে থাকল, বলল, 'একদিন মা আমার সামনে সুশান্তকে বলল, তুমি তো ডাক্তার নও ; কেন অযথা ও-সব কথা বল। ওকে বকিয়ো না, বিরক্ত করো না।'...সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না। আমি মাকে বলেছিলাম, অকারণে তুমি ওকে অপদস্থ করলে। মা বলেছিল, 'ওরা আমার অনেক করেছে, তোমায় মাতিয়ে এই অসুখ দিয়েছে। তা দিক, আর আমার সুখ দরকার নেই।' ছোট আকাশ থেকে চোখ নামাল, তার গলা পাতলা, কাঁপছিল চোখ যেন একটু চিকচিক করছে। ও বলল, 'মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখে নি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার

দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক ; ভরসা পাওয়ার কত শক্তি…'
ছোট আমার দিকে তাকাল, 'আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'
ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম-ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে। বাতাবিলেবুর গাছটা অনেক দূরে। তার মাথার ওপর দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেললাইনের বাতি চোখে পড়েছিল আমার। দশরথ ধোপার কুঠিতে ওরা গান গাইছে। গত সপ্তাহে দশরথের ছেলের বিয়ে হয়েছে, আজও থেকে থেকে সেই আনন্দের লহরী তোলে তারা।
খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল। বলল, 'কড়ি, এবার তোর পালা—'
বড়দা, বড়দি আমার দিকে তাকাল। মেজদা তার অন্ধ চোখ অনুমানে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখল। সহসা অনুভব করলাম, ওরা আমার হৃদয়ে লুকানো মার ছবি দেখার জন্যে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। আমার ভয় করছিল। কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো কোনো সাক্ষীর বোধহয় জবানবন্দী দেবার সময় এই রকম ভয় হয়।
এই মুহূর্তে সকলই স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাসও শান্ত হয়ে আছে। দুধেরফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে। বড়দার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলার আয়োজন করছিলাম। বড়দার পাশ দিয়ে বেদীর কুলঙ্গীতে প্রদীপ চোখে পড়ছিল। শিখাটি স্থির। মার চোখের মতন শিখাটি যেন আমায় লক্ষ করছিল।
'ভেবে পাচ্ছি না—' আমি বললাম। আমার মন স্থির নয়, নিঃসংশয় নয়। দ্বিধায় গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে আমি বললাম, 'কখনও মনে হচ্ছে অনেক কিছু যেন দেবার আছে, আবার মনে হচ্ছে কিছু নেই। আমি সব চেয়ে ছোট বলেই মা আমায় তার শেষ গচ্ছিত ধনের মতন করে সরিয়ে রেখেছিল। মানুষ যেমন করে সিন্দুকে অবশিষ্ট অলংকার তুলে রাখে অনেকটা সেইরকম। ব্যবহার করত না, দেখত না।' কথা বলার সময় ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছি। গলা কাঁপছিল তখনও, তবু আমার স্বর স্পষ্ট হয়ে এসেছে অনেকটা। 'তোমরা মাকে যত পেয়েছ, যেমন করে পেয়েছ, আমি তা পাই নি। আমার মা আমাদের সংসারকে তেমন করে বুঝতে দেয় নি। ভাবত, আমার এ-সবে দরকার নেই।…কিন্তু আমি মাকে দেখেছি।…একবার মার সঙ্গে আমায় কাশী যেতে হয়েছিল। তোর মনে আছে ছোট, বাবা মারা যাবার পর মা একবার আমায় নিয়ে কাশী গিয়েছিল পনেরো বিশ দিনের জন্যে। তোরা ভেবেছিলি মার মন ভাল নয়, বাবার অভাবে মন বড় কাতর—তাই মা কটা দিন তীর্থের জায়গায় মন জুড়িয়ে আসতে গেছে। হয়ত খানিকটা সেই উদ্দেশ্যেই মা গিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়।…' আমার গলা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল, আমি আর ভীত হচ্ছিলাম না ; আমার মনের সামনে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, যা খোঁজার আমি যেন তা পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপশিখাটি শেষ বারের মতন দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেজদাকে দেখছিলাম। 'কাশীতে বাবার এক বন্ধু থাকত। আমি কখনও তার নাম শুনি নি—'

'শচীন-জ্যেঠামশাই।' বড়দা বলল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ। তুমি তা হলে জান ?'

'জানি বই কি। শচীজ্যেঠাকে আমি কতবার দেখেছি। তুইও দেখেছিস, অনু।'

'দেখেছি।' বড়দি মাথা নাড়ল।

'বাবার সঙ্গে ব্যবসা করত। তারপর কি হয়, আলাদা হয়ে গেল। পরে আর আমি শচীজ্যেঠার কথা শুনি নি।'

'নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়েই শেষ জীবন কাটাচ্ছিলেন।' আমি বললাম। বলার সময় শচীন-জ্যেঠামশাইয়ের কাশীর সংসার আমার চোখে ভাসছিল, স্পষ্ট অনাবৃত। 'বাঙালীটোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ওঁরা থাকেন ; উনি স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে—একটি পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন্ বাড়িতে যেন রান্নাবান্নাব কাজ কবে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।...কাশীর সেই অন্ধকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় একটি অসহায় পরিবার গলা পর্যন্ত ডুবে। মা গিয়েছিল সেখানে বাবার পুরানো কোন্ ব্যবসায় শচীন-জ্যাঠা কবে কাগজপত্রে বাবার অংশীদার ছিল সেটা নাকচ করিয়ে আনতে। উনি সে-কথা মনেও রাখেন নি, মনে রাখার কথাও নয়। তবু মা আইনের ফাঁক রাখতে রাজী নয। কে জানে কবে এই গর্ত খুঁড়ে সাপ বেরুবে না। একশো টাকার দু'খানা মাত্র নোট মা শচীন-জ্যেঠার হাতে দিয়ে সেই পুরানো অংশীদারী বাতিল করিয়ে নিল।...আমি মাকে বলেছিলাম, তুমি তো অনেক আগেই এটা ওঁদের ছেড়ে দিতে পারতে মা। বাবাও তো কাঠের ব্যবসাটা আর কবত না।...জবাবে মা বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝ না। ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছবে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে। টাকাটা আমি অকারণে খোয়াব ! অত স্বার্থ-ত্যাগ আমি শিখি নি।' 'আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানছিল, সেই যন্ত্রণায় আমি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না ; আমার সামনে শচীন-জ্যেঠার পিচুঁটিভরা চোখ দুটি ভাসছিল। কী দুর্গতি তাঁর ! মা স্বার্থত্যাগ জানত না।' আমি চাপা গলায় বললাম, 'মা দীন ছিল, আরমন কৃপণ ছিল।...আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না।'

আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদমগাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির

বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপা-দের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাঁকোর ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসল্ দিচ্ছে পথের জন্যে। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল।
মেজদা কিছু বলে নি। এবার বলবে। মেজদার পালা ফুরোলে আমাদের পাঁচটি আঙুলই গুটিয়ে যাবে।
আমরা কেউ কোনো কথা না বলে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
মেজদা কিছু বলছিল না। মেজদা শূন্যপানে মুখ তুলে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অধীর উৎকণ্ঠিত সেই অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।
'দীনু—' বড়দা মেজদাকে ডাকল।
মেজদা স্থির, শান্ত। যেন আকাশের দিকে তার অন্ধ চোখ মেলে সে হৃদয় দিয়ে মাকে দেখছে।
'দীনু—' এবার বড়দি হাত বাড়িয়ে মেজদার গা স্পর্শ করল।
মেজদা তবু পাথরের মতন বসে। তার নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছিল না।
ছোট ডাকল, 'মেজদা।'
হাত দিয়ে মেজদাকে স্পর্শ করে বললাম, 'মেজদা, এবার তোমার পালা।'
মেজদা সামান্য নড়ল। আকাশের দিকেই তার মুখটি তোলা, অমল জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখ লেপে রেখেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।
মেজদা তার সাদামাটা মেঠো সুরেলা গলায় বলল, 'সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।' কয়েকদণ্ড থামল মেজদা, তারপর বলল, 'আমাকে যেন একটা নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।...এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'
মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মা-র সৎকার যেন এইমাত্র সমাধা হল।
সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।

আত্মভুক

ঘন-বুনোটের জাল জানলায় আটকান। মাছির মত ছটফট করে খুকীর চোখদুটো। রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটে, রিকশা, ঠেলাগাড়ি যায়, ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টরের মোটর সাইকেলও মাসে দু'একবার আসে, জালের এপার থেকে খুকী তাকিয়ে থাকে। খুকীর কোন কাজ নেই। ঘড়ির দিকে তাকায়, ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই বাবা অফিস বেরিয়ে যাবে। তারপরেই এক ছুটে চলে যাবে ও হালদার বাড়ি।

নাকের উপর ধুলোর তিলক কেটে দিয়েছে জালটা। জালে চাপড় দেয় খুকী। এইটুকু তো ঘর। লাফিয়ে হাত বাড়ালে কড়িকাঠটাকে বোধহয় ছোঁয়া যায়। জংসন স্টেশনের মত কড়িকাঠের কাটাকুটি। উই পোকায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বরগা। দরজার চৌকাঠটাও ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশিয়ে এসেছে মেঝের সঙ্গে। ঘরে রোদ্দুর আসে না। লেপ তোষকে ভ্যাপসা গন্ধ। একতলা বাড়ি। ছাদের সিঁড়ি নেই, বিছানা রোদে দেওয়া যায় না। খুকী হাঁপিয়ে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিমেণ্ট-ওঠা উঠোন। পুরু শ্যাওলা। এখন আর পা হড়কায় না। একপাশে রান্নাঘর আর বাড়িওয়ালী বুড়ী থাকে। খুকী ঘড়ি দেখে আবার, আর এতক্ষণে, যেন এই প্রথম মনে পড়ল, হালদার বাড়িতে একটাও কড়িকাঠ নেই। ঢালাই কংক্রিটের ছাদ। এ পাড়ায় ওই একটি বাড়িতেই ওপর দিকে তাকালে ধবধবে দেওয়াল দেখা যায়। নতুন কালির গন্ধ এখনো ফুরোয় নি। অত তো হাওয়া! আর দরজায় পালিশ। হাত দিলে পিছলে পড়ে হাত। কেউ ডাকেনি, নিজে যেচে আলাপ করা খুব সোজা কথা নয়। তবু অনেকটা সোজা হয় যদি সমবয়সী কোন মেয়ে থাকে, কিন্তু হালদার বাড়িতে মেয়ে নেই, ছোট বউ কম করেও তার থেকে দশ বছরের বড়। হালদার গিন্নী চালচলনে রাশ ভারী, আর বড় বউ যেন মোমে গড়া পুতুল। কি খুশীই না হলো ওরা তাকে দেখে। সেই প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়েছিলো খুকী। ইচ্ছে করে এবাড়ির মেয়ে হয়ে থেকে যায়। গল্প করে এটা—ওটার। সতের নম্বরের ন' পিসির গল্প বলে। হালদার বাড়ির সুন্দর ফুরফুরে বউ দুজন, অবাক চোখে শোনে, আর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলে, "ওমা, তাই নাকি!"

ওদের বিস্ময়ে খুকী খুব খুশী। সে চাইছিল ওরাও তাকাক তার দিকে, শুনুক তার কথা। ন' পিসিকে ওরা জানে স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখিনী! তাই রসিয়ে রসিয়ে খুকী গল্প করে। অল্পবয়সী কোন সম্পর্কের কার সঙ্গে যেন ন' পিসি বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর কেমন করে জানি বাপের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। বড় বৌ, ছোট বৌ, দুজনেই খুকীর গা ঘেঁষে আসে। মৃদু তাপ পাওয়া মোমের মত নরম নরম হাত বড় বৌয়ের, খুকীর হাত ছুঁয়ে যায়। ছোট বৌয়ের ডাগর চোখ, খুকীর চোখ পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে। সময় কাটে গল্পে। তারপর খুকী বাড়ি ফেরে। মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

"ছিলি কোন চুলোয় এতক্ষণ ?"

"হালদার বাড়িতে।"

স্নান করা বেড়ালের মত চুপসে যায় মা।

"কি রোজ রোজ যাস ওদের বাড়ি। গেলেই তো এটা ওটা খেতে দেবে। ওতে কখনো মান থাকে।"

খুকী চুপ করে থাকে, শুধু আর একটা কথা শোনার জন্য। প্রতিদিনের শোনা কথাটা।

"হ্যাঁরে, আজ কি খেতে দিল রে ?"

তারপরই কথায় কথায় ঢেউ ছড়ায় খুকী, মার প্রশ্নের ঘাটলায়।

প্রায় লাফিয়ে উঠল খুকী। পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে অনেকক্ষণ। মা একবার চিৎকার করে ওঠে। "তাড়াতাড়ি ফিরিস। কাপড় সেদ্ধ করতে দিচ্ছি। এসে কেচে দিবি।"

কথাটা শুনতে পেল কি পেল না, খুকী ততক্ষণে হালদার বাড়ির বড় বৌয়ের ঘরের পর্দা সরিয়ে ইতস্তত করতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন বালা গড়িয়ে এসেছে। আয়নার সামনে বালাপরা হাতটাই নয় শরীরটাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে বড় বৌ। খুকী মুগ্ধ চোখে আয়নাটারই তারিফ করে। কি বড় আয়নাটা! আরশুলা রঙের ড্রেসিং টেবল, গা-ডোবান সোফা, বসলেই আরাম জড়িয়ে ধরে গলা পর্যন্ত। ঝকঝকে রেডিও সেট, রঙীন শেডের ল্যাম্প, ডানলোপিলোর বিছানা। প্রত্যেক দিন খুকী এ সব দেখে, আজকেও দেখল বড় বৌকে দেখার সঙ্গে। তারপর পায়ে পায়ে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়াল।

ফুরফুরে হাওয়া আসছে। পাখাটা বন্ধ। তবু হাওয়া আসে। তিনতলায় ঘর। সারা দেওয়ালটাই তো জানলা দিয়ে তৈরি। আলো, আলো আর হাওয়া। ঘুম পেয়ে যায় খুকীর। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শুধু ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে এমন একটা ঘর পেলে। একটু খানির জন্য চোখটা বুজেও আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ করে নেয় দৃষ্টিটা। বড় বৌয়ের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে। খুকীর মন দুরুদুরু। না বলে ঘরে

ঢুকেছে, তাই কি ? এবাড়ির রীতি, জিজ্ঞাসা করে ঘরে ঢোকা। কিন্তু সে তো ঝি-চাকরদের জন্য নিয়মটা। না, ঝি-চাকরদের সঙ্গে তার তফাত নিশ্চয় আছে। কথাটা ভেবে মনে মনেই লজ্জা পেল খুকী। কি আক্কেলে সে নিজেকে ঝি-চাকরদের সঙ্গে তুলনা করার কথা ভাবতে পারল।

খুকী আবার তাকায়। বিরক্তি চিহ্নটা নেই। তবু যথেষ্ট ভরসা পায় না।

"মার যেমন পছন্দ। এটাকে ভেঙে আবার গড়াব।" বড় বৌ বলে হঠাৎ। মুখের বিরক্তিটা হাতে টেনে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বড় বৌ খুলে ফেলল বালাটা। খুকী চুপ করে রইল।

"আজকাল কি আর ঐ ফ্যাশান চলে।"

নড়েচড়ে বসল খুকী। এবার বড় বৌ কথা চাইছে তার কাছ থেকে।

"তারকদার বৌয়ের কিন্তু ঠিক ওমনি একটা বালা আছে।" নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল খুকী। তারকদার বৌয়ের গল্প এ-বাড়ির সবাই জানে। বি এ পাস। প্রেম করে বিয়ে হয়েছে। কি একটা আপিসে চাকরি করে, মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। এই নিয়ে তারকদার সঙ্গে বৌয়ের তুমুল ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে। গলার শির ফুলিয়ে নয়, দাঁতে দাঁত চেপে কথা কাটাকাটি হয়। হাজার হোক শিক্ষিত তো দুজনেই। নিজেদের কথা আর পাঁচজনকে শুনতে দিতে চায় না।

"তুমি শুনেছ ওদের ঝগড়া ?"

স্প্রীংয়ের ধাক্কায় দুলতে দুলতে বড় বৌ খাটের কিনারে গড়িয়ে এল। খুকী ঝগড়া শোনেনি, তবু ইচ্ছে হল বলে, হ্যাঁ শুনেছি। তাহলে হয়ত, বড় বৌ ওকে টেনে নিয়ে খাটের উপর শুইয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুনতে চাইবে গল্পটা। এমন খাটে কোনদিন শোয়নি খুকী। লোভী চোখে তাকাচ্ছে সে বড় বৌয়ের প্রায় অর্ধেক-ডোবা শরীরটার দিকে। "কি ? শুনেছ, কি বলে ওরা ঝগড়ার সময় ?"

মুখ টিপে হেসে খুকী একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, "সে বড় অসভ্য কথা।"

হাত বাড়িয়ে খুকীকে খাটের ওপর টেনে আনল বড় বৌ। যা ভেবেছিল তাই। খুকী বিছানায় সাবধানে হাত বুলিয়ে, হাসল। কি রকম গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে বড় বৌ। এমন বিছানায় শোয়া ওর অনেক দিনের অভ্যাস। খুকী তার নিজের বসবার ভঙ্গীটাও অনেকখানি শ্লথ করে দিল।

এতক্ষণে বড় বৌয়ের মনে হল, গরম চায়ের সঙ্গে খুকীর গল্পটা ভাল জমবে।

"খুকী ভাই একটা কাজ করবে। নীচে গিয়ে ঠাকুরকে বলবে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।" খুকী উঠে দাঁড়াল।

"কিছু মনে করলে না তো। ঝিটা যে থেকে থেকে কোথায় ডুব মারে। আর বিস্কুটের টিনটাও নামিয়ে দিয়ে যাও।"

ঝড়ের মত নীচে নেমে আসে খুকী। এ বাড়ির বাজার আসে দশটায়। স্কুল বা অফিসের ভাত খাওয়ার কোন লোক নেই। ব্যবসাদারের বাড়ি। তবু দশটা বেজে গেছে, তাই মরবার ফুরসুত নেই এখন ঠাকুরের।

"ঠাকুর শিগগিরী দু'কাপ চা করে দাও।"

"চা-ফা এখন হবে না। এতক্ষণ উনুন কামাই যাচ্ছিল, তখন আসনি কেন।"

ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে কয়েকবার ছোটাছুটি করে ঠাকুর। তবু দাঁড়িয়ে থাকে খুকী। তিন তলার ঘরে, ফুরফুরে হাওয়া। সাদা দেওয়ালে ধাক্কা লাগা সূর্যের আলো। নরম সোফা, আর বড় বৌ, এদের ঘেরাটোপের মধ্যে বসে চা খাওয়া। তার জন্য কিছুক্ষণ কেন, সারা বেলাটাই তো সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ডাল ফুটছে উনুনে। পিঁড়িতে পা গুটিয়ে বসে ঠাকুর তাকাল খুকীর দিকে। সরু সরু পা। ফ্রকটা ঝলমল করে কোমরের নীচে হাঁটুর তলা পর্যন্ত। কিন্তু অস্বস্তি হয় পনেরো বছরের খুকীর। বুকের কাছটায় হাত পাশাপাশি করে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যমনস্কোর ভান করে।

পানের ছোপ পড়া ঠাকুরের দাঁতগুলো কাল ঠোঁট দুটোকে পিছনে ফেলে খুকীর দিকেই যেন এগিয়ে আসে। চৌকাঠের ধারে সরে আসে খুকী। ঠাকুর এ বাড়িতে অনেক দিনের লোক।

"চলে যাচ্ছো নাকি!"

ডালের কড়া নামিয়ে, কেটলি বসাল ঠাকুর। "তুমি নিজেই করে নিয়ে যাও।"

ঘরের মধ্যে গুটি গুটি এসে দাঁড়াল খুকী। ঠাকুর পা চুলকোতে শুরু করল। খুকী আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে কেটলির দিকে। গনগনে আঁচ, দু'কাপ জল সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠল! চা ছেঁকে দুধ, চিনি দেবার সময় হাঁ-হাঁ করে উঠল ঠাকুর।

"করছ কি অতখানি চিনি দেয়। মা যদি জানতে পারে, তাহলে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে।"

ভয়ে আর নিজের কাপে চিনি দেয় না খুকী। পেয়ালা হাতে উঠে দাঁড়ায় সে। কানা ছাপিয়ে পড়ছে চা। সাবধানে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করে। প্রায় ধমকে তাকে থামায় ঠাকুর। "চিনি না দিয়ে চা খাবে কি!"

দু' চামচ চিনি কাপে ঢেলে, চামচ নাড়তে থাকে ঠাকুর। বাঁ হাতটা খুকীর কাঁধে এসে পড়ে যেন আচমকা। সরে যেতে গেল খুকী, আঙুলগুলো কাঁকড়ার মত খুবলে ধরল ঘাড়টা। ভয়ে কেঁপে ওঠে খুকীর হাত। খানিকটা চা

চলকে পড়ল পায়ে। কেউ যদি এসে পড়ে, কেউ যদি দেখে ফেলে, তার চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেমন হয়।

কিংবা একটা চড় যদি মারা যায়, কিন্তু দু হাতে যে কাপ রয়েছে। যদি ভেঙে যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে খুকী সোনালি নকশা করা পাতলা ফিনফিনে কাপ দুটোর দিকে। এত কথা যখন ভাবছিল ততক্ষণে চাপ চাপ, বিড়ি আর দোক্তার গন্ধ তার গালে ঠোঁটে বুলিয়ে গেল ঠাকুর।

রান্নাঘর থেকে প্রায় ছিটকেই খুকী এল। গরম চা আঙুলে পড়ল। উঠোনে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে একবার কেঁপে উঠল। চারতলা হালদার বাড়িটা চায়ের কাপে দুলে উঠে, ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। সিঁড়িতে ওঠার আগে কাপ দুটো সে নামিয়ে ফুঁ দিল আঙুলে। কেমন একটা পুরুষালি গন্ধ, গা গুলিয়ে উঠল খুকীর। যদি কেউ দেখে ফেলত তাহলে কি হতো। ভয়ে শিরশির করে ওঠে হাঁটুদুটো। নিশ্চয় তাকেই সকলে খারাপ ভাবত, এই বাড়িতে আসাও বন্ধ হয়ে যেত।

থুথু ফেলে কাপ দুটো তুলে নিল খুকী। হালদার বাড়ির সিঁড়ির রেলিংগুলো নির্ভুল ছায়া ফেলে কাপের মধ্যে এখন পাশাপাশি সাজান রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই কপট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বড় বৌ।

"ওমা, তুমি আবার নিজে হাতে করে আনলে কেন, ঠাকুরকে বললেই তো হতো।"

"আপনাদের ঠাকুরের যা মেজাজ। কত খোসামোদ করে তবে চা তৈরি করে আনলুম।"

হেসে তাকাল খুকী বিস্কুটের টিনটার দিকে।

হালদার বাড়ি থেকে বার হতেই বার নম্বরের জেঠিমা ডাকল খুকীকে। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল, তবু হেসে জানলার ধারে এগিয়ে এল খুকী।

"সত্যি বলছি, আর একদম সময় পাই না। নইলে বলুন আপনার কাছে তো রোজই আসতুম।"

"আহা-হা, কি এমন কাজের লোক হয়েছিস' শুনি। হালদার বাড়ি রোজ যাবার সময় তো ঠিকই পাস।"

জেঠিমার সুরে অভিযোগ নয় অভিমানটাই তীব্র। খুকী জানলার রডে হাত বুলোয়। কোন কথা বলে না সে। যেন জেঠিমার কথাটাই সে মেনে নিয়েছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে থাকে।

"হ্যাঁরে ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ি আহিরীটোলায় না? সেদিন ভাগ্নীর বড় ননদ এসেছিল। সে-ই বলল, হালদার বাড়ির ছোট বৌ ওদের শ্বশুর বাড়ির পাড়ার মেয়ে। বাপটার বুঝি মনোহারী দোকান আছে। দেখতে সুন্দর, কটা গায়ের রঙ বলেই না উতরে গেল।"

খুকীর কথা যেমন করে থামিয়েছিল জেঠিমা, তেমনি করে খুকী বলে উঠল, "আচ্ছা, জেঠিমা এখন চলি, মা রাগ করবে।"

"আহা, এই তো মোটে সাড়ে এগারোটা, ভেতরে আয় না। ডলু কি কেলেঙ্কারী করেছে শুনেছিস তো।"

মনে মনে ক্লান্ত হয়েছিল খুকী। এক কাপ চা, খান দুই বিস্কুট খিদেটাকে যেন চাগিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলো ভিতরে গিয়ে বসে। তারিয়ে তারিয়ে শোনে ডলুর কথা। সবই জানা, তবু নতুন কিছু হয়তো ঘটেছে এবারে। জেঠিমার পাশ দিয়ে সে ঘরের মধ্যেটা দেখতে পায়। ছোট্ট ঘর, সারা ঘর জুড়ে প্রায় সেকেলে ভারী পালঙ্ক। খাটে স্তূপীকৃত বালিশ আর তোশক। খাটের নীচে বড় কয়েকটা ট্রাঙ্ক। দেয়ালে তাক ভর্তি টিনের কৌটো আর শিশি বোতল। আলমারী, আলনা আর ঠাকুর দেবতার ছবি। দম আটকে আসে শুধু তাকিয়ে থাকলেই। সঙ্গে সঙ্গে হালদার বাড়ির ঘরগুলোও মনে পড়ে খুকীর।

পাড়ার অন্য বাড়িতে আর না যাবার কারণটা এই মাত্র যেন খুঁজে পেল খুকী। ভাল লাগে না। এই দম চাপা ঘর, ময়লা জামা-কাপড়, নোংরা চালচলন। ঠিক এই জন্য তার নিজের বাড়িটাও ভাল লাগে না। এরা চুপ করে থাকতে জানে না। অবাক হতে জানে না। এদের মাঝে খুকী অতি সাধারণ হয়ে যায়। কত তফাৎ এদের সঙ্গে হালদার বাড়ির। সেখানকার বড় বৌ, ছোট বৌ, নভেল হাতে বিছানায় গড়ায়, রেডিওর কাঁটা ঘোরায়, সাজগোজ করে সিনেমায় যায়। অজস্র সময় আর উপকরণ ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে না পেরে, হাঁপিয়ে ওঠে। খুকী ঈর্ষা করে না। তাতেও তার ভয়। যদি ওরা জেনে ফেলে। কাছে আসতে যদি না দেয়।

"না জেঠিমা আজ বসব না। আর একদিন এসে শুনব।"

চলে যাচ্ছিল খুকী। জেঠিমা ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে ওদের দু বোয়েরই ছেলেপুলে হয় নি কেন রে?"

"জানি না।"

ক্লান্তস্বরে খুকী জবাব দিল। আবার প্রশ্ন আসে জেঠিমার, "ছোট বোয়ের ভায়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলুম?"

ঘাড় নেড়ে খুকী এগিয়ে যায়।

'ভাগ্নীর ছোট ননদ এবার আই এ পাস দিয়েছে, একবার বলিস না কথাটা।"

খুকী তখন অনেক দূরে।

দুপুরের অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় কেচে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে খুকী। মাদুরে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে, আর কাঠওয়ালির চীৎকারে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যায়। একদিন বুঝি ওর কাছ থেকে কাঠ কিনেছিল, তাই রোজ জানলার কাছে চীৎকার করে যাবে। খোলা কল দিয়ে জল পড়ছে। বিরক্ত হয়েই খুকী

কলটা বন্ধ করে দেয় আর গজগজ করে। এই এক আপদ জুটেছে। রোজ এসে ঘ্যান-ঘ্যান করবে। বিরক্ত হয়েই খুকী কলঘরে যায়।

কিন্তু খুকী যখন হালদার বাড়ির ছাদের পাঁচিলে কনুই রেখে দাঁড়ায়, বিরক্তির রেশমাত্র তখন আর থাকে না। গোটা পাড়াটাই ঐখান থেকে দেখা যায়। অবাক লাগত প্রথম প্রথম। নতুন মনে হত বাড়িগুলোকে এত ওপর থেকে দেখলে, অবাক হবার সুযোগটুকু দেবার জন্য হালদার বাড়ির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল খুকী মনে মনে। নীচু নোংরা বাড়ি আর মানুষগুলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যও তাকে রক্ষা করেছে হালদার বাড়ি।

এতদিন যাওয়া-আসা করছে খুকী, হালদার বাড়ির প্রকৃতি সে চিনে নিয়েছে তার বুদ্ধি দিয়ে। সময় কাটাবার অজস্র উপকরণের মধ্যে খুকী আর তার গল্পও একটা উপকরণ। তাই খটকা লাগল খুকীর। আজ কয়দিন ধরেই সে লক্ষ্য করেছে, তাকে দেখে আর হালদার বাড়ি তেমন খুশী হতে পারছে না। সারা বাড়িটা যেন থমথমে মুখ নিয়ে তার দিকে ভ্রূকুটি করে আছে। খুকী ভয় পায় এসব দেখে। হালদার বাড়িতে সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি কথা আর ভাবভঙ্গী বিশ্লেষণ করে। ভয়টা তার বেড়ে যায়, সেদিন চিল-কোঠার ঠাকুর ঘরে হালদার গিন্নীর কথাটা মনে পড়ে।

ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করছিল হালদার গিন্নী। শুধু একবার তাকিয়ে কাজে মন দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুকীই প্রথম কথা শুরু করল।

"ভট্‌চাজদের শ্রীধরের কাজগুলো সব দত্ত কাকীই করে। বাসন মাজা ঘর ধোয়া এমন-কি পুরুত ঠাকুরের জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে দেয়।"

হালদার গিন্নী শুনেও শোনে না। খুকী তাতে কিছু মনে করে না। আপন মনেই সে বলে যায়, শুধু চোখ দুটোকে তীক্ষ্ম রেখে!

"এই নিয়ে কত কথা উঠেছিল, আর উঠবে নাই বা কেন, অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে, তার অত রাত পর্যন্ত মন্দিরে থাকার দরকারটাই বা কিসের? পুরুত তো লোক ভাল নয়। ছোটবেলায় ডলুকে একবার কি করেছিল জানেন?"

"জানি কি করেছিল।"

এতটুকু হয়ে যায় খুকী, হালদার গিন্নীর স্বরের তীব্রতায়। গুটি গুটি সে তিনতলায় নেমে এসেছিল। উল বুনছিল বড় বৌ। খুকী চুপ করে দেখছিল। হঠাৎ সে বলে ওঠে।

"তারকদার সোয়েটারটা দেখেছেন তো, খয়েরী হাতায় কালো বর্ডার। বলুন তো কে করেছে।"

বড় বৌ কথা বলে না, আরো দ্রুত হাত চলে। উত্তর না পেয়ে অপ্রস্তুত হয় না খুকী। জবাবটা সে নিজেই দেয়।

"নীলিমাদি। আগে ওদের বাড়িতে ভাড়া ছিল। তারকদার বিয়ের আগেই উঠে গেছে। এখনো তারকদা ওদের বাড়ি যায়। প্রত্যেক রোববার। নীলিমাদির এখনো বিয়ে হয়নি, খুব ভাব ছিল ওদের দু'জনের। এই নিয়ে বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তাতে বৌদি কি বলেছিল জানেন?"

"জানি।"

ছোট বৌয়ের ঘরে পা দিয়েই মনে পড়ল আবার, এ বাড়িতে ক্রমশই সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছে। খাটে শুয়ে সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল ছোটবৌ। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল খুকীকে।

"পড়ছেন বুঝি! কি পড়ছেন?"

জবাব পেল না খুকী। তা'তে কি হয়েছে, এ বাড়িতে তার কথাই তো সকলে শুনতে চায়।

"আপনার মতো বিনুদিরও বই পড়ার বাতিক আছে। ওর ভায়ের মাস্টার রোজ বই এনে দেয়। একদিন বই না পেলে সে'কি ছটফটানি বিনুদিব। শুধু বই তো আর নয়, ওর মধ্যে আরও একটা জিনিস থাকে।"

"জানি, চিঠি থাকে তো!"

জানি জানি আর জানি। আর কিছু জানতে বাকি নেই এদের। কেউ তার কথা শুনতে চায় না। এ বাড়ির কৌতূহল যেন ফুরিয়ে গেছে। সব সম্পর্ক ফুরিয়ে আসছে তার হালদার বাড়ির সঙ্গে।

কাঠের রেলিংয়ে হাত রাখে খুকী। কি পালিশ! পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলছে। পর্দায় ময়ূরের নকশা মনে হয় যেন নাচছে। চোখ ফেরান যায় না। চা খাবার জন্য কেউ তাকে ডাকল না।

বাড়ি ফিরে খুকী ঠিক করল, আর সে হালদার বাড়ি যাবে না। পরপর কতগুলো বিকেল গড়িয়ে গেল, রাত পুইয়ে এল।

সদর দরজা থেকে পায়ে পায়ে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে যায় খুকী ডলুদের সদর দরজা লক্ষ্য করে। হালদার বাড়ির সীমানা দিয়েই সে ছুটে একদম ডলুদের রান্নাঘরে এসে উঠল।

"বেশ করেছি। আমার সর্বনাশ আমি করেছি তাতে তোমাদের কি?"

ঘর থেকে চাপা চীৎকারে বাতাস তোলপাড় করল ডলু। রান্না ঘর থেকে একই সুরে জবাব দিল ডলুর মা।

"তুই কি আমার একটা মেয়ে? অন্যগুলোর ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না? এই কেলেংকারীর পর ওদের আর বিয়ে হবে?"

"বিয়ে না হয়, তাহলে আমি যা করেছি তাই করবে। সংসারে যখন এনেছিলে মনে ছিল না, খাইয়ে পরিয়ে বিয়ে দিতে হবে।"

"বলি তোর বিয়ে কি আমরা ইচ্ছে করে দিচ্ছি না ? বাপের রোজগার-পাতি, সংসারের মানুষ জন, সব মিলিয়েই না বিবেচনা করতে হয়।"

কি একটা বলবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল ডলু, খুকীকে দেখে চুপ করে ফিরে গেল। জুলজুলে চোখে খুকী তাকায় ডলুর ঘরটার দিকে। হালদার বাড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র যেন ডলুর কাছে। এবার সে এমন করে তার গল্পের ঝুলি ভরাবে যাতে আর কোনদিন না হালদার বাড়ি বলতে পারে, জানি।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি মাড়িয়ে, চকচকে রেলিং ধরে ধরে, ময়ূর আঁকা পর্দার সামনে, নিঃসংকোচে দাঁড়াল খুকী। ফুরফুরে হাওয়ায় পর্দার ময়ূরটা নাচছে। খুকী পর্দা সরিয়ে ঢুকল। ছোটবৌ চা খাচ্ছে। পাতা জোড়া ছুঁই ছুঁই করছে সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে। ফিসফিস করে খুকী বলল, "জানেন কি হয়েছে ডলুর।"

"জানি।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য খুকীর চোখের সামনে ময়ূর নেচে উঠল। জানি জানি আর জানি। ওরা সব জানে। সব ? ওদের জানার বাইরেও কি কিছু থাকতে পারে না ? খুকী অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকল ছোটবৌয়ের দিকে, তারপর টপটপ করে জল পড়তে শুরু করল তার চোখ থেকে।

"কি ব্যাপার, কাঁদছ কেন ?"

খুকী ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

"কিছু হয়েছে কি তোমার ?"

খুকী মাথা নোয়াল। "আমার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

অবাক হয়ে ছোটবৌ উঠে ওর পাশে এল। খুকী ফিসফিস করে কি যেন বলতেই ছোটবৌ কৌতূহলে ফেটে পড়ে বলল, "অ্যাঁ, কার সঙ্গে ? কে করল তোমার···কবে হল, কি ভাবে ?"

খুকী মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না না বলতে পারব না।"

আর সে মনে মনে ধারাবাহিক সুখে বলতে থাকল, এইবার এইবার, দেখি কেমন করে জানি বলো, এইবার দেখব।

শবাগার

মুকুন্দ খবরকাগজের প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু-সংবাদ দেখল, বাসিমুখেই। দুজন বিদেশী মন্ত্রী, একজন বাঙালী ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে। ওদের বয়স ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬। মুকুন্দর বয়স ৫১, কিন্তু সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেরানী। থাকে পৈতৃক বাড়িতে, ছোট সংসার, একতলা ভাড়া দেওয়া।

দোতলায় রান্নাঘর ও কলঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে চিন্তিত স্বরে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "থ্রম্বসিসে আজকাল খুব মরছে।"

লীলাবতী চা তৈরিতে ব্যস্ত। বলল, "কে আবার মরল?"

হাঁ-করে ভিতরের পাটিতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ বলল, "খণ্ডরের কাগজে দিয়েছে, চাজ্জন্।"

"থম্বসিস হয়েই তো ছোঠ্ঠাকুরঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে মরে গেল। পাশের লোকটা পর্যন্ত টের পায়নি। কি পাজি রোগরে বাবা!"

এরপর লীলাবতী যা-যা বলবে মুকুন্দর জানা আছে। কি দশাসই চেহারা ছিল, কি দারুণ রগড় করত, কি ভীষণ খাইয়ে ছিল ইত্যাদি। একতলার কলঘরের ছিটকিনি খেলার শব্দ হতেই মুকুন্দ বারান্দার ধারে সরে এল। শুকনো শাড়িটা আলগা করে সদ্যস্নাত দেহে জড়িয়ে শিপ্রা বেরোচ্ছে। হাতে গোছা করে ভিজে কাপড়।

শীতলপাটির মত গায়ের চামড়া, দেহটি নধর। লীলাবতী রান্নাঘর থেকে একটানা কথা বলে যাচ্ছে। মীরা স্কুলে যাবার জন্য আয়নার সামনে। মনু তার ঘরে এখনো ঘুমোচ্ছে।

শিপ্রা উঠোনের তারে কাপড় মেলে দিতে দিতে মুকুন্দকে দেখে ভ্রুকুটি করেই হাসল। গোড়ালি, মুখ ও দুটি হাত তোলা। চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল, "এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার।"

নিচের ভাড়াটে শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গকে দিন কুড়ি আগে জবাব দিয়ে ক্যানসার হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিন গুণছে। লীলাবতী গলা নামিয়ে বলল, "যা অবস্থা দেখলুম, মনে হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। বউ আর মেয়ের যে কি দশা হবে এরপর! মনুকে তুলে দাওতো, চা হয়ে গেছে।"

মনুকে ডাকতে গিয়ে মুকুন্দ দরজার কাছে থমকে গেল। কাত হয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে, লুঙ্গিটা হাঁটুর উপরে উঠে রয়েছে। বাইশ বছরের ছেলে, কলেজে পড়ে। ঈষৎ গম্ভীর প্রকৃতির। বাপের সঙ্গে কমই কথা বলে। মুকুন্দ সন্তর্পণে লুঙ্গিটা নামিয়ে মনুর কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওঠ্, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে মুখ ধুতে যাবার সময় মুকুন্দ দেখল, মেয়ের ফ্রকটা তারে মেলবার জন্য শিপ্রা ছুঁড়ে দিল এবং পড়ে গেল উঠোনের মেঝেয়। মুকুন্দর মনে পড়ল, তারটা এত উঁচু করে বেঁধেছিল গৌরাঙ্গই। ও খুব লম্বা। তখন ওর ক্যানসার ধরেনি।

দোতলা থেকে সিঁড়িটা একতলায় এসে ঠেকেছে শিপ্রাদের দরজার পাশেই। ডানদিকে ঘুরে গেছে হাত-পনেরোর একটা গলি সদর দরজা পর্যন্ত, বাঁদিকে উঠোন ও শিপ্রার রান্নাঘর। মুকুন্দ

বাজারের থলি হাতে নীচে নামতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আজ কিন্তু রেশন তোলার শেষদিন, নইলে হপ্তাটা পচে যাবে।"

"অফিস যাবার সময় দেব।" বলেই মুকুন্দ ওর পাছায় হাত রাখল।

"ধ্যাৎ।" শিপ্রা ফাজিল হেসে ছিটকে সরে গেল।

সদর দরজার গায়েই শিপ্রাদের ঘরের জানলা। মুকুন্দ একবার তাকাল। গৌরাঙ্গ বুকের উপর হাত রেখে স্থিরচোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। বাজার থেকে ফেরার সময়ও সে তাকাল। গৌরাঙ্গ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখদুটো কঠিন বরফের মত ঝকঝকে। যেন শীতল-ক্রোধ জমাট বেঁধে রয়েছে। অফিসে যাবার সময় মুকুন্দ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল। শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো। মুকুন্দর হাত থেকে দশটাকার নোটটা নেওয়া মাত্রই শিপ্রাকে সে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেতে যাবে, কিন্তু শিপ্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকিয়েই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মনু মাথা নিচু করে মুকুন্দর পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ অসহায় বোধ করে অবশেষে শিপ্রার ঘরের জানলায় তাকাল। গৌরাঙ্গর চুল ধরে বাচ্চামেয়েটি টানাটানি করছে। গৌরাঙ্গর চোখ থেকে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটলে একটা বিন্দু হয়ে রয়েছে।

বাসে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুর বাসের মধ্যে থ্রম্বসিসে মারা গেছল। তারপর মনে হল, মনু কি আমায় ঘেন্না করবে?

"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।" মুকুন্দর পিছনে কে একজন কাকে বলল, "পাইপগান দিয়ে মেরেছে। বছর আঠারো বয়স হবে।"

"রাস্তাতেই ?"

"তবে নাতো কোথায় ? বাড়ি থেকে বার করে এনে, রাস্তাভর্তি লোকের সামনেই !"

"কেউ কিছু করল না ?"

"পাগল ! করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে !"

"পুলিস ?"

"এসে বডিটা নিয়ে গেল।"

"অ্যারেস্ট করেনিতো কাউকে ? যা পেটান পেটাচ্ছে তাতে নাকি চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে !"

বাসের লোকেরা, এরপর, পেটানোর নানান বীভৎস পদ্ধতির আলোচনা শুরু করল। মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মনুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে ! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে ?

অফিসের লিফটে পাঁচতলায় ওঠার সময় সে ভাবতে লাগল, মনু কি ওর মাকে ব্যাপারটা বলে দেবে ? একেবারে ছেলেমানুষ নয়, সিরিয়াস ধরনের। হয়তো লজ্জায় নাও বলতে পারে। এই সময় মুকুন্দ শুনল, তার সামনের লোকটি পাশেরজনকে বলছে —"না ভাই, শরীর খারাপ নয়। ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে, এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছেনা। মনটা তাই—" লিফট চারতলায় থামতেই ওরা দুজন বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসামাত্র পাশের টেবলের অজিত ধর মাথা হেলিয়ে বলল, "মুকুন্দদা আজকের কাগজ দেখেছেন ? চার চারটে থ্রম্বসিস ডেথ ফ্রণ্ট পেজেই। সবাই অ্যাবাভ ফিফ্‌টি।"

"আমার ফিফটি-ওয়ান।" মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল

টেবলের ফাটল থেকে উঠে আসা ছারপোকাটার দিকে এবং সেটা একটা ফাইলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার পর আবার বলল, "আমার একান্ন শুরু হয়েছে।"

"এবার সাবধান হোন। স্নেহজাতীয় জিনিস খাওয়া কমান আর লাইট ধরনের কিছু ব্যায়াম করুন।"

অজিত ধরের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। বছর পনেরো আগে ওয়েট-লিফটিং-এ স্টেট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ফেদারওয়েটে। বিয়ে করেনি। এখন তবলা শিখছে। মুকুন্দ ড্রয়ার থেকে দোয়াত বার করে কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এসব হবেনা।"

"কি করে জানলেন?"

"যারা হ্যাপি যাদের উদ্বেগ নেই তাদের হয়না। থ্রম্বসিসে কটা মেয়েমানুষ মরেছে?"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ নই।" অজিত ধর গম্ভীর হয়ে মুখ ফেরাল। মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়, পচ ধরে বীভৎস দেখাচ্ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এসেই জয়ার ভাসুর বমি করে ফেলে। আইডেন্টিফাই করার মত কোনকিছু সঙ্গে থাকলে ভদ্রলোক তার ছেলেকে বমি করাত না।

এবার মুকুন্দ, কৌতুহলবশতই ভাবল,বাসে আজ যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতাম, তাহলে আমার লাশটার কি হত? বাসটা নিশ্চয় থেমে যাবে। কেউ বলবে হাসপাতালে, কেউ বলবে থানায় বাসটাকে নিয়ে চল। তারমধ্যে সেই লোকটা—যে বলেছিল, 'পাগল। করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে'—বলবে "একদমই যখন মরে গেছে তখন আমাদের অফিস লেট করিয়ে লাভ কি, বরং এখানেই নামিয়ে দিন, পাবলিক কিংবা পুলিশ ব্যবস্থা করে দেবে।" শুনে মনে মনে সবাই হাঁফ ছাড়বে, তবে দু-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা খুবই নিষ্ঠুর দেখাবে, বরং বাসের একটা সীটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে তারপর থানায়

বা হাসপাতালে পেঁাছে দিলেই হবে। এই কথার পর তর্ক বেধে যাবে। তখন ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বাসটা চালিয়ে দেবে। সবাই ড্রাইভারকে তখন, উল্লুক বলবে।

মুকুন্দর মজা লাগছিল এইরকম ভাবতে। কিন্তু সত্যিই যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতুম? এই অজিত ধর কি লিফটে উঠতে উঠতে কাউকে বলবে—না মশাই, শরীব আমার ফিট আছে। বারো বছরের কলীগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করতনা, তবে মদ-টদ খেত শুনেছি।

আড়চোখে মুকুন্দ তাকাল অজিত ধরের দিকে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে বিয়ে করেনি। শরীর গরম হতে পারে বলে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখেনা। আড়াইটে বাজলেই ড্রয়ার থেকে একটা আপেল বার করে খায়। ওর থ্রম্বসিস হবেনা। ওর ছেলে থাকত যদি, সে বমি করার সুযোগ পাবেনা। পকেট হাতড়ে মুকুন্দ কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা আর এলাচের মোড়ক বার করল। এর কোনটা দিয়েই তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবেনা। মোড়কটা জনৈক ভোলানাথ গুঁইয়ের লণ্ড্রি বিল। সেটা কুচিয়ে ফেলে মুকুন্দ নিজের নাম-ঠিকানা ইংরাজীতে একটা কাগজে লিখে, বুকপকেটে রেখে স্বস্তি বোধ করল।

অফিস থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ শুনল, উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়েছে তাই ট্রাম বন্ধ। বাস স্টপে গিয়ে দেখল শিশির নামে লীভ-সেকশ্যনের নতুন ছেলেটি দাঁড়িয়ে। বছর পঁচিশ বয়স, ফার্স্ট ডিভিশ্যনে ফুটবল খেলে। অফিস টিমে খেলবে বলেই চাকরি পেয়েছে। আঁটসাট প্যাণ্ট, নাভির নীচে বেল্ট, উঁচু গোড়ালির ছুঁচলো জুতো আর ছিপছিপে শরীর। অফিসের মেয়েরা যে ওর দিকে তাকায় এটা ও জানে। কিন্তু শিশির

এখন ধুতি-পাঞ্জাবী-চটি পরে দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার কি? এই বেশে তোমায় ঠিক মানাচ্ছেনা ভাই, কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে।"

শিশিরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। একটি সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারের বাসে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগোল এবং হ্যাণ্ডেল ধরে পা রাখামাত্র বাস ছেড়ে দিল। পা-দানির একটি যুবক তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিঠে বাহুর বেড় দিল। শিশির বাসটার থেকে চোখ সরিয়ে তিক্তস্বরে বলল, "এখন সবথেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিস রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটু দুটো এখনো ভাল করে মুড়তে পারেনা। আমি জানি ছেলেটা কোন গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"

মুকুন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, "আমার ছেলেও গোলমালে থাকেনা, কিন্তু কার সঙ্গে মিশছে তাতো জানিনা।"

শিশির আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার ভাই কাল বাড়িতে বোমা এনে লুকিয়ে রেখেছিল। জানেন মুকুন্দদা, আমরা খুব গরীব। খেলার জন্যই এই চাকরি। পঙ্গু হয়ে যাই যদি আমায় রাখবে কেন, এখনো তো কনফার্মড হইনি। এই শরীরটাই আমার সব।"

মুকুন্দকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শিশির প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুকুন্দও হাঁটতে শুরু করল। আধঘণ্টা হাঁটার পর তার মনে হল রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে, পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে, সি আর পি ভর্তি লরী তিন-চারবার চোখে পড়ল, ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। মুকুন্দ স্থির করল, গলি ধরে যাওয়াই ভাল।

মিনিট কয়েক পরেই মুকুন্দর গা ছমছম করতে লাগল। যতোই

এগোয়, সবকিছু ভূতে পাওয়ার মত ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ছাদে আবছা মুখের সারি। দূরে দূরে রাস্তার আলো, মাঝেরটা নেভা। দুধারের শ্যাওলাধরা, পলেস্তারা খসা, বিবর্ণ দেয়ালগুলোর মাঝখানে গর্ত, ঢিপি আর আস্তাকুঁড়ভরা রাস্তাটাকে প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দে মুকুন্দর এবার মনে হতে লাগল কেউ পিছু নিয়েছে।

আর একটু এগিয়ে ডানদিকের গলিটা দিয়ে তিন-চার মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছান যায়। তবু মুকুন্দ আর এগোতে সাহস পেলনা। পাশের সরুগলির মধ্যে ঢুকে বড়রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়েই, আচম্‌কা একটা রাইফেল ও দুটো পিস্তলের মুখোমুখি হয়ে দুহাত তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছেন?" সাদা প্যাণ্ট, হলুদ বুশশার্টপরা লোকটি মুকুন্দর পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল।

"বাড়ি যাচ্ছি স্যার, পাশের বঙ্কু সরকার লেনে থাকি।"

"তাহলে এখানে কেন?"

"অফিস থেকে ফিরছি। গোলমাল দেখে গলি দিয়ে যাচ্ছিলুম।"

"পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে?"

"জানিনা স্যার।"

"নাকি বলবেন না?"

"সত্যি আমি জানিনা।"

ইউনিফর্ম পরা ভারিক্কি ধরনের যে লোকটি এতক্ষণ শুধুই মুকুন্দর দিকে তাকিয়েছিল বলল, "নিয়ে গিয়ে দেখাও তো, আইডেন্টিফাই করতে পারে কিনা।"

মুকুন্দর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে হলুদ বুশশার্ট বলল,

"বাঁয়ে।" সে তখুনি বাঁদিকে ফিরে, দুহাত তুলে, চলতে শুরু করল। রাস্তার যেখানটায় আলো কম এবং দুটো বাড়ির দেয়াল 'দ'-এর মত হয়ে একটা কোণ তৈরি করেছে সেখানে টর্চের আলো ফেলে লোকটি বলল, "ওকে চেনেন?"

মুকুন্দ দেখল একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা পাশে ফেরান। দু'হাত তোলা অবস্থায় এগিয়ে এসে ঝুঁকে "মনু" বলে অস্ফুটে কাতরে উঠেই বুঝল, দেখতে অনেকটা মনুর মতই। চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা ফালা হয়ে পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁট দুটো চেপে রয়েছে, গলায় গভীর ক্ষত। হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ প্যান্টে। গলা থেকে চোঁয়ান রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"এর নাম মনু?"

"না, না, আমার ছেলের নাম মনু। একে অনেকটা তার মত দেখতে। একে আমি একদম চিনিনা স্যার।"

"কখনো একে দেখেননি? ভাল করে দেখে বলুন।"

মুকুন্দ আবার ঝুঁকে পড়ল। গোড়ালি থেকে মাথার প্রান্ত জমাট বাঁধা আগ্নেয়গিরি লাভার একটা ঢেউ খেলানো খণ্ডের মত। এই খণ্ডটাই উত্তপ্তকালে ওর সর্বস্ব ছিল। ওর যন্ত্রণা, বিস্ময় আর দাপট। এখন খোলা চোখ দুটি থেকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নির্গত হচ্ছেনা।

মাথা নেড়ে মুকুন্দ বলল, "না, একে কখনো দেখিনি।"

"আচ্ছা চলে যান, এধার-ওধার করবেন না।"

কিছুদূর গিয়ে মুকুন্দ ফিরে তাকাল। বুশশার্ট তাকে লক্ষ করছে। লাশটা এখন অন্ধকারে। মুকুন্দ মনে মনে বলল, আর একটা আনআইডেন্টিফায়েড ডেড বডি। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে স্বস্তিবোধ করল। এবার গলিটা, আর একটা গলিকে কেটে সোজা মুকুন্দর পাড়ায় ঢুকে গেছে। মোড়টা আধো অন্ধকার।

দুটি ছেলে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়েই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে ফুট দুয়েক লম্বা ঝকঝকে ইস্পাত।

"কি জিজ্ঞাসা করছিল ?"

মুকুন্দ চিনতে পারল ছেলেটিকে। মনুর বন্ধু ছিল ছোটবেলায়। তখন বাড়িতে আসত, নাম তাজু। না-থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে শুনেছে। এখন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানেই প্রায়-সময় কাটায়। মনু এখন ওর সংগে আর মেশেনা।

"কিছুই না। শুধু জানতে চাইল লাশটাকে চিনি কিনা।"

"আমাদের কারুর কথা জিজ্ঞেস করল ?"

"না।"

"খবরদার, বলবেন না কিছু।"

ওরা দুজন আবার দেয়ালে সেঁধিয়ে গেল। দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে একটি রিকশা আসছে। একজনকে বিরক্তস্বরে মুকুন্দ বলতে শুনল, "ওম্মা, এইতো যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠাণ্ডা।"

জানলায় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দকে দেখেই আলো জ্বেলে দরজা খুলে বলল, "যা ভাবনা হচ্ছিল !"

"আমার জন্য ?"

"তবে নাতো কি ?"

শুনে মুকুন্দর ভাল লাগল প্রথমে। তারপর ভাবল, গৌরাঙ্গর জন্য একদম না ভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, "গৌরাঙ্গ আছে কেমন ?"

"একই রকম।" শিপ্রা সাধারণভাবে বলল এবং সহসা গলা নামিয়ে যোগ করল, "মনু কেমন-কেমন করে তাকাচ্ছিল। কাউকে বলে দেবে না তো ? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"বড় হয়েছে। মনে হয়না বলবে।"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। মীরা ও লীলাবতী সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। তাকে দেখে ওরা হাঁফ

ছাড়ল। মীরা বলল, "জান কী কাণ্ড হয়েছে! একটা ছেলের গলা কেটে ফেলে রেখে গেছে খুদিরাম বসাক ষ্ট্রীটে।" মনু পাশের ঘর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "গোলমালের সময় অতুল বোস লেন দিয়ে না ঢুকে শেতলাতলার গলিটা দিয়ে আসাই সেফ্।"

ওর কথা শুনতে শুনতে মুকুন্দর মনে হল, মনু তাহলে এতক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়তো বমি করবেনা।

পরদিন অফিসে বেলা বারোটা নাগাদ মুকুন্দকে একজন টেলি-ফোনে উত্তেজিত স্বরে বলল, "আপনার ছেলে মানবেন্দ্র সেনকে পুলিস রাস্তা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি বলছেন! মনুকে?" মুকুন্দ চিৎকার করে উঠল। "আপনি কি করে জানলেন?"

"আমার ভাইকেও ধরেছে। থানায় গেছলুম। আমাকে নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার ছেলে জানিয়ে দিতে বলল। এখুনি থানায় গিয়ে চেষ্টা করুন, ছাড়াতে পারেন কিনা।"

ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেল মুকুন্দ। তারপরই ওর চোখ-কান দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেলনা, শুনতে পেলনা। তারপর কাতর স্বরে অজিত ধরকে বলল, "এইমাত্র একজন খবর দিল, ছেলেটাকে পুলিসে ধরেছে রাস্তা থেকে। কিন্তু মনু তো ওসব করেনা, অত্যন্ত ভাল ছেলে! এখন কি করি বলোতো?"

"দেরি করবেননা এখুনি থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন। কেস লিখিয়ে ফেললে আর উপায় নেই, চালান করে দেবে। শুনেছি প্রচণ্ড মার দিচ্ছে থানায়।"

"তোমার কেউ চেনাশুনো থানায় আছে? অন্তত যাকে বললে, মারধোরটা করবেনা। মনুর ভীষণ দুর্বল শরীর।"

অজিত ধর মাথা নাড়ল।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে থানায় ?"

"সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেটমেণ্ট তৈরি করছি, মুকুন্দদা। চারদিন পরই মাইনে। এখনতো ফেলে রেখে—"

মুকুন্দ পাঁচতলা থেকে নামল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে বারদুয়েক বলল, "একটু জোরে চালান ভাই।" থানায় আট-দশটি ছেলের সঙ্গে মনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও-সিকে বলল, "আমার ছেলে কোনকিছুর মধ্যে থাকেনা স্যার, ওকে ভুল করে এনেছেন।"

"কোনটি আপনার ছেলে ?" গম্ভীর এবং যেন ক্লান্ত, এমন স্বরে ও-সি বলল।

মুকুন্দ আঙ্গুল তুলে দেখাবার সময় মনুর পাশে দাঁড়ান হাফ-প্যাণ্ট পরা ছেলেটিকে কনুই তুলে খুব মন দিয়ে বাহুর থ্যাঁতলান জায়গাটা পরীক্ষা করতে দেখল। মনুর দিকে তাকিয়ে ও-সি বলল, "সব বাপ-মা এসেই বলে, তাদের ছেলে নিরপরাধ। যদি নিরপরাধ হয় তাহলে ছাড়া পাবে। আগে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি।"

"কখন ছাড়বেন তাহলে ?"

ও-সি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মনু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার আমি কিছুই জানিনা। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কলেজে যাচ্ছিলুম। খাতা ছাড়া হাতে আর কিছু ছিলনা।"

"চুপ করো।" কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল ও-সি'র পাশে দাঁড়ান ধুতিপরা লোকটি। থতমত হয়ে মনু তাকাল মুকুন্দের দিকে। দুটি ছেলে পাংশুমুখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটি ধমকে আবার বলল, "তাজু তোমার পাড়ার ছেলে আর তাকে তুমি চেননা ?"

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমার ছেলে ওর সঙ্গে মেশেনা স্যার।"

"বাজে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে আপনার ছেলে ওর বন্ধু। তাজুকে কোথায় পাওয়া যাবে, দলে আর কে কে আছে, বলুক, আপনার ছেলেকে ছেড়ে দোব।

মুকুন্দ দেখল মনু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ওকে এত ভয় পেতে দেখে সেও কাতর হয়ে পড়ল। চোখের জল মনুর ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটল করছে। মুকুন্দের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। আবছাভাবে গৌরাঙ্গর মুখটা ফুটে উঠল তার মনে। কাল সকালে এই রকম একটা বিন্দু টলটল করছিল ওর থুতনির কাছে। মেয়েটা তখন চুলধরে টানছিল। কিন্তু মনুর তো ক্যানসার হয়নি! মুকুন্দ বিষণ্ণচোখে তাকিয়ে রইল মনুর দিকে। শুধু কি শরীরের জন্যই ওর এই কান্না। রাস্তায় কাল বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল যে ছেলেটি সেও কি শরীরটাকে ভালবাসতো না!

ও-সি ঘরের একধারে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চাপাস্বরে মিনিট দুয়েক কথা বলে ফিরে এল। "আপনি এখন যান, সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ নেবেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ছেলে জীবনে কখনো পলিটিক্স করেনি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।" মুকুন্দ ঝুঁকে ও-সি'র হাঁটুতে হাত রাখল। হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে ও-সি বলল, "আচ্ছা ঘণ্টা দু-তিন পরেই আসুন, নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।"

বেরিয়ে এসে মুকুন্দ ঠিক করতে পারলনা এবার কি করবে। থানার সামনেই একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল। এখন অফিসে ফেরা আর এখানে বসে থাকা একই ব্যাপার। লীলাবতীর কান্নাকাটির থেকেও ভাল। বসে থাকতে থাকতে সে অবসন্ন বোধ করতে শুরু করল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল থানার ফটকে। ক্লান্ত মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি নানান বীভৎস দৃশ্য এখন সে দেখতে পাচ্ছে, অদ্ভুত করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রত্যেকটাই স্নায়ুবিদারক।

ছটফট করে মুকুন্দ উঠে পড়ল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বারবার সে শিপ্রার দেহে, নানাবিধ অশ্লীল শব্দে এবং থ্রম্বসিসে নিজেকে আবদ্ধ করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলনা। সবকিছু ছাপিয়ে মনুর কান্নাটা তাকে পেয়ে বসছে। ঘণ্টাখানেক পর সে আবার থানার সামনে ফিরে এল এবং রকে বসতে গিয়েই দেখল মনু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে।

"মনু।" তীক্ষ্ণস্বরে মুকুন্দ ডাকল। মনু মুখ তুলে তাকাল। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে প্রথমেই তন্নতন্ন করে ওর আপাদমস্তক দেখল। তারপর হেসে বলল, "ছেড়ে দিল।"

মাথা নেড়ে মনু ফিকে হাসল।

"মারধোর করেনি?"

"হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ধরার সময়।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে, হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দ বলল, "অনেকক্ষণ খাসনি, আয় এই দোকানটায়।"

"আমার খিদে নেই।"

"ধরল কেন তোকে?"

"যে ছেলেগুলোকে থানায় দেখলে, ওরা একটা স্কুলে ভাঙ্গচোর করে বোম ফাটিয়ে এসে আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ প্লেন-ড্রেস পুলিস ঘিরে ধরে মারতে মারতে ওদের সঙ্গে আমাকেও ভ্যানে তুলল।"

"তুই যদি বুড়োমানুষ হতিস তাহলে ধরত না।"

মনু জবাব দিলনা। মিনিটখানেক পর মুকুন্দ বলল, "অফিসে ফোন পেয়েই সোজা থানায় এসেছি। বাড়ির কেউ জানেনা, তুই বাড়িতে এ সম্পর্কে কিছু বলিসনা, তাহলেই তোর মা কান্না জুড়ে দেবে।"

ঘাড় ফিরিয়ে মনু তাকাল ওর দিকে। চোখদুটো দেখে মুকুন্দর বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর

মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গর চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দর আবার মনে হল, মনুর কেন ক্যানসার হবে!

"তোকে আর কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?"

চমকে উঠে মনু ভ্রু কুঁচকে অস্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি জিজ্ঞাসা করবে?"

"যা জানতে চাইছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।" মনু দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি এখন বাড়ি যাবনা, তুমি কি বাড়ি যাবে?"

"আমি," মুকুন্দ দুধারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "দেখি কোথাও গিয়ে সময় কাটাতে পারি কিনা।"

মনু ভিড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুকুন্দ তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির করল, ও ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর মাতাল হইনি, আজ হব।

রাত প্রায় বারোটায় মুকুন্দ বাড়ি ফিরল। কড়ানাড়ার আগেই সদরদরজা খুলে গেল। অন্ধকারে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই চাপাস্বরে মনু বলল, "এখন এত রাত করে বাড়ি ফিরোনা।"

মুকুন্দ অন্ধকারের মধ্যে মনুর মুখটা দুই করতলে একবার চেপে ধরে, কথা না বলে দোতলায় উঠে গেল।

সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙল তার। চা খেতে খেতে মনুর খোঁজ করল। দুটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেই চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি মুকুন্দ রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে দেখতে পেল না। ভয়ে বুক শুকিয়ে এল তার, শিপ্রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কারা ডাকতে এসেছিল?"

"একজনকে দেখেছি, রোগাপানা, ফর্সা, মনুরই বয়সী।"

"হাতে কিছু ছিল?"

"কেন?" ভীতস্বরে শিপ্রা বলল।

ধমকে উঠল মুকুন্দ, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।"

"অতশত দেখিনি।"

মুকুন্দ এবার ছুটে বেরোল। পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছল। সেখান থেকে দু-তিনটে গলি ঘুরে, গলাকাটা লাশটা যেখানে পড়েছিল সেখানে হাজির হল। এইসময় তার বুকফাটা কান্না পেল। বাড়ি ফিরতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "মনু তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।"

একটা করে সিঁড়ি টপকে মুকুন্দ দোতলায় এল। মনু তার ঘরে চেয়ারে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে। মুকুন্দ ঘরে ঢুকেই বলল, "কেন ওরা এসেছিল?"

"কারা!" মনু স্থির চোখে মুকুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চাহনিটা তুলে নিয়ে আবার জানলার বাইরে রাখল।

"ওরাকি জেনেছে?" ব্যগ্র স্বরে মুকুন্দ বলল।

"কি জানবে?" মনু এবার তীব্রচোখে তাকালো।

মুকুন্দ ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি রে আমি জানি।"

"কি জান তুমি?"

"তোকে ভয় পেতে দেখেছিলুম।"

"কিসের ভয়?"

"শরীরটার জন্য ভয়।"

"তুমি পাওনা?" প্রশ্নটি করার জন্যই যেন নিজের উপর অভিমানে মনুর বসার ভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল।

"হ্যাঁ পাই।" মুকুন্দ কোমল কণ্ঠে বলল। "আমি তোকে দোষ দিচ্ছিনারে। যদি বলতে না চাস তো বলিসনা। কিন্তু তুই আমার ছেলে, তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটা কাপুরুষতা নয়।"

"তোমার ভয়টা ছেলের প্রাণের জন্য, তাই সেটা কাপুরুষতা নয়।" মনু যান্ত্রিক স্বরে যেন মুখস্ত বলল।

"এভাবে কথাটা নিচ্ছিস কেন!" মুকুন্দ বিব্রত হয়ে বলল। "আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারণ আছে কিন্তু এজন্য করিসনি।"

"তুমি কি আমায় ঘেন্না করছ, আমি যা করেছি?"

"মোটেই না। আমি চিরকাল তোকে ভালবাসব।"

"কিন্তু আমি নিজেকে ঘেন্না করছি। থানায় তুমি এমনকরে আমার দিকে তাকালে মনে হল আমি একটা মরামানুষ। কিরকম যেন ভয় করল আমার। নয়তো একটা কথাও বলতামনা, কিছুতেই না।" মনু উঠে দাঁড়াল। টেবলের বইগুলো অযথা ওলট-পালট করতে করতে মোচড়ান স্বরে বলল, "তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"

মনু একবার শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুকুন্দ তখন প্রত্যাশামত নিশ্চিতরূপে দেখতে পেল, কঠিন বরফের মত ঝকঝকে ওর চোখদুটি। যেন শীতল ক্রোধে জমাট বেঁধে রয়েছে।

মুকুন্দর অফিসে যাবার সময় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজায়। সে হাসল। মুকুন্দ ভ্রুক্ষেপ করলনা। গলির মোড়ে লাল ডোরাকাটা জামা গায়ে তাজু দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ তাকালনা। বাস মাঝপথে বিকল হয়ে থেমে গেল। মুকুন্দ কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে ভাড়ার পয়সা ফেরৎ নিলনা। অফিসে অজিত ধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, খবরটা ভুল। মনুকে ধরেনি। ছুটির পর ট্রাম থেকে নেমে মিনিট তিনেক হেঁটে বাড়ি। নামামাত্র দেখল জটলা করে লোকেরা ভীতচোখে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে। একজন তাকে বলল, "ওদিকে যাবেননা মশাই। এইমাত্র পরপর চারটে গুলির শব্দ হল।" মুকুন্দ সে কথায় কান দিলনা। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে। সেটাকে ঘুরে পার হয়েই সে থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর মাথা নামিয়ে গলিতে ঢুকল। তার পাশ দিয়ে দুটো লোক পিস্তল ও রাইফেল পরিবৃত একটা লাল

ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মুকুন্দ পিছন ফিরে তাকালনা। থমথমে গলির দুপাশের ভীত, বিস্মিত এবং অব্যক্ত চাহনি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকল।

মনু তার ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। মুকুন্দ দরজার কাছ থেকে বলল, "তাজুকে পুলিসে নিয়ে গেল। বোধহয় বেঁচে নেই।"

লীলাবতী ও মীরা ছুটে এল বিবরণ শোনার জন্য। মুকুন্দ তখন কলঘরে ঢুকল। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফেরাতেই দেখল মনু ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে কলঘরের দিকেই আসছে। "কি হল!" বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।

মধ্যরাত্রে মুকুন্দ নীচে নেমে এসে শিপ্রার ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরল।

"একি, একি! ঘরের মধ্যে নয়। ও রয়েছে যে!"

"থাকুক্‌গে।" শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল। "ওতো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।"

দ্বিজ

গমনে বামন নাম নিতে নিতে নিশিকান্ত অগ্রসর হয়েছিল। কী ভেবে চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। ইশারায় ডাকল নয়নতারাকে। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, এখানে সকলে কয় কী, গোপালের মা ট্যার পায় নাই তো ?

কেউ না। নয়নতারা এগিয়ে এসে পাঞ্জাবির খোলা বোতাম দু'টো লাগিয়ে দিল। কেউ না। আমি সব ঠিক কইরা রাখছি। তোমার ভাবনা নাই। সকলে জানে এক জমিদার বাড়ি চণ্ডীপাঠ করণের কাম পাইছ। বৈশাখ মাস ভইরাই করবা।

নিশিকান্তর চোখ দু'টো খুশিতে চিকচিক করে উঠল। গায়ে টোকা দিয়ে আদর করল বৌকে। এই বয়সে যতটা মানায়, ততটাই ভ্রূভঙ্গি করে নয়নতারা বলল, পণ্ডিতের মাইয়া না আমি। কিসে বাহ্মণের সম্মান থাকে জানি না ?

কিন্তু বৈশাখ মাসটা তো চিরকাল থাকপ না। তখন ?

সে তখন ঠিক করলেই চইলব। সে ভাবনা এখন ভাইবা লাভ কী।

তা সত্যি। আবার বামন নাম নিতে নিতে নিশিকান্ত এগিয়ে গেল। বানের টানে যখন এই অচেনা দেশে ভেসে এসেছিল, তখনও তো বিশেষ কিছু ভাবনার অবসর হয়নি। এখন তো তবু পায়ের নিচে মাটি মিলেছে। জ্যৈষ্ঠমাসের ভাবনা জ্যৈষ্ঠমাসে।

ঠোঁট বেয়ে গড়ানো পানের কষের মতো আকাশে একটু একটু রঙের সাড়া দেখা দিয়েছে। প্রথম লোকালটা চলে যায়নি তো। আজ নির্ঘাৎ লেট।

যায়নি, কিন্তু নিশিকান্ত সিগন্যালটার কাছাকাছি আসতে না-আসতেই গেল। বোকার মতো নিশিকান্ত গার্ডের পেছনের লাল আলোটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে গেল। কিন্তু কোঁচাতেও ধুলো। সারা মুখ যেন কিচ কিচ করে উঠল। মিনিট দুই দেরি হয়েছে। যতক্ষণ গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য না হল ততক্ষণ নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব করল। দু'মিনিট দেরি হয়েছে। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে যতক্ষণ নয়নতারার সঙ্গে কথা বলেছিল, ঠিক ততটুকু সময়। পরের গাড়ি আরও পঞ্চাশ মিনিট পরে। নিশিকান্ত বাসের খোঁজে গেল।

নাগেরবাজারে নেমে গোটা দুই মোটে মোড়। কারখানার দোচালাটার কাছাকাছি আসতে দমবন্ধ হয়ে এল। পোড়া তামাকের গন্ধ। প্রথমে কাশতে কাশতে মুখ লাল হয়ে যেত, এখন অনেকটা সয়ে এসেছে।

আগেই দেখে নিয়েছিল, প্রায় বিশ মিনিট লেট। বেলা চড়েছে অনেক। পৈতে, পাঞ্জাবি আর বুকের লোম ভিজে সেঁটে একাকার হয়ে গেছে। সবাই বসে গেছে সুতো আর কাঁচি নিয়ে—সমস্ত ঘর জুড়ে পাতা কাটার শব্দ ; খস খস। নিশিকান্তও চুপে চুপে দেরিতে আসা পড়ুয়ার মতো এককোণে বসে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নটবরের শকুনি-নজরে পড়ে গেছে।

এগিয়ে এসে নটবর একেবারে নিশিকান্তর সম্মুখে দাঁড়াল। বিষ ঢেলে দিল গলায়। কী চক্কোত্তি, আজও লেট ?

Scanned by CamScanner

একটা চোখ এমনিতেই নটবরের কানা, রাগ হলে আর একটাও আধ-বোঁজা করে আনে। নিশিকান্ত সাহস করে মাথা তুলতে পারছিল না। তোৎলা গলায় বলল, আইজ্ঞা ট্রেন লেট।

মিছে কথা বোলো না চক্কোত্তি। কেমন বামুন তুমি! ট্রেন লেট না তুমি লেট। ফার্স্ট লোকালটা তো ঠিক সময়েই এসেছে, আরও দু'জনে এসেছে সে গাড়িতে, তারা কাজেও লেগেছে। দেব নাকি পাওনা-গণ্ডা তোমার সব আজই হিসেব করে চুকিয়ে?

ভয়ে ভয়ে মাথা তুলে নিশিকান্ত দেখল নটবরের আধ-বোঁজা চোখের পাতা দু'টো তখনও মিট মিট করছে। গলায় পৈতেটা থেকেই হয়েছে মরণ, নইলে ওখানেই ওবুড় হয়ে নটবর দাসের পা দুটো জড়িয়ে ধরত নিশিকান্ত চক্রবর্তী, আইজ্ঞা, এই বারের মতো... কাইল শুইতে রাইত হইয়া গেছিল, প্যাটে ফাঁপ ধরছিল কেমন, ঘুম হয় নাই... তাই ওটতে...

সব কৈফিয়ৎ নটবর শুনল কি-না বোঝা গেল না। চলে যেতে যেতেও তাকে গজরাতে শোনা গেল, আগেই জানি; এসব বামুন-কায়েত দিয়ে বিড়ি বাঁধার কাজ হয় না। দেশ থেকে ভেসে এয়েছিল, দয়া করে কাজ দিলুম, তা দু'দিন যেতে না-যেতেই ফাঁকি। যত স্লা উড়ো লোক এসে জুটেছে, চেপে বসচে আমাদের ঘাড়ে। এদের দিয়ে দেশের চিবিদ্ধি।

থুথু ফেলার মুদ্রায় নটবর ঠোঁট দু'টোকে ছুঁচলো করল।

নিশিকান্তর মনে এল, উন্মূল মানুষ দিয়ে যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হয়, তবে রোয়া ধানেও ফসল হত না। কিন্তু মনে আসা সব কথা মুখে আনা যায় না।

খানিক বাদে ঘুরে এসে নটবর বলল, কাল তুমি পাঁচশো বিড়ি কম দিয়েছিলে চক্কোত্তি। আজ দু'দিনের হিসেব পুরো করে দিলে, তবে তোমার ছুটি। বোয়েচ?

মাথা নিচু করে নিশিকান্ত পাতা কেটে যেতে লাগল নির্দিষ্ট মাপমত। পোড়া তামাকের গন্ধে বার কয়েক হাঁচি এল, ঘণ্টাখানেক পরে শিরদাঁড়া উঠল টনটন করে। আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল, সবাই বিড়ি বাঁধছে এক মনে। অর্জুন, গণেশ, সনাতন, মধু, ভৈরব। জন দুই মুসলমানও আছে। ঘাম ঝরছে দরদর করে। হালে শোনা একটা হিন্দি গান ধরেছে মধু। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে শিস্ দিতে চেষ্টা করছে। ঠাসা ঘরখানায় শুধু বস্তাপচা আলুর ভ্যাপসা গন্ধ।

বাসা থেকে একখানা হাতগড়া আটার রুটি নিয়ে এসেছিল। পকেটে থেকে থেকে সেটা শুকিয়ে কড়া হয়েছে। রুটিটা দাঁতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিশিকান্তর মনে হল গণেশ, মধু, অর্জুন এরা সব আছে ফুর্তিতে। গান গায়, মহানন্দে 'সুশীতল বিড়ি' বাঁধে। সেও এদের কাছাকাছি এসেছে, এদের ঘামের পচাটক গন্ধ আসছে তার নাকেও, তবু কোথায় যেন পর্দা আছে। বয়সের তফাত? সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু বয়সই নয়। এদের কারণে অকারণে হাসাহাসি; শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় এমন ভাষায় গালাগালি; আবার গলাগলি আলাপ, সব নিশিকান্তর কানে নতুন। ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু শিরশিরে অস্বস্তিটুকু যায়নি। শীতের দিনে যেন নাইবে বলে পুকুর ঘাটে এসেছে। নিশিকান্ত পা বাড়ায় একবার, ঝাঁপ দেয় আর কি, গায়ে কাঁটা দেয়, আবার পিছিয়ে যায়।

বামুনের ছেলে দিয়ে বিড়ি বাঁধার কাজ হয় না। কে জানে নটবর হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। শ্রীভগবান চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন যখন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গুণ অনুসারে কর্মবিভাগ।

কিন্তু ওপরে যিনি আছেন তিনি সাক্ষী, নিজের ইচ্ছায় নিশিকান্ত এ-কাজ নেয়নি। ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ ছিলেন স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ, দেশবিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁর সন্তান, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে লেখাপড়া শেখা হয়নি। গত চারপুরুষ ধরে যজমানী ব্যবসাই চলেছে। একশো ঘর যজমান, গ্রামান্তরেও কিছু কিছু ছিল; বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল কিছু কিছু। বিবাহ-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাসনাদি দশবিধ সংস্কারে ডাক আসত। এ-ছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর, সত্যি-সত্যি পার্বণ তো তেরোটাই নয়, হিসেব করলে অনেক বেশী। এক মুহূর্ত ফুরসুত

Scanned by CamScanner

ছিল না। সংস্কৃত ভাল করে শেখা হয়নি, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি খানা কণ্ঠস্থ করেছিল। সারা বছরের চাল ডাল কেনার ভাবনা ছিল না, বরং বাড়তি কয়েক মণ বিক্রিই করত। আর লালপেড়ে সেই ধুতিগুলো—অতবড় যে বস্ত্র সংকট গেল লড়াইয়ের শেষ বছরে, কোনদিন কাপড়ের অভাব হয়নি।

কিন্তু সকালের কুয়াশার মতো সব মিলিয়ে গেল একে একে। শাঁসালো যজমানরা সরে পড়ল প্রথমে, সেই পাকিস্তান হবার আগে ভাগেই। তারপরও তো কতদিন মাটি কামড়ে পড়েছিল নিশিকান্ত, সামান্য লাঞ্ছনা, অল্পস্বল্প বিদ্রূপ, আমলে আনেনি। কিন্তু বামুনপাড়ায় যখন একঘরও রইল না, তখন নিশিকান্তকেও পোঁটলা বাঁধতে হল। মুসলমানরা প্রাণেও না মারে যদি, লক্ষ্মীপুজোয় পুরুতগিরি করতে তো ডাকবে না। মোল্লা মৌলবী ফেলে ছেলে-মেয়ের সাদির সময় নিশিকান্তের কাছে দৌড়বে না।

কলকাতা এসেও পৈতৃক ব্যবসাটাই ধরে রাখতে নিশিকান্ত চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পুরনো দু'এক ঘর যজমানের কাছেও গিয়েছিল। কিছু সুবিধে হল না। যারা অবস্থাপন্ন তারা পুজোআচ্চার পাট অনেকদিনই তুলে দিয়েছে। যারা কায়ক্লেশে আছে, তারাও আমল দিল না। অনেকে তো চেনেই না নিশিকান্তকে। বলল, না ঠাকুর, এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে পুজো! সম্বচ্ছরে একটা মোটে পুজো করি—লক্ষ্মীপুজো। তা সেজন্যে চার আনা দক্ষিণার পুরুত ঠিক করাই আছে। শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে কালীঘাট আছে, গোটাকতক টাকা ব্রাহ্মণকে ধরে দিই। বাদবাকি ব্যবস্থা সেই করে।

দিন কতক গঙ্গার ঘাটেও ঘুরঘুর করেছিল নিশিকান্ত। সে বড় শক্ত ঠাঁই। সারি সারি মাথাকামানো উ'ড়ে বামুন বসে আছে, ফুল, বেলপাতা, চন্দন আর তিলক কাটার জন্যে সোডার বোতলের ছিপি নিয়ে। ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল করে। নিশিকান্ত বসতেই পেল না।

তারপর এল সেই চরম অভিজ্ঞতা। চিন্তা করলে আজও কান গরম হয়ে ওঠে।

চকমিলানো বাড়ি, বড় বড় থাম দেখে নিশিকান্ত ঢুকে পড়েছিল। বৈঠকখানায় কয়েকজন বাবু দাবা খেলায় মত্ত। নিশিকান্ত চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, একজনের নজরে পড়ে গেল।

কী চাই?

আইজ্ঞা ব্রাহ্মণ, পূর্ববঙ্গ থিকা আইছি—

মাথা কিনেছ। কী চাই চটপট বলে ফেলোনা বাপু।

—আইজ্ঞা আমরা পুরুষানুক্রমে পুরোহিত, যজমানী ব্যবসা। আপনাগো মস্ত বড় ঘর, সে আমি দেইখাই ট্যার পাইছি। যদি অনুমতি করেন তয় একটু—ঢোঁকগিলে নিশিকান্ত বাক্যটা সম্পূর্ণ করল,—আমি চণ্ডীপাঠ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন সব জানি।

ভ্রূকুটি ঘুচে গিয়ে শ্রোতাদের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে একজন নিশিকান্তকে বললেন, তুমি ঠাকুর বোধ করি ভূত ছাড়াতেও পারো। পারো না?

আর একজন বললে, চণ্ডীপাঠ করবে—সংস্কৃত জানো?

—আইজ্ঞা, কিছু কিছু।

একটুখানি শোনাবার ফরমাশ হল।

মুখের ঘাম মুছে নিশিকান্ত গলা পরিষ্কার করে শুরু করলে, যা দেবী সর্বভূতেষু—

সবে দু'টো শ্লোক ব'লতে পেরেছে এমন সময় ঘরের দেয়াল থেকে সিলিং পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বাবুরা হাসির তোড় সামলাতে পারছেন না। কেউ কেউ রুমাল গুঁজে দিয়েছেন মুখে।

—থামো ঠাকুর! এসব বাঙাল উচ্চারণ এখানে চলবে না, বুঝলে? অন্তস্থ 'য' এর উচ্চারণ আর একটু শ্রদ্ধাভরে করতে শেখো।

থতমত খেয়ে নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করল, ক্যান্, ভুল হইছে বাবু?

ভুল? বিলকুল ভুল বাওয়া, বিলকুল। চণ্ডীপাঠ তো তোমাকে দিয়ে হবে না চাঁদ, তুমি বরং জুতো শেলাই করতে শেখো। কাজের কাজ হবে, দু'পয়সা ঘরে আসবে।

Scanned by CamScanner

বলতে বলতে একজন সত্যিই জুতো পরা দু'খানা পা নিশিকান্তর দিকে ধরলে।

নিশিকান্তর চোখের পলক পড়ছে না, কান দু'টোর মধ্যে কে যেন অসংখ্য তেঁতুল বিচি ঝাঁকাচ্ছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে বহুকষ্টে সামলে নিলে। মাথা নিচু করে কখন বেরিয়ে এসেছে নিজেই টের পেল না। উপবীত স্পর্শ করে কঠিন অভিশম্পাত দেবে, একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু কলিযুগে ব্রহ্মশাপও ব্যর্থ। নিজের কাছেই নিজে কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করল নিশিকান্ত। নতুন কিছুর চেষ্টা করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য অভিমানের ময়ূরপুচ্ছ আর না।

অভিমান গেল কিন্তু সংস্কার গেল না। আরও অনেক ঠোক্কর খেতে খেতে নিশিকান্ত চক্রবর্তী এসে ঠেকেছে, সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরির কারিগরের কাজে। হাত দু'খানা কাজ করে, কিন্তু মাথা হেঁটই থাকে, মাঝে মাঝে চোখের পাতা দু'টি ভিজে ওঠে। এ কি তার কাজ ? ক্যাম্পের কেউ টের পায়নি। পাখি ডাকার আগে নিশিকান্ত বেরিয়ে পড়ে। গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে জুতো। এখনও অনিশ্চিত সরকারি ডোলই যাদের একমাত্র ভরসা তারা ঈর্ষাক্লিষ্ট চোখে চেয়ে থাকে। তাদের জোয়ানসমর্থ ছেলেগুলো এখনও কিছু জোটাতে পারল না, অথচ এই বুড়ো পুরুত দিব্যি...

গোরস্থানেও লাশপিছু দু'ফুট জমি জোটে, কিন্তু মহিমপুর ক্যাম্পের জ্যান্ত মানুষগুলোর তাও জোটেনি। চালাপিছু দু'ঘর পরিবার। কোনক্রমে অষ্টাবক্র হয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে হয়। স্যাঁত-সেঁতে মেঝেয় ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নিশিকান্ত লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে না। আর, ঘুমোয় কখন যে স্বপ্ন দেখবে। লুকিয়ে-চুরিয়ে-আনা সুশীতল বিড়িতে টান মারে, আর ভাবে, খুক-খুক কাশতে-কাশতে চিরকাল তাকে নিচের সিঁড়িতে গড়াগড়ি দিতে হবে না। উঠবেই আস্তে আস্তে। কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে এগোবে। ততদিন চুপচাপ। নয়নতারা হুঁসিয়ার। মহিষপুর ক্যাম্পের কাকপক্ষীও যেন টের না পায় নিশিকান্ত চক্রবর্তীর অদৃষ্টের চাকা গড়াতে গড়াতে কোন ভাগাড়ে গিয়ে ঠেকেছে।

আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে গেল, শিরদাঁড়া আর সোজা করে রাখা যায় না, নিশিকান্তর হাত তখনও চলছে। একে একে সবাই চলে গেল, অর্জুন, মধু, গণেশ, সনাতন। যে যার রোজগার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, নটবর দাসের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে পাওনা। নিশিকান্তর এখনও দেড়শো বিড়ি বাকি। দেখতে দেখতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল, হাতের রগগুলো টনটন করছে, কিন্তু নটবরের হিসাব মিলিয়ে তবে ছুটি। এখন ক্যাশ্ মেলাচ্ছে নটবর, বিড়িগুলো প্যাকেট করে রাখছে, একটু পরেই হয়তো সামনে এসে দাঁড়াবে, কৈফিয়ৎ চাইবে। নিশিকান্তর মুখের ভেতর জিভটা শুদ্ধ তিতো হয়ে উঠল।

তাকিয়ে দেখল, আশে পাশে আর কেউ নেই। শুধু খানিকটা দূরে ভৈরব বোড়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে। নিশিকান্তর কেমন অবাক লাগল, সবাই গেছে এ ছোকরা যায়নি যে ? প্রশ্নটা মনে এল, কিন্তু স্থায়ী হল না, কেননা সময় নেই, তাছাড়া গায়ে পড়ে এদের সঙ্গে নিশিকান্ত কখনও আলাপ করে না। আরও প্রায় পঁচিশটা বিড়ি বাঁধার পর নিশিকান্ত ফের তাকাল। ছোকরা তখনও বসে। নিশিকান্তর মনে হল ওর দিকেই যেন তাকিয়ে আছে। কী ভেবে নিশিকান্ত হাতের কাজ বন্ধ করল। এগিয়ে গেল ভৈরবের কাছে।

তুমি বাড়ি যাও নাই যে ?

শূন্য একটা ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে ভৈরব তাকাল। সারা মুখে বসন্তের শুকনো দাগ, চোখ দু'টো লালচে। নিশিকান্ত সামান্য চমকে উঠল। জ্বর নয় তো ? কপালে হাত দিতে সন্দেহমাত্র রইল না।

এত জ্বর তোমার, এখনও রইছ ? তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও নাই ক্যান্ ?

অস্ফুট জ্বরাতুর কণ্ঠে ভৈরব যা জবাব দিল তার মর্ম এই যে, আগে ছিল না, এই একটু আগে এসেছে। কম্পজ্বর এমন মাঝে মাঝে হঠাৎ আসে, তার চেয়েও হঠাৎ ছাড়ে। কিছু ভাবতে হবে না, হাতের কাজ যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে নিশিকান্তর, তবে সে সোজা বাড়ি চলে যাক। জ্বরের প্রথম তোড়টা কমুক, নিজের পথ ভৈরব নিজেই দেখতে পারবে।

Scanned by CamScanner

তবু নিজের জায়গাতে ফিরে যেতে নিশিকান্তর কেমন বাধল। ঠিক চক্ষুলজ্জা নয়, এই অনুভূতির উৎস চোখের চেয়েও গভীরে, একেবারে হৃদয়ে। এই প্রথম একজন রুগ্ন অসহায় সহযোগীর জন্য নিশিকান্ত মমতা বোধ করল। যে আবেগ পশ্চিমবঙ্গের শুকনো মাটিতে পা দিয়ে অবধি শুকিয়ে গিয়েছিল, বহুকাল পরে সমস্ত সত্তা জুড়ে আবার যেন তা টলমল করে উঠল।

তা হয় না মনু। তোমারে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া তয় আমি যামু।

কাজ শেষ হ'ল চক্কোত্তি ?

নটবর একেবারে সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে কথা যেন জড়িয়ে গেল নিশিকান্তর। বলতে গেল, হইল পেরায়, আর দশটা মিনিট অপেক্ষা করেন ইত্যাদি। কিন্তু স্বর ফুটল না।

কতক্ষণ লাগবে আর,—সারা রাত্তির ?

হঠাৎ কী হল, নিশিকান্ত সমস্ত সংকোচ জয় করে বলে উঠল, আপনারে করজোড়ে কই দাস মশয়, আইজকার মতো ছাইড়া দেন আমারে। কাইলকার পাওনাও প্রায় শেষ কইরা আনছি, আর শত্‌খানেকের মতন বাকি। ভৈরবকে দেখিয়ে বলল, এ্যার দেখি অসুখ করছে, বাড়ি না দিয়া আইলে তো চলবে না।

কী কাকুতি ছিল নিশিকান্তর কণ্ঠে, কিংবা করজোড়ে, নটবর আর কিছু বলল না।

সেদিন শুধু নতুন অভিজ্ঞতা হয়নি নিশিকান্তর, নতুন অনুভূতিও এসেছে। পাঁচজনের সঙ্গে পাশাপাশি বসে এতদিন কাজ করেছে, সামান্য মুখচেনা গোছের ছিল, মেলামেশির কথা ভাবতেও পারেনি। হঠাৎ সেদিন জ্বরতপ্ত ভৈরবের ধূসর, শূন্য চাউনি থেকে মনে যে স্নেহের ছোঁয়াচ লাগল, সেই স্নেহ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল শরিকানা-বোধে। অনাদর আর অশ্রদ্ধা পেয়ে জীবন সম্বন্ধেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল নিশিকান্ত। পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, সামনে কিছু নেই, আর কি, এখন একদিন সব চুকে গেলেই হয়। নেহাৎ শাস্ত্রে আর আইনে আত্মহত্যা পাপ তাই...। যে কাজটুকু জুটেছিল, তাতেও নিশিকান্তর মন ছিল না, সব সময়ই তিক্ত সব সময়ই বিরক্ত। ফাঁকি দিত, যেটুকু করত তাও সসংকোচে। শোণিতস্রোতে, মজ্জায়, একটা ভীরু লজ্জা অহরহ সাঁতার দিচ্ছে।

কিন্তু যে মুহূর্তে পাশের মানুষটিকে নিশিকান্ত ভালবাসতে পারল অমনি সব ভীরুতা, তিক্ততা, অপমান-বোধের বোরখা যেন খসে পড়ল। অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এসেছে, সেই আলো-আঁধারে নিজেকেও যেন একটু চেনা যাচ্ছে; জীবন সম্বন্ধে নতুন করে এসেছে মূল্যবোধ।

ভৈরবকে যেদিন পৌঁছে দিয়ে এসেছিল, তারপরও আরও কয়েকবার নিশিকান্ত ওদের আস্তানায় গেছে। সনাতন, অর্জুন, মধু, সব একসঙ্গেই থাকে এই বস্তিটায়। প্রথম দিন চমকে উঠেছিল নিশিকান্ত, ক্যাম্প আর বস্তির চেহারা কি হুবহু এক! ক্যাম্পে দরমার বেড়া, এখানে চাঁছা বাঁশের ওপর কাদার প্রলেপ। ক্যাম্পের চাল মরচে পড়া ফুটো টিনের, এখানে খাপ্‌রা। ঘর-পিছু একটা করে ফোকর, প্রাথমিক উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল জানালা হিসেবে ব্যবহার করার, কিন্তু স্থপতির সে স্পেকুলেশন ব্যর্থ হয়েছে। এখন সেই ফোকরের মুখ জুড়ে মাকড়শার পুরু জাল, তার নিরাপদ আড়ালে পাখির বাসা; চড়ুইগুলো বাইরের আলো হাওয়ার বিরুদ্ধে নিরন্তর সত্যাগ্রহ করছে।

প্রথম দিন দম বন্ধ হয়ে এল, তবু মনে হল চেনা চেনা। এর আগেও এখানে নিশিকান্ত এসেছে, কিন্তু কবে, মনে পড়ল না। কিন্তু দু-চার মিনিট যেতে না যেতেই আচ্ছন্নভাবে কেটে গেল। আশ্চর্য, আগেই বোঝা উচিত ছিল তার। মহিমপুর ক্যাম্পের ছ'ফুট-আটফুট খুপরিতে পা দিয়েই প্রথমদিন এমনই অনুভূতি এসেছিল। মনে হয়েছিল ছুটে বেরিয়ে আসে। খাপ্‌রার কোটরের ভিজে মাটির এই ভাপ, এই ঘামপচা-পচা গন্ধ, চোখজ্বলা ধোঁয়া, আর চাপচাপ অন্ধকার, সব যে মহিমপুর ক্যাম্পের,—এতক্ষণ না চিনে ছিল কী করে!

মনের মধ্যে যে উঁচু-নিচুবোধটুকু তখনও ছিল, বারকয়েক কেঁপে কেঁপে যেন সমতল হয়ে গেল। অদৃষ্ট

Scanned by CamScanner

নিশিকান্ত চক্রবর্তীর খোরাক এই অন্ত্যজ মানুষগুলোর সঙ্গে একই শানকিতে বেড়েছে; আলাদা পংক্তিতে আসনের বিড়ম্বনা আর কেন।

দিন পাঁচ-সাত পরে একদিন বাসায় ফিরে নিশিকান্ত নয়নতারার মুখে এক খিলি পান গুঁজে দিল। নয়নতারা প্রথমে বুঝতে পারেনি, মশলার স্পর্শে জিব সরস হয়ে উঠতেই মুচকে হাসল; পান? আজ হঠাৎ পান কেননের শখ হইল যে? পয়সা শস্তা হইছে?

নিশিকান্ত জবাব দিল, কিনি নাই। পাইলাম অমনি। আমিও একটা খাইছি।

নয়নতারা দেখল নিশিকান্তর বরাবরের বিড়িখাওয়া পুরু কালো ঠোঁটে আজ হঠাৎ টুকটুকে হয়ে উঠেছে। ছিল কৌতুক, এবার হল কৌতূহল। কও দেখি কী বিত্তান্ত।

বৃত্তান্তটা নিশিকান্ত বলল বৈ কি, বেশ সাড়ম্বরেই বলল।

সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকে যা আয়, তাতে কারিগরদের চলে না। ওরা কিছুদিন আগে সবাই মিলে একটা পানের দোকান দিয়েছে গোরাবাজারে। ছোট দোকান, সকলের চাঁদায় তৈরি। কারখানার ছুটিমতো সবাই পালা করে এখানে বসে, অর্জুন, সনাতন, ভৈরব। পানের সঙ্গে বিড়িও আছে। ঠিকমত চালু হলে সিগারেটও রাখা হবে। তার কিছুদিন পর সরবত। নিশিকান্তকেও নিয়েছে ওদের দলে। রোজ দু'ঘণ্টা করে দোকানে বসে নিশিকান্ত।

তারপর থেকে রোজই নিশিকান্ত বাড়ি ফেরার সময় দু'চার খিলি পান নিয়ে আসতে লাগল। এই পানটা নতুন মশলা দিয়ে সাজা। এর নাম রসখিলি। এক খিলির দাম এক আনা।

কও কী?

ঠিকই কই। তুমি আর কয়রকমের পান দ্যাখছ গোপালের মা। কাশীতে পাওন যায় টাকা-টাকা খিলি পান। একটা খাইলে তার গন্ধে ভোম্‌রা ছুইটা আসে।

নিশিকান্ত অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শার গল্পটাও বলে। পান খেয়ে নবাব সাহেব পিক ফেলতেন যখন, দু'তিন মাইল দূরের লোকও টের পেত। হবে না কেন। সে তো আর সাধারণ মশলা না। মণিমুক্তা দিয়ে সাজা।

পানের মধ্যে মণিমুক্তা? ঠিক বোঝা যায় না, নয়নতারা বিস্মিত হয়, না অবিশ্বাস করে। মিট মিট হাসে নিশিকান্ত। বিশ্বাস হইল না? রাজাবাদশার কাণ্ড তুমি কী-ই বা দ্যাখ্‌ছ গোপালের মা।

দেখেনি নিশিকান্তও; বলা বাহুল্য সব গল্পই সহকর্মীদের কাছে শুনেছে।

আর একদিন আনল একখিলি পান, তার নাম হিমখিলি। মুখে দিয়েই নয়নতারা টেনে আনল বাইরে। অপ্রতিভ হয়ে নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করল কী জিভ্ পোড়ল নাকি।

পোড়ে নাই। অবশ হইয়া গেছে। এত ঠাণ্ডা?

বরফের উপরে রাখা যে। আজকাল এই পানই খরিদ্দারে পছন্দ করে।

মিঠে, বাংলা, ছাঁচি। রসখিলি, হিমখিলি। তাম্বুলা, ঠোঁট-আল্‌তা।

নাম শোনে নয়নতারা আর ঠোঁট ওলটায়। ইস, পানের তো খিলি, তার নামের এত বাহার!

নতুন প্রেমে পড়ার মতো লাজুক ছোপ লাগে নিশিকান্তের গালে।— হইবে না? পান সাজন সোজা কর্ম মনে করছ নাকি। একি ঘরের পান যে সুপারি আর খয়ের চুন মিশাইলেই হইল।

ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না নিশিকান্ত, উত্তেজিত রসনায় সব কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। বোধহয় বোঝাতে চায়, পান সাজাও একটা আর্ট; সামান্য মশলা মেশানোর উনিশ-বিশে রসনায় রসসঞ্চারের তারতম্য ঘটে। আর্ট তো সবই। কাজে যেদিন থেকে মন বসেছে, সেদিন থেকে নিশিকান্ত আবিষ্কার করেছে বিড়ি বাঁধাতেও বাহাদুরি আছে। কেমন সাইজের পাতায় কতখানি তামাক। কেমন করে বাঁধলে ঠোঁটে চেপে রাখায় অনায়াস সুখ।

মাঝে মাঝে নয়নতারাকে জিজ্ঞাসা করে, কী গো, ক্যাম্পের লোকে এখন কয় কী।

Scanned by CamScanner

কইবে কী। চোখ টাটায়। কয় যে পুরাপেট ভাত জোটে না, ঠোঁট দুইটা টুকটুইকা করনের শখ যে দেখি ষোলো আনা ?

নিশিকান্ত হাসে।—কইতে দাও। কয়দিন আর! ক্যাম্পে আর বেশিদিন না। আমরা কারিগর কয়জনে একত্তর থাকমু ঠিক হইছে। একটা ভালমত জায়গা দেইখা লওনের অপেক্ষা। সামনের মাসে যশোর রোডে আর একখানা দোকান হইবে। একটায় আর কুলায় না গোপালের মা।

যশোর রোডের দোকান যেদিন খোলা হল, সেদিনটা নিশিকান্তের কেটে গেল নেশার মতো। একটা দিন কারখানা থেকে ছুটি নিয়েছিল। এ-দোকানের চার্জ তার। সারা দিন মাথা তোলার অবসর ছিল না, একের পর এক পান সেজে গেছে, বিড়ির বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়েছে। খুচরা পয়সা ঠিকমত গুণে নেবার অবসর হয়নি, ফুটোওয়ালা কাঠের বাক্সে ঝুপ ঝুপ করে ফেলেছে।

সন্ধ্যার পর এল অর্জুন, সনাতন, ভৈরবরা। সবার সম্মুখে বাক্স খোলা হল। গুণে গুণে আর ফুরোয় না। পয়সা, ডবল, আনি, দুয়ানি মিলে প্রায় বিশ টাকা। সমস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠল সকলে। নিশিকান্তকে মাথায় তুলে নাচে আর কি। প্রথম দিনেই এতটা সাফল্য কেউ আশা করেনি।

অর্জুন বলল, সব তোমার হাতের গুণ দাদু, তোমার হাতের যাদু। আমাদের হাতের তৈরি পান কি এমন মিঠে হয়। খদ্দেরে একবার খায়, তারপর থুথু ছিটিয়ে চলে যায়।

সনাতন বলল, যদি এভাবে চলে তো তিন মাসের মাথায় 'সুশীতল বিড়ি ফ্যাক্টরির' মুখে লাথি মেরে চলে আসব।

নিশিকান্ত বলল, সবুর। এত তাড়াতাড়ি না। এখন অনেক বাকি। সিগারেট রাখতে হবে, সরবতের সরঞ্জাম চাই। আয়না চাই নয়ন-মোহন। তবে না দোকানেরে কই দোকান।

সেদিন লোকাল ট্রেনে যখন নিশিকান্ত চেপে বসল, তখনও মগজ থেকে সারা দিনের উত্তেজনার ফেনা মিলিয়ে যায়নি। বিশ টাকা বিক্রি...তার পান খেতে লোকে ফিরে ফিরে আসে...তোমার হাতে যাদু আছে দাদু...তাকে ঘিরে সহর্ষ উল্লাস। অর্জুন সনাতনদের দাদু, নিজের কাছেই সম্পর্কটা কেমন অদ্ভুত ঠেকল নিশিকান্তর; অনেক বিদেশ ঘুরে এসে নিজের পরিবারের লোকগুলির সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের রোমাঞ্চের মতো। শুধু অর্জুন-সনাতনই নয়, আরও অনেককে নিয়ে যেন ছড়িয়ে আছে এই পরিবার; দু'বেলা লোকাল ট্রেনের থার্ডক্লাসে যারা যাওয়া আসা করে, যারা ভিড়ে ছাদে ওঠে, কিংবা ফুটবোর্ডে ঝোলে, সকলের মধ্যেই নিশিকান্ত যেন একান্ত আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেল।

কত পিছনে পড়ে আছে সেই নিশিকান্ত চক্রবর্তী, ছেঁড়া পুঁথি বগলে নিয়ে যে চণ্ডীপাঠে উমেদারি করে বেড়াত ? ভাল মনে পড়ে না, পূর্বজন্মের মতো সুদূর মনে হয়। তা হোক, এই নতুন জন্মই বা মন্দ কী ? এই নিশিকান্তর জন্যে অনুরাগ আছে সহমর্মী সহকর্মীদের চোখে, এই নিশিকান্তর কাজের তারিফ আছে দশজনের মুখে। সে কাজের দাম মেলে নগদ পয়সায়।

ক্যাম্পে ফিরল শিস দিতে দিতে।—গোপালের মা, চোখ বোঁজো। নয়নতারা চোখ বুঁজতেই নিশিকান্ত কয়েক খিলি পান আর পাঁচ টাকার একখানা নোট রাখল রেকাবের ওপরে।

এখন চাও।

নয়নতারা তাকাল, কিন্তু ছুঁল না নোট, মুখে নিল না পান। চোখ মুখ গম্ভীর।

দেখে নিশিকান্তও কেমন দমে গেল।—কী হইছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল নয়নতারা, সন্তর্পণে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে এল। ফিস ফিস করে বলল, সব্বোনাশ হইছে। ট্যার পাইয়া গেছে ক্যাম্পের মাইনষে।

নিশিকান্ত ঠিক যেন বুঝেও বুঝল না। বিরক্ত গলায় বলল, কী ট্যার পাইছে।

নয়নতারা আরও কাছে সরে এল, প্রায় কানের ওপর মুখ রেখে যা বলল তার মর্মার্থ: আজ পাশের

Scanned by CamScanner

চালার মন্মথ কী কাজে গিয়েছিল দমদম। সে কী দেখে এসেছে সেই জানে, ক্যাম্পে ফিরে আর পাঁচজনের কাছে দশখানা করে লাগিয়েছে। সারা বিকেল ওরা হাসাহাসি করছে সামনের মাঠটাতে। নয়নতারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্মথ বলেছে, স্বস্তিপাঠ! নিশিকান্ত ঠাউরের চণ্ডীপাঠের নমুনা আজ দেইখা আসলাম দমদমায়। পানবিড়ির দোকান দিছে আমাগো চক্কোত্তি। পান সাজে, আর পয়সা পয়সা খিলি বেচে।

তারপর?

তারপর আমিও ছাইড়া কথা কই নাই। নয়নতারা উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে দিল, আমিও কইছি কক্‌খনও না। পান সাজনের মতো ছোট কাম করতেই পারো না তুমি। দ্যাশের চিনা-শুনা লোক দোকান দিছে, তুমি খালি দাঁড়াইয়া থাইকা দেখা শুনা করো। তোমারে যে পান-আলা কয় তার জিহ্বা যেন খইসা পড়ে।

ঠিক কই নাই?

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল নিশিকান্তের মুখ।

ছোট কাম? তুমি কইলা গোপালের মা, পান সাজন ছোটলোকের কাম?

কইলাম তো,—হাঁপাতে হাঁপাতে নয়নতারা বললে, কইমু না, ছাইড়া দিমু?

একটা ঢোঁক গিল্‌ল নিশিকান্ত; বুক থেকে জিব অবধি যেন তেতো হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আহত সুরে ধীরে ধীরে বলল, গোপালের মা, একটা কথা কই তোমারে। আমারে পান-আলা কইয়া যত না অপমান করছে মন্মথ, পান সাজনেরে নিচা কাম কইয়া তার থিকা কম অপমান করলা না তুমি।

Scanned by CamScanner

কানাকড়ি

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধান গলা সাড়া এল, কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হ'ল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিস পত্তর কিছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউসনি ছিল যে। একটু পাখা করবে?

খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ন বেজেছিল। মিনিট খানেক পরে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠ শরীর সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখের মাথা খেয়েছ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি মাইরি ভুল হয়ে যায়।

তুমি তৈরী?

রেডি।

তাহলে ষ্টেডি—গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এল।

মন্মথ শুনল সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবে না।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি, আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেল গাছের হাতধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরিটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্ত শরীর মেয়েদের বয়সের মতো, এ বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোঁজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক'মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তার সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢঙঢঙ ট্রাম বেরুলো। চৌবাচ্চার ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা ষাট নম্বর আলেকজাণ্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন: আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুঁইপানি স্নান: সাড়ে আট। নমোনমো খাওয়া: ন'টা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরানো আয়েসী একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি—সাড়ে ন'টা, দৌড়—দৌড়—দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, ক্বচিৎ একটি কাকের কা-কা, ক্বচিৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হায়রান ফিরি-ওয়ালা এ গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্নে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হিল। আলাপ হতে হতে ছ'দিন কাটল।

জানলায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘরে থাকেন?

চৌকাঠের ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকব না ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা

নতুন এসেছেন। তা ফুরসুৎই পাইনা যে এসে পরিচয় করব। দরজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবার বলল, জুতো খোলার দরকার নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তক্তপোষে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনের না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চুপচাপ ঘুমুচ্ছে। কার মতো হয়েছে,—বাপের মতো?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল, আপনারা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে মেয়েটি বলল, দিদি আবার কী। মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়োই হবো আপনার চেয়ে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ক'জন—তিনজন না চার?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পারলাম কই যে তিনজন হব।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? করেন নি কেন।

করিনি কি আর সাধ করে। হ'ল না মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামের বাঁশী বাজল বলে।

শ্যামের বাঁশী? একটু অবাক তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সির কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না?

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীর। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গরীবের ঘরের মেয়ে, পড়েছি গরীবের হাতে—আমি ট্যাক্সি চড়েছি মোটে দু'বার। একবার সেই বিয়ের সময়, আরেকবার এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতালে যেতে। সাবিত্রী ইঙ্গিতে ওর মেয়েকে দেখিয়ে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশমশ জুতো,

কোট প্যাণ্ট—

ও মা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হ'ল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এসো ভাই কাজকর্ম চুকল?

ঢুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট কিন্তু এমন সাজান গুছান ঘর তার কখনো চোখে পড়েনি। ঝকঝকে পালিশ, খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশের ওয়ার। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমারিতে কাঁচের, চীনেমাটির খেলনা, কতরকম।

এগুলো? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে, আমার কি পুতুল খেলার বয়স গিয়েছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে, নোংরা কাপড়, কি জানি। মল্লিকার হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায় যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায় গিয়েছিলেন বুঝি?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আর গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাড়ল না দিদি?

আবার দিদি? বলবে মল্লিকাদি। ছাড়ল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি? আপনার ছোট?

আঙুলের বয়সের হিসেব করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু' বছর হবে। কেন তুমি দেখনি? সেই যে, রোজ গাড়ি নিয়ে বিকেলে আসে? ও আবার সিনেমায় কাজ করে কিনা। ডিরেক্টর।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পরে মন্মথকে, গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে।

না জেনে শুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি ?

খাওয়া বন্ধ করে মন্মথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ফিসফিস করে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি ? ও-পাশের ঘরে থাকে একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলত। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মত ! একটু থেমে বলল, সেদিন বলছিল মামাত দাদা, আজ বলছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্য হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।

ওর চরিত্র তেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের ?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি !

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে ?

হাতাটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না ?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি ?

সাবিত্রীর চোখ দু'টো তখনো জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যাছাড়া কী। দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না কর, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাব।

ভাতের থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলে বৌয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথা বদলানো থেকে ভাজের কাপড় কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে ? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দুখানা শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে ? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চল। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ। ও—কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবে না তুমি ?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপা কান্না ভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও ছোঁব না।

ছোঁবে না ?

না।

থাক তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল। পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথা ব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দুটি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল, খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাক্‌সকাল আকাশের মতো স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভ, শুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাত কাঁদা চোখ দু'টিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ

অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল। পাতা দুটি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোঁট দু'টি থরথর হ'ল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল। সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারল না, আরো বেশি করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথর বুকে।

পরক্ষণেই হাসি-কান্না মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম!

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবে না তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছুই না। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসা বাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী-রপ্তানীর ওপর আমাদের অফিস। মাল আসছে না নিয়মিত বিদেশ থেকে। পাকিস্থানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকরির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুন বাসার হাঙ্গামা করে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ় গলায় মন্মথ বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হ'ল।

বাজারের থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল এই, শোন।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইরে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুরে চোখের জল বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দরজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কত্তাগিন্নীতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকোন হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম, না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়। সাবিত্রী তবু বিশ্বাস করছে না দেখে, মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্ত্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিয়েটার দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখদুটো ফোলাফোলা, ভাল ঘুম হয়নি কিনা, তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোও নি। চোর এলে কিন্তু মুসকিলে পড়ত ভাই, বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হ'ল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না; এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারল না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকাদি বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভারি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই। কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই অফিসে গেছেন। ও বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলো না। তোমাকে এখুনি বাজার যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্তগলায় মন্মথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আর একটা মাছের মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত শখ যে। এত খাবার সাধ—পোয়াতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ আস্তে। সাধ নয়গো মান। আমার মান বাঁচাতে পার একমাত্র তুমি। তারপর সাবিত্রী ফিসফিস করে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথর মুখ। কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে আছ বল তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেব কিনা ভাবছি, —তার ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমরা দু'জনকে নিয়ে দু'জন কারুর কাছে ছোট হব না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনও, কেন কেন, তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যের সঙ্গে?

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধরল সাবিত্রী। ধরা গলায় বলল, আর করব না। কিন্তু আজকের মত আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে এক বাটি কিনে নিয়ে এসো। কম খরচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্মথ তীক্ষ্ণস্বরে বলল, পাগলামি ক'র না। আমি এখন যাই হোটেলে, হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মুড়ো রাধা হয়েছে।

শেষ পর্য্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগাড় করে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিছু টের পায়নি কিন্তু, খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোর ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে

এক কোণে। ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমের ওপর ধবধবে চাদর!

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে, মুখে, মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল, জান না? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন, আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারে না? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই? দেখতো কেমন টানটান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না মল্লিকাদি, কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমতন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে প্রসাধন করল, সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরী করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ, ভ্রু রেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়মের নিখুত সাজানো রীডের মত দাঁতের পাঁটি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকাদি বলল, আহা, বসো না।

তখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, মল্লিকা এটা-ওটা, এখানে সেখানে সরাতে লাগল; টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে লাগল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ একসঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে গায়ের কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো পটপট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, আর রুমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমি বমি অনুভূতি এলো। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলে আস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেঁটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরানো আঙুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি সাবিত্রী সারা শরীর ভয়ে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে পা দিয়েই এক রকম চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে, কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জানো।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা-দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছে, না?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটর দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে, বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙল। কিন্তু ভাঙে না। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পরক্ষণেই হারমোনিয়ামটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এত-দিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্যে কত ছোট কাজই না করে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আমাদের কিন্তু

গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত করতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পরদিন মুখ দেখাতে পারবে না ওর কাছে। আশ্চর্য, পরদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আরেকটার ফরমাস করে।

সাবিত্রী বাঁকা গলায় বলল, কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কুলকুচির জল সশব্দে দূরে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো ঠাট্টার কথাটা মনে রেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগ্‌-গিরই আমরা একটা গীতিনাট্য অভিনয় করব কিনা, কাল আমার ঘরে তার মহড়া হল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে, জান?

সাবিত্রী নীরবে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁষে এল। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবারে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে। ওরা এবারে যে ফিল্মটা তুলছে তাতে নাকি ছোট্ট একটি মায়ের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না —ঠিক অমনি একটা পোজ ওদের চাই।

সাহস পেয়ে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, তুমি মরো মল্লিকাদি।

রবিবার বাড়িওয়ালার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারা দিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিস ফেরৎ যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়েই সটান চলে এল বাড়ি। কোনদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, এ

কি, এত শীগ্‌গির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখারই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁষে এল সাবিত্রী। মন্মথর কপালে উদ্বিগ্ন করতল রাখল; ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল না, তখন গাল কাৎ করে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণ ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেপাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী ছাঁটাই?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই? বয়স কত ওর—দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপর নীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল: কলকাতার দুধ ত সিকিটাই জলমেশানো, পাথর ভর্ত্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হ ত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা করছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোন আশা পেয়েছ।

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড এণ্ড জ্যাক্‌সন কোম্পানীর বড়বাবুকে কেমন জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল: আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লারিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমার চেহারা আগাগোড়া দেখে

নিয়ে—চোখ নয় তো শালার, যেন বুরুশ—বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যার, বস্তুবত আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মারা গেছেন স্যার তাই··। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল বেটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোট সাহেবকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। মন্মথ হো-হো করে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত? সাবিত্রী বলল।

আরে সেইখানেই তো মুশাকল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু' আনা খরচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথর হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না, না ঘেঁসতে, না মিশতে, তবু কি কম্‌লি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড় একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম মল্লিকাদি?

গরম? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেল না। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না কিছু। গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ, এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পূঁজরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী।

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুব। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী বলেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

রেসে যাব ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশ, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিনটোটের খেল মেলাতে পারলে ত কথাই নেই,—রাতারাতি বড়মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দুটো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালের হাঁড়িতে হাত দিল! বেরুল টিনের একটা কৌটো, সেই কৌটোর মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল পয়সা, সব শুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরি হলে কালিঘাটে পূজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকার তখনো সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায়, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিরে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেক্ষণ কিছু বলতে পারল না। তারপর সঙ্কোচ জয় করে নীচু গলায় বলল, কম পয়সায় রেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকার চোখে-মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল, কত কম পয়সা, ভাই?

এই ধরো,—স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন,—পাঁচ আনাতেই চলবে। আমার চেনা বুকি আছে কত; তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল।

মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমার যা ভাল মনে হয় ক'র, মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে আসলে ফিরে এল কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী, আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেণ্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছ আট আনা।

আমার এই ভাল মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে। চায়ের সঙ্গে ফুলুরি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি ?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি ?

তবু হাসল সাবিত্রী।—যদি বলি তাই।

ঠাট্টাকটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হবো না, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরনে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসেবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকব সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিলনা, শুধু মন্মথর পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বার বার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না দেখো। তা ছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলেছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাব।

মন্মথ বলেছে, সে ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এ অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবে না, তার ওপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে ? আর, ক'দিনের জন্যই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস ?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এল, ফ্যাকাশে, সাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই ?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে

খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছু না। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে গিয়েছিলাম তো। রোজই ঘুষঘুষে জ্বর হ'ত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন,—ব্যাস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আরো দেড়। একটা ট্রামের মান্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবে না?

মন্মথ হাই তুলে বলল, মুর, দুর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুর প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্তী এণ্ড দত্ত,—অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানী?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেকদূর এগিয়েও হ'ল না। কোন একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেসেণ্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রীর ওপর দু'পারসেণ্ট কমিশন। সে অফিসের মাঝারি একজন কেরাণীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চর শালা জোচ্চর—পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা ?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ দিয়েছিল ছ' হাজার, বলামাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওর বাবা শুধুমাত্র শাঁখা-সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আপশোষই মন্মথ করছে নাতো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে! আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগ্‌গির আজ খেতে বসেছ ভাই ?

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েক দানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিম্বা বলত, আজ তোমার ভগ্নীপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পারেনি ; তা আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে এল মল্লিকা। একটু চেখে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ ছল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হ'ল সাবিত্রীর চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে রাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ করে এসেছে সাবিত্রী ? ওর কাছে আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বলে ? অকস্মাৎ সাবিত্রীর মনে হ'ল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবনাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে।

সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ করল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দু'টো গরম, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধারকরা স্যাণ্ডালটার স্ট্রাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।

ঘড়িতে দেখল তখনো সিনেমা শুরু হতে মিনিট পনেরো দেরি। ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা; অভাবের কথা; উপোস দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্যে ভাবি না। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি?

তাই তো, কী কাজ। না জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টীচার হতে পারবো না, নার্স না, দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখনা মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দু'টো ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখিরীর আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই

আছে। আমি জোর করে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজ নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্থল অবধি কেঁপে উঠল। কুয়োর গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল: বেশ আমি রাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বায়োস্কোপে। মন্মথ বেরিয়ে গেছে। তার অনুমতি দেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি।

আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে—

অন্ধকার ঘরে পর্দার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীর, সেদিকে কান নেই। গলা শুকনো, দেহ আড়ষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিরালোকতার সুযোগে এগিয়ে এল একখানি রোমশ হাতের ছোবল। এই বুঝি ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সরে গেল সাবিত্রী; কতবার যে পাশের হাতলে অন্যমনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার থস থস করে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কর বাঁ-হাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময় ফশ্ করে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশালাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকের ভেতর থেকে রুমাল বার করে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দু'টো আইসক্রীম নিয়ে ফিরে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাৎ করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেল না।

বুঝতে পারছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেব একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার?

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই—এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাই ছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখর ছবির অবিরাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝল না সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পালা করে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনল।

শেষবারের মতো আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মতো সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন?

না—বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দুজনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, একগ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাস করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মতো লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশমশ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হ'ল না, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আরেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটি গুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন স্যাণ্ডালের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বারবার কঠিন

একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই ?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা—আপনি তো খুব দেখেন, না ?

আমি ? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ করি, জানেন না ?

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। চায়ের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলবার আছে সাবিত্রীর, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পারল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কি-করে। তারপর শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে, তাও কাজ এগোচ্ছে না। বাজার খারাপ। বারবার মার খেয়ে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেরৎ নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরীয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন,—আপনাদের ছবিতে নাকি—নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনারা।

স্মিতচোখ দুটির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূ জোড়া সন্নিহিত হয়ে এল: মল্লিকা বলেছে আপনাকে ? কবে ?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু করে বলে যেতে লাগল আমাদের বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম আমি যদি···আমাকে যদি—

সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বারবার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম, তখন স্বাভাবিকভাবে মায়ের পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালান গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে বই

তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধরার মতো সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটি হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু,—সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কর চোখে নিজের চেহারার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজসাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালো রেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরাবেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ; এ-চেহারা হিরোয়িনের সাজে না, এ কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হ'ল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেব।

একটা গাড়িও করে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হয়ত উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘরময় পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী করবে মন্মথ? মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে? বার করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওর হুকুম না নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানোর অপরাধের জন্যে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কারী করবে?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যখন, তখন এ সব সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি! সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দরজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকের ওপর শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনো বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

সিনেমা ভাঙল?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আরে, জানি জানি। এসে দেখি তোমার মল্লিকাদি খুকিকে লেবেঞ্চুস বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করছে। ওর কাছেই শুনলাম।

পরম প্রশান্ত মন্মথর মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এর চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিল না কেন, এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভালো, ভালো। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ খুব ভালো। নীচু স্বরে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?

কী বলবে?

এই ধরো কাজের কথা। কতরকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিয়ে দিতে পারত? তা তুমিও কিছু বললে না?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিয়েছিল কেন। নিজের দরকারের কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন?

অত ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।—অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝনা?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না?

চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। রা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল; রাজি হওনি কেন?

হলেই কি মান থাকত তোমার।

মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভরবে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ী করে বাড়ি পৌছে দিত ?

পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্মথর। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মন্মথ ঠাট্টা করছে না, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কর সঙ্গে এক মোটরে আসুক। একটু ছোঁয়াছুঁয়ির ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে ?

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ করো।

বলে আর অপেক্ষা করল না, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি। কী হয়েছে সাবিত্রী, অমন করছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না রোধের প্রাণপণ প্রয়াসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেছে। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায় না জানিয়ে গিয়েছিলে বলে খুব বুঝি বকেছেন মন্মথবাবু ?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে ? কানের কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু করেছে ?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে ?

এ তবেরও জবাব পেল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্ততঃ ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনোদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

পদিপিসীর বর্মিবাক্স

পাঁচুমামার প্যাঁকাটির মতন হাত ধরে টেনে ওকে ট্রেনে তুললাম। শূন্যে খানিক হাত-পা ছুঁড়ে, ও বাবাগো মাগো বলে চেঁচিয়ে-টেঁচিয়ে শেষে পাঁচুমামা খচ্‌মচ্‌ করে বেঞ্চিতে উঠে বসল। তার পর পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ফেলে, খুব ভালো করে নিজের হাত-পা পরীক্ষা করে দেখল কোথাও ছড়ে গেছে কি না ও আয়োডিন দেওয়া দরকার কি না। তার পর কিছু না পেয়ে দুবার নাক টেনে, পকেটে হাত পুরে, খুদে-খুদে পা দুটো সামনের বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে চিঁচিঁ করে বলল, "ছোটবেলায় একবার ভুলে বাদশাহি জোলাপ খেয়ে অবধি শরীরটা আমার একদম গেছে, কিন্তু বুকে আমার সিংহের মতন সাহস। তা নইলে পদিপিসীর বর্মিবাক্স খোঁজার ব্যাপারে হাত দেব কেন!" বলে ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ দুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তো অবাক।

কোনার বেঞ্চিতে যে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনিও অবাক! পাঁচুমামা বলল, "একশো বছর পরে পদিপিসীর বমিবাক্স আমি আবিষ্কার করব। জানিস, তাতে এক-একটা পান্না আছে এক-একটা মোরগের ডিমের মতন, চুনী আছে এক-একটা পায়রার ডিমের মতন, মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতন! মুঠো-মুঠো হীরে আছে, গোছা-গোছা মোহর আছে। তার জন্য শত-শত লোক মারা গেছে, রক্তের সালওয়েন নদী বয়ে গেছে, পাপের উপর পাপ চেপে পর্বত তৈরি হয়েছে—সব আমি একা উদ্ধার করব!"

তখন আমার ভারি রাগ হল। বললাম, "তুমি ইঁদুর ভয় পাও, গোরু দেখলে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়, তুমি কী করে উদ্ধার করবে?" পাঁচুমামা বলল, "আমার মনের ভিতর যে সিংহ গর্জন করছে।" বলে একদম চুপ মেরে গেল। আমি পাঁচুমামাকে একটা ছাঁচি পান দিলাম, এক বোতল লেমোনেড খাওয়ালাম, খাবারওয়ালাকে ডেকে মস্ত শাল-পাতার ঠোঙা করে লুচি, আলুর দম, কপির সিঙাড়া, খাজা আর রসগোল্লা কিনে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, "ও পাঁচুমামা, পদিপিসীর বমিবাক্সটা কোথায় আছে?" পাঁচুমামা আমার এত কাছে ঘেঁষে এল যে তার কনুইটা আমার কোঁকে ফুটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুমামার ভুরুর প্রত্যেকটা লোম খাড়া হয়ে দুটো শুঁয়োপোকার মতন দেখাতে লাগল। ওর মাথাটা ঝুলে আমার এত কাছে এসে গেল যে ঐ শুঁয়োপোকার সুড়সুড়ি আমার কপালে লাগল। পাঁচুমামা নিচু গলায় কথা বলতে লাগল, আর আমি তাই শুনতে-শুনতে টের পেলাম চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কখন জানি ওঁর নিজের বেঞ্চি ছেড়ে পাঁচুমামার ওপাশে ঘেঁষে হাঁ করে কথা শুনছেন, তাঁর চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেছে আর গলার মধ্যিখানে একটা গুট্‌লি মতন ওঠানামা করছে। তাই দেখে আর পাঁচুমামার কথা শুনে আমার সারা গা সির্‌সির্‌ করতে লাগল।

পাঁচুমামা বলতে লাগল, "দেখ্‌, মামাবাড়ি তো যাচ্ছিস। সেখানকার গোপন সব লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো তোর জানা দরকার। এ কথা কখনো ভেবে দেখেছিস? পদিপিসীর নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকতে পারত তা জানিস? ঠাকুর্দার পদিপিসী, অদ্ভুত রাঁধতে পারতেন। একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন যে

চিমড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনিও অবাক!

বড়লাট সাহেব একেবারে থ! বলেছিলেন, এই খেয়েই তোমলোককো দেশকো এইসা দশা! থাক গে সে কথা! অদ্ভুত রাঁধুনি ছিলেন পদিপিসী। বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ! সিংহের মতন তেজও ছিল তাঁর, হাজার হোক, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি তো তাঁরই বংশধর। বুঝলি, ঐ পদিপিসী গোরুর গাড়ি চড়ে, মাঘীপূর্ণিমার রাতে বালাপোশ গায়ে, নিমাইখুড়োর বাড়ি চলেছেন বত্রিশবিঘার ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে। যাচ্ছেন আর মনে-মনে ভাবছেন নিমাইখুড়োর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, জঙ্গলে একা থাকেন, মেলা সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা নিয়ে, কপালে চন্দন সিঁদুর দিয়ে চিত্তির করা, কথায়-কথায় ভগবানের নাম। অথচ এদিকে মনে হয় দেদার টাকা, দানটানও করেন, জিগ্‌গেস করলে বলেন—সবই ভগবানের দয়া! এত লোক থাকতে ভগবান যে কেন ওঁকেই দয়া করতে যাবেন সেও একটা কথা।

"এই-সব ভাবছেন হঠাৎ হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একদল লাল লুঙ্গিপরা, লাল পাগড়ি বাঁধা, লাল চোখওয়ালা ডাকাতপানা লোক একেবারে গোরুর গাড়ি ঘেরাও করে ফেললে! নিমেষের মধ্যে গোরু দুটো গাড়ি থেকে খুলে নিল, আর পদিপিসীর সঙ্গে রমাকান্ত ছিল, তাকে তো টেনেহিঁচড়ে গোরুর গাড়ি থেকে বার করে তার ট্যাঁক থেকে সাড়ে সাতআনা পয়সা আর নস্যির কৌটো কেড়ে নিলে। পদিপিসী থান পরা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর তার উপর দুই হাত দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এমন করে দাঁড়ালেন যে ভয়ে কেউ তাঁর কাছে এগুলো না। শেষটা তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে বাটপাড়েরা, গাড়োয়ান, রমাকান্ত সবাইকে তো আধমরা করে ফেললি, গোরুগুলোরও কিছু বাকি রেখেছিস কি না জানি না। এবার তোরাই আমাকে নিমাই-খুড়োর বাড়ি কাঁধে করে পৌঁছে দে!' তাই-না শুনে ডাকাতরা জিভ-টিভ কেটে, পদিপিসীর পায়ে একেবারে কেঁদে পড়ে বলল, 'নিমাইসর্দার যদি জানতে পারে তার কুটুমকে এরা ধরেছিল—নিমাইসর্দার এদের প্রত্যেকের ছাল ছাড়িয়ে নেবে, হাউমাউ!' তখন তারা ফের গোরু জুতে, পয়সা ফিরিয়ে, রমাকান্তর গায়ে হাত বুলিয়ে, গাড়োয়ানকে নগদ চারটে পয়সা ঘুষ দিয়ে, নিজেরাই নিমাইখুড়োর বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছিল।

"পদিপিসীও নিমাইখুড়োর কথা জানতে পেরে মহাখুশি!"

পাঁচুমামা ঢোক গিলে চোখ গোল করে আরো কত কি বলল। "পদিপিসীর ভীষণ বুদ্ধি, ধাঁ করে টের পেয়ে গেলেন খুড়োই ডাকাত-দলের সর্দার। পদিপিসী খুড়োর বাড়ি দুপুর রাতে পৌঁছেই খুড়োর চোখের ওপর চোখ রেখে, দাঁতে-দাঁত ঘষে বললেন—'শালবনে আমাকে ডাকাতে ধরেছিল, তাড়াতাড়ি গোরুর গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আমার তসরের চাদর খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, পায়ের বুড়ো আঙুলে হোঁচট লেগেছে, আর তা ছাড়া মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। এর কী প্রতিশোধ নেব এখনো ঠিক করি নি। এখন রান্না করব, খাব, তার পর পান মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখব।'

"খুড়োর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত থেকে রুপোবাঁধানো গড়গড়ার নলটা মাটিতে পড়ে গেল; খুড়োমশাই বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে তারই উপর একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ নাড়তে লাগলেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। পদিপিসী তাই দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমার মধ্যে যে-সব সন্দেহরা ঝাঁক বেঁধে অন্ধকার বানিয়ে রেখেছে, তারা যাতে মনের মধ্যেই থেকে যায়, বাইরে প্রকাশ পেয়ে তোমার অনিষ্ট না ঘটায়, তার ব্যবস্থা অবিশ্যি তোমার হাতে।' বলে চাদরটা চৌকির উপর রেখে কুঁজো থেকে খাবার জল নিয়ে পা ধুলেন। তার পর রান্নাঘরে গিয়ে খুড়িকে ঠেলে বের করে দিয়ে মনের সুখে গাওয়া ঘি দিয়ে নিজের মতন চারটি ঘিভাত রাঁধতে বসে গেলেন। খুড়োও আস্তে-আস্তে সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—'তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ডাকাতের কথা কাউকে না বল।'

"পদিপিসী একমনে রাঁধতে লাগলেন।

"খুড়ো বললেন—'একশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু হাসলেন। খুড়ো বললেন—'পাঁচশো টাকা দেব।' পদিপিসী একটু কাশলেন। খুড়ো মরীয়া হয়ে বললেন—'হাজার টাকা দেব, পাঁচ হাজার টাকা দেব, আমার লোহার সিন্দুক খুলে দেব, যা খুশি নিয়ো।' পদিপিসী খুন্তিকড়া নামিয়ে রেখে সোজা সিন্দুকের সামনে উপস্থিত হলেন। খুড়ো সিন্দুক খুলতেই হীরে-জহরতের আলোয় পদিপিসীর চোখ ঝলসে গেল। খুড়ো ভেবেছিলেন সেইসঙ্গে পদিপিসীর মাথাও ঘুরে যাবে, কী নেবে না-নেবে কিছু ঠাহর করতে পারবে না। কিন্তু পদিপিসী সে মেয়েই নয়। তিনি অবাক হয়ে গালে আঙুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন—'ওমা, এ যে

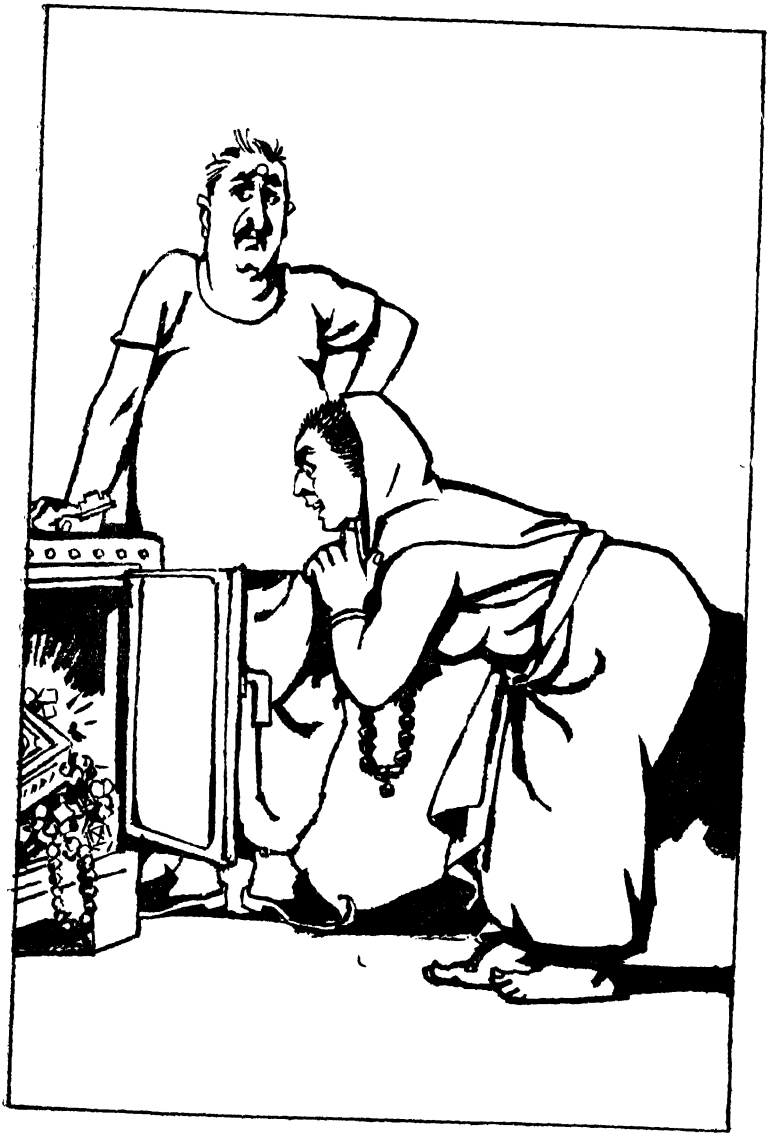

ওমা, এ যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর !

আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর! ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে বাটপাড়, কি দাঁওটাই মেরেছিস!' বলে দু হাতে জড়ো করে একচিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙরের নক্‌শা-আঁকা লাল বর্মিবাক্সও টেনে নামালেন। খুড়ো হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বললেন—'আহা, ওটা থাক, ওটাতে যে আমার সব প্রাইভেট পেপার আছে!'

"পদিপিসী থপ্‌ করে মাটিতে থেবড়ে বসে বললেন—'চোপরাও শালা। নয়তো সব প্রাইভেট ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেব।' বলে কাগজপত্র বের করে ফেলে দিয়ে, ঐ-সব ধনরত্ন বর্মিবাক্সে ভরে নিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে জলচৌকিতে বসে কড়াটা উনুনে চাপালেন। সারারাত ঘুমলেন না, বাক্স আগলে জেগে রইলেন, ভোর না-হতেই আবার গোরুর গাড়ি চেপে শালবনের মধ্যে দিয়ে লাল আলোয়ান গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।"

পাঁচুমামা এবার থামল। আর আমি মাথা বাগিয়ে জিগ্‌গেস করলাম—"তার পর?" এবং সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও নিশ্বাস বন্ধ করে বললেন—"তার পর? তার পর?" পাঁচুমামা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনার কী মশাই?" ভদ্রলোক অপ্রস্তুতপানা মুখ করে বললেন—"না, না—গল্পটা বড় লোমহর্ষণ কিনা—"

পাঁচুমামা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললাম—"চুপ, চোখ ইজ্‌ জ্বল্‌জ্বলিং।" পাঁচুমামা তাঁকে কিছু না বলে আবার বলতে লাগল—"এত কষ্ট করে পাওয়া বর্মিবাক্স নিয়ে পদিপিসী সারাদিন গোরুর গাড়ি চেপে বাড়িমুখো চলতে লাগলেন। দুপুরে সজনে গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে খিচুড়ি আর সজনে ফুল ভাজা খাওয়া হল, তার পর আবার গাড়ি চলল। এমনি করে রাত দশটা নাগাদ পদিপিসী বাড়ি পৌঁছুলেন। কেউ মনেই করে নি পিসী এত শিগ্‌গির ফিরবেন, সবাই অবাক। সবাই বেরিয়ে এসে পদিপিসীকে আর জিনিসপত্র পোঁটলা-পাঁটলি টেনে নামাল। তার পর গোলমাল, চ্যাঁচামেচি, ডাকাতের গল্প, অবিশ্যি ডাকাতের সঙ্গে খুড়োর যোগের কথা পদিপিসী ছাড়া কেউ সন্দেহও করে নি, পদিপিসীও চেপে গেলেন। হঠাৎ বাক্সটার কথা মনে পড়তে বগল থেকে সেটাকে টেনে বের করে দেখেন, যেটাকে বর্মিবাক্স বলে সযত্নে গাড়ি থেকে-নামিয়েছিলেন সেটা আসলে পানের ডিবে। বর্মিবাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।"

পাঁচুমামা চোখ গোল করে চুল খাড়া করে চিঁচিঁ করে বলতে লাগল আর আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম। "সে বাক্স একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। সেই রাতদুপুরে পদিপিসী এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করলেন যে বাড়িসুদ্ধু সবাই যে যেখান থেকে পারে মশাল, মোমবাতি, লণ্ঠন, তেলের পিদ্দিম জ্বেলে নিয়ে এসে এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে মহা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পদিপিসী নিজে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলেন। বললেন, 'নেই বললেই হল! এই আমার বগলদাবা করা ছিল, আর এই তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না! একটা আধহাত লম্বা শক্ত কাঠের বাক্স একেবারে কর্পূরের মতন উড়ে গেল। একি মগের মুল্লুক!'

"বলে গোরু খুলিয়ে, গোরুর গাড়ির ছাউনি তুলিয়ে, বাঁশের বাঁধন আলগা করিয়ে, গাড়োয়ানের দুহাতি ধুতি ঝাড়িয়ে আর রমাকান্তকে দস্তুরমতো সার্চ করিয়ে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। শেষে যখন গোরু দুটোর ল্যাজের খাঁজে খুঁজতে গেছেন তখন গোরু দুটো ধৈর্য হারিয়ে পদিপিসীর হাঁটুতে এইসা গুঁতিয়ে দিল যে পদিপিসী তখুনি বাবাগো মাগো বলে বসে পড়লেন। কিন্তু বসে পড়লে কি হবে, বলেইছি তো সিংহের মতন তেজ ছিল তাঁর, বসে-বসেই সারারাত বাড়িসুদ্ধু সবাইকে জাগিয়ে রাখলেন। কিন্তু সে-বাক্স আর পাওয়াই গেল না। এতক্ষণ যারা খুঁজছিল তারা কেউ বাক্সে কী আছে না-জেনেই খুঁজছিল। এবার পদিপিসী কেঁদে ফেলে সব ফাঁস করে দিলেন। বললেন, 'নিমাইখুড়ো আমাকে দেখে খুশি হয়ে ঐ বাক্স ভরে কত হীরে-মোতি দিয়েছিল, আর সে তোরা কোথায় হারিয়ে ফেললি।' তাই-না শুনে যারা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে বসে পড়েছিল, তারা আবার উঠে খুঁজতে শুরু করে দিল। শুনেছি তিন দিন তিন রাত ধরে মামাবাড়িসুদ্ধু কেউ খায়ও নি ঘুমোয়ও নি। বাগান পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। যাদের মধ্যে বিষম ভালোবাসা ছিল তারাও পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিল।"

আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বললাম, "তার পর? তার পর?" পাঁচুমামা বলল, "তার পর আর কি হবে? এক সপ্তাহ সব ওলটপালট হয়ে রইল, খাওয়া নেই, শোয়া নেই, কারু মুখে কথাটি নেই! সারা

বাড়ি সবাই মিলে তোলপাড় করে ফেলল। কত যে রাশি-রাশি ধুলো, মাকড়সার জাল, ভাঙা শিশি-বোতল, তামাকের কৌটো বেরুল তার ঠিক নেই। কত পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি বেরুল; কত গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেল; কত হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু পদিপিসীর বর্মিবাক্স হাওয়ায় উড়ে গেল। এমন ভাবে হাওয়া হয়ে গেল যে শেষ অবধি অনেকে এ কথাও বলতে ছাড়ল না যে বাক্স-টাক্স সব পদিপিসীর কল্পনাতে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। কেবলমাত্র রমাকান্ত বার বার বলতে লাগল—নিমাইখুড়োর বাড়ি থেকে পদিপিসী যে খালি হাতে ফেরেন নি এ কথা ঠিক। গোরুর গাড়িতে আসবার সময়ে বাক্সটা চোখে না-দেখলেও পদিপিসীর আঁচল চাপা শক্ত চৌকো জিনিসের খোঁচা তার পেটে লাগছিল, এবং সেটা পানের বাটা নয় এও নিশ্চিত, কারণ পানের বাটার খোঁচা তার পিঠে লাগছিল।

"বাক্সের শোকে পদিপিসী আধখানা হয়ে গেলেন। অত হীরে-মোতি লোকে সারাজীবনে কল্পনার চোখেও দেখে না আর সে কিনা অমন করে কোলছাড়া হয়ে গেল! শোকটা একটু সামলে নিয়ে পদিপিসী আবার রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর খোঁজে গেছিলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। গিয়ে দেখেন বত্রিশবিঘার শালবনের মাঝখানে নিমাইখুড়োর আড্ডা ভেঙে গেছে, জনমানুষের সাড়া নেই, বুনো বেড়াল আর হুতুমপ্যাঁচার আস্তানা।

"তার পর কত বছর কেটে গেল। বাক্সের কথা কেউ ভুলে গেল, কেউ আবছায়া মনে রাখল। একমাত্র পদিপিসীই মাঝে-মাঝে বাক্সের কথা তুলতেন। আরো বহু বছর বাদে পদিপিসী স্বর্গে গেলেন। যাবার আগে হঠাৎ ফিক করে হেসে বললেন, 'এই রে! বাক্সটা কী করেছিলাম এদ্দিন পরে মনে পড়েছে!' বলেই চোখ বুজলেন! তাই শুনে পদিপিসীর শ্রাদ্ধের পর আর-এক চোট খোঁজাখুঁজি হয়েছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নি।"

চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বললেন, "তার পর?"

পাঁচুমামা বলল, "সেই বাক্স আমি বের করব। কিন্তু আপনার তাতে কী মশাই?"

পাঁচুমামা এইখানে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থাকার ফলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক উঠে গিয়ে সুড়্‌সুড়্‌ করে নিজের জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে

বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবাই ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়ে একেবারে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে দেখা গেল।

আমি আশা করে বসেই আছি পাঁচুমামা লোমহর্ষণ আরো কিছু বলবে, কিন্তু পাঁচুমামা দেখলাম চটিটি খুলে ঘুমোবার জোগাড় করছে। তাই দেখে আমার কেমন অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগল আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক থাকতে না পেরে দাঁত খোঁটা বন্ধ করে জিগগেস করলেন, "একশো বছর ধরে যা এত খোঁজা সত্ত্বেও পাওয়া যায় নি, তাকে যে আবিষ্কার করবেন, কোনো পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ জাতীয় চিহ্ন-টিহ্ন কিছু পেয়েছেন?"

পাঁচুমামা বলল, "ঠিক পাই নি, তবে পেতে কতক্ষণ? পদিপিসীর শেষ কথায় তো মনে হয় যে চোখের সামনেই কোথাও আছে, চোখ ব্যবহার করলেই পাওয়া যাবে। লুকিয়ে রাখবার তো সময়ই পান নি। আর মনে পড়ে যখন হাসি পেয়েছিল তখন নিশ্চয় চোরেও নেয় নি। কিন্তু পাঁচশোবার বলছি মশাই আপনার তাতে কী?" চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সবাই শুয়ে পড়ল আর আমি একা জেগে অন্ধকার রাত্রের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে হাজার-হাজার জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি আর থেকে-থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়ার মধ্যে ছোট-ছোট আগুনের কুচি দেখতে লাগলাম। ক্রমে সে-সব আবছা হয়ে এল, আমার চোখের সামনে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মিবাক্স, লালচে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট হিংস্র এক মাছ প্যাটার্নের ড্রাগন, তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লক্‌লক্‌ করছে। আরো দেখতে পেলাম যেন বাক্সর ঢাকনিটা খোলা হয়েছে আর তার ভিতর পায়রার ডিমের মতন, মোরগের ডিমের মতন, হাঁসের ডিমের মতন, উটপাখির ডিমের মতন সব হীরেমণি আমার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। হঠাৎ ঘচ্‌ করে ট্রেন থেমে গেল।

মামাবাড়ির স্টেশনে পৌঁছলাম গভীর রাতে। স্টেশনের বেড়ার পেছনে কতকগুলো লম্বা-লম্বা শিশুগাছের পাতার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা

ঝোড়ো হাওয়া সির্‌সির্‌ করে বয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানুষ নেই। ছোট্ট স্টেশনবাড়ির কাঠের দরজার কাছে স্টেশনমাস্টার একটা কালো শেড্‌ লাগানো লণ্ঠন নিয়ে হাই তুলছেন। পান খেয়েছেন অজস্র, আর বহুদিন দাড়ি কামান নি। একটা গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, গোরুর গাড়ি দূরে থাকুক, একটা বেড়াল পর্যন্ত কোথাও নেই।

আমি পাঁচুমামার দিকে তাকালাম; পাঁচুমামাও ফ্যাকাশে মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তখন আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, "তুমি যে প্রায়ই বল আমরা এখানকার জমিদার, এরা তোমাদের প্রভুভক্ত প্রজা, এই কি তার নমুনা? আমি তো ভেবেছিলাম আলো জ্বলবে, বাদ্যি বাজবে, মালাচন্দন নিয়ে সব সারে সারে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পর আমরা চতুর্দোলায় চেপে মামাবাড়ি যাব। গিয়ে গরম-গরম—"

পাঁচুমামা এইখানে আমার খুব কাছে ঘেঁষে এসে কানে-কানে বলল, "চোপ্‌ ইডিয়ট্‌! দেখছিস না চার দিক থেকে অন্ধকারের মতন বিপদ ঘনিয়ে আসছে? রক্তলোলুপ নিশাচররা যাদের পিছু নিয়েছে তাদের কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শোভা পায়?"

চমকে উঠে বক্তৃতা থামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা নিবু-নিবু দু-সেলওয়ালা টর্চ জ্বেলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে রাশি-রাশি পোঁটলা-পাঁটলি ছেলেপুলে ও মোটা গিন্নিকে নামাচ্ছেন। তাঁরা নামতে না-নামতেই গাড়িটাও ঘড়্‌ঘড়্‌ করে চলে গেল, আর অন্ধকার লম্বা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। তার মধ্যে শুনতে পেলাম পাঁচুমামা আমার ঘাড়ের কাছে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে নিশ্বাস ফেলছে। এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে কে চ্যাঁচাতে লাগল, "অ পাঁচুদাদা, অ মেজদিমণির খোকা! বলি এয়েচ না আস নি?" পাঁচুমামার যেন ধড়ে প্রাণ এল, খচ্‌মচ্‌ করে ছুটে গিয়ে বলল, "ঘনশ্যাম এলি! আঃ বাঁচালি!"

ঘনশ্যাম কিন্তু পাঁচুমামার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ ভালো লাগে না পাঁচুদাদা। এ দিকে বড় গোরু তো আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছেন। কত টানাটানি করলাম, কত কাকুতি-মিনতি করলাম, কত ল্যাজ মোচড়ালাম। শেষ অবধি গাড়ির বাঁশ

খুলে নিয়ে পেটের নীচে চাড় দিয়ে পর্যন্ত ওঠাতে চেষ্টা করলাম। সে কিন্তু নড়েও না, ঐরকম বসে ঘাস চাবায়।"

পাঁচুমামা বলল, "অ্যাঁ ঘনশ্যাম! তবে কী হবে?"

ঘনশ্যাম বলল, "হবে আবার কী? চল দেখবে চল।"

আমরা সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে কাঁকর-বেছানো প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে ওদিকে ধুলোমাখা রাস্তায় এসে পড়লাম। সেইখানে দেখি রাস্তার ধারে একটা গোরুর গাড়ি। তার একটা গোরু পা গুটিয়ে মাটিতে বসে-বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, অন্য গোরুটা তার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে জাবর কাটছে।

সত্যি-সত্যি সে গোরু কিছুতেই উঠল না। তখন ঘনশ্যাম পাঁচু-মামাকে আর আমাকে জিনিসপত্রসুদ্ধু গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে সেই গোরুটার জায়গায় নিজেই গাড়ি টানতে শুরু করে দিল। গাড়ি অমনি চলতে লাগল।

স্টেশন ছাড়িয়েই ডানহাতে পুরনো গোরস্থান। সেখানটাতে আবার মস্ত-মস্ত ঝুলো-ঝুলো পাতাওয়ালা উইলোগাছ জমাট অন্ধকার করে রয়েছে। সেখানে পেঁছিতেই পাঁচুমামা ফিস্‌ফিস্‌ করে আমাকে ইংরিজিতে বলল, "এখানে সব সিপাই বিদ্রোহের সময়কার কবর আছে।" অমনি ঘনশ্যাম গাড়ি থামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "ইংরিজিতে সব ভূতের গল্প বললে ভালো হবে না পাঁচুদাদা। এইখানেই গাড়ি নামিয়ে চম্পট দেব বলে রাখলাম।"

পাঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে ভূতের গল্প নয় রে ঘনশ্যাম। কবরের কথা বলছিলাম।" ঘনশ্যাম আরো বিরক্ত হয়ে বলল, "ভূতের কথা নয় মানে? কবর আর ভূত কি আলাদা? ইংরিজি জানি না বলে কি তোমাদের চালাকিগুলোও ধরতে পারব না নাকি! না পাঁচুদা, আমার পোষাবে না।" বলেই ঘনশ্যাম গাড়িটা দুম্‌ করে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

এমন সময় খটাখট্‌-খটাখট্‌ শব্দ করে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে উপস্থিত। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম সাদা ফ্যাকাশে মুখ করে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক জ্বল্‌জ্বলে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

পাঁচুমামা তখুনি হাত-পা ছুঁড়ে মূর্ছা গেল।

ঘনশ্যাম বললে, "ইয়াকি ভালো লাগে না পাচুদাদা।" বলে আবার গাড়ি টানতে শুরু করল। পাঁচুমামাও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উঠে বসল। অনেক রাতে মামাবাড়ি পৌঁছলাম। মনে পড়ল পদিপিসীও এমনি দুপুর রাতে রমাকান্তকে নিয়ে নিমাইখুড়োর বাড়ি থেকে ফিরেছিলেন। সত্যি, বমিবাক্সটা গেল কোথায়? পাঁচুমামাকে জিগ্‌গেস করলাম, "হাত থেকে পড়ে-টড়ে যায় নি তো?"

পাঁচুমামা দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে বলল, "স্‌স্‌ চুপ, এটা শত্রুর আস্তানা। বুক থেকে হৃৎপিণ্ড উখড়ে নিলেও পদিপিসীর বমিবাক্সর নাম মুখে আনবি না।"

গাড়িবারান্দার নীচে গোরুর গাড়ি নামিয়ে ঘনশ্যাম সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ঘরের মধ্যে থেকে প্যাঁচা, ফিঙে, নটবর, খেন্তি, পেঁচী, ইত্যাদিরা সব বেরিয়ে এল মজা দেখবার জন্যে। কিন্তু গাড়ি থেকে লটবহর নামাতে কেউ সাহায্যও করল না। পাঁচুমামাও নেমেই কোথায় জানি চলে গেল। শেষ অবধি আমি মনে-মনে ভারি রেগে জিনিসপত্র দুমদাম করে মাটিতে ফেলতে লাগলাম। সেই দুমদাম শুনে দিদিমা বেরিয়ে এসে আমাকে চুমুটুমু খেয়ে একাকার। দিদিমা আমাকে সেজ-দাদামশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

দেখলাম সেজ-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্যি টেরিকাটা চুল নিয়ে ইজিচেয়ারে বালাপোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ভিতর ধ্বক্‌ করে টের পেলাম শত্রু নম্বর ওয়ান! সেজ-দাদামশাইকে প্রণাম করতেই একটু মুচকি হেসে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "হুঁ!"

ভীষণ রাগ হল। রেগে-মেগে দিদিমার সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়ে আমার দাদামশাই যে বড় পিঁড়িতে বসতেন তাতে আসন হয়ে বসে লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ফুলকপির-ডালনা, চিংড়িমাছের মালাইকারি, চালতার অম্বল, রসগোল্লার পায়েস, এক নিশ্বেসে সমস্ত রাশি-রাশি পরিমাণে খেয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ হলে দেখলাম পাঁচুমামাও কোন সময় আমার পাশে বসে খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

দু-একবার তাকালাম। পাঁচুমামার ভাবখানা যেন আমায় চেনেই না। তখন আমার ভারি দুঃখ হল। পাঁচুমামাও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু হাত ধোবার সময় কানের কাছে মুখ এনে

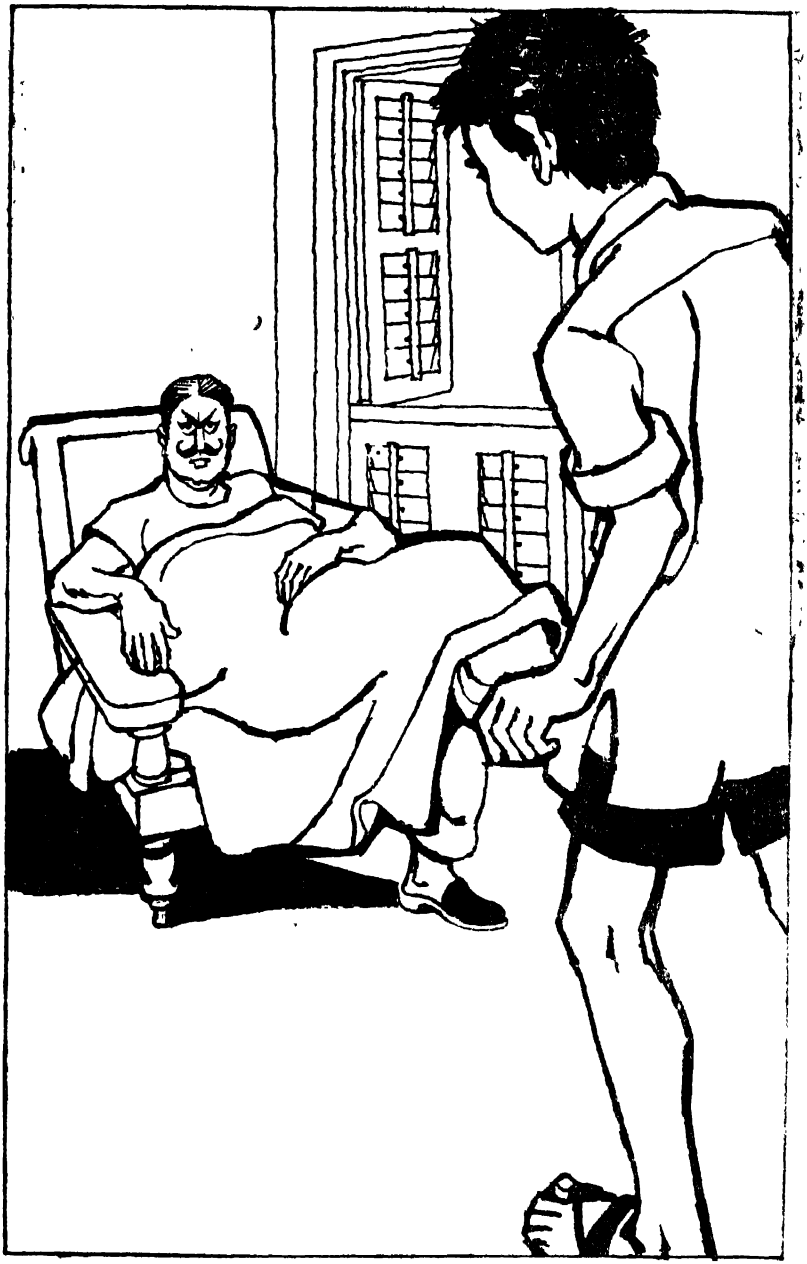

সেজু-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, ইজিচেয়ারে বাঘ'পোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "দুজনে বেশি ভাব দেখালে মতলব ফেঁসে যাবে। ওল্ড লেডি নম্বর ওয়ান স্পাই।" আমি একটু আপত্তি করতে গেলাম, কারণ দিদিমাকে আমার ভালো লাগছিল।

পাঁচুমামা বলল, "চোপ্‌, আমার খুড়ি আমি চিনি না।"

পুরনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, হাতে মোমবাতি নিয়ে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় বিশাল এক শোবার ঘরে শুতে গেলাম। কতরকম কারু-কার্য করা ভীষণ প্রকাণ্ড আর ভীষণ উঁচু এক খাটে শুলাম। সেটা এমনি উঁচু যে সত্যিকারের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাতে উঠলাম। খাটের উপর আবার দু-তিনটে বিশাল-বিশাল পাশবালিশ। আর খাটের নীচে মস্ত-মস্ত কাঁসা-পেতলের কলসি-টলসি কি সব দেখতে পেলাম। দিদিমা একটা রঙচঙে জলচৌকির উপর মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে আমাকে বেশ ভালো করে ঢাকা দিয়ে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ টপ করে ঘুমিয়ে পড় তো মানিক। আমি খেয়ে এসে তোমার পাশে শোব। কাল তোমাকে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর গল্প বলব। একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না তো?" পদিপিসীর নাম শুনে আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। মুখে বললাম, "আলোটা রেখে যাও, তা হলে কিচ্ছু ভয় পাব না।" দিদিমা আদর করে চলে গেলেন। পাঁচুমামা কেন বলল স্পাই নম্বর ওয়ান!

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল দেখি ভোর হয়ে গেছে। দিদিমা কখন উঠে গেছেন। আমিও খচ্‌মচ্‌ করে খাট থেকে নেমে আস্তে-আস্তে গিয়ে ঘরের সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়ালাম। দেখি ফুলবাগান থেকে, আর তার পেছনে আমবাগান থেকে কুয়াশা উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেইজন্যেই হোক, কিংবা আম-গাছতলায় যা দেখলাম সেইজন্যেই হোক, আমার সারা গা সির্‌সির্‌ করে উঠল। দেখলাম ছাইরঙের পেণ্টেলুন আর ছাইরঙের গলাবন্ধ কোট পরে মুখে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাই-না দেখে আমার টনসিল ফুলে কলাগাছ!

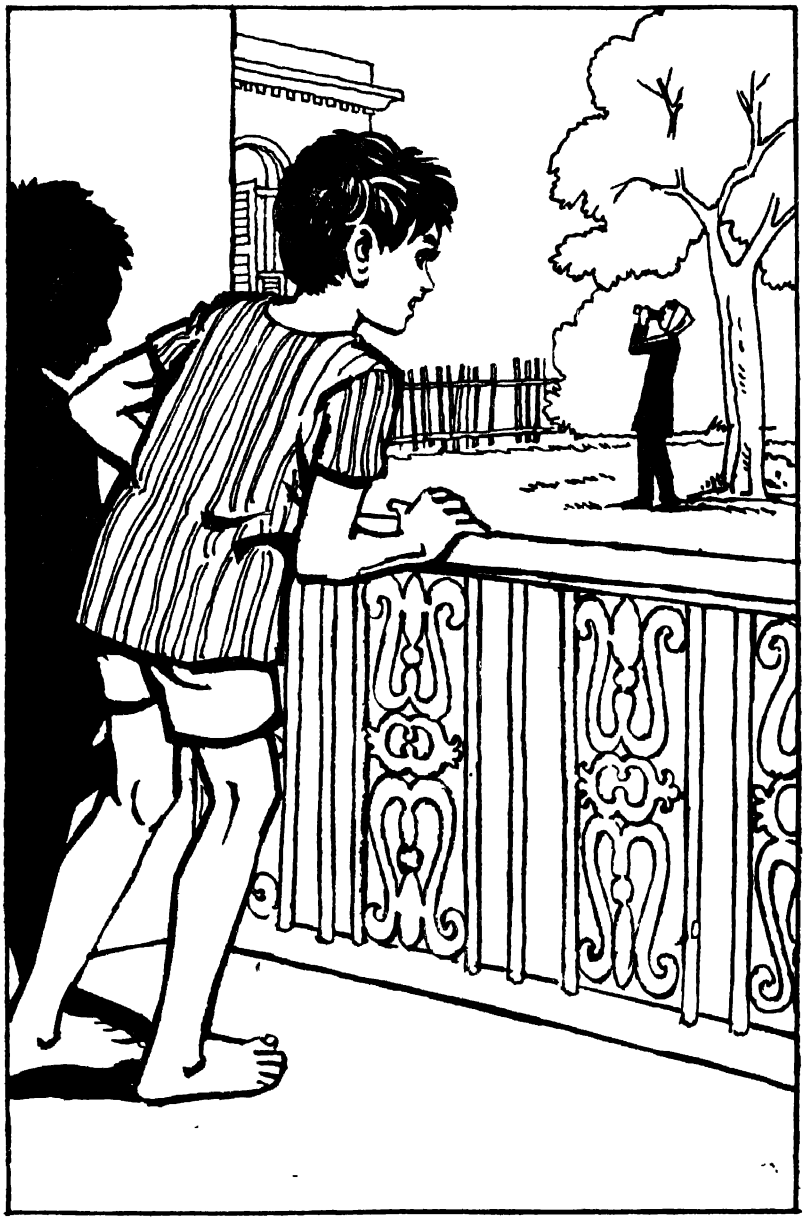

মুখে-মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে বাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছেন।

এমনি সময় সুট্ করে সে আমগাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল আর ভোরবেলাকার প্রথম সূর্যের আলো এসে বাগান ভরে দিল। ফিরে দেখি আমার পাশে লাল নীল ছককাটা লুঙি আর সবুজ কম্বলের ড্রেসিং-গাউন পরে আম-কাঠির দাঁতন চেবাতে-চেবাতে সেজ-দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সেজ-দাদামশাই বললেন, "জানিস, এই বারাণ্ডাটাতে আমার ছোট-কাকা কত কি করিয়েছিলেন! বিলেত থেকে ছোটকাকা ভীষণ সাহেব হয়ে ফিরলেন। ঘাড়-ছাঁট চুল, কোটপ্যাণ্ট পরা, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট, কথায়-কথায় খারাপ কথা। ক্রমেই বললেন, 'আমি মেম আনব, বিলেতে সব ঠিক করে রেখে এসেছি। এই দোতলার উপর শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা এক বাথরুম বানাব, লম্বা বারাণ্ডাটা তো আছেই, তার এক কোণ দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বানাব। সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে ঐ সিঁড়ি বেয়ে জমাদার ওঠানামা করবে। নইলে মেম আসবে না বলেছে।' তাই-না শুনে আমার ঠাকুমা-পিসিমা আর জেঠিমারা হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, 'অমা! সে কি কথা গো! মেমদের যে লাল চুল, কটা চোখ, ফ্যাকশা রঙ আর মড়াখেকো ফিগার হয়। কি যে বলিস তার ঠিক নাই, মেমরা যে ইয়েটিয়ে পর্যন্ত খায় শুনেছি!' ছোটকাকা বিরক্তমুখ করে বললেন, 'অবিশ্যি তোমরা যদি চাও যে আমি সন্নিসী হই, তা হলে আমার আর কিছুই বলবার নেই। বল তো নাগা সন্নিসীই হই, মেমেও দরকার নেই, নতুন স্যুটগুলোতেও দরকার নেই!' তাই শুনে ঠাকুমারা সবাই আরো চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কিন্তু ভয়ে ঠাকুর্দার কানে কেউই কথাটা তুললে না। ছোট-কাকাও সেই সুযোগে মিস্ত্রি লাগিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফেললেন। ঐখানে রেলিং কেটে সিঁড়ি বসানো হয়েছিল। দোতলা থেকে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি একটা ছিলই, বাঁদর তাড়াবার জন্যে, তারই ঠিক নীচে দিয়ে নতুন সিঁড়ি হল। এখন খালি বাথরুম বানানো আর জমাদারের পাগড়ি কেনা বাকি রইল। ঠাকুর্দার কাছে কী ধরনের মিথ্যে কথা বলে টাকা বাগানো যায় দিনরাত ছোটকাকা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন। এদিকে পাড়ার চোররাও সুবিধে পেয়ে রোজ রাত্রে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে শুরু করে দিল! তাদের জ্বালায় ঘুমোয় কার সাধ্যি! শেষটা একদিন ঠাকুর্দার ঘুম

ভেঙে গেল, গদা হাতে করে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন, চোররাও সিঁড়ি দিয়ে ধপ্‌ধপ্‌ নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। চাঁদের আলোয় ঠাকুর্দা অবাক হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর আস্তে-আস্তে আবার শুতে গেলেন। পরদিন সকালে উঠেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ঐ সিঁড়ি খুলিয়ে ফেললেন। রাগের চোটে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়িটা অবধি খুলিয়ে দিলেন। কাটা রেলিং ফের জোড়া দেওয়ালেন। আর ছোটকাকাকে ডেকে বললেন, 'পানুর ছোটমেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। টোপর পরে প্রস্তুত হও।' শেষটা ঐ পানুর ফর্সা মোটা গোলচোখো বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ছোটকাকার বিয়ে হয়ে গেল। এবং বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তারা সারাজীবন পরম সুখে কাটাল। পাঁচুটা তো ওঁরই নাতি। এই রে, ঘনশ্যাম আবার আমার ঈশপগুল নিয়ে আসছে। বলিস যে আমি বেরিয়ে গেছি।" বলেই সেজ-দাদামশাই হাওয়া।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ছাদ পর্যন্ত বাঁদর তাড়াবার সিঁড়ির খাঁজগুলো দেওয়ালের গায়ে কাটা-কাটা তখনো রয়েছে।

সব পুরনো বাড়ির মতন মামাবাড়ির ঘরগুলো বিশাল-বিশাল, সিঁড়িগুলো মস্ত-মস্ত, বারাণ্ডাগুলোর এ মাথা থেকে ডাকলে ও মাথা থেকে শোনা যায় না। আর দুপুরে সমস্ত বাড়িখানা অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গেল। পাঁচুমামার টিকিটি সকাল থেকে দেখা যায় নি। নেহাত আমার সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছিল, নইলে ও যে জন্মেছে তারই কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাড়িসুদ্ধু কেউ ওর নাম করল না। দুপুরে পদিপিসীর বর্মিবাক্সর সন্ধান নিচ্ছি এমন সময় কানে এল খুব একটা হাসি-গল্পের আওয়াজ।

রান্নাঘরে আনন্দ কোলাহল। এমন কথা তো জন্মে শুনি নি। অবাক হয়ে এগিয়ে-বাগিয়ে চললাম। বারাণ্ডার বাঁকে ঘুরেই দেখি চাকর-বাকররা বিষম ঘটা করে অতিথি-সৎকার করছে। কে একটা রোগা লোক ঠ্যাং ছড়িয়ে বামুনঠাকুরের উঁচু জলচৌকিতে বসে রয়েছে। চার দিকে পানবিড়ি আর কাঁচি সিগারেটের ছড়াছড়ি। বামুনদিদি পর্যন্ত ঘোমটার মধ্যে বিড়ি টানছে। ঘনশ্যামট্যাম সবাই উপস্থিত আছে, পান খেয়ে-খেয়ে সব চেহারা বদলে ফেলেছে।

আমার পায়ের শব্দ পেয়েই নিমেষের মধ্যে রান্নাঘর ভোঁভাঁ, কে যে

কোথায় চম্পট দিল ঠাওরই করতে পারলাম না। চোখের পাতা না ফেলতেই দেখি কেউ কোথাও নেই, খালি বামুনদিদি ঘোমটার ভিতরে হাই তুলছে এবং বিড়িটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত গোপন করে ফেলেছে! কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখ এড়াতে পারে নি। ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিমড়ে ভদ্রলোক। ভাবতে-ভাবতে গা শিউরে উঠল! এতদূর সাহস যে ভোরবেলা দুরবীন দিয়ে পরখ করে নিয়ে দুপুর না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁদিয়েছে! চুলগুলো আমার সজারুর কাঁটার মতন উঠে দাঁড়াল। বামুনদিদিকে জিগ্‌গেস করলাম, "কে লোকটা?" বামুনদিদি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"কোন লোকটা খোকাবাবু? তুমি-আমি ছাড়া আর তো লোক দেখছি না কোথাও!" বলেই সে সরে বসল, অমনি তার কোলের মধ্যে কতকগুলো রুপোর টাকা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। বুঝলাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করেছে! কি ভীষণ!

এদিকে পাঁচুমামার সঙ্গে পরামর্শ করব কি! সে যে সকাল থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার আর কোনো পাত্তাই নেই! একবার কি একটা গুজব শুনেছিলাম নাকি ভুলে বেশি জোলাপ খেয়ে ফেলেছে। তবুও তখুনি তার খোঁজে বেরুলাম। চার-পাঁচটা ভুল দরজা খুলে চার-পাঁচবার তাড়া খাবার পর দেখি পুবদিকের ছোট ঘরে তক্তপোশের ওপর শুয়ে-শুয়ে পাংশুপানা মুখ করে পাঁচুমামা পেটে হাত বুলচ্ছে। আমাকে দেখেই বিষম বিরক্ত হয়ে নাঁকিসুরে বলল, "কেন আঁবার বিরক্ত কঁরতে এঁসেছ। যাঁও না এঁখান থেঁকে।" আমি বললাম, "চার দিকে যেরকম ষড়যন্ত্র চলেছে এখন আর তোমার আরাম করে শুয়ে-শুয়ে পেটে হাত বুলনো শোভা পায় না! এদিকে শত্রু এসে ঢুকেছে সে খবর রাখ কি?" পাঁচুমামা কোথায় আমাকে হেল্প করবে, না তাই-না, শুনে এমনি ক্যাঁও-ম্যাঁও শুরু করে দিল যে আমি সেখান থেকে যেতে বাধ্য হলাম!

সারাদিন ভেবে-ভেবেও একটা কূলকিনারা করতে পারলাম না। রাত্রে দিদিমা পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলতে-বুলতে বললেন, "বলেছিলাম তোকে পদিপিসীর বমিবাক্সের গল্প বলব, তবে শোন।"

দিদিমা সবুজ বালাপোশ ভালো করে জড়িয়ে গালের পান দাঁতের

পেছনে ঠুসে গল্প বলবার জন্যে রেডি হলেন। আর আমার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। দিদিমা বলতে লাগলেন, "পদিপিসীর ইয়া ছাতি ছিল, ইয়া পাঞ্জা ছিল। রোজ সকালে উঠে আধ সের দুধের সঙ্গে এক পোয়া ছোলা ভিজে খেতেন। কি তেজ ছিল তাঁর। সত্যি মিথ্যে জানি না, শুনেছি একবার একটা শামলা গোরু হাম্বা-হাম্বা ডেকে ওঁর দুপুরের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিল বলে উনি একবার তার দিকে এমনি করে তাকালেন যে সে তিনদিন ধরে দুধের বদলে দই দিতে লাগল। পদিপিসী একবার শীতকালে গোরুর গাড়ি চেপে কাউকে কিছু না-বলে রমাকান্ত নামে একটিমাত্র সঙ্গী নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন ফিরে এলেন দুপুর-রাত্রে। এসেই মহা হৈ-চৈ লাগালেন কি একটা নাকি বমিবাক্স হারিয়েছে। সবাই মিলে নাকি দেড়বছর ধরে ঐ বাক্স খুঁজেছিল। কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ চোখে দেখে নি সে বাক্স। শেষপর্যন্ত সে পাওয়াই গেল না!" আমি নিশ্বেস বন্ধ করে বললাম, "তাতে কী ছিল?"

দিদিমা বললেন, "কে জানে! মসলা-টসলা হবে। ঐ পদিপিসীর একটিমাত্র ছেলে ছিল, তার নাম ছিল গজা। কালো রোগা ডিগ্‌ডিগে, এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া তেল-চুকচুকে চুলে টেরি বাগানো। দিন-রাত কেবল পান খাচ্ছে আর তামাক টানছে। পড়াশুনো কি কোনো-রকম কাজকর্মের নামটি নেই। সারাদিন গোলাপি গেঞ্জি আর আদ্দির ঝুলো পাঞ্জাবি পরে পাড়াময় টোটো কোম্পানি। সখের থিয়েটার, এখানে-ওখানে আড্‌ডা। অথচ কারু কিছু বলবার জো নেই, পদিপিসী তা হলে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

"জানিস তো ভালো লোকের কখনো ভালো হয় না। যত সব জগতের বদমায়েস আছে সবাই সুখে জীবন কাটিয়ে যায়। গজারও তাই হল। যখন আরো বড় হল, গাঁজা গুলি খেতে শিখল, জুয়োর আড্‌ডায় গিয়ে জুটল। মাঝে-মাঝে একমাস-দুমাস দেখা নেই। আবার একগাল পান নিয়ে হাসতে-হাসতে ফিরে আসে। পদিপিসী যেখান থেকে যেমন করে পারেন টাকা জোগান। পাজি ছেলেকে পায় কে!

"হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে। কথায়-কথায় বাড়িসুদ্ধু সবাইকে পাঁঠার মাংস খাওয়ায়, ঝুড়ি-ঝুড়ি সন্দেশ আনে। একবার

সমস্ত চাকরদের গরম বেনিয়ান কিনে দিল। ঘোড়ার গাড়ি কিনল, হীরের আংটি কিনল। বাড়িসুদ্ধু সবাই থরহরি কম্পমান! কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায়! পদিপিসী অবধি চিন্তিত হলেন। অথচ চুরি-ডাকাতি করলে তো এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিত! টাকা ভালো, কিন্তু পায় কোথা?"

গজার উপাখ্যান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাই নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুনতে পেলাম পাহাড়ে-পাশবালিশটার আড়ালে দিদিমা আস্তে-আস্তে নাক ডাকাচ্ছেন! আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। তার পর শুনলাম দূরে হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে, আর মাথার উপর পুরনো কাঠের কড়িগুলো মট্‌মট্‌ করে মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম এ-সবের জন্যে ঘুম ভেঙে যায় নি। যার জন্যে ঘুম ভেঙেছে সে নিশ্চয় আরো লোমহর্ষক। শুয়ে-শুয়ে যখন শুয়ে থাকা অসহ্য হল, পা সির্‌সির্‌ করতে লাগল, আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জল না খেয়ে আর এক মিনিটও থাকা অসম্ভব হল, আস্তে-আস্তে খাট থেকে নামলাম। আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বাইরে প্যাসেজে দাঁড়ালাম। ঐ একটু দূরে সারি সারি তিনটে কলসিভরা জল রয়েছে, কিন্তু মাঝখানের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারটুকু পেরোতে ইচ্ছা করছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ পায়ের গুলিটা চুলকোচ্ছি আর মন ঠিক করছি এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

কি আর বলব! হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। যেদিকে শব্দ সেদিকে সেজ-দাদামশাইয়ের ঘর। কল্পনা করতে লাগলাম দাঁত দিয়ে ছোরা কামড়ে ধরে হাত দিয়ে সিঁদ কাটতে-কাটতে, কানে মাকড়িপরা, লাল নেংটি, গায়ে তেল-চুকচুকে সব চোর-ডাকাতেরা সেজ-দাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে ওঁর হাতবাক্স সরাচ্ছে, রুপোর গড়গড়া নিচ্ছে, মখমলের চটি পায়ে দিচ্ছে!

এমন সময় ঠুস্‌ করে সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল আর বিড়ি ধরাতে-ধরাতে যে বেরিয়ে এল বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিনলাম সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক—বগলে জুতো নিয়ে পা টিপে-টিপে এগুচ্ছে।

আমার তো আর তখন নড়বার-চড়বার ক্ষমতা ছিল না তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। লোকটা কিন্তু কি-একটা পেরেকে না কিসে হোঁচট খেয়ে 'দুর শালা!' বলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। একটু বাদেই নীচের তলায় একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম।

এতক্ষণে আমার চলবার শক্তি ফিরে এল, ভাবলাম জল খেয়ে কাজ নেই। ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক। একবার বেরুল চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক, এর পরে হয়তো বেরুবে দামড়া ডাকাত। ফিরতে যাব এমন সময় একটা সাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে সবেমাত্র পকেটে পুরেছি এমন সময় আবার সেজ-দাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেল এবং এবার স্বয়ং সেজ-দাদামশাই বেরিয়ে এসে টর্চ হাতে নিয়ে আঁতিপাতি করে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। আমি তো এদিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। ধরে ফেললে কী যে হবে ভাবা যায় না। এমন সময় সেই একই পেরেকে না কিসে হোঁচট খেয়ে সেজ-দাদামশাইও হাত-পা ছুঁড়ে কত কি যে বললেন তার ঠিক নেই। ভালোই হল, আমাকে দেখবার আগেই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘরে ফিরে গিয়ে বোধ হয় কিছু লাগালেন-টাগালেন।

আমি যে কি ভাবব ঠাওর করতে না-পেরে খানিকটা জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। পকেটে কাগজটা কর্‌কর্‌ করতে লাগল, কিন্তু দিদিমা আলো নিভিয়ে দিয়েছেন, পড়বার উপায় নেই। রঙ-চঙে চৌকির উপর রোজকার মতন আজও দেশলাই মোমবাতি রাখা ছিল, কিন্তু সব জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে আর জ্বাললাম না। সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা করতে-করতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম পদিপিসী এসে পেছনের বারান্ডার দরজা থেকে আমাকে ডাকছেন। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, থান পরা, ছোট করে চুল ছাঁটা, কপালে চন্দন লাগানো—অবিকল পাঁচুমামা যেমন বলেছিল। এক হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে ডাকছেন, আর অন্য হাতটা পেছনে রেখেছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, "বাক্স পেয়েছিস?" আমি বললাম, "কই না তো! নিমেষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে

একবছর ধরে খুঁজে-খুঁজেও পাওয়া যায় নি, আমার আশা আছে যে আমি দুদিনেই খুঁজে দেব ? কোথায় রেখেছিলে ?"

পদিপিসী বললেন, "ভালো করে খুঁজে দেখ। পেলে তুইই নিস। পাঁচুটা একটা ইডিয়ট, জোলাপের পর্যন্ত ডোজ ঠিক করতে পারে না, তুইই নিস। বাক্সের মধ্যে লাল চুনীর কানের দুল আছে, তোর মাকে দিস। আর দেখ, ঐ ব্যাটা চিম্‌ড়েটাকে আর ঐ বুড়োটাকে একেবারে কাইণ্ড অফ বোকা বানিয়ে দিস। বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনো অভাব নেই, জুড়িগাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে, গাঁজার ব্যবসা করেছে। আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠদের কী গতি হবে ?" বলে আমাকে চুমু খেয়ে পদিপিসী ছোটকাকার তৈরি সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চললেন, এবং পেছন ফিরতেই দেখলাম যে হাতটা পেছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত এক গদা।

গদা দেখে এমন চমকে গেলাম যে ঘুমই ভেঙে গেল। দেখলাম সকালবেলার রোদ পেছন দিকের বারাণ্ডা দিয়ে ঘরে এসে বিছানা ভরে দিয়েছে। কাটা সিঁড়ির দাগটা চকচক করছে। হঠাৎ কেন জানি মনে হল সিঁড়িটা একটা ভারি ইম্‌পরট্যাণ্ট জিনিস।

এই তো সুবর্ণ সুযোগ সেই গোপন চিঠি পড়বার। পকেট থেকে বের করে দেখলাম লাল কালিতে লেখা—শ্রীযুতবাবু বিপিন বিহারী চৌধুরীর কাছ হইতে ২০০্ পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা।

পুঃ সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।

অবাক হয়ে ভাবছি সেজ-দাদামশাই কী উদ্দেশ্যে চিম্‌ড়েকে টাকা দিলেন, কী অনুসন্ধান ? এ বিষম সন্দেহজনক ! এমন সময় দরজা খুলে পাঁচুমামা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকেই দুম্ করে দরজা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়ালমাছের মতন হাঁপাতে লাগল। মুখটা দেখলাম আগের চাইতেও সাদা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে বললাম, "কী হয়েছে পাঁচুমামা ? আবার জোলাপ খেয়েছ ?"

পাঁচুমামা শুকনো ঠোঁট আরো শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা করে বলল, "খেন্তিপিসী এসেছে।"

আমি বললাম, "খেন্তিপিসীটা আবার কে ?"

পাঁচুমামা আমসি হেন মুখটি করে বলল, "পদিপিসী দি সেকেন্ড !"

চিঠিটা পাঁচুমামার নাকের সামনে নেড়ে বললাম, "ও-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না মামা ! স্বয়ং সেজ-দাদামশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন, এই দেখ তার প্রমাণ !" পাঁচুমামা চোখ গোল-গোল করে চিঠিটা সবে পড়তে যাবে এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দরজা গেল খুলে, আর সত্যি বলছি, অবিকল আমার সেই স্বপ্নে দেখা পদিপিসীর মতন কে একজন তোলোহাঁড়ির মতন মুখ করে ভিতরে এলেন। বুঝলাম, ঐ খেন্তিপিসী। পাঁচুমামা দরজার ঠেলা খেয়ে ছিট্‌কে আমার খাটের উপর পড়েছিল, সেখান থেকে সরু গলায় চেঁচিয়ে বলল, "কী করতে পার আমার তুমি ? এমন কোনো স্ত্রীলোক জন্মায় নি যাকে আমি ভয় পাই ! জানো আমার বুকের মধ্যে সিংহ—" এইটুকু বলতেই খেন্তিপিসী কোমরে কাপড় জড়িয়ে খাটের দিকে একপা এগুলেন আর পাঁচুমামাও অন্যদিক দিয়ে টুপ্ করে নেমে খাটের তলায় অগুনতি হাঁড়ি-কলসির মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

খেন্তিপিসী তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন, আমার হাত এমনি কাঁপতে লাগল যে চিঠিটা খড়্‌মড়্ খড়্‌মড়্ করে উঠল। তাই শুনে খেন্তিপিসী এমনি চমকালেন যেন বন্দুকের গুলি শুনেছেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কথা বলবার আগেই সেজ-দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। খেন্তিপিসীকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আ খেন্তি, তুই আবার এখানে কেন ?"

খেন্তিপিসী চায়না ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের চোখ দুটো আমার ওপর থেকে সরিয়ে বরফের মতন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কেন, তোমার কি তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে ? পুজোর সময় একটা কাঁচকলাও দিলে না, আমার ভজাকে যে কাপড় দিলে সেও অতি খেলো সস্তা রাবিশ। বাপের বাড়ি থেকে কলাটা-মুলোটা দূরে থাকুক কচুটারও মুখ দেখি না। তাই বলে বৌদির ঘরের কোনায়ও একটু জায়গা হবে না ?"

পাঁচুমামা এখানে দুটো হাঁড়ির মাঝখান দিয়ে মুণ্ডু বের করে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলল, "জায়গা হবে কি না হবে তাতে তো তোমার ভারি বয়ে

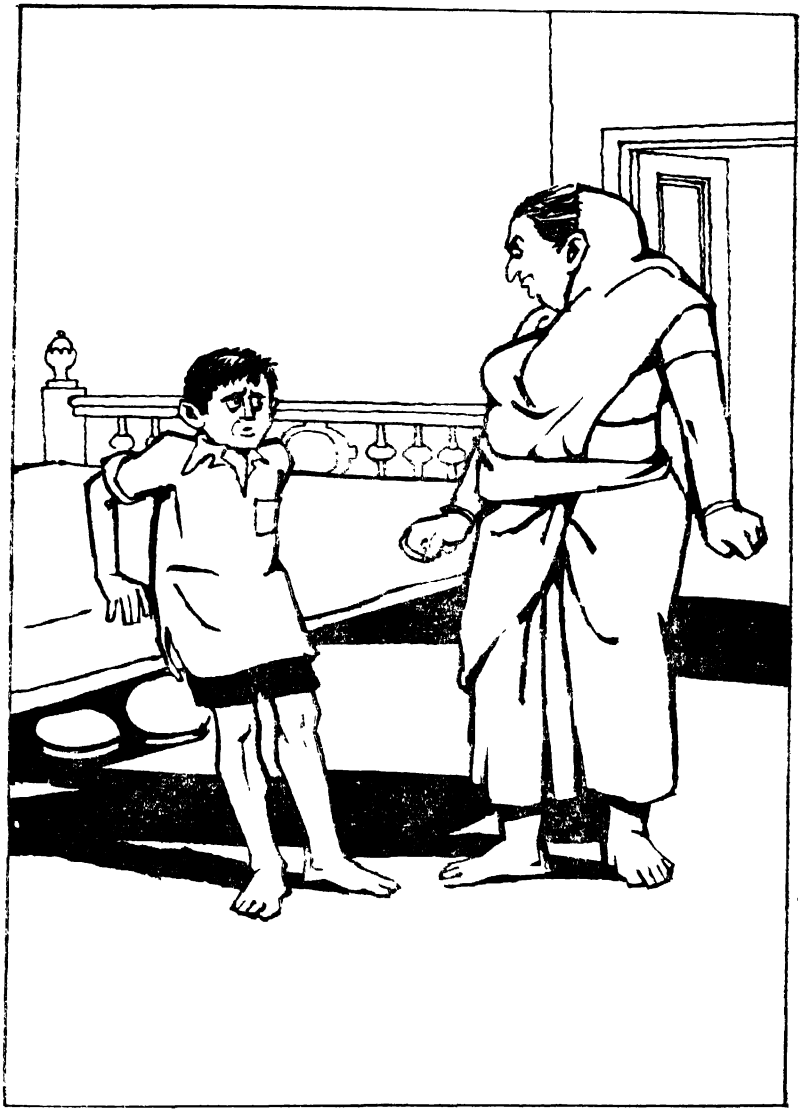

খেন্তিপিসী আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন।

গেল! এই ভরসকালে আমার ঘরেই-বা তোমার কত জায়গা—" বলেই কচ্ছপের মুণ্ডুর মতন সুট্ করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল!

সেজ-দাদামশাই এবার গলা পরিষ্কার করে পাঁচুমামাকে তাড়া দিয়ে বললেন, "এই পাঁচু হতভাগা, বেরিয়ে আয় বলছি। আমার একটা ইম্পরট্যাণ্ট কাগজ হারিয়েছে, খুঁজে দে বলছি, নইলে ভালো হবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে খেন্তিপিসীও বললেন, "বেরো এক্খুনি। তুইই নিশ্চয় আমার স্যুটকেশ থেকে বাড়ির নক্শাটা সরিয়েছিস। বেরো বলছি। তোকে আমি সার্চ করবই করব। না বেরোলে ঐ খাটের তলায় সেঁদিয়েই সার্চ করব। আমি জানি না তোদের সব চালাকি! পদিপিসীর বাক্সর জন্যে তোরাও ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিস! অথচ বাক্সতে আর কারো অধিকার নেই। ওটা স্ত্রীধন, ওটা আমি পাব!" সেজ-দাদামশাই রেগে বললেন, "তুই পাবি মানে? তোর ভজার পেটে যাবে বল! আমি আইন পাস করেছি, তা জানিস? কেউ যদি পায় তো আমি পাব। জানিস আমি দুশো টাকা খরচ করে ডিটেকটিভ লাগিয়েছি। ও বাক্স আমি বের করবই!"

এইবার দরজার কাছ থেকে একটা নরম কাশির শব্দ শোনা গেল। দেখলাম চিম্ড়ে ভদ্রলোক সেখানে কালো আলস্টার পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন। বিড়িটা এবার বের করে বললেন, "মনে থাকে যেন তিনভাগের একভাগ আমার! যদি বাক্স পান আমার অদ্ভুত বুদ্ধির সাহায্যেই পাবেন।"

খেন্তিপিসী হঠাৎ আবিষ্কার করলেন খাটের তলা থেকে পাঁচু-মামার ঠ্যাং দুটো অসাবধানতাবশত একটুখানি বেরিয়ে রয়েছে। আর যায় কোথা, নিমেষের মধ্যে হিড়্হিড়্ করে টেনে পাঁচুমামাকে বের করে এনে দুই থাপ্পড় লাগালেন, তার পর বুকপকেট থেকে একটা মোটামতন কাগজ টেনে বের করে বললেন, "তবে না নক্শা নিস নি!"

তার পর কাগজটা খুলে বললেন, "ইস্, দেখেছ সেজদা, ব্যাটাছেলে সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছে!"

সেজ-দাদামশাইও অমনি বললেন, "কই দেখি-দেখি!"

চিম্ড়ে ভদ্রলোকও এগিয়ে বললেন, "মানুষ হওয়াই একরকম অসম্ভব!"

পাঁচুমামা তখন একদৌড়ে আবার খাটের তলায় ঢুকল এবং এবার

পা গুটিয়ে সাবধানে বসে বলল, "আমার কলেজের পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে তোমাদের কী দরকার শুনি? বিশেষত খেন্তিপিসীর মতন একজন আকাট মুখ্যু স্ত্রীলোকের! নক্‌শা হারিয়েছে! দরকারি কাগজ হারিয়েছে! তাই আমার ওপর হামলা! আর ঐ ইজের-পরা ছোকরার হাতে যে কাগজটা আছে সেটা কী?"

পাঁচুমামার কাছে আমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা আশা করি নি! কিন্তু তখন দেখলাম আপত্তি-টাপত্তি করবার সময় নেই। দেখলাম খেন্তিপিসী, সেজ-দাদামশাই আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক নিজেদের ঝগড়া ভুলে, পাঁচুমামার সংস্কৃতের নম্বর ভুলে, গোল হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন! শুনতে পেলাম ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে ওঁদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে! বুঝলাম বিপদ সন্নিকট!

হঠাৎ 'ও দিদিমা' বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমার পেছনের দরজা দিয়ে বারাণ্ডায় উপস্থিত হলাম। বুঝলাম দেয়ালে সিঁড়ির খাঁজকাটার কাজ শেষ হয় নি! নিমেষের মধ্যে খাঁজের মধ্যে মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুঁজে গুঁজে একেবারে ছাদে উপস্থিত হলাম। এবার আমি নিরাপদ, যদিও আমি এখন অবধি চা পাই নি তবু নিরাপদ! আমি ছাদে শুয়ে খুব খানিকটা হাপরের মতন হাঁপিয়ে নিলাম। আমি জানি ওদের কারু সাধ্য নেই ওপরে ওঠে!

আস্তে-আস্তে রোদ এসে ছাদটাকে ভরে দিল। আমার পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইতে লাগল। দেখলাম ছাদে রাশি-রাশি শুকনো পাতা জমেছে কত বছর ধরে কে বা জানে। শুনলাম কত-কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বকবকম করছে। দেখলাম বাড়ির সামনের দিকে গম্বুজের মতন করা, তাতে খোপ খোপ আছে, পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া-আসা করছে। চার দিক একটা পায়রা-পায়রা গন্ধ! খিদে যে পায় নি তা নয়। তবু যেই মনে হল নীচে সব ওৎ পেতে বসে আছে, নেমেছি কি কপাং করে ধরবে, অমনি আর আমার নামবার ইচ্ছে রইল না। দরকার হলে ছাদে শুধু দিনটা কেন, রাতটাও কাটাব স্থির করলাম।

কিছু করবার নেই, কিছু দেখবার নেই। চার দিকে পাঁচিল, ওপরে

আকাশ আর কশো পায়রা কে জানে! শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা নানান সুরে কখনো রেগে চেঁচিয়ে, কখনো নরম সুরে ফুসলিয়ে আমাকে ডাকছে।

আমি সে ডাকের কাছ থেকে যতদূরে পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন পায়রাদের রাজ্যে এসেছি। খোপের ভেতর থেকে দেখলাম কচিকচি লালমুখোরা আমাকে অবাক হয়ে দেখছে, আর তাদের মায়েরা চ্যাঁ-চ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। সারি সারি খোপে শত-শত পায়রার বাসা। চার দিকে পায়রার পালক, পায়ের নীচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সব খোপে পায়রার বাসা, কেবল এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া!

তখন আমার গায়ের লোমগুলি খড়্‌খড়্‌ করে একটার পর একটা উঠে দাঁড়াল আর পা দুটো তুলতুলে মাখনের মতন হয়ে গেল, কানের মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম শোঁ-শাঁ করে সমুদ্রের শব্দ। যে আমি কোনোদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশি পেলাম না, সেই আমি কি তবে আজকে একশো বছর ধরে কেউ যা পায় নি সেই খুঁজে পাব?

খট্‌ করে হাঁটু দুটো ফের শক্ত হয়ে গেল আর আমি তর্‌তর্‌ করে গম্বুজের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চার দিকটা গোলপানা বটে কিন্তু মাঝখানটা ফোঁপরা, কেমন একটু ভিজে ভিজে গন্ধ, আর ভিতরের দেয়াল কেটে লেখা খোঁচাখোঁচা হরফে—

"ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়।"

ধপাস্‌ করে লাফিয়ে পড়লাম ওর ভেতরে। দেখলাম গম্বুজের গায়ে কুলুঙ্গির মতন ছোট তাক করা আছে, বোধ হয় তারই বাইরের দিকটাতে যে খোপ আছে তাতেই জায়গার অভাবে পায়রা বাসা করে নি। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

মাটিতে বসে দুহাত দিয়ে কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে মাঝারি সাইজের একটা বাক্স নামালাম। কি আর বলব! তার রঙ একটুও চটে নি, একেবারে চকচক করছে, আর ঢাকনার উপর আঁকা ড্রাগনের সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কোলের উপর সেই বাক্স রেখে তার ঢাকনা খুলে ফেললাম। উপরে খানিকটা ছেঁড়ামতন হলদে হাতে-তৈরি কাগজ, মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা করে সুতো চালিয়ে কাগজগুলো একসঙ্গে আটকানো, যাকে বলে

বাক্সটা খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

পুঁথি। তার একপৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা, অন্যপৃষ্ঠায় খোঁচা-খোঁচা হরফে গজা কি সব লিখেছে।

সেই পুঁথিও নামালাম। নামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সের মধ্যে আট-দশটা সাদা লাল নীল সবুজ পাথর বসানো আংটি, হার, বালা আর একজোড়া জ্বল্‌জ্বলে লাল চুনী বসানো কানের দুল। বুঝলাম স্বপ্নে পদিপিসী এইটাই আমার মাকে দিতে বলেছিলেন। তাই সেটা তখুনি পকেটে পুরলাম।

তার পর পুঁথিটা খুলে, কি আর বলব, দেখলাম যে শ্রীগজার লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয়। বুঝলাম পুঁথিটা সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দেওয়া দরকার, বাক্সটা দিদিমাকে দেব, যেমন খুশি ভাগ করে দেবেন। তখন আমি ওদের ক্ষমা করলাম। আমাকে গোল হয়ে মিছিমিছি আক্রমণ করার জন্য ওদের ওপর একটুও রাগ রইল না।

বাক্সটা নিয়ে সে যে কত কষ্ট করে দেয়াল বেয়ে গম্বুজের মাথায় উঠলাম, আবার দেয়াল বেয়ে বাইরের দেয়াল দিয়ে নামলাম সে আর কি বলব! তার পর বাঁদর-তাড়ানো সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে নামাটাও প্রায় অমানুষিক কাজ। নেমে দেখি ওরা সবাই চক্রাকারে তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, কিন্তু আমার হাতে ধরা একশো বছর আগে হারানো পদিপিসীর বমিবাক্স দেখে সবাই নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি কাউকে কিছু না-বলে দিদিমার হাতে বাক্স দিলাম, আর ঢাকনির তলাটা থেকে হলদে পুঁথি বের করে সেজ-দাদামশায়ের হাতে দিলাম। সেজ-দাদামশাই অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে ওলটাতে লাগলেন। আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও অভ্যাসমতন নিঃশব্দে এগিয়ে ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেজ-দাদামশাই খুব লম্বা আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক খুব বেঁটে হওয়াতে বিশেষ সুবিধে হল না।

হঠাৎ সেজ-দাদামশাই বিষম চমকে উঠে বললেন, "আরে, এ যে বাবার পদিপিসীর ছোটোবোন মণিপিসীর বিয়ের আসন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই পুঁথি! এ কোথায় পেলি! আরে, এ হারানোর ফলেই তো পুরুতঠাকুর ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়েছিলেন, আর তার ফলেই বাবার মণিপিসী আর পিসেমশাই সারাটা জীবন ঝগড়া করে কাটিয়েছিলেন।"

তার পর পাতা ওলটাতেই গজার হাতের লেখা চোখে পড়াতে আরো বিষম চমকে গিয়ে বললেন, "শোনো-শোনো, পদিপিসীর ছেলে শ্রীগজা কী লিখেছে শোনো। আরে, এটা যে একটা ডায়েরির মতন শোনাচ্ছে, না আছে তারিখ, না আছে বানানের কোনো নিয়মকানুন। ব্যাটা সাক্ষাৎ মাসির বিয়ের জায়গা থেকে বিয়ের মন্ত্রের পুঁথি চুরি করে তাতে কী লিখেছে দেখ।

"সোমবার ॥ সর্বনাশ হইয়াছে। মাতাঠাকুরানীর গোরুর গাড়ি উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়া আমার হাতে বমিবাক্স গুঁজিয়া দিয়া মাতাঠাকুরানী সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ও অভ্যাসমতন বাড়িসুদ্ধ সকলকে তাড়নপীড়ন করিতেছেন।

"মঙ্গলবার ॥ আর পারা যায় না। বাক্স আমি কিছুতেই কাহাকে দেব না, স্থির করিয়াছি; অথবা ইহারা যেরূপ খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছে, বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা ছাড়া কোনো উপায় নাই। বগলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

"শুক্রবার ॥ সৌভাগ্যবশতঃ তাড়িওয়ালার বাড়িতে বাক্স লুকাইবার সুবিধা পাইয়াছি। খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইলে বাড়ি আনিব।

"সোমবার ॥ তাড়িওয়ালার সহিত পরামর্শ করিয়া গাঁজার ব্যবসা শুরু করিয়াছি। বিষম লাভ হইতেছে। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরিও করিতে হয়।

"শনিবার ॥ জিনিসপত্র বহু কিনিয়াছি, বহু দানও করিয়াছি। ইহারা জিনিস লয় অথচ আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাই মনে করিয়াছি শহরে বাড়ি কিনিব।

"রবিবার ॥ ঘটনাক্রমে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। এখানেই আমার এই লিপি ও বাকি গুটিকতক অলংকার রাখিলাম। ইহাদের বিবাহাদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবেক। ইতি শ্রীগজা।"

সেজ-দাদামশায় হতাশ গলায় বললেন, "তার পরই বোধ হয় ঠাকুর্দা বাঁদরের সিঁড়ি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, গজার আর কাউকে গয়না উপহার দেয়া হয় নি। শেষে তো সে কলকাতাতেই থাকত শুনেছি। পদিপিসীর ফিক করে হাসারও কারণ বোঝা গেল। তাঁর মতে গজার থেকে বাক্স পাবার যোগ্য পাত্র আর কেই-বা ছিল!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খেন্তিপিসী বললেন, "বাক্সে কী আছে ?"

দিদিমা ঢাকনি খুলে দেখলেন। বললেন, "আমি ভাগ করে দিচ্ছি। খেন্তি, যদিও তুই আমার কাছ থেকে সেবার তিনশো টাকা ধার নিয়ে শোধ দিস নি, তবু এই হারটা তুই নে।" সেজ-দাদামশাইকে বললেন, "ঠাকুরপো, তোমার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো : তুমি এই হীরের আংটি নাও। এটা মেজঠাকুরপোর ছেলেকে দেব ; এটা পাঁচুর ; এটা ন্যাড়ার প্রাপ্য ; এটা পুঁটকি পাবে ; এটা বুঁচকি পাবে ; এই বালা-জোড়া আমার ভাগ, আমার মেয়েকে দেব।" বলে মাকে দেবার জন্য আমার হাতে দিলেন। তার পর সকলের সামনে আমাকে আদর করে বললেন, "বাকি রইল এই পান্নার আংটি, এটা দাদা তোমার, কারণ তুমি খুঁজে না-দিলে এদের দ্বারা হত না। এবার চল দিকিন, কত পুলি বানিয়েছি হাতমুখ ধুয়ে খাবে চল। হ্যাঁ, বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম, মসলা রাখব।"

দিদিমার সঙ্গে চলে যেতে-যেতে শুনলাম খেন্তিপিসী পাঁচুমামাকে বলছেন, "তাকে দিল সাত নহর আর আমার বেলা এক ছড়া !" আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক সেজ-দাদামশাইকে বলছেন, "স্যার, আমার দুশো টাকা?"

পেশা-বদল

বড়কাকা কোনো নামকরা খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও তাঁর অবস্থাটা খুব একটা আরামপ্রদ নয়। ছোট সম্পাদক মশাই তাঁকে যখন-তখন যেখানে-সেখানে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপদ্-আপদ্ যাতায়াতের অসুবিধা, মোহনবাগানের ম্যাচ্, কিছুই কানে তোলেন না। খবর সরবরাহ করবার পরেও রেহাই নেই, জনসাধারণের বেশির ভাগই হয় রেগে টং, নয় এক গাল হেসে বলে, "মিথ্যা কথা বলবার আর জায়গা পায়নি!" শুধু মুখে বলে না, বড় সম্পাদককে লিখে পাঠায়। তিনি ছোট সম্পাদককে ডেকে পাঠান। তিনি আবার বড়কাকাকে যা নয় তাই বলেন। বলেন, "ওহে, আমরাই কি আর সবসময় অকুস্থলে যেতাম, নাকি যাওয়া সম্ভব ছিল? তবে বিবৃতিটা একটু কলম টেনে লিখতে হয় তো? আসলে পাঠকরা অত সত্যিমিথ্যার ধার ধারে না, বিবৃতিটা বিশ্বাসযোগ্য হলেই হল।"

এবার বড়কাকা হেঁড়ে গলায় বললেন, "কোথায় যেতে হবে, সেটা আগে বলুন। আপনার মোটর-সাইকেলটা পাব তো?"

Scanned by CamScanner

ছোট সম্পাদক শুনে আকাশ থেকে পড়লেন, "জয়-ঢাক পিটিয়ে সেখানে গেলেই হয়েছে। গিয়ে দেখবে সব ভোঁ-ভাঁ, যে দু-একজন থাকবে, তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে! জনসাধারণের একজন হয়ে যাবে—প্রথমে ট্রেনে, তারপর পায়ে হেঁটে। সেই পুরোনো নীল পেন্টেলুন আর পটলার ছেঁড়া চেকশার্ট পরবে, চপ্পল পায়ে দেবে। বলবে সরকারী মাছের চাষের তথ্য সংগ্রহ করতে। পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা নদী পুকুর ডোবার নাম, মাপ, অবস্থান লিখে ম্যাপে এঁকে আনতে।"

বড়কাকা লাফিয়ে উঠে বললেন, "ম্যাপ! ও আমি পারব না। আমি সায়েন্সের ছেলে। আর কাউকে পাঠান।"

ছোট সম্পাদক বললেন, "শুনলাম নাকি আমাদের আপিসের বাড়তি দশজন ছাঁটাই হবে।'

বড়কাকা বললেন, "ঠিকানা বলুন।"

ছোট সম্পাদক তো হাঁ। "ঠিকানা বলব মানে? জানলে তো বলব। তাছাড়া একটা গোটা গাঁয়ের কি আবার রাস্তার নম্বর হয় নাকি? নামটাও ভাল মনে করতে পারছি না...অম্বুজা কিংবা শম্বুকী, কি ঐ ধরনের কিছু। একটা স্ব আছে, ল্ডও হতে পারে। মোট কথা, বেজায় অদ্ভুত গ্রাম, ওরকম আর একটাও গ্রাম ভূ-ভারতে নেই। ভুল হবার কোনো উপায় থাকলে তো ভুল জায়গায় যাবে? বসো, সব নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে চায়ের দোকানের ছোকরা ছোট রমেশকে চারটে মাছের চপ আর দু'পেয়ালা চা ফরমায়েস করতেই, বড়কাকার রাগ অনেকটা পড়ে গেল।

ছোট সম্পাদক বললেন, 'বুঝলে, বাঁকড়ো বীরভূম সাইডেই হবে জায়গাটা। মনে হয়, লুপ লাইনের গাড়ি ধরে আমেদপুর কি ঐ রকম কোথাও নেমে পড়লে ঠিক পেয়ে যাবে।" ছোট রমেশকে বললেন, "চারটে আলুর পরটাও আন্।"

বড়কাকা বললেন, "গ্রামটার নাম মনে নেই, কোথায় জানেন না, সেখানে কি ব্যাপার সেটুকু বলবেন তো?"

ছোট সম্পাদক হ্যা-হ্যা করে হেসে বললেন, "সেইখানেই তো সমস্যা! কি ব্যাপার সেটা জানবার জন্যেই তো অদ্দূর যাওয়া।"

বড়কাকা অবাক্। ছোট সম্পাদক বললেন, "খাও, তারপর ছাঁচি পান খাওয়াব। গ্রামটা বেজায় অদ্ভুত। সকলের অবস্থা ভালো। ভাবতে পার, গাঁয়ে একটা গরীব লোক নেই? খেত-খামার, গরু-ছাগল, বড় ব্যবসা কিছুই নেই, অথচ সবাই পরম সুখে আছে!"

বড়কাকা বললেন, "হয়তো ভালো চাকরি-বাকরি..."

Scanned by CamScanner

"আরে না-না, তাহলে আর খরচাপাতি করে লোক পাঠানো কেন? কেউ কোনো কাজ করে না। সকলে ভালো ভালো প্যান্ট-শার্ট পরে, লুচিটুচি খেয়ে, বড়জোর পুকুরে গিয়ে মাছ ধরে। ব্যস্, তার বেশি নয়। শুনেছি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব প্রাচীন সব পুকুর আছে নাকি! কে, রমেশ? এখানে রাখ্, আর মুকুন্দর কাছ থেকে চারটে বড় ছাঁচি পান নিয়ে আয় তো বাপ্!"

এতক্ষণে বড়কাকা অন্ধকারে পথ দেখলেন, "তাহলে আমিও যদি বড়কর্তার পুরোনো ছিপটা আর কিছু ভালো চারের মসলা নিয়ে যাই, তাহলে তো ভালো হয়। কেউ সন্দেহ করবে না। ঐ সূত্রে দিব্যি ভাব জমিয়ে ভেতরের কথা জেনে নিতে পারা যাবে! আচ্ছা, ওদের মিসায় ধরে না কেন? অবিশ্যি আমার কোনো আপত্তি নেই, মাছ-টাছ পাব।"

ছোটবাবু চটে গেলেন, "ধরবেটা কাকে? বলছি ওদের বিষয়ে কেউ কিছু জানে না, আমাদের সেই জানানটা দিতে হবে, তারপর না হয় মিসা-ফিসা।"

বড়কাকা আরেকটু গাঁইগুঁই করলেন, "দেখুন, যারা ভালো মাছ ধরে তাদের ধরিয়ে দিতে আমার মন সরে না। আর কাউকে পাঠান।"

ছোটবাবু রেগে বললেন, "আর কাউকে কেন পাঠাব? একমাত্র তোমাকে পাঠালেই কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। আজ রাতেই রওনা হবে। আমেদপুর অবধি টিকিট কেটে রাখছি। সেখানে নেমে জায়গা খুঁজে নেওয়া, ব্যস্, কি এমন শক্ত কাজ?"

তাই হল শেষ পর্যন্ত। তবে রাতের গাড়িতে নয়, পরের দিন সকালের গাড়িতে। খানা জংশনের পর যেই না গাড়ি লুপ লাইনে ঢুকল, চারদিকটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। মাটির রঙ বদলে গেল, গাছপালা অন্য রকম হল, এমন কি কাগ-শালিকের সঙ্গে জোড়ায়-জোড়ায় ডোরাকাটা হুপো-পাখি দেখা যেতে লাগল। সহযাত্রীদের চেহারাও অন্য রকম মনে হল—ঢ্যাঙা, কালো, কোঁকড়া চুল, কাটা-কাটা নাক-মুখ। সঙ্গে সঙ্গে বড়কাকার মন ভালো হয়ে গেল।

তার ওপর সঙ্গীও জুটে গেল। চোখ বুজে ঢুলছেন, এমন সময় নাকে এল একটা চেনা-চেনা সোঁদা গন্ধ। চোখ খুলে দেখেন, লম্বা কালো একটা লোক, সঙ্গে একগোছা ছিপ আর একটা মুখ-বাঁধা পিতলের হাঁড়ি, তাতে যে মাছ ধরার 'চার' ছাড়া আর কিছু নেই, সে আর বলে দিতে হবে না। লোকটা সন্দেহের সঙ্গে বড়কাকার কাগজে জড়ানো ছিপ আর মাছের চারের গন্ধওয়ালা হ্যাভারস্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডানকুনিতে তো বড় বড় মেছো পুকুর আছে, তাহলে এ মুলুকে কেন?"

শুনে পিত্তি জ্বলে গেলেও বড়কাকা হেসে বললেন, "ডানকুনি দিয়ে হবে না

Scanned by CamScanner

মশাই! সরকারের চাকরি করি, বলে নাকি বাঁকড়ো-বীরভূমের যত সব খাল-বিল-নদী, পুকুর, সব জায়গার নক্সা চাই, মাছের চাষ হবে। এই আর কি।"

লোকটা বলল, "ছিপ দিয়ে নক্সা হবে নাকি?"

"না, তা হবে না, তবে কোথায় মাছ আছে না আছে দেখতে হবে তো?"

লোকটা ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "চোত-বোশেখে সব শুকিয়ে খটখট করে, মাছের চাষ কেমন করে হবে শুনি?"

বড়কাকা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাহলে আপনার সঙ্গে ছিপ-মসলা কেন?"

অন্য দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে লোকটা বলল, "তাই বলে সব কি আর শুকোয়? একেক জায়গায় ভূমি পাত্‌লা, পৃথিবীর ভেতরকার জল বুড়বুড়ি দিয়ে বেরুতে থাকে। কোথাও ফুটন্ত, তাতে গন্ধকের গন্ধ, কোথাও ঠাণ্ডা টলটলে মিষ্টি।"

বড়কাকা বললেন, "ধেৎ! তাই আবার হয় নাকি?"

লোকটা চটে গেল, "হয় কি না হয়, আমার সঙ্গে কম্বুগাঁয়ে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। তবে ঐ মাপজোক চলবে না। ওখানকার লোকদের চেনেন না তো, বেশি ট্যাঁ ফু করতে গেলে পুঁতে ফেলবে।

'কম্বুগ্রাম' শুনে বড়কাকার দু-কান খাড়া, জিভ কেটে বললেন, "পাগল! একবারটি দেখেই চলে আসব।"

লোকটি বলল, "তাহলে উঠুন, এই আমেদপুরেই নামতে হবে। তারপর হাঁটতে পারবেন তো?"

তা আর পারবেন না বড়কাকা? ছোট সম্পাদকের জ্বালায় কোথায় হাঁটতে বাকি রেখেছেন? চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান তাঁর নখাগ্রে। তবে এ দিকটার সঙ্গে বিশেষ চেনা নেই। বেশ জায়গা কিন্তু। শুকনো খরখরে, উঁচুনিচু ভাঙ্গা জমি, শাল-শিমূল-খেজুর, কেমন একটু পাহাড়ে-পাহাড়ে ভাব।

গ্রামটা সরু রাস্তাটার একেবারে ওপরে। চারিদিকে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। লোকটা বলল, "কি দেখছেন? এক মানুষ পুরু, তিন মানুষ খাড়া, সেকালের ঠ্যাঙাড়ে ঠেকাবার ব্যবস্থা। এখনো কাজে লাগে। আসুন আমার সঙ্গে, এই রকম আরেকটা গাঁ পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।"

গ্রামে ঢুকে বড়কাকা আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না। পরিষ্কার পথের দু'ধারে গাছ দিয়ে ছায়া-ঘেরা সব পাকা বাড়ি; একটা চায়ের দোকান মনে হল, লোকটা বলল নাকি ওদের ক্লাব। তার বাঁধানো চওড়া রকে বসে কয়েকজন চা খাচ্ছে, ট্রান্‌জিস্টর বাজছে, সকলের গায়ে নাইলনের শার্ট, হাতে সিগারেট, পায়ে চপ্পল। এই রকম জায়গাতেই স্থানীয় খবর পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

ওদের দেখে তারা মহা খুশি, "ওয়া! ওয়া! এই তো তাসের দু-পার্টি হয়ে গেল!" বড়কাকা গিয়ে বসলেন।

চীনে-মাটির পেয়ালায় নতুন চা এল, বড় ডিশে গরম মুড়ি আর পেঁয়াজি এল। বড়কাকা একমুঠো মুখে পুরে হাতের তাস গুণে নিয়ে বললেন, "আজ কি আপনাদের ছুটি?"

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, "ছুটি আবার কিসের? এ-গ্রামে কেউ চাকরি-বাকরি করে না। ছুটি বললেই ছুটি, আবার কাজ বললেও কাজ।"

আরেকজন বলল, "তা ছাড়া আমাদের সক্কলের নাইট-ডিউটি। দিনের বেলা কেউ কাজ করে না। নিজেদের ব্যবসা কিনা।"

বড়কাকা তাস বাছতে বাছতে বললেন, "তা খুব লাভজনক পেশা বলুন। হরিণের চামড়ার চপ্পল, সিগারেট লাইটার। অমন পেশা পেলে আমিও চাকরি ছাড়ি।" একটা তাস ফেলে বললেন, "আমাকে কত মাইনে দেয় শুনবেন আপনারা 'ছোঃ ছোঃ' বলে আমার গায়ে থুতু দিয়ে, এখান থেকে আমাকে উঠিয়ে দেবে। মাত্র দুশো দশ টাকা, বুঝলেন? আর এর সবটাই প্রায় গিন্নি গাপ করেন।"

ওরা তো মহাখুশি। একজন বলল, "থেকে যান, থেকে যান। গিন্নি আপনার টিকির ডগারও নাগাল পাবে না। ও কি জামা-কাপড় গায়ে দিয়েছেন! ছি-ছি, আবার ক্যাম্বিশের জুতো পরেছেন! লম্বু, তুমিই না বলছিলে ছেলেপুলেদের লেখা-পড়া শেখাবার একজন লোক দরকার?"

ওদের মধ্যে সব চাইতে যে বুড়ো, সেই হল মোড়ল। তার পরণে তসরের ধুতি। সে বলল, "যেখানে কারো চোদ্দ-পুরুষে কেউ কখনো চাকরি-বাকরি করেননি, সেখানে ও এসে পণ্ডিতমশায়ের চাকরি নেবে? কেন, ব্যোমকেশের কি হল?"

বাকিরা এ-ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, "তাকে পাওয়া যাচ্ছে না মোড়ল।"

মোড়ল আঁৎকে উঠল, "পাওয়া যাচ্ছে না? বলিস্ কি রে! আর তোরা দিব্যি তাস পেটাচ্ছিস্।"

সব চেয়ে যে বেঁটে, সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বড়কাকার সব তাস দেখে নিয়ে বলল, "আমরা আবার কি করব? তাকে নিশ্চয়ই ধরেছে।"

তাই শুনে মোড়ল হাত-পা এলিয়ে রক থেকে নিচে পড়ে গেল। লম্বু বলে একজন মোড়লের মুখে ঠাণ্ডা চা ছিটিয়ে বলল, "আহা, ঠাট্টাও বোঝ না! খুড়ো, সে কলকেতা গেছিল ভালো ছিপ আর চার আনতে। তাকে কেউ ধরে নি, সে-ই

Scanned by CamScanner

বরং এনাকে ধরে এনেছে পণ্ডিতমশাই করবার জন্য। তার আর ভাল লাগছে না।"

মোড়ল খচমচ করে রকে উঠে বলল, "ভালো লাগছে না বললেই হল! রাত-পাচারো করবে না, পণ্ডিতমশাইও হবে না, তাহলে চলবে কি করে?"

বাকিরা তাস খেলা বন্ধ করে বলল, "দেখ মোড়ল, আমাদের জিনিষপত্র সওদা করবার লোক দরকার, ব্যোমকেশ তাই করবে। তুমি শার্টের রং চিনতে পার? নাকি গণেশ ময়রা পারে? এই লোকটি মাছ ধরতে ভালবাসে, এ হবে পণ্ডিতমশাই।"

মোড়ল বলল, "বাইরের লোককে তো কখনো এখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। যদি পালিয়ে গিয়ে সব কথা বলে দেয়?"

বড়কাকার দু'কান খাড়া। ছোটবাবু গোপন করলে কি হবে, যা সন্দেহ করেছিলেন ঠিক তাই!

লম্বু বলল, "পালাবে কি করে? ফটক তো বন্ধ।"

চমকে বড়কাকা চেয়ে দেখেন, বাস্তবিকই মোটা-মোটা শালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ফটকটি বন্ধ। অবিশ্যি তার জন্য ভাবনা নেই, ভাবনা হল এদের সব অদ্ভুত কথাবার্তা লিখে রাখা যাচ্ছে না, ভুলে যাবার ভয় আছে। এমনিতেই ছোট সম্পাদক কখনই বিশ্বাস করবেন না। তার উপর কিছু কিছু বাদ পড়লেই তো হয়ে গেল। তা ছাড়া নিজেরা খুব বেশি মালুম দিচ্ছিল না। তবে এটা যে একটা চোরা-চালানিদের ঘাঁটি তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্রতীর থেকে এতদূরে যে স্মাগ্‌ল্‌ড্‌ গুডস কেউ মজুত রাখতে পারে, অনুসন্ধানকারীরা সন্দেহ করবে না।

এক নিমেষে বড়কাকার চোখে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কাজকর্ম না করে এদের এত সাচ্ছল্য, আর শুধু সাচ্ছল্যই বা বলি কেন, দস্তুরমতো বড়মানুষির রহস্য তাঁর কাছে প্রকট হয়ে গেল। এখন সামগ্রীগুলো লুকোবার জায়গাটা বের করা, আর কাগজে-কলমে লিখে রাখাটুকু বাকি।

হঠাৎ বড়কাকার মুখটা হাঁড়ি হয়ে গেল। বিবৃতিটা যদি ওঁর নামে বের করতে না দেয়? তা ছাড়া এসব কথা ছেপে বের করে দিলেই তো পুলিশ-পেয়াদা, থানা-দারোগা শুরু হয়ে যাবে। এ লোকগুলো তো খুব খারাপ নয়। ক'দিন যদি ওঁকে আটকেই রাখে তাতেই বা ক্ষতি কি? গত বছর পুজোর সময় পর্যন্ত ছোটবাবু ছুটি দেয়নি। কোথায় নাকি দুগ্‌গোঠাকুরের মুণ্ডু নড়ছিল, তার বিবৃতি আনতে পাঠিয়েছিল। দূর, দূর, খবরের কাগজে কখনো কেউ কাজ করে? গিয়ে দেখেন, কিছুই না, পাড়ার ছোকরাগুলো যেমন, ঠাকুর বসাতে গিয়ে গলার জোড়াটা ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারপর রবার সলিউশন আর টোন্‌-সুতো দিয়ে সেটা মেরামত করা

Scanned by CamScanner

হয়েছিল। তা একটু-আধটু নড়বে না তো কি হবে? ফিরে এসে ফাঁস করেন নি, বলেছিলেন সব বাজে কথা। ও বেচারাদের বিপদে ফেলে কি লাভ? তা ছাড়া হেঁড়েমতো চেহারার মস্তানটি বলেছিল, "এ বিষয়ে একটি কথা লিখেছেন তো পিটিয়ে ছাতু করব। ঠাকুরের মুণ্ডু নড়ছে বলে আপনার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে মশাই?"

উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বড়কাকা বিখ্যাত। তিনি বললেন, "রোজ মাছ ধরতে দাও যদি, তাহলে পণ্ডিত হতে আমার আপত্তি নেই। ত্যাঁদড় ছেলেপুলেকে আমি ভয় পাই না।"

মোড়ল বলল, "মেয়েগুলো বেশি ত্যাঁদড়।"

"তা হোক গে, কাল থেকে পড়াব, আজ একবার পুকুরে নিয়ে চল।"

বাস্তবিক আশ্চর্য পুকুর। এই রকম শুকনো খাবার দেশ, সেখানে টলটল করছে গভীর কালো জল। তার কিছু দূরেই গরম জলের পুকুর, সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার জল বেরিয়ে যাবার জন্যও নাকি এক মানুষ পুরু মাটির দেওয়ালের অনেক নিচে মাটির তলায় নালা কাটা আছে। সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিতে বড়কাকার বেশি দেরি লাগেনি। মায় কোথা দিয়ে মাল পাচার হয় সেটা সুদ্ধু।

মোড়লের বাড়িতে তুলল বড়কাকাকে। যত্নও হবে, নজরেও থাকবেন, বড়কাকার আর কি আপত্তি থাকতে পারে? বড় পুকুরের পুরু মাছের গাদার ঝাল, পেটির অম্বল, আর পোস্তো-দেওয়া ছোট ছোট বড়ি ভাজা, আর গাওয়া-ঘি দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের ভাতকে কি আর খুব খারাপ বলা চলে? তারপর নেয়ারের খাটে বালাপোষ গায়ে ঘুম।

বিকেলে ঘুম থেকে টেনে তুলে লম্বু ওঁকে মাছ ধরতে নিয়ে গেল। খুব ভালো মসলা দিয়ে পান খাওয়াল। মসলা দেখে মাছ ধরবার চারের কথা মনে পড়ল। তার কৌটোটা বের করতেই লম্বু হেসে কুটোপাটি, "আরে ও-সব লাগবে না, মাছ কিলবিল করে, জলের মধ্যে জায়গা কুলোয় না। সত্যি কথা বলতে কি, ছিপটাও নেবার দরকার নেই। হাত ডুবিয়ে মাছ ধরা যায়।"

অবাক হয়ে বড়কাকা বললেন, "কেন, ছিপ দিয়ে তোমরা মাছ ধর না? তবে যে ট্রেনের সেই লোকটা ছিপের বাণ্ডিল, চারের হাঁড়ি নিয়ে এলো?"

"ছিপের বাণ্ডিল কে বলল, আঁকশী বলুন। আর অন্য কাজের জন্য হাঁড়ি, তা ছাড়া মাছ ধরব কখন? সারারাত ডিউটি দিই, সারাদিন চান-খাওয়া-ঘুমেই কেটে যায়। আজ রাতে নেহাৎ ছুটি, তাই আমাদের দেখতে পাচ্ছেন। চারদিকে পেয়াদা চারিয়ে আছে দেখলেন না?"

বড়কাকা তো অবাক! "কই, না তো, পেয়াদা-ফেয়াদা তো কিছু দেখলাম না!

Scanned by CamScanner

এক যদি তোমাদের ব্যোমকেশ পেয়াদা হয়...”

এই শুনে লম্বু তো চটে কাঁই। উঠে দাঁড়িয়ে জলে কনুই অবধি হাত ডুবিয়ে দুটো দেড়-সেরি মাছ ধরে দিয়ে বলল, “নিন, উঠুন, এখানে আর থাকলে রেগেমেগে সব কথা বলে ফেলব। ব্যোমকেশদা বলেছে, আপনারা যা দেখেন তাই নাকি কাগজে লিখে দেন, অবিশ্যি ছোটবাবুর নামে...কি হল?”

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বড়কাকা বললেন, “ছিপে মাছ গেঁথেছে। খুব ভারী মাছ, হাঙর-টাঙর না হলে বাঁচা যায়...হেঁইও! আহা-হা-হা, আমার হাত ধর কেন?”

বলতে বলতে ছিপের সঙ্গে বঁড়শীতে গাঁথা পেতলের মাঝারি সাইজের একটা মুখবন্ধ ঘড়া উঠে এল। তার দু'পাশে দু'টি কড়া, একটিতে বঁড়শী লেগেছে। তাই দেখে লম্বুর চুল খাড়া। “এই সেরেছে। ও মোড়লদা...আ!” এই বলে এক দৌড়।

বড়কাকাকে বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি দিতে হবে, কাজেই এই সুযোগে পেতলের ঘড়ার প্যাঁচ লাগানো মুখটা খুলেই বড়কাকা থ! হাত থেকে ঘড়া পড়ে গেল, ভিতর থেকে একটা এই বড় মোহর পড়ে গড়িয়ে গিয়ে জলের ধারে আটকাল। সঙ্গে সঙ্গে উঠি-পড়ি করে মোড়ল ছুটে এসে বড়কাকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, “খুঁজে দিলি বাপ! বুড়ো ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া আশীর্বাদী ঘড়াটি দেড়শো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাঁচালি বাপ! বড় কষ্টে দিন যাচ্ছিল।”

এই বলে ঘড়ার মুখ এঁটে সেটাকে আবার পুকুরে ফেলে দিল। ঠং করে শব্দ হল। তারপর এক এলাহি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মোড়লের বুড়ো ঠাকুরদার হারানো ঘড়া পাওয়া গেছে, গাঁ-সুদ্ধু সবাই আহ্লাদে আটখানা।

বড়কাকা একটু ভাবিত। এ-সব গল্পের বইয়ের মতো ব্যাপার, লিখলে লোকে বিশ্বাস করবে তো? ছোটবাবু বলে দিয়েছিলেন, সত্যি-মিথ্যেয় ততটা এসে যায় না, লোককে বিশ্বাস করাতে হবে।

বড়কাকাকে নতুন ধুতি দিয়ে, লাল ফুলের মালা দিয়ে, ছোট-ছোট মেয়েরা প্রণাম করল। রাতে সুগন্ধ চালের ঘি-ভাত, কচ্ছপের মাংস, আর লাল ঘন ক্ষীর খাওয়ান হল। শুয়ে বড়কাকার আর ঘুম আসে না। এ-পাশ ও-পাশ করছেন, ঘর অন্ধকার, এমন সময় মোড়ল এসে পাশে বসল। তার মাথার কড়া গন্ধ-তেলের গন্ধ থেকেই তাকে চেনা গেল। মোড়ল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, “ব্যোমকেশ বলেছে তুমি আমার পদ্যগুলো কাগজে ছাপিয়ে দিতে পার। তাই যদি দাও তো তোমাকে এখান থেকে পালাবার উপায় করে দিই।”

Scanned by CamScanner

বড়কাকা সটাং উঠে বসে বললেন, "ছাপিয়ে দেব। আগে বল, তোমরা দিনে কাজ কর না, রাতে কিসের ডিউটি দাও?"

মোড়ল একটু উস্‌খুস্ করে বলল, "ছাপাবে তো ঠিক? তাহলে বলি, আমরা কোথাও চাকরি করি না, চাকরি আমরা ঘেন্না করি। আমরা চাষবাস করি না, সে সবও আমরা ঘেন্না করি। পাঁচশো বছর ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষরা রাত জেগে জিনিষ পাচার করার ব্যবসা করে এসেছেন।"

তবে কি যা সন্দেহ করেছিলেন তাই? চোরা কারবার! বড়-কাকা বললেন, "খুলে বল, কি জিনিস পাচার কর?"

হাই তুলে মোড়ল বলল, "কি আবার পাচার করব? কারো সোনাদানা, কারো টাকাকড়ি।"

"অমনি দিয়ে দেয় তারা?"

ফিক্ করে মোড়ল হেসে বলল, "তাই দেয় কখনো? একটু ঠ্যাঙাই-ট্যাঙ্গাই, তবে প্রাণে মারি না, তাতে পাপ হয়।...পদ্যগুলো ছাপিয়ে দিও বাপ, নইলে এইখানে পণ্ডিতি করে জীবন কাটাতে হবে। ফটক খোলা হবে না। সবচেয়ে ষণ্ডা যারা, তারা অষ্টপ্রহর পাহারা দেয়।"

বড়কাকা হাত বাড়িয়ে বললেন, "কই দাও তোমার পদ্য, দেখি কি করতে পারি...কিন্তু ফটক বন্ধ, পালাব কি করে?"

মোড়ল আবার ফিক্ করে হেসে বলল, "বাঁশ-বাজি জান না? আমার বুড়ো ঠাকুরদা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বাঁশ ধরে তিনতলা সমান লাফ দিয়েছিল, শোননি? সে যাক গে, আরো ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাক, মেয়েরা ঘুমোলে তোমাকে নিয়ে যাব। ওরা বড় চুকলিখোর। একবার টের পেলে আর তোমার যাওয়া হবে না। এই নাও পদ্য।"

বড়কাকা হ্যাভারস্যাকে পদ্যের তাড়া গুঁজে সবে চোখ বুজেছেন, এমন সময় লম্বু এসে হাজির। এসেই ফিসফিস করে বলল, "কি বলছিল বুড়ো? আমি আপনাকে পালাবার উপায় বাত্‌লে দেব। পণ্ডিতি করতে হয় আমি করব। আর রাত জাগতে পারি না। ভাবতে পারেন, চোদ্দ-পুরুষ ধরে আমাদের গাঁয়ের কোনো পুরুষ মানুষ রাতে ঘুমোয়নি—এক পুজোর দিন ছাড়া, যেমন আজকে।"

বড়কাকা উঠে বসলেন, "পণ্ডিতি করবে কি করে? সংস্কৃত জানো? ব্যোমকেশ কেন করবে না?"

লম্বু একটু হুম্-হাম্ করে বলল, "করবে না, কারণ আমি বলেছি রিজাইন না করলে গলায় দড়ি পাকিয়ে গিঁট বেঁধে দেব।"

বড়কাকা বললেন, "সব্বাই রাতে ঘুমোতে চায় নাকি?"

Scanned by CamScanner

"তা চাইবে না? চোদ্দ-পুরুষের জমানো ঘুম।"

বড়কাকা বললেন, "তার চেয়ে এসব ছেড়ে দিয়ে সব্বাই পুলিশে চাকরি নিয়ে ফেল না কেন? সারারাত এবং দিনেও অনেকক্ষণ ঘুমোতে পাবে। মাইনে পাবে, পোষাক পাবে, ছুটি পাবে। পেয়াদার ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না, বরং তোমাদের ভয়ে লোক পালাবে, চুরি-চামারি বন্ধ হবে, মাইনে বাড়বে, নাম হবে, সম্পাদকরা সেধে তোমাদের মোড়লের পদ্যও ছাপবে।"

তাই শুনে লম্বু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বড়কাকার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাথা ঠুকতে লাগল, "তাই যেন হয় কর্তা, পণ্ডিতি করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই, নিজের নাম-ই ভালো করে লিখেতে পারি না! চলুন, মত বদলাবার আগে আপনাকে রেল-স্টেশন অবধি পৌঁছে দিই। শেষ রাতের গাড়ি ধরবেন।" এই বলে লম্বু হ্যাভারস্যাক তুলে নিল।

চার দিন বাদে বিকেলের দিকে বড়কাকা স্নান করে, ঝোল-ভাত খেয়ে খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে ছোট সম্পাদককে বললেন, "বিশ্বাসযোগ্য কিছু পেলাম না, স্যার। তবে প্রাণ হাতে নিয়ে, বাঁশ-বাজি করে পালিয়ে আসতে পেরেছি, সেটাই যথেষ্ট।"

ছোট সম্পাদক চশমা খুলে রেখে বললেন, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

বড়কাকা অবাক হয়ে বললেন, "জ্বর হয়েছিল, স্যার। ভাবতে পারেন, টগবগে গরম জলের পুকুরের পাশে টলটলে ঠাণ্ডা জলের পুকুর? সেখানকার সবাই দিনে ঘমোয় আর রাতে নাইট-ডিউটি দেয়। তিন মানুষ উঁচু, এক মানুষ পুরু দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক গাঁ।"

ছোট সম্পাদক বাধা দিয়ে বললেন, "আজগুবি গল্প রাখ। তুমিও যে ব্যোমকেশ বলে আমাদের খ্যাপা সংবাদদাতার মতো হলে! সে লিখেছে, ঐ অঞ্চলে নাকি একটা গ্রাম আছে, সেখানকার সবাই আবহমান কাল থেকেই চোরাই-কর্ম ছাড়া কিছু করেনি, এখন দেশের হালচাল পাল্‌টেছে, ওরাও সব পুলিশে যোগ দিয়েছে। ও অঞ্চলে আর চুরি বা ডাকাতি হবে বলে মনে হয় না। দেখছ তো, কষ্টে পড়লে লোকের স্বভাব কেমন শুধরে যায়! তবে এর মধ্যে কোনো বিশ্বাসযোগ্য স্টোরি নেই।"

বড়কাকা মনে মনে কাষ্ঠ হাসলেন, "স্টোরি নেই তো পুকুরের জলে ঘড়া ফেললে ঠং করে উঠল কেন? ও পুকুর যদি ঘড়া-প্যাঁটরায় ভরতি না থাকে তো কি বলেছি! বলে মাছ বেচারারা পালাবার জায়গা পায় না, হাত দিয়ে ধরা যায়!" এই ভেবে পকেট চাপড়াতেই মোড়লের পদ্য খড়মড় করে উঠল। বড়কাকা বললেন, "শম্ভু বলছিল ম্যাগাজিন সেক্‌শনের ঐ দুই নম্বর কলমে একটু ফাঁক

Scanned by CamScanner

পড়েছে, দুটো পদ্য গুঁজে দেব, সার?''

ছোট কর্তা বললে, ''না-না, ওসব ছাপলে কাগজ উঠে যাবে। খেলাধূলোর বিষয় কিছু গুঁজে দাও।''

বড়কাকা উঠে পড়লেন। তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। পাড়ার 'চেতলা ইয়ং মেন্‌স্‌'কে দিলে ওরা খুশি হয়ে সব ক'টা ওদের ''ডামাডোল''-এ ছেপে দেবে, যেই শুনবে ওদের ক্লাব সম্বন্ধে বড়কাকা তাঁদের ম্যাগাজিন সেক্‌শনের দুই নম্বর কলমে পাঁচ লাইন লিখে দিয়েছেন। এরপর মোড়লকে কয়েক কপি পাঠাতে হবে।

Scanned by CamScanner

দ্রৌপদী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাছি (নিহত), নিবাস চেরাখান্‌, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা.....

দুই তকমাধারী য়ুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী: সাঁওতালীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?

দুই তকমাধারী: দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী: অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজী লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কি?

দুই তকমাধারী: মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্‌টেড ইন মেনি....

ড্যাসিয়ের: দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। 1971 সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিসের হাতে সারেণ্ডার না করাতে এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভৃতি লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমূত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমূত্র বারোভাতারী। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়ান্‌ডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালী সাঁওতাল সাঁওতালনীকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র, তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ দ্বিবিধ: এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষতা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুত বাঁকড়াঝাড় থানার আণ্ডারে (এ ভারতে কেন্মোটিও কোনো না কোনো থানার আণ্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানী জঙ্গলের চতুষ্পার্শে, এমন কি অগ্নি ও নৈঋত কোণেও, থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেন্‌তাইপার্টি নির্বিশেষে সুশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্‌বারটা দিয়ে দিন" ও বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-

কাণ্ডুজে বাবু ও খোঁচোড় হত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয়,তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীয় বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী ঘটনার আগে সাইরেন চীৎকারে ''কুলকুলি'' দিয়েছে। কতকগুলি অসভ্য, সাঁওতালীদের কাছেও দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে। যথা :—

''সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে''

এবং

''হেন্দে রাম্ব্রা কেচে কেচে
পুনডি রাম্ব্রা কেচে কেচে।''

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্রের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ, বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিলিমের মতই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাড়খানীতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ ''জোম্বি' অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায়, যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে ''জান লে লি'' বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কি য়ুনিফর্ম কি গ্রন্থসাহেব, কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্সড রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালি প্রৌঢ় সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিস্ট সেনানায়কের টেবিলে হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবাণ্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভাল জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমর প্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান। পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে ''পঞ্চ ক'' আদি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার ''আর্মি হ্যান্ড বুক'' কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য লয়কো। তাতে লেখা আছে, আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সব চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্দি ও দুল্না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেন না তারাও টাঙি-হেঁসো-তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুত তাদের আক্ষেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশি। সকল বাবু চেম্বার স্ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্সে বেরোবে। কিন্তু দুল্না ও দোপ্দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে বটে, কিন্তু এ সামান্যি মানুষ নয়। ইনি প্র্যাকটিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য শ্রদ্ধা করেন যে, ও কিস্সু নয়,চেংড়ারা বন্দুক লইয়া খেলো মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন্ অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ

করে দাওয়ালীদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মত করভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেকার মত টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পারস্পেকটিভে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন এও তিনি জানেন। আজকে "অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন" করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্স্পীয়ারের মত তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্পেরো।

যা হোক, এরপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জীপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানীর জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হবার পর থেকে দোপদি ও দুলনা প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যাণ্ড ফাইল। অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানী জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণ্ডগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ·303র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে "মহো" বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন্ মাঝি।

এই "মহো" শব্দটির মানে কি? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? এর মানে কি তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার—গোল্ডেন-পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদ্ঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা "মহো" বলল বেটে? মালদ' হতে কেউ এল?

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর দুলনের শবদেহ উক্ত পাথরে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামোফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মত গাছের সপত্র ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে

অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার পদ্ধতি যেমন, যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোন চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্‌দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়। কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধারে খচরমেচর শুনে সেনারা গুলি ছুঁড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদের পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দ্বীরাম ঘড়ারী অসংসারীর মত দুলন্‌-সংশ্লিষ্ট বকশিশ না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে আনতে সেনারা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা পায়। লাশ নিতে ''কোই ন আয়া'' শুনে সেনানায়ক পেপারব্যাকের আন্টিফাসিস্ত্ ''ডেপুটি'' কেতাবটি চাপড়ে ''হোয়াট'' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনই একজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, সার! ওই হেন্‌দে রামব্রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারী ল্যাংগোয়েজ।

অতএব দোপ্‌দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানী জঙ্গল বেল্‌টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে চক্ষুগোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জনন স্থান প্রভৃতি শেয়াল-শকুন-হায়েনা-বনবিড়াল-পিঁপড়ে ও কৃমির খাদ্য হয় এবং নির্মাংস শুভ্র কঙ্কাল নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন মনে হচ্ছে তারা কোনো একজন নিশ্বস্ত ক্যারিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলনকে রক্তাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

''ওদের'' কথাটিও হাইপোথেসিস্‌।

কেন?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সংঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন? নুলোরা কি সম্মুখ সংঘর্ষ করতে পারে? কণ্ঠাস্থি লটরপটর পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন?

উত্তর দুরকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ! এসব কথা কি কইতে আছে? যা হবার তা তো...

এখন কতজন জঙ্গলে আছে?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড় বাহিনী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্টিফায়েড?

উত্তর: অবজেকশন। "বন্য পরিবেশ" কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিনী সুষম খাদ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা, বিবিধ ভারতী শোনা ও "ইয়ে হ্যায় জিন্দগী" ফিল্মে সঞ্জীব কুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না! পরিবেশ "বন্য" নয়।

কতজন আছে?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে? অ্যাট অল কেউ আছে কি?

উত্তর দীর্ঘ।

যথা: ওয়েল, অ্যাকশন হচ্ছে। মহাজন-জোতদার গোলদার শুঁড়ি-বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক-অতীতের খোঁচড়, এরা আজও সন্ত্রস্ত। নিরন্ন নেংটেরা আজও উদ্ধত ও অনমনীয়। দাওয়ালরা কোনো কোনো পকেটে বেটার ওয়েজ পাচ্ছে। পলাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রামগুলি আজও নীরব ও বিদ্বেষী। এইসব ঘটনাবলী থেকে মনে করার কারণ আছে....

এ ছবিতে দোপ্দি মেঝেন্ কোথায় বসে?

সে নিশ্চয় পলাতকদের সঙ্গে শামিল আছে। ভয়ের কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয়ই কেতাবী শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবী শিক্ষা ওরিয়েন্টেশন করে নতুন করে সংগ্রাম পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবী শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতেকলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজে নিকেশ হবার নয়।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানী ফরেস্ট থামতে পারে না। কারণ, আর্মি হ্যান্ড বুকের সাবধান বাণী।

দুই

দোপ্দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।

দোপ্দি পেটকাপড়ে ভাত বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেয়। ভাত জুড়োলে দোপ্দি পেটকাপড়ে ভাত বাঁধে ও ধীরে ধীরে চলে।

চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাঙর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘষে দিলে উকুন নিকেশ হয়। তারপর সোডা দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলা যায়। কিন্তু হারামিরা ঝণার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরোসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে।

দোপ্‌দি!

দোপ্‌দি সাড়া দিল না। স্বনামে ডাকলে কখনোই সাড়া দেয় না ও । ওর নামে বখশিশ ঘোষণার কাগজটা আজই পঞ্চায়েত আপিসে দেখে এসেছে। মুসাই টুডুর বউ বলছিল, উ কি দেখিস? কুথাকার কে দোপ্‌দি মেঝান! তারে ধরা করালে টাকা!

কত টাকা?

দু—শো!

হাঁই গ!

বেরিয়ে এসে মুসায়েব বউ বলল। ইবার সাজসাজন্ খুব। স—ব লতুন পুলুস!

হাঁ।

তু আসিস না আর।

কেনে?

মুসাইয়ের বউ চোখ নামিয়ে বলল। টুডু বলে সি সাহেবটো আবার এসেছে। তোরে ধরলে গাঁ-বসত...

আবার জ্বালাই দিবে।

হঁ। আর দুখীরামের কথাটো....

সাহেব জেনেছে?

সোমাই আর বধুনা হারামি করল।

তারা কুথা?

টেন চেপে পলাল।

দোপ্‌দি কি ভেবে নিল। তারপর বলল, ঘর যা। কি হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।

তু পলাতে পারিস না?

নাঃ। কতবার পলাব বল? ধরলে বা কি করবে বল? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, মোদের আর কুথা যাবার নাই।

দোপ্‌দি আস্তে বলল, কারো নাম বলব না।

দোপ্‌দি জানে, এতদিনে শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্‌দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থাকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত। কিল্‌ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার... আনানোন্ মেল .. এজ টুয়েন্টি টু...

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্‌দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্‌দি!

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নাম উপী মেঝেন। কিন্তু কে ডাকে?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। "দোপ্‌দি" শুনে সন্দেহের ধারাল

pathagar.net

কাঁটা শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিল্ম রোল খুলে চলল। কে? সোম্‌রা নয়, সোমরা পলাতক। সোমাই আর বুধনা পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ? বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুলনার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন, মাতং মাঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্‌দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সূর্য সাউ বিডিবাবুর সঙ্গে ষড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মত নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, জ্বলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ?

জ্বলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাসি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কি ভাল কাজ করলা তুমি?

জল দিই নাই গ্রামকে?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়েছ।

তোরা জল পাস না?

নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসহ্য সহজে জ্বলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুল্‌না বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।

দোপ্‌দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জীপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নিচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস দীপক-দুল্‌না মাঝি-দোপ্‌দি মেঝেন সারেণ্ডার, সারেণ্ডার। নো সারেণ্ডার সারেণ্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটখট—বাতাসে কর্ডাইট—খটখট—বাউণ্ড দি ক্লক—খটখট। ফ্লেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন অ্যান্ড উইমেন, চিল্‌ডরেন

pathagar.net

... ফায়ার —ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটফল। দোপ্‌দি আর দুল্‌না বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পল্‌তাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপ্‌দি ও দুল্‌না ঝাড়খানী বেল্‌টের আশে পাশে কাজ করবে। দুল্‌না দোপ্‌দিকে বুঝিয়েছিল, এই ভাল রে! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না! কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিস সব নিশ্চিহ্ন হবে না?

কিন্তু আজকে ওকে পিছন থেকে কে ডাকল?

দোপ্‌দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি. ডব্লু. ডির খাম্‌বা—পেছনে ছুটে আসার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানীর জঙ্গল এখনো ক্রোশখানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিস আবার তার নামে লুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামি সাহেব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তা ছাড়া সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপর সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারাণ বেরাকে সূর্য সাউ করে দেবার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধনা সবই জানত। দোপ্‌দির বুকের নিচে ভীষণ বিপদের আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধনা যে হারামি করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওর লজ্জার কিছু নেই। দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্‌ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্‌দির মাঝে ব্যবধান এক থাকছে। কোঁচড়ে ভাত, কসিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিত, মালিনী, শামু, মন্টু কেউ বিড়ি সিগারেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কসিতে কাগজের মোড়ক গোঁজা আলকুলির বীজ খেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্‌দি বাঁ দিকে ঘুরল। এদিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্‌দি বনে যাবে না।

জান কসম। জা—হান্‌ কসম দুল্‌না, জান ক—সম। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্‌দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদের আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানীর কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান দিয়ে দিব উপী, যে শত দুখীরামরে—। দোপ্‌দি ভাগ্যে বাবু হতে যায় নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভালো কাস্তে-হেঁসো-টাঙি-ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যামপের আলো। দোপ্‌দি সেদিকে বা যাচ্ছে কেন? দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুর্যে যায়। আঃ—হা! রাতভোর আমি চক্ষু মুদে ঘুর্যে বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তুই শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি? দম ছুটোয়ে তোরে গাড়ায় ফেলে নিকাশ করে দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্‌দি বাস স্টেশনে বসে গল্প করে

বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিস এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলা চার, পিঁয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্‌দি মেঝান কাঁউটার হয়ে খেলছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেনজ করবে। কমরেড দোপ্‌দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানী থাকছে। কোনো কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেসট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নিচে রাখা কাঠের টুকরোর তীর ফলা-মুখ যেদিকে, সেদিকের হাইড আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্‌দির পছন্দ, বোধায়ত্ত।। দুল্‌না মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এ সব মাথায় জারায়নি বলে এ ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্‌দি ফিরল, ভালো, ফিরল না, ব্যাড। চেইনজ হাইড-আউট। নিশানী এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্‌দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ডাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্‌দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই। এত উঁচুনিচুতে কখনো আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এদিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া। বাঘাগুগগুলি ইটা বেটে, সকল টিবা সকল টিবার মত দেখতে। ঠিক আছে দোপ্‌দি ফেউটাকে শোঁসানে নিয়ে তুলবে। সারুন্দার পতিতপাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেন্‌ড!

টিলাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। আরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাশ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় দি এনিমি, বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যানটিসিপেট করতে পারতেন, এখনও পারছেন, আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে "কার্সট ব্লাড" পড়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন দেখেছেন।

দোপ্‌দি তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ ও নিরাশা। কারণ দ্বিবিধ। ছ বছর আগে মাওসে-তুঙ-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ দেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালীদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্‌দি দাওয়ালী। ডেটেবান ফাইটার। সার্চ অ্যান্‌ড ডেস্ট্রয়। দোপ্‌দি মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্‌ট!

দোপ্‌দি থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্‌দির বুকের নিচে কানালের বাঁধ ভাঙল। সর্বনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনী সাহু। সামনের টিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধনা। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্‌দি এখন দু হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দুবার, তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানী জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

তিন

সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘণ্টা। ঠিক একঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল" বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে "জল" বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত—তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কি যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়াল ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি । ঘাড় ঘোরায় ও বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রী ওকে দেখে ও হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশীক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপর সকাল হয়।

তারপর দ্রৌপদী মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজ "দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড" খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

"চল্" বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদী ও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক্ যেতে বলছিস?

বড় সাহেবের তাঁবুতে।

তাঁবু কুথাক্ ?

হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্, যেছি আমি।

সান্ত্রী জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সান্ত্রী এবম্বিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদীকে, কিন্তু কয়েদী দুর্বোধ্য আচরণ করলে কি করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলা ঘণ্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

এ কি? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। দুটি স্তন দুটি ক্ষত।

এ কি? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

কাপড় কই ওর, কাপড়?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।—

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে। দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়। □

pathagar.net

জাতুধান

মহাশ্বেতা দেবী

জাতুধান মানে যে রাক্ষস, তা সাজুয়া তিওর কোনদিন জানতে পেত না। রাম সিংগির মাতৃশ্রাদ্ধে সে উপাধিটি অর্জন করে। ভাগীরথীর কূলাশ্রি বেলেটি নামক সেমি-শহর ও সেমি-গ্রামের তিওর পাড়ার অশেষ সৌভাগ্য, রাম-জননী অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে, নবান্নের উৎসব সেরে তবে মারা যান। শ্রাদ্ধ হল অসাগর ধানচালের দিনে। রাম সিংগি একদা জমিদার ছিল, তিওররা ছিল তার প্রজা। বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তারা বর্গাদার। ফলে উপসী কেননা উক্ত জমিটি চর-জমি। ভাগীরথী, চরটি এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। তবু মাতৃশ্রাদ্ধে রাম সিংগি সকলকেই ডাকে। বাইন কেটে ভাত রাঁধা হয়। সায়েব বাড়ির বাথরুমের বড় বড় টব, নিলেমে কেনা, তাতে ডাল চালা হয়। তিওররা কাঠ আনে, কলাপাতা, উঠোন চাঁছে এবং ভরা শীতে, বর্ণোচ্ছেদের জাত বাঁচাতে বাইরে বসে থাকে। সেখানেই ওদের পাত পড়ে।

সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।'

সাজুয়া কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও, কথা না কয়ে। ওর রাক্ষুসে খাওয়া লোকে দেখে, ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।

পুরুত দাওয়ায় বসে দেখছিলেন। তিনি বললেন, মিষ্টি মেঠাই তাহলে ওই ওড়াবে?'

সাজুয়া মাথা ঝাঁকাল। রাম সিংগি বলল, 'না ঠাকুর মশাই। ভাত খাবে পাহাড় প্রমাণ, সাজুয়াকে জব্দ করতে হলে মিষ্টি দেন পাতে। আট-দশটা খেলেই মুখ মরে যাবে।'

পরিবেশকরা সাজুয়াকে আবার ভাত দিল, ডাল। বলল, 'মাছ খাবি না?'

Scanned by CamScanner

'খাব।'

'ডাল দিয়ে বেটা পাহাড় সাফ করছে।'

'তুমি দিবার, দিয়ে যাওনা মশাই।'

'লয় লিয়ে যাস?'

'মশাই, যত খেলাম, তত খাব। লিয়ে যাব কাল। এঁটো বাসি লিব। আজ খাব।'

'হেই সাজুয়া, মরবি বাপু।'

'তা দেখ, মা জননী লিত্য মরবে?'

দেখতে দেখতে পুরুত বললেন, 'এ বেটা জাতুধান। মানে রাক্ষস।'

সাজুয়া খেয়ে এসে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, কি বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস মোরে বলে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কি হয়? পেটে খেলে লামের লাথ সয়।'

সাজুয়ার বউটি ছোট খাট, গোল-গোল গড়নের শ্রীময়ী মেয়ে। সে ফিক করে হাসল।

পুরুত বললেন, 'রাক্ষস কি হে! তুমি বাবা জাতুধান! "রাক্ষস" নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বললে বেশ মানাচ্ছে।' 'ত ভাল।'

'তা বাবা, পেটটি করেছ বড়। পেটের অন্ন জুটাতে ত মুশকিল।'

'জুটে কই? জুটে না ত? যেদিন জুটবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।'

সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে, উচ্চারণ করতে জিভেও এড়ে না। কাজ, মানে চাষ-কাজ যখন থাকে, তখনি ওর পেট ভরা মুশকিল। যে বছর চর নেই, চাষ নেই, সে বছর ও বেরিয়ে পড়ে। যতদিন পারে, রাম সিংগির কাছে ধার নেয়। তারপর বউ ও লুংগি, গেঞ্জি, গামছা কেচে দেয়। পোঁটলা বেঁধে ও রওনা দেয়।

বউ বলে, যেও না।'

সাজুয়া বউকে আদর করে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যেতে মন উঠে না। কিন্তুক, ওই দশ দিন কিলো চালে তোর আর মায়ের অনেক দিন যাবে। আমি রইলে সব খেয়ে ফেলব। 'পেট মেরে খাও, ঘরে থাক।'

সাজুয়া গভীর, অপ্রতিরোধ্য দুঃখে মাথা নাড়ে। বলে, 'তাই যদিক পারতম! ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই, এ ভাবলে মোর মাথায় বাসুকি

Scanned by CamScanner

নাড়ে। আমি রইতে তোদের আসান নাই। তাথে তুই কাজও করতে পারবি।'

'কোথা যাবে?'

'দেখি, মাতং যেথা লয়ে যায়।'

মাতং ওদের নেতা এবং বছর বছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায় ধান চষতে। সাজুয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। পেট ভাতায় ধান চষে, কাটে, মজুরী ও ধান নেয়। শীতের মুখে নৌকোয় ধান চাপিয়ে এসে পড়ে।

নিজেই বোরা বয়ে আনে। মাতং-এর ওপর ওর এবং ওদের অগাধ বিশ্বাস। অবিশ্বাস্য কম মজুরী ও পেট ভাতায় কণ্ট্রাক্টরদের পথ মেরামতি, জোগালি কাজ, চাষের দেওয়ালী কাজ ইত্যাদির এক বিস্তীর্ণ গুডউইল-মার্কেট তৈরি করেছে ও। কোন-না-কোন ভাবে ও লোকগুলিকে বাঁচায়।

সাজুয়াকে মাতংও বলে, 'রাক্ষস বলতাম, জাতুধান হলি। তা ভাল! কিন্তুক আমি ক দিন? এই বুড়া মরলে তোদের হবে কি? কাজের সুতারশি ধরে নিবি, তা এমন খাওয়া খাস, যে দেখে মানুষ ডরায়।'

'সে বার? কাটোয়ায়?'

মাতং হ হ করে হাসে ও বলে, সেবার কি হল শোন্ সাজুয়ার মা! কাটোয়াতে চাষ করে আমরা চলে আসব। কুণ্ডুবাবু ত বাড়িতে সত্যনারাণ দিছে। তার কাকা শেঁাসাচ্ছিল, তা বুড়া সেদিনই মোল। অশুচ লেগে গেল। যত ভাত তরকারি ফেলা যাবে, ফল-সিন্নি। তা এই হতভাগা বলে, দাও দেখি, খেয়ে লই।

—খেল বটে! সেদিন খেল, জাড়ের কাল, পরদিন খেল, আমরাও খেলাম, কিন্তুক ও খেল আমাদের দশজনার সমান।'

সাজুয়ার মা ক্ষিপ্র হাতে বাঁশের চেঁচারি চিরতে থাকে ও বলে, 'ও পেটে, মোরা ক্যানিং টাউনে, পঞ্চাশের আকাল হল। তা আকালের যত মানুষের যত খিদা ওর পেটে।'

মাতং বলল, ওই ভাতের খিদ। কোথা যাব, খেতে এসে ধান পুজবে, তা পূজার ফল-মিষ্টি-বাতসা ওর রুচে না।

সাজুয়া বলল, 'ভাত হতে মিষ্টি কি, মোরে বল দেখি? উ শালোর বাত্‌সা—মুড়কিতে মুখ মেরে ল্যায়। থুঃ!

এই রকমই সাজুয়া। আমাদের জাতুধান। কালো, বিশাল দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল; কঠোর পরিশ্রমী বলে যা খায়, তা গায়ে লাগে।

Scanned by CamScanner

বউ এখন হাসে ও মাতংকে বলে, 'রঙ্গ দেখ যদি! সেদিন ঘরে চাল নেই। আমি আনতে গেলাম। খুব ঝড়। মা বলে, ছাগল দুটা ঘরে উঠা। তা হোথা শুয়ে র'ল খোসলা গায়ে? বলে কি! বাতাসে ছাগল উড়াক, কান্দীতে নিক, ফরক্কায় নিক, আমি লড়ব না। অঙ্গ লাড়লে খিদা চেগাবে। তোর বউ আসুক, কতখানিক চাল আনে দেখি, তখন যদি বা বা—বাতাস থাকে, তাইলে তোর ছাগল, সবার ছাগল তাড়য়্যে লয়ে ঘরে উঠাব।'

মাতং বলে, 'সেদিন তুমু শালো, মনিবের পাঁঠা ঘরে উঠালৃছ। ঝড়ের দিনে। মনিব জানে না, আঁ? তুমু?' 'আরে মোর গ্যাকা ভীম! সেদিনই তুম, গোকুল, ফাগুনাল, মাঁস খেছ, দিই নাই?'
'যাঃ, খাছিস তো খাছিস!'

'খুড়া, সম্‌সারে ত্যাত চাল, ত্যাত খাসি, ত্যাত সামিগাগি। মনির বৈটার পেটে নানা রোগ। খেতে পারে না। আমি পারি।
জুটে না। তাতেই জুটাতে হয়। মাঝ মধ্যে।'
এবার বর্ধমানে নিব।'

'খুব খাব। ডিংলা সিজাব, বেগুন পুড়াব, লুন মরিচ মেরে দিব। আঃ! বর্ধমানে কত ধান রে! কানাল ছুটে যেমন নষ্ট মাগী, ধান হয় যেমন মাটির অঙ্গে মারের দরা! খুব খাব।'

কথাবার্তা হয়ে যায়। সাজুয়া ঘর ছাড়ে। গভীর, গভীর পত্নী প্রেমে, জননীর প্রতি ভালবাসায়। ও থাকলে, এই টানের দিনের সব চাল খেয়ে ফেলবে। ওরা বউ-শাশুড়িতে, আজ আমানি, কাল পস্টি, পেট মেরে মেরে খাবে ক দিন ধরে। চলে যাবার কালে কোলের ছেলেটা, একমাত্র সন্তান ওদের, গেঁদা নুনা শিশু জগন্নাথের জন্যে সাজুয়ার কষ্ট হয় এবং ভাবে, ফরক্কায় টাকার খেলা, চারিদিকে কত রাস্তা, ব্যাবসা, বাণিজ্য, ওকে কেন পেটের ভাতের জন্য চলে যেতে হয়?

মা বলে, 'তার আনিস।'

বউ বলে, 'লাল নীল নাইলং সূতা।'

ও বলে, 'আনব।'

তারা এবং বেত এবং নাইলন সূতোয় বেঁধে নানা রকম ডালা, ঝাঁপি, সাজি তৈরি করে এরা বাঁশ চিরে-চিরে। মহাজন নিয়ে যায়।

এ ভাবেই চলে, চলতে থাকে, যতদিন না নতুন চণ্ডে বান আসে।

Scanned by CamScanner

রঙের ধান, চঙের ধান। আকাশে মেঘ ঘুরে-ঘুরে ফেরে। চেপে বৃষ্টি হয় না। যেন শরতের বৃষ্টি। আসে যায়, আসে যায়। সাজুয়ার মা বলে, 'যত জল সব শওরে? চাষী-বাসী দেশে জল নেই?'

'থাক না থাক, এবার অসাগর ধান, মা!'

ধান এবার হবেই হবে। গাছের গত্ কি, এই মোটা। পাতাগুলি ঘন সবুজ, তেজাল। চরাল জমি, সরকারী সার, খুব জেঁকেছে চাষ।

সাজুয়া জগন্নাথকে কোলে নিয়ে লুফল। বলল, 'বউ! চল তোরে চর দেখাই।'

'তুমি দেখ।'

'চল!'

'মহাজনের দাদন্।'

ধান-কাটার সময় অবধি এদের পেট চলে মহাজনের দাদনে। সাজি-ডালা-কুলো তৈরি করে। সাজুয়া বলল, 'র, আমি চিরে দেই?'

'দিলে খেতে চাইবে।'

'হ হ! বলতে দিব না কিছু। ধান-চাল বাড়ি লিয়ে আসছি।'

মা বলল, 'ত্যাত বুদ্ধি। তাতেই রাম সিংগি পাওনা কাটে তোর?'

'এবার একটা ডাবা আনব।'

'গরু কোথা?'

গরু কেন? বড় হাঁড়িতে ভাত রান্‌বি, ফ্যানে ভাতে ডাবায় ঢালবি, 'আমি নুন-মরিচ ফেলব আর খাব। এক ডাবা!'

বউ বলল, 'তবে আর কি! খুর গজাবে, লেজ গজাবে, শিং বেরাবে।

সাজুয়া রাগ করল না। ওদের সমাজে সাম্যবাদ। মা বুড়িও বসে খায় না, বউও বসে খায় না। ওর সম্বচ্ছর খেটে খায়। সমানে—সমানে কথা ওদের মধ্যে চলে। মা ওদের হাসি শুনল, বলল, 'ঘরে বসে রঙ্গ! যা না, গিন্নি মা বাগাল চাঁছাবে?'

রাম সিংগির নারকোল গাছগুলির পাতা চেঁছে কাঠি বের করার কাজটি সাজুয়া নিজেই নিজেকে দিয়েছে। তখনি ও মনিব বাড়ি গেল। কপাল ওর খুবই প্রসন্ন। মনিব্যান বলল, 'বাইরে শুনে যাস্।'

'কেন, মনিব্যান?'

'শোন্ গা।'

Scanned by CamScanner

রাম সিংগির বলল, 'কাজ আছে, বুঝলি ? নারকেল বাগানে চালা বাঁধ ক'টা।'

'কেন ?'

'বেটা জাতুধান ! খেতে জানে, ভাবতে জানে না। গরু-মোষ রাখতে হবে না ?'

রাম সিংগির গাই-মোষ অনেকগুলি। দুধের টাকা মনিব্যানের নিজের টাকা। বছর তিরিশ আগে, বাঁজা মনিব্যানের সম্মতি নিয়ে রাম সিংগি শালীকে বিয়ে করে। সম্মতি দিয়ে মনিব্যান ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছিল। তখন রাম সিংগি এক আঁজলা টাকা দিয়ে বউকে বলে, 'মোষ কেন, মাদী মোষ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল।'

রাম সিংগির দ্বিতীয় পক্ষ পুত্র ধন বাড়িয়েছে বছর বছর। ছেলের মা। মনিব্যান বাড়িয়েছে স্ত্রীধন। দুধাল গাই-মোষ নিয়ে তিনজন চাকর ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে থাকে। পর পর চালা ঘরে সমৃদ্ধ বাথান।

সাজুয়া রাম সিংগির কথা শুনে, কেন গোয়াল তুলতে হবে তা জিগ্যেস করল না। সে কথা মনেই এল না ওর। ও বলল, সে ধরেন যেয়ে গরু-মোষ অ্যানেক। তা, টান চালা বেঁধে দিব। মাতংরে বলি ? ওরা যা লিবে তা লিবে। আমার শুধু পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সা।'

'পেট খোরাক ?'

'দু বেলা।'

'অ্যাঁ ?'

'হাঁ বাবু। তাতে ঘরে চাল বাঁচবে। মা বউ খেয়ে বাঁচবে।' রাম সিংগির কথাটা খুব পছন্দ হয়নি। তবে মনিব্যান বলে পাঠাল, 'সাজুয়া দু বেলা কেন, চার বেলা খাবে। কোন কথা জানি না হয়। আমার গরু-মোষ আমার সন্তান।'

ভরপেট ভাত খাবে, সেই আনন্দে সাজুয়া সব ভুলে গেল। মাতংকে ডাকতে গেল। মাতং সব শুনে বলল, 'অ্যাঁ ? বাথান উঠাবে ? কে ?'

'তা শুধাই নাই।'

বেটা জাতুধান লিচ্চয় বান ডাকবে।

'হাঃ, লদী দেখে বুঝ না ?'

'বুঝ না ? বেটা পেট চিনে। ভাত খাবে, তাতেই লাচ কত ! শালা, এখন লদী দেখে বান বুঝা যায় ? ফরক্কার জল ছাড়বে লিচ্চয়।'

Scanned by CamScanner

'আঁ ? জল ছেড়ে সব ভাসাবে ?'

'আমি জানি।'

ওরা দুজন রাম সিংগির কাছে এল। রাম সিংগি কথাটাকে গুরুত্ব দিল না। বলল, 'যারা নাবালে আছে, তাদের ভয়। বাথান নাবালে। তাতেই সরাই। তোদের ঘর ডাঙায়, লয় ? তোদের ভয় কি ?'

'যদি বান ডাকে ?'

'বান ডাকলে শালারা আমার কাধে চাপ না ? আমার চালের ছাদ্দ কর না ?'

মাতং বলল, 'তোমার সরকার দেয়, তাতেই দাও। লইলে কি দিতে ?'

'ওই করেই ত চলছে বাপু। তোরাও পেলি, আমিও দিলাম, সরকারও দেখল। যা বাপ, চালা খুঁটি আন্ গা। নতুন খ্যাড় দিলাম !'

চালা কেটে, খুঁটি উপড়ে, নারকোল বাগানে নতুন বাথান বাঁধতে-বাঁধতে দু দিন গেল। মনিব্যান সতীনকে নিয়ে ভাত, কলাই ডাল, আমরা পোস্তর টক রাঁধল। অনেক খাওয়া। কিন্তু সাজুয়ার মনে কোথায় খোঁচ ঢুকে গেল, মাতঙের।

কাজ সারা হলে মাতং বলল, 'বাস চেপে বহরমপুর যাব ? সেথা সকল খবর পাব।'

'কে দিবে খবর ? মাজিষ্টর ?'

'শালা লদী-আপিসে নাই ?'

'তাই যাও।'

'আগে মা বইত, খাল পাড় উঁচু রইত। ফরক্কা হয়ে হতে কানে-কানে জল। এত্টুক্ বাড়লে পাড় ভাসবে।'

'ডাঙায় ঘর !'

'শালা শুধা পেট চিনে। ঘর ত ডাঙায়, চর কি ডাঙায় ?'

'না না, চর কখনো ডুবে ? মা যখন ডুবায়, তখন ডুবায়। ভাসায় যখন, তখন ডুবায় না। এবার নিজে ভাসাল, ধান দিল, ডুবাবে ?'

'জানি না।'

পাড়ে যেয়ে হামু টেনে দেখলাম, পিঁপড়াত ঠাঁই ছেড়ে যায় না ?

'রাম সিংগি নিশ্চয় কিছু জানে।'

'চল, চরে যাই !'

'দেখে লই দু-চার দিন।'

Scanned by CamScanner

দু-চার দিন সময় দিল না ভাগীরথী। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে তিমপাড়ায় ঢুকল।

ডোমদের চেঁচামেচি শুনে প্রথমে সাজুয়ারা ভাবে, ওদের শুওর পালিয়েছে। শুওর ওদের মাঝে মাঝেই পালায়। তখন হই হই পড়ে যায়।

তারপর ওরা বুঝল, এ অন্য কোন বিপর্যয়। আলো এবং লাঠি নিয়ে ওরা বেরুল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। জল, সর্বত্র জল। বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে জল। একটা বুকুর ছুটছে।

মাতং চেঁচাল, 'হা পতিত! সদন হে! উঠে এস তোমরা!'

'আলো ধর হে—এ-এ-এ!'

'ধরলাম!'

সাজুয়া বলল, এখনো হাঁটু পরিমাণ। লেমে উদের টেনে আনি। ইঃ! এ যে বেপজ্জয় জল হে! ত্যাত জল?

ওদের টেনে টেনে পাড়ে তুলতে সকাল হল। নির্মেঘ আকাশ। নির্মম সূর্য। ভাগীরথী ফুলে ফুলে উঠছে, জল দুপাড়ে ছড়াচ্ছে।

রাম সিংগির বাগানে ওরা চলে এল। রামের ছেলে বহরমপুরের বন্যা-কন্ট্রোল আপিস থেকে খবর আনল। জল না ছাড়লে ফরক্কা বাঁধ ভেঙ্গে যেত। পদ্মা চ্যানেলে জল বহানো সম্ভব নয়। বড় বড় বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে গিয়ে এই বন্যা।

রামের ছেলে মহোল্লাসে বলল, 'মেলেটারি লেমেছে। হাইওয়ের উপর নৌকো চলছে নৌকো বোঝাই মানুষ আনছে। ক্যাম্প হবে, চাল-আটা-ওষুধ-কাপড়, খুব বেবস্থা।'

'হেথাকার কি ব্যাবস্থা?'

'আমাদেরই করতে হবে।'

'তুই আবার যা। গম আন্। ভেঙে সিজ্যে থাক। তত শ মানুষকে চাল দেওয়া যায়?'

মনিব্যান রাম সিংগিকে ভেতরে ডাকল। ছেলেপিলে হয়নি, বাঁজা মানুষ, পঞ্চাশে পৌঁছেও শক্ত শরীর। মনিব্যান বলল, 'চাল দাও, লিখে দিও। কাটবো।'

'তা ত লিখবই। চাল দেব?'

'দাও। বেপজ্জয় দুগ্যতি মা!'

'দেখি।'

Scanned by CamScanner

বিকেলের মধ্যে ডোমপাড়া রইল না। জলের চাদর বিছিয়ে গেল সর্বত্র। ব বলা গাছের মাথা জেগে থাকল। রাম সিংগি সাজুয়াদের বলল, বাইরে চালা বাঁধ্। এবার বাবুদের টনক নড়বে। আসবে সব। জল যদি বেলাটির খালে ঢুকে, আবাদ ভাসবে। শালারা বছর বছর দেখে যায় আর 'হবে হবে' বলে। সাজাখালির বাঁধটা সারালে জল ঢুকত?

সাজুয়ারা বলল, 'ওরা করুক।'

'তোরা?'

'মোরা চরে যাব।'

'কেন?'

'মোদের জান সেথা।'

'চর! চর আছে?

মাতং অভিজ্ঞ লোক। সে বলল, 'না থাকবে বা কেন?'

'চর ডুবলে সাজাখালি ডুবে। সাজাখালিতে পুলিশের ঘাট-চৌকি। ঘাট চৌকি ডুবলে জানতাম না? তুমি খবর পেতে না?

রাম সিংগিও খুব চিন্তিত। বলল, অসাগর ধান রে! গেলে আমারও গেল। তোরা যাবি বলছিস, তা বোট মারা পড়বে না তো?

মাতং গভীর হতাশায় বলল, 'বাবু! বাথান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোম পাড়া ডুবল।'

'বুঝি নাই রে বাপ!'

'বোট মারা পড়বে বলে মনে লেয় না। জল যেমন হেলা-দোলা নাই। নিচ হতে ঠেলে কে উচা করে। কোন দেশ বাঁচাতে মোদের ভাসায়?

প্রশ্নটি বেলাটির মাতং তিওর করে, উত্তরটির সঙ্গে বহু দপ্তর, ব্যক্তি, একাধিক রাজ্য ও রাষ্ট্র জড়িত। রাম সিংগির ও সব জানে না। নানা কথা মনে হয় ওর। সদরের খবর, জল ছাড়া হবে। রাম সিংগি জানত, বাথান সরাল। সরকার খবর ঘোষণা করে মানুষজনকে ভাঙা জায়গায় আসতে বলতে পারত, বলে নি। সরকারের কাছে "বন্যাগ্রস্ত" ঘোষিত না হওয়া অবধি বেলাটি কোন অস্তিত্ব নয়। রাম সিংগি তা বলতে পারে না। সেই বেলাটি। দুর্গত ডোমরা সামনে বসে আছে। সরকার যদি ত্রাণে সাহায্য না দেয়, তাহলে সে গেল। এরাই খেপবে, এবং যে সাজুয়া জাতুধান, আহার বিনা কিছুই বোঝে না, সেই সকলকে নিয়ে বলবে, 'গোলার চাবি দেন।' এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে রাম সিংগির দুবার হয়েছে।

Scanned by CamScanner

তিক্ত। "গোলার চাবি দেন" যদি বলে অত্যন্ত চেনা মানুষ, তাহলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। কিন্তু তারপরেই সাজুয়া প্রত্যহের মত অতীব নর্মাল ব্যবহার করেছে। বলেছে, 'বাগান সাফ করলে বাগাল নিব। ঘরে শলা নাই।' নানা মিশ্রিত চিন্তা ধাক্কা দেয় রাম সিংগির মনে এবং সে বোঝে, চরের সতেজ, সুপুষ্ট ধানগুলির জন্য সে উদ্বিগ্ন। বলে 'নৌকায় যা। চিড়া-গুড় লয়ে যা। জলের গতিক কে জানে? যদি আজ না ফিরা হয়?'

ভাগীরথী উঁচু হচ্ছে, উঁচু হচ্ছে। জলে কচুরিপানা, ঘরের চাল ও খুঁটি, মরা গরু। সাজুয়া বলে, 'কুনো গেরাম খেয়ে আসতেছে বুঝি? ইঃ! লতুন খ্যাড় গো চালে, লতুন খুঁটি। কার সাধের ঘর গো!'

মাতং জল দেখে। বলে, 'ই লতুন বান! জল ছাড়ে। দেশ ভাসায়।'

সাজুয়া বলে, 'হুই পদ্মা, হেই ভাগীরথী। মাঝে এতটুনি ফারাক, তিরতির করে। যদি উ ফারাক ভাসে, তবে?'

'বাপ-ঠাকুরের কাছে যাবি শালা। ফারাক ভাসলে, পদ্মা-ভাগীরথী হাত মিলালে জেলা থাকবে? শালা জানে পেটে খেতে, আর ফাল কথা বলতে।'

সাজুয়া চুপ করে যায়। গেরুয়া জলরাশির ওপর দিয়ে কালো নৌকাটি যায়। ভাগীরথীকে দেখে মাতং বা সাজুয়া বা গগন বা ঈশানের এখন "মা" মনে হয় না। ফরক্কার জল পাবার পর এ এক নতুন ভাগীরথী।

নদীর চেহারা নেই তার, চেনা চেহারা। নদীর পুরনো চেহারায় গ্রীষ্মে চড়া পড়ত, তিন-চার ধারে জল বইত, তাতে ডুব জল—সাঁতার জল থাকত। পাড়ে ধরে নামলে জল। বর্ষায় টাবু—টুবু। এক সময়ে বর্ষার বড় নৌকো চলত, কলকাতা থেকে ষ্টীমার আসত।

এখানকার ভাগীরথীর চেহারা কানালের মত! সম্বচ্ছর জল। দু পাড় ছুঁয়ে। জল ভাল, খুব ভাল, শুধু এ জলের নদীর চেহারা বা স্বভাব নেই। আকাশে জল নেই, নদীতে বান, কে কবে শুনেছে?

দূর থেকে চর চোখে পড়ে। গেরুয়া জলের বুকে এক খণ্ড শাল্লা ভাসছে। সাজুয়া বলে, 'জয় মা! গঙ্গা পূজায় ডালী দেব।'

চরটি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে ওর আর মাতংদের চোখ দিয়ে অপ্রতিরোধ্য আবেগে জল ভরে আসে। মাতং এক আঁজলা জল নিজের ও অন্যদের মাথায় ছেটায়। বলে 'দোষ নিয়ো না মা! কটু কথা বললাম কত!' বলে

Scanned by CamScanner

পূজায় সবে ডালী দিব।'

চরটি কাছে আসে, ক্রমশ। ধান বোনার সময়ে রাতে থাকতে হত বলে মাচাঙে চালা। ধান পাকলে পাহারা দিতে পাখির হাত থেকে—চালাটি কাজে লাগবে। ওর মাচাঙের নিচে যায় ও দাঁড় দিয়ে পেটায়। সাপ নেই। মাতং বলে, 'জলের টানে সাঁপ অন্যত্তর যেছে।'

ওরা মাচাঙের নিচে বসে। চিড়ে ও গুড় খায়। তারপর সাজুয়া মাচাঙে ওঠে। চেয়ে দেখে। মাতং বলে, 'কি দেখিস?'

'জল।'

'কতদূর দেখা যায়?'

'সাজা খালি।'

'তবে ভয় নাই।'

'কত ঘরের চাল, পানা কত রে!'

'খেতে খেতে আসছে।'

'উনি ও জাতুধান হল?'

'হয়। লদী রাক্ষসী হয়।'

নেমে এসে ওরা খেতের আগাছা খানিক উপড়োয়। তারপর সাজুয়া বলে, 'আমি থাকি। খেয়েছি, এখন কষ্ট লাই আর। তোমরা খেয়ে, সকলারে লয়ে এস। ঘাস না উঠালে ধান যাবে।'

'নৌকা আছে তত? চর ফেলাল, হেঁটে আসব, তা ফরক্কা হতে সকল বিস্মরণ।'

'মেয়ে ছেলা লয়?'

ওরা সাজুয়াকে রেখে চলে আসে। বিড়ি চেয়ে নেয় সাজুয়া। হেঁকে বলে, 'ফিরা নৌকায় চলে এস হে! এই বানে মদনরা নৌকা নিবে না।'

'আসব।'

ওরা চলে আসতেই সাজুয়া মাচাঙে শুয়ে পড়ে। খুব নিশ্চিন্ত লাগে ওর। বান হোক, গ্রাম ভাসুক, চর তো ডোবে নি? ঘুমিয়ে পড়ে ও।

ওদের যেতে বেলা গড়ায়। ফলে বিকেলে ওদের না দেখে ওর তেমন উদ্বিগ্ন লাগে না। আজ পারে নি। কাল আসবে। ধান ওদেরও। এখন আগাছা ও ঘাস না কুঁদরালে ওদেরও ক্ষতি। সাজুয়া কল্পনা প্রবণ নয়। ফলে আদিগন্ত ভাগীরথীর বুকে একা ও চরের মাচাঙে বসে আছে, এ উপলব্ধিতে ওর মনে কোন ভয়ের অনুভূতি জাগে না, দৃশ্যটির অমানুষী

Scanned by CamScanner

ও আদিম সৌন্দর্য ওকে স্পর্শ করে না। বিড়ি টেনে ও সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। শুক্ল পক্ষে চাঁদ ওঠে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ভাগীরথী আকাশ পানে ঠেলে উঠতে থাকেন সোজা।

সাজুয়া ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খায়। প্রথমে মৃদু তারপর জোর ধাক্কা। না, গায়ে ধাক্কা নয়, মাচাঙ নড়ছে। ওরা এল নাকি? ওঠে বসে ও, এখন চোখ কচলে চেয়ে দেখে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী ওর চারিদিকে। বিমূঢ় আতঙ্ক বিহ্বল সাজুয়া আবার চেয়ে দেখে। ধান নেই, চর নেই, জল ওর মাচাঙের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। চালে উঠবে? চাল তো তেমন পোক্ত করে বাঁধা হয়নি? মাচাঙের খাঁচাটি আঁকড়ে ধরে ও চোখ বোজে। বউ নয়, মা নয়, ছেলে নয়, নিজের জন্যে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। কিছুই পাওয়া হল না জীবনে। সব সাধ অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল। জলে পড়ে তবে সাজুয়া বুঝতে পারল, ভাগীরথীর বুকের নিচে ভীষণ তোলপাড়। গুম গুম শব্দ হচ্ছে অতলে। ওপর পানে চাইলও। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত চন্দ্রমা। মাচাঙের খাঁচা জড়িয়ে সাজুয়া চাইতে থাকল। একটা গাছ ভেসে আসবে না? একটা শক্ত পোক্ত চালাঘর? তারপর ওর আতঙ্ক বিহ্বল চোখের সামনে একটা জলের দেওয়াল ছুটে এল। আসতে আসতে, জ্যোৎস্নার আলোর লোনা জল যেন দাঁত বের করে হাসল।

চর ভেসে গেছে, এ কথা জানা যায় ভোরে। সাজখালিতে ত্রাণ বোট যেতে থাকে যখন। পুলিশের ঘাট-চৌকিতে জল ঢুকে পড়ার কারণে বেলেটি এখন ত্রাণকেন্দ্র হয়। রাম সিংগিকে অশেষ ব্যথা দিয়ে সরকার, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্যে আলাদা শিবির ফেলে। জওয়ানরা উদ্ধার ও ত্রাণ-দান চালাতে থাকে। রাম সিংগি চর ডুবতে পয়লা ব্যথা পায়। দ্বিতীয় ব্যথা পায় রিলিফের গম-চিড়ে-গুড়-কাপড় ইত্যাদির হেফাজতী না-পেয়ে। তারপর ভয় খায়, বি ডি ও যখন খিঁচিয়ে বলেন, 'নিজের গাই-বলদ সরালেন খবর পেয়ে। খবরটা দিতে পারেন নি? সে খবরও সরকার দেবে? সরকার মানে সরকারী আমলা শুধু? আমি জানলে নিশ্চয় জানাতাম। বান-বন্যা বলে কথা! জেনে চেপে গেলেন?'

রাম সিংগি সকাতরে বলে, 'সে ত হয়েই গেছে। চেল্লাচিল্লি করিয়েন না সার। এ ডোমগুলো শুনলে ছিঁড়ে খাবে। তাতে আমাদের সাজুয়া চর মুনতে গিয়ে ভেসে গেছে, তিওররা কান্‌তে লেগেছে?

'আপনার চর-জমি ত?'

Scanned by CamScanner

'আজ্ঞা!'

রাম সিংগি আরো কাতর হয় ও বলে, 'মোটর বোট নিয়ে ঘুরতে ওকে জানি তোলে?'

তার ওপর তো কারো রিষ নেই যে দেখলেও তুলবে না। এই জলের তোড়, সে কি আছে?

নৌকো ঘুরতে থাকে জলে। এখন পরের পর গ্রাম ভাসছে। বেলেটি ব্লক ডিকলেআর্ড বন্যা প্লাবিত ব্লক। ত্রাণ করে আনা হয় যাদের, তাদের মধ্যে মাতংরা, সাজুয়ার বউ ও মা বৃথাই খুঁজে খুঁজে ফেরে সাজুয়াকে। অবশেষে জানা যায়, নদীর মাইল তিনেক আগে, একটি গলিত শবদেহ দেখা গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। প্রসারিত ও স্ফীত হাতে লোহার বালা।

এখন আর সন্দেহ থাকে না কোন। সাজুয়ার বউ দাপাদাপি করে কাঁদে। মা ঘন ঘন মূর্ছা যায়। মাতংরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তারপর মাতং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সকলি জান। গেল যখন, সে যখন নাই, তখন রীতকরম কত্তে হবে। সাজুয়ার মা! মাতং রইতে তোমরা মরব না। এখন ওঠ।'

'কি কত্তে উঠব, অ দেওর!'

বউরে বলা যায় এমন কথা? উঠ, তার খ্যড়ের ঠাকুর দাহ কত্তে হবে। ছরাদ আছে। আহা হা রে, আমরা বলছি রাক্ষস! বামুন নাম দিল জাতুধান! আহা হা রে, দলমলা ছেলে, কুন রিষ জানে না গো! ডোমপাড়ায় জল, তাতে কাঁধে বয়ে বাছুর উঠাল ডাঙায়! এখন আমি মরব, বুড়াটা না জোয়ানটা গেল!'

'কেনে রেখে এল তারে, অ দেওর! সে ত গোঁয়ার হাবাটা ছিল! কেনে বা তার কথা শুনলে?'

'সাজুয়ার মা! সে দুস্কে মোর বুক ফাটে। কে জানে বল, এমন হবে? উঠ উঠ, দাহ আছে, ছরাদ আছে, জ্ঞাতভোজন আছে, তার গেঁদাটার অমঙ্গল হবে ন্যাল্যে।'

'কোথা হতে হবে?'

মাতং ভীষণ ক্রোধে বলল, 'রাম সিংগি বাবু দিবে? জল আসবে জেনেছিল, কারেও বলে নাই? মোষের কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই!'

চার দিকে বন্যাতাড়িত মানুষ। বেলাটি এখন মানুষে থই থই।

Scanned by CamScanner

তিওররা খড়ের পুতুল দাহ করল। তারপর রাম সিংগির কাছে গেল। মাতং বলল, এই বান-বন্যা তোমারে ছুঁল না বাবু! সরকার সকল দিতেছে।

'মোদের সাজুয়ার ল্যেগে তুমি দাও। লয় ত খারাপ হয়ে যাবে।'

রাম সিংগি তার গ্রামীণ ও অন্ধ মানসিকতায় মাতংয়ের ক্রোধকে যথার্থ মনে করল ও বলল দিব। দিব না কেন? সরকার তাসাতেছে, তোরাও তাসাতিছ, বান ত আমি ডাকা করেছি, লেঃ, কি লিবি, লে। তোদের পিছনে বড় গিন্নি। তার দুধের টাকা সুদে খাটায়।'

মনিব্যান বলল, 'ই চাল তুমি লিখবা না। ওরা রুখলে ধান কাটতে পুলিস আসবে। আর হাংনামা কর না।'

'আর করি? মন্দ করলে বি..ডি. দেখে। ভাল করলে দেখবে? ভালর দিন নাই। সে আমলে বাপ আকালে গোলা খুলে রায়সাহেব খেতাব পায়।'

'সাজুয়ার ছরাদে চাল দিবে, তাতে তুমি খেতাব পাবা না?'

'খেতাব এখন নাই। ই বেটারা সামনে "শালা" না বললে সেই জানবে বাপের ভাগ্য। বানে জগৎ ডুবায়, ছরাদ!

চালের বস্তা এনে মাতংরা সাজুয়ার মাকে দিল। বলল, আর তিন দিন। তা বাদে আমরা তেল-তৈজস আনব। আমি রীতকর্ম করা দিব। লাও, লোহা রাখ। বউয়ের চুলে বেঁধে দিবে।'

চালের বস্তার গায়ে হাত বুলিয়ে, যেন ক্ষুধাকাতর, সদাই অন্নলোভী সাজুয়ার স্পর্শ পেয়ে মা ও বউ ঘুমোল। দুঃখের দিনেও ঘুম আসে, ঘুম এল। মা বলল, 'মাতং দেওর ছিল বলে ত্যাত চাল! নইলে উ হারামি দিত?'

বউ বলল, 'ছরাদ হলে চলে যাব ধামনাই। তুমি ঘর দেখবা, আমি ভাজদের সঙ্গে মাঠে যাব। সেথা বিটিছেলা মাঠে খাটে।'

'তাই যাব। বান না হতে আকাল আসবে। বাবু আর কারে সাজুয়ার ভাগ দিবে লিয্যস। মানুষ এখন পোক পতং, অসাগর মানুষ! বাবাঃ, ত্যাত মানুষ কোথায় ছিল? এত হ্যাচাক জ্বলতে দেখি নাই, ত্যাত মানুষ দেখি নাই।'

চরের দাংগায় তুমি রাড় হলে, চর ভেসে আমি! আর রব না হেথা।'

'নে ঘুমা।'

দুজনে জড়াজড়ি করে ঘুমোল।

Scanned by CamScanner

ঘুমের মধ্যে মা আগে শোনে, দরজার ওপারে কে বিপন্ন গলায় ডাকছে, 'দরজা খোল !'

ধরমড়িয়ে উঠল মা। কে ডাকে ? সাজুয়া ? মৃত্যুর পর তার প্রেত ?

'কে ?'

'আমি মাতং হে, দরজা খোল।

বউকে ডেকে তোলে মা, তারপর দরজা খোলে।

বউ ডিবরি জ্বালে।

মাতং সঙ্গে সাজুয়া।

'ই কি দেওর ?'

'মা, আমি !'

'তুই !'

'আমি !'

'মরিস নাই ?'

বউ ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাতং ধমক দিয়ে বলে, 'কেন্দ্যে পরে। আগে ওরে চাল দাও, চিবায়ে জল খাক। মরে এসেছে।'

'মরে নাই ত ! মরে নাই !' মা হেসে কেঁদে সাজুয়ার গায়ে হাত বোলায়। বলে, 'তুই !'

'হুই ভেসে এট্টা গাছ পাই। তাতে সাঁপ কি ! লরে-লাগে ভেসে ভেসে সেই জিয়াগঞ্জ ! সেথায় মড়া হয়ে পড়েছিলাম। উঠাল সেপাইরা। তা বাদে ধুম জ্বর ! ইঞ্জিশান, অষুদ, দে, চাল দে !'

বউ চাল ও জল দেয়। সাজুয়া খায়। জল খেয়ে বলে, 'হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে হাঁটতে—মাতঙের ঘরে আগে ডাকতে বুড়া ভূত দেখল।'

মাতং গলা সাফ করে বলল 'অনেক ছরাদ হয়ে ফেল্‌ছে রে ! সে অনেক কথা।'

'ঘরে চাল এত ?'

'শালা চাল দেখতেছে ! শোন বেটা !'

মাতং ওকে সব কথা বলে। ভয়ে ভয়ে বলে। জলে ভেসে যাবার অভিজ্ঞতা, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার অভিজ্ঞতা, সাজুয়ার মাথা না খারাপ হয়ে যায়। 'কম কথা নাকি ? মা ও বউ, অপরাধীর মত বসে থাকে। সাজুয়া ওদের পেটায় যদি ?

Scanned by CamScanner

সব শুনে মেলে সাজুয়া বলে, 'দাড়াও, বুঝে লই। আমার খ্যাড়ের ঠাকুর দাহ করলা ?'

'সি তোরে শুদ্ধ করে লিব।'

'ছরাদে জ্ঞাতভোজনের চাল আনলা ?'

কালই ফিরত দিব। লইলে বেটা বলবে, তোরা সাজস করে ই কাজ করছিস।'

'লাঃ!'

'কি বলিস ?'

'চাল ফিরত দিব না'

'তবে ?'

সাজুয়া ওদের অবাক করে হাসে। দমকে দমকে হাসে। বলে, 'উঃ, আমি সেথা আছি। তোমরা খ্যাড়ের ঠাকুর পোড়ালা, ছরাদের চাল আনলা...'

তোর মারে বলাছি, মাতং রইতে তোমরা মরবানা। আমরা তোর সমাজ লই ?'

মাতংয়ের পায়ের ধুলো খায় সাজুয়া। বলে, 'তা জানি হে বুড়া।'

'তবে ?'

'দেখ! সবে বলে জাতুধান, আমার বুদ্ধি লাই। বুদ্ধি আমার হলছে হে এট্টা। আমি যে এসছি, জীয়ন্তে ফিরাছি, তুমি ভিন্ন কেও জানে না ?'

'তাতে ?'

'বুঝলা না ?' আবার হাসে সাজুয়া, মাতংয়ের গালে আঙ্গুল দিয়ে চুম কুড়ি খায়। বলে, 'চালের বস্তা লয়ে এদের লয়ে আমি ধামনাই চললাম। তুমি বলবা, ওরা কোথা গিছে, মা বউ, তা জান না। বলবা, বুঝি ধামনাই গিছে। সেথা ছরাদ করবে।'

'রাম সিংগিরে কি বলব ?'

'কিছু বলবা না। বান শুকালে আবার চলে আসব। বলব জাতুধান আমি, তাতেই ভাগীরথী ফিরায়ে দিল। বলল, এখনো অনেক দিন দানা আছে তোর ?'

'এ চাল ?'

সাজুয়া হাসে। বলে, 'আমি তো রাক্ষস, জাতুধান, আমার ছরাদের চাল আমি খাব না ? আরে এমন ছরাদ হয় নাই! যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছে ?'

Scanned by CamScanner

'তাই কর গা! আমি কারেও কিছু বলব না কিন্তুক কাজটা কেমন হল বল্? শুদ্ধ হল না, দাহ হল, দেও দেবতার রিষে পড়বি।'

'পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বের্‌থা যায়। মা চল্, বউ, গেঁদাটা ওঠা। আঁধারে পলাতে হবে।'

নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে জাতুধান অন্ধকারে পালাতে থাকে। ধামনাই অনেক দূরে। পালাতে পালাতে মনে হয়, ও ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান।

এই বান-বন্যা থেকেও ফায়দা তুলে নিল।

(১৯৭৮)

Scanned by CamScanner

গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প

ওরা আসে নিশুতি রাতে। প্রতি অমাবস্যায়।

তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক শুনশান অদৃশ্য। মনে হয় এখানে কেউ বেঁচে নেই, কোনো বাড়িঘর নেই। বাতাসে গাছের ডগাগুলো কাঁপে, বাঁশবনে একটা বাঁশের সঙ্গে আর একটা বাঁশের ঘষা লেগে শব্দ হয় কর-র-র কর, কর-র-র কর। লিচু গাছে ঝাঁক বেঁধে এসে বসে বাদুড়, দুএকটা প্যাঁচা খ্যারখেরে গলায় ডাকে, পাঁচলা মোড়ের বড় অশথ গাছটায় একটা তক্ষক ঠিক সাতবার তক্‌খো তক্‌খো করে। ওই তক্ষকটা নাকি সাড়ে তিনশো বছর ধরে বেঁচে আছে।

সেই সময় ওরা আসে। ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় কাঁপতে থাকে কয়েকটা ছায়া।

তখন শোনা যায় খকর খকর খক করে কোনো পুরোনো রুগীর কাশির শব্দ, দুএকটা শিশু তেড়ে কেঁদে ওঠে। তখন বোঝা যায়, এই অন্ধকার-ঢাকা নিস্তব্ধ ভূমিতেও মানুষের জীবন বহমান।

দুএকটা জানলা খুলে যায়। দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় কয়েকটি ছায়ামূর্তি। আলো ও ঝুমঝুম শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তারা পাঁচলা মোড়ের অশথতলায় থামে।

মোট এগারোজন উঠতি বয়েসের ছেলে। তাদের সঙ্গে দুটি লণ্ঠন। দুজনের হাতে দুটি বর্শা, চারজনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। লণ্ঠন দুটো মাটিতে রেখে তারা প্রথমে শীত কাটাবার জন্য হাতে হাত ঘষে, শরীরের যেখানে সেখানে ধপাধপ করে চাপড়ে মশা মারে। তারপর তারা সকলে মিলে বিকট মোটা গলায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ

হে রে রে রে রে রে রে রে
জাগো রে, গ্রামবাসিগণ জাগো রে।

পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিদিকে ফিরে ফিরে তারা চারবার হুঙ্কার দেয় এরকম। তারপর অন্যরা, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালে তার মধ্যিখানে এসে ঘুঙুর পরা চারজন পা ঝুমঝুমোয়। সবাই তালে তালে হাততালি দেয়। হঠাৎ শুরু হয়ে যায় গান ঃ

ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
বিপিন খুড়োর নতুন কলে
তুলসীপাতা গঙ্গাজলে
ভূতের কেঠো হাড়ের গুঁড়ো মিশায়ে রস খেয়েছি
ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনতে এয়েছি।

তাদের সেই তারস্বরে গান ও ঘুঙুরের শব্দে অশথগাছের কয়েকটি কাক হঠাৎ ঘুম ভেঙে কা-কা-কা করে ওঠে। দু'তিনটে শেয়াল ছুটে পালায়। কাছেই কোনো বাড়ির দাওয়ায় তামাক টানার মটমট শব্দ শোনা যায়। ওরা আবার গায় ঃ

ভূতের নাতি ভূতের পুতি বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই হবে না আর ছাড়াছাড়ি।
মামদো ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যি
দেখাও যদি তিন সত্যি
দশটি করে টাকা পাবে হাতে হাতে দোকানদারি,
সেই টাকায় খাও মণ্ডা মিঠাই করে সবে কাড়াকাড়ি।
ভূত জিনিতে, ও ভাই ভূত জিনিতে
ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে
ভূত জিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
দশ টাকা। দশ টাকা। দশ টাকা।
এক এক ভূত দশ টাকা। হাতে হাতে গরমা গরম। দশ টাকা।

গান শেষ করার পরও নাচ থামতে চায় না। বিশেষত বেঁটে নিতাইয়ের। সে নাচতে ভালবাসে। সুরেন্দ্র তার দিকে একটি বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা। তখন নিতাই থামে। সুরেন্দ্রর বুকখানা লোহার দরজার মতন। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বর্শা। তার চোখে মুখে বেশ একটা তৃপ্ত ভাব। গানখানি সেই বেঁধেছে, কিন্তু নিজে গাইতে পারে না। অন্যরা যখন গায়, তখন সে হাততালি দেয় চোখ বুজে।

আর একটি বর্শা বিনোদের হাতে। সে বর্শাটিকে পতাকা দণ্ডের মতন সামনে ঝুঁকিয়ে ধরে আছে। সেই বর্শার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি জন্তু। জন্তুটা একবার ছটফট করতেই বিনোদ বলে, আরে শালা, এখনো তেজ যায়নি।

বর্শাটা ঘুরিয়ে সে জন্তুটাকে একবার মাটিতে আছড়ায়। ঝনঝন করে শব্দ ওঠে।

সকলে বিড়ি ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়। এর পরের গান হবে মালো পাড়ায় বটগাছের নিচে।

সুরেন্দ্র রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক মারে, ও পবন ঠাউদ্দা, জেগে আছো নাকি?

যে বাড়ির দাওয়া থেকে তামাক টানার মটমট শব্দ আসছে, সেখান থেকে উত্তর আসে, আছি রে! আয়, আয় ইদিকে!

পবনের বয়েস চার কুড়ি, না পাঁচ কুড়ি তা সে নিজেই জানে না। শরীরটা বেঁকে গেছে। সব কখানা হাড় পরিষ্কার গোনা যায়। তার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, দুটি নাতিও গত হয়েছে, কিন্তু পবনের আর যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

সবাই এসে ওই দাওয়ায় বসে। লণ্ঠন দুটো নামিয়ে রাখে পাশে। যে যে নেচেছিল, এই শীতের মধ্যেও তাদের গায়ে চকচক করে ঘাম।

নিতাই জিজ্ঞেস করে, জলের কলসিটা কোথায়, ঠাকুদ্দা? বাইরে আছে নাকি?

পবনের ছোট ছেলে নিবারণও উঠে এসেছে চোখ মুছতে মুছতে। সে এক ঘটি জল নিয়ে আসে। নিতাই আলগোছে টাগরা ভিজিয়ে প্রায় অর্ধেকটা জল শেষ করে দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটো দরজার পাশ থেকে কুতকুত করে চেয়ে দেখে।

পবন একবার হুঁকোটা পাশে নামিয়ে রাখতেই বিনোদ সেটা তুলে নিয়ে টান মারে। তারপরই মুখ বিকৃতি করে বলে, এ রাম রাম! এটা কি ঠাউদ্দা? একি তামাক?

পবন ফোকলা দাঁতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে সে।

নিতাইয়ের পাশে বসা ঘনাই বলল, কেন, কি হয়েছে। দেখি তো?

ঘনাইও হুঁকোতে টান মারে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক থু থু করে ওঠে।

পবন হাসতে হাসতে বলে, তোরা পারবি না! একেলে ছেলে তো। আমার সহ্য হয়!

—এ তো তামাক নয়, এটা কী খাচ্ছো তুমি?

তামাক পাবো কোথায়? তামাকের দাম কত জানিস? আমার ছেলে আমাকে তামাক কিনে দেবে? একটা পয়সা ঠেকায় না।

তবে কল্কেতে তুমি কী ভরেছো?

—অনেক কালের তামাক টানা অভ্যেস, না মলে যাবে না। তামাক পাই না। তাই শুকনো আমপাতা আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরি করেছি। আমার তো বেশ লাগে।

—অ্যাঁ!! থুঃ! অভক্তি।

তামাকের বদলে দুজনকে গোবর খাইয়ে খুব হাসতে থাকে পবন।

নিবারণ তার বাপের উদ্দেশে বলে, মরণকালে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে একেবারে!

নিতাই আর ঘনাই কয়েকটা চোখাচোখা গালাগাল দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি দরজার পাশ থেকে হি হি করে হাসে।

পবন অন্যদের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ছেলের উদ্দেশে বলে, মরার খোঁটা দিচ্ছিস কেন রে? আয়ু যখন ফুরোবে, তখন মরবো। তার আগে কথা কী?

নিবারণ বলল, ফের যদি তোমাকে গোবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি—

সুরেন্দ্র মাথাখানে বাঁধা দিয়ে বলল, আহা থাক। এই নাও ঠাউদ্দা, একটা বিড়ি খাবে নাকি?

পবন বিড়িটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, বেঁচে থাক, বাবা। ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। আর একটা বিড়ি দিবি? কাল সকালে খাব।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলে, ঠাউদ্দা, ভূত-টুতের সন্ধান পেলে না একটাও? তুমি তো জানতে অনেক?

পবন বলল, জানতাম তো। দেখিছিও কত। নিজের চোখে দেখিছি। বাড়ির কাছে, এই পাঁচলা অশথতলায় পেত্নি

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিছি। একবার পড়েছিলাম মেছোভূতের পাল্লায়। হিজলমারির বিল থেকে মাছ ধরে নে আসছি। অমনি সেই শালার ভূত আমার পেছু নেছে। দুকদম যাই আর সে বলে, মাঁছ দেঁ নাঁ— ও পঁবন , মাছ দেঁ না— তারপর দেখি একটা না তিনডে ভূত, শেষমেষ আমি মাছ ফেলে-ফালে দে দৌড়—

—তা একটাও ভূত ধরে দিতে পারলে না?

—এখন তো আর দেখি না। তোদের দেখলি বোধ হয় ভয় পায়। এই তো পরশুদিন সন্ধেবেলা আমি এই দাওয়ায় বসে বসে হুঁকো টানছি, দেখি কি গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে লাল্লা বেনারসী শাড়ি পরা এক বউ পিদিম হাতে নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখলাম। আমি ডাকলাম, ও মা, তুমি কে? কোথায় যাও? তা কোনো সাড়াও দেয় না।

—সে তুমি নিবারণকা'র বউকে দেখেছ।

—হা আমার পোড়া কপাল! আমার ছেলে বউ বেনারসী শাড়ি পাবে কোথায় রে ছোঁড়া! তার একখানাও জ্যান্ত শাড়ি আছে কিনা সন্দেহ। এ দেখলাম এক সোন্দর বউমানুষ, গা-ভর্তি গয়না।

—দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলে না কেন?

—আমার কি পায়ে সে জোর আছে? নেবারণও তখন বাড়িতে ছেল না—আমি তারে দুবার ডাকতে না ডাকতেই চোখের সামনে অদ্দিরিশ্যি হয়ে গেল। হ্যাঁরে সুরেন, সত্যিই ভূত ধরলে তুই দশ টাকা দিবি?

—নিশ্চয়ই দেব। পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি। নগদানগদি দাম পাবে।

পবন তার ঘোলাটে চোখ মেলে নিজের ছেলের দিকে তাকায়। লোভীগলায় ঝামটা দিয়ে বলে, একটু বনবাদাড়ে ঘুরলেও তো পারিস। নগদা-নগদি দশ টাকা এই বাজারে কে দেয়? দশখানা তাগড়াই মানকচুরও দশ টাকা দাম ওঠে না। হাত খালি, বসেই তো আছিস।

নিবারণ বললে, তুমি চুপ কর। ভূত আবার ধরা যায় নাকি? আমি কোনোদিন ভূত দ্যাখলামই না এখন পর্যন্ত!

পবন বিড়বিড় করে বলল, চোখ থাকলেই দেখা যায়। এ গেরামে মেটি সতেরোডা সতেরো রকমের ভূত আছে, আমি নিজের চক্ষে দেখিছি। এক একটা দশ টাকা, কম কথা?

বিনোদের বর্শার সঙ্গে বাঁধা প্রাণীটা আবার নড়ে-চড়ে উঠল।

নিবারণ চমকে উঠে বলল, ওটা কি?

বিনোদ বলল, ওটা একটা স্যাজা। ভলাইচণ্ডীতলার সামনে রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, বর্শা দিয়ে গিঁথে ফেললাম। কড়া জান শালার, এখনো মরে নি।

নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি এবার দরজার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এল শজারুটাকে দেখতে। বড় বড় কাঁটাগুলো ফুলিয়ে মাটির ওপরে থুবু হয়ে বসে আছে শজারুটা। মেয়েটির পরনে একটা ইজের। ছেলেটি একেবারে ন্যাংটা। নিবারণ ওদের তাড়া দেয়, যা ঘরে যা, যা। মেয়েটির বয়েস তেরো। সে দুহাত আড়াআড়ি করে রেখেছে বুকের ওপরে। এক পলক শজারুটাকে দেখে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। ছেলেটা নড়লো না।

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, কী করবি এটাকে নিয়ে?

বিনোদ বলল, কেটে মাংস খাব।

—জ্যান্ত রাখতে পারলে বিকিকিরি করতে পারতি, ভালো দাম পেতি।

—জ্যান্ত স্যাজা ধরা কি সোজা কথা? কলাগাছের খোল থাকলে হত। তা তখন পাই কোথায়? শালা এখনও নড়াচড়া করছে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর বাঁচবে না। পেটটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছি!

—শালারা আমার ওঠোনের কচুগাছের তলা খুঁড়ে খেয়ে যায়। কখন আসে, টেরও পাই না। এক একদিন শেষরাতে ঝমঝম শব্দ শুনি, উঠে এসে আর দেখি না।

—ভূত ধরার ঠেঙে স্যাজা ধরা সোজা। তাও পারিস না?

পবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শজারুর মাংসের ভারি চমৎকার স্বাদ। লাল লাল মাংস, কত নরম, আর তেলে ভরা। ইস, কতকাল সে মাংসই খায়নি। এখান থেকে বিনোদের বাড়ি প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। কাল দুপুরবেলা যদি হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায়, গিয়ে বলবে, অ বিনোদ, একটু মাংস চাখতে এলাম। তাহলে কি আর দেবে না একটু?

কথায় কথায় বেশ সময় গেল। সুরেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো এবার যাওয়া যাক। ঠাউদ্দা, তুমি কাছাকাছি বাড়িরসব লোকদের ডেকে বল, ভূত খুঁজে দেখুক, এক এক ভূত দশ টাকা—ধরতেও হবে না, দেখিয়ে দিলে আমরাই ধরে নেবো, কিন্তু একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে হবে।

ভূত কিনে তুই কী করবি রে? সত্যিই ভূতের তেল হয়?

সুরেন্দ্র মুচকি হেসে বলল, দেখই না কী হয়। কত লোকের কত রোগ সারিয়ে দেব।

—তোর জন্য আমার ভয় হয় রে। শেষে তুই-ও ভূতের হাতে মারা যাবি। ওনাদের রাগ তো জানিস না, কোনোদিন রাগে পেলে তোর ঘাড়টা মটকে দেবে।

সুরেন্দ্র হা-হা করে হাসে। কিছুদিন আগে হলেও সে সদর্পে অনেক কথা বলতো। বুক চাপড়ে জানিয়ে দিত, কোনো ভূতের বাপের সাধ্য নাই তার ধারে কাছে আসে। কিন্তু এখন আর সে ওসব কিছু বলে না। ফাদার পেরেরা তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

পবন আবার বলল, তোর বাপকেও ভূতে ঘাড় মটকেছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, খাল পাড়ে পড়েছিল মানুষটা, চোখ দুটো ওল্টানো, ভয়ে কালসিটে পড়ে গিয়েছিল মুখে।

সে কতকাল আগেকার কথা। ও কথা শুনলে সুরেন্দ্রর আর দুঃখ হয় না। সে বলল, সেইজন্যেই তো ভূত ধরার ব্যবসা খুলিছি। বিনোদের মা শাঁকচুন্নি দেখে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল জলে। নেতাইয়ের বাপকে তাড়া করেছিল আলেয়া ভূত। ঘনাইয়ের মামা ভির্মি খেয়েছিল তিনবার। চল, চল, উঠে পড় সবাই।

কিন্তু ওরা উঠতে গিয়ে দেখল, দুটো হারিকেনের মধ্যে একটা নেই।

নিতাই বলল, আরে, আর একটা হ্যারকেন কোথায় গেল? এই তো রাখলাম এখানে।

পবন বলল, দুটো তো আনিস নি, একটাই তো ছিল।

বিনোদ জোর দিয়ে বলল, এঃ! দুটো হ্যারকেন এনে রেখেছি আমরা।

—তা হলে যাবে কোথায়? দ্যাখ না, অশথতলায় ফেলে এসেছিস কিনা। ভুলও তো হতে পারে।

—মোটেই এত ভুল হয় না। নেতাই একটা হ্যারকেন এনেছে আর সুখেন একটা।

নিবারণ মিনমিন করে বলল, তা হলে হ্যারকেন যাবে কোথায়? চোখের সামনে থেকে তো ভূতে নিয়ে যায়নি।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়ে স্যাজা দেখতে এয়েছিল। ওদেরই কেউ হাতে বাঝিয়ে নিয়ে গেছে।

নিবারণ ঘরের মধ্যটায় উঁকি দিয়ে বলল, কই, ওরা তো নেয় নি ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

নিতাই বলল, ওসব চালাকি কর না নিবারণকা। আমরা ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখব। একি মামদোবাজি?

নিবারণ বলল, ঘরের মধ্যে তোর কাকি শুয়ে আছে, আর তুই ঘরে ঢুকবি? আমাদের চোর ভেবিচিস?

—তা হলে হ্যারকেন গেল কোথায়?

—আমরা হ্যারকেন নিয়ে কী করবো রে গুয়োরবাটা? এক ফোঁটা ক্রাচিন কেনার মুরোদ আছে আমার? ঘরে একটা পয়সা নেই। দুদিন চাল কিনিনি।

ছেলেকে সমর্থন করে পবন বলল, পয়সা থাকলে আমি গোবর পুড়িয়ে খাই।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাক নিবারণকা। আমি ওদের জিজ্ঞেস করব।

গলার আওয়াজ পিতা-উচিত গম্ভীর করে নিবারণ ডাকল, পান্তি, গেনু, ইদিকে একবার শুনে যা।

মেয়েটি বেরুলো না, এল ছেলেটি।

সুরেন্দ্রর আগে নিবারণই জিজ্ঞেস করল, হ্যারকেন নিয়েছিস? ছেলে দুদিকে মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল, আমি নিইনি।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, এই গেনু, তোর দিদি কোথায়?

গেনু বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে হাত দেখিয়ে উত্তর দিল, ওই সেথায় গেছে।

কেন, ওই দিকে গেছে কেন?

মা'র সঙ্গে গেছে।

নিতাই ঠাট্টার সুরে বলল, নিবারণকা, তোমার বউ-মেয়েতে মিলে ভূত খুঁজতে গেছে নাকি?

পবন ধমক দিয়ে বলল, অমন অনাছিষ্টি কথা কবিনে নেতাই। পোয়াতি বউ রাতবিরেতে যাবে ভূতের সন্ধানে? আঁটকুড়ি পেত্নির নজর লাগলে পেটের ছেলে পেটেই মরে থাকবে। বাহিখানার ওধারে আমি কতদিন পেত্নি দেখিছি।

নিতাই ঝাংকার দিয়ে বলল, তাহলে পুতের বউ রাতবিরেতে ওদিকে যায় কেন?

নিবারণ বলল, তোর কাকির উদুরি অসুখ আছে।

—তা আমাদের হ্যারকেন নিয়ে গেছে, বলে গেলেই পারতো।

—কে তোদের হ্যারকেন নেছে? নিলে আমরা দেখতে পেতাম না?

—আরে, এ তো মহাজ্বালা! আমাদের হ্যারকেন কি শূন্যে উড়ে গেল?

সুরেন্দ্র বলল, চল, ওদিকে গিয়ে দেখে আসি।

পবন কিংবা নিবারণ নড়লো না। অন্যরা দল বেঁধে গেল বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে।

খানিকটা দূরেই একটা আমলকী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে পান্তি। এই শীতের মধ্যেও তার কোমরে ইজের

আর খালি গা। কিশোরী মেয়ের বুকে যে জিনিস শব্দ করে তার যৌবনের আগমন জানান দেয়, সে সেখানে তার দুহাত চাপা দিয়ে আছে।

ওদের দেখেই সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ইদিকে আসবেন নে, ইদিকে আসবেন নে!

কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে হারিকেনের ক্ষীণ আলো। সেদিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুরেন্দ্র বলল, হ্যারকেনটা জিজ্ঞেস করে আনিস নি কেন? আমরা পাঁচলা মোড়ে দাঁড়াচ্ছি, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যাবি।

নিতাই রসিকতা করে বলল, আর ওদিকে পেত্নি-টেত্নি দেখলে আমাদের চেঁচিয়ে ডাকিস, কপাৎ করে গিয়ে ধরে নে আসবো। দশ টাকা পাবি!

ঘরের দাওয়ায় বসে পবন বলল, খালধারে চৌধুরীবাড়ির বাবু একবার একটা ভূত ধরিছিলেন, জিয়ন্ত কঙ্কাল। কত ঝটাপটি করিছিল, কিন্তু কর্তাবাবু দড়ি দিয়ে বেঁধে ফ্যাললেন। আহা, আমাদের ভাগ্যে ওরকম হয় না। নগদ দশটা টাকা, সাতসের চাল খরিদ করা যায়।

গেনু জিজ্ঞেস করল, দাদু, তুমি সত্যি ভূত দেখেছ?

পবন বললো, হাঁরে দাদু, কতবার?

—আমাকে একবার দেখাবে? দূর থেকে একবারটি দেখব!

—দেখবি, ভাগ্যে থাকলে ঠিকই দেখবি। তবে না দেখাই ভাল।

দূরের দলটার দিকে তাকিয়ে নিবারণ বলল, শালাদের বড় টাকার গরমাই হয়েছে।

একটু পরে ঘুঙুরের রুনুরুনু শব্দ তুলে ওরা আবার চলে গেল দূরে। হারিকেনের আলোও মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িটা।

সুরেন্দ্রকে নিয়ে গ্রামের লোক খুব ধন্দে পড়েছে। বেশ কিছুদিন সবাই ভুলেই ছিল ওর কথা। ওর বাপ মারা যাবার পর ওদের বংশটাই মরে হেজে যেতে বসেছিল। ওর যখন বারো তেরো বছর বয়েস, তখন চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে রাখালি করতো। একদিন মেজোবাবুর চটিজোড়া পড়েছিল বৈঠকখানার সিঁড়িতে, ও ছোঁড়াটা সেটা হাত দিয়ে না সরিয়ে পা দিয়ে সরাতে গিয়েছিল, অমনি চোখে পড়ে গেল মেজোবাবুর। প্রচণ্ড ঠ্যাঙানি খেয়ে ধুঁকতে লাগল উঠোনে পড়ে। ছোঁড়ার নাকি চুরি-টুরির হাতটানও হয়েছিল। ঠ্যাঙানি খাবার দিন বিকেলবেলা ছোঁড়াটা গ্রাম ছেড়ে পালালো। তারপর শোনা গিয়েছিল ছোঁড়াটা শহরে গিয়ে সাইকেলের দোকানে পাম্প দেয়। তারপর কেউ ওর খোঁজ রাখে নি।

সে এখন আবার ফিরে এসেছে মস্তো জোয়ান মদ্দ হয়ে। কোন ফেকটরিতে নাকি কাজ করে, গায়ে রঙিন রঙিন জামা, হাতে ঘড়ি। বিড়ির বদলে সিগ্রেটই বেশি খায়। একদিন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে থুক করে থুতু ফেললে। একবার না, তিনবার। এমন কাণ্ড এ গ্রামে কেউ কক্ষনো করে নি।

ও-বাড়িতে অবশ্য কত্তাবাবুরা কেউ থাকেন না এখন। এক গোমস্তা শুধু টিমটিম করছে। গোমস্তাবাবু বুড়োমানুষ, তিনি আর কী করবেন, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন শুধু। পাইক বরকন্দাজ তো নেই আর একটাও। এখন সংবৎসরের ধানই ওঠে না।

গ্রামে কতকগুলান চ্যালা-চামুণ্ডা জুটেছে সুরেন্দ্রর। ফি-হপ্তায় শনি-রবিবার সে বাড়ি আসে। নিজেদের পোড়ো ভিটেয় আবার ঘর তুলেছে, সেখানে চ্যালাগুলাকে নিয়ে হল্লোট করে। খাওয়া-দাওয়া ভালোই জোটে কিনা ওখানে। গত মাসে ওরা পুবপাড়ার বহুকালের মজা দীঘিটা সাফ করতে গিয়েছিল। সাফ হয়েছে না ঘেঁটু হয়েছে, শুধু জলে নেমে দাপাদাপি। সবাই জানে, ওই দীঘিতে যখ আছে, প্রতি বছর একজন করে মানুষ টেনে নেয়। ওদের দলেরও একজন মরতে বসেছিল। মাঝপুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে আর দম পায় নি। হাঁক-পাঁক করতে করতে যখন উঠলো তখন মুখখানা নীল হয়ে গেছে। তবু ওদের আক্কেল হয় নি, আবার সামনের হপ্তায় নামবে।

আর এক ঢং হয়েছে, অমাবস্যার রাত্তিরে দল বেঁধে কেত্তন গাইতে গাইতে ঘোরা। গাঁয়ের অকর্মা ছোঁড়াগুলো এই এক কাজ পেয়েছে। সুরেন্দ্র নিশ্চয় ওদের নেশাভাঙের খরচাপাতি দেয়। কয়েকজনকে নাকি শহরের ফেকটরিতে চাকরিও জুটিয়ে দেবে বলেছে। সেটাই বড় টোপ।

ভূত কেনার অছিলায় সুরেন্দ্র কী বলতে চায়, তা অনেকেই বুঝেছে। সবাই তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে থাকে না। কিন্তু এতকাল এতলোক যা নিজের চক্ষে দেখেছে, তা মিথ্যে হয়ে যাবে? আর ভূতগুলোও হয়েছে মহা ফেরেববাজ, সুরেন্দ্রর দল দেখলে কিছুতেই সামনে আসে না। ভূতেরাও ওকে ভয় পায়? যা ষণ্ডামার্কা চেহারা, ভূতের বাবাও ওকে ভয় পাবে।

দিন দিন তেজ বাড়ছে সুরেন্দ্রর। ক্রমাগতই রেট বাড়াচ্ছে সে। আগে ছিল দশ টাকা, তারপর বিশ, তারপর

পঞ্চাশ, এখন একেবারে একশো টাকায় তুলেছে। এক ভূত ধরায়ে দিলে একশো টাকা। ধরাতেও হবে না, দূর থেকে দেখায়ে দিলেই হবে, আর দুজন সাক্ষী রেখে দেখালেই হবে। একশো টাকা শুনলেই মাথার রক্ত ছনছন করে। এ বাজারে একশো টাকা কে দেয়? মানুষের জীবনেরই দাম নাই, আর একখানা ভূতের দাম একশো টাকা। শালাকে ভূতে ঘাড় মটকায় না কেন? নাকি ভূতেরাই নিজেদের দাম চড়াচ্ছে আর আড়ালে বসে মিটিমিটি হাসছে।

সুরেন্দ্র নাকি প্রথম প্রথম গাঁয়ে এসে নিতাইদের বলেছিল, মানুষের আত্মা বলে কিছু নাই। কথাটা শুনলেই গা ছমছম করে। মানুষের আত্মা নাই? তাহলে কোথা থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া? এ-জন্মে দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও পরকালে সুখের আশা থাকে। আত্মাই যদি না থাকে, তা হলে আর পরকাল কী? হারামজাদা। এসব কথা যে বলে, মেরে তার মুখ ভেঙে দিতে হয়! প্রথমটা শুনেই মনে হয়েছিল, সুরেন্দ্র নিশ্চয়ই কেরেস্তান হয়েছে। তাহলে শালাকে একঘরে করার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কেরেস্তান তো নয়, গত বছর যে ও ধুমধাম করে দুর্গোপুজো করলে।

দুর্গোপুজো নিয়ে গত বছর একটা কাণ্ডই হয়েছিল। এ-গাঁয়ে একখানাই দুর্গোপুজো হয়, চৌধুরীবাবুদের বারবাড়িতে। চিরটাকাল যেমন হয়ে আসছে। গত পাঁচ সাত বছর ধরে বাবুরা কেউ গাঁয়ে আসেন না। জমিদারি লাটে উঠেছে, আয়পত্তর কিছু নেই, তাহলে আর আসবেন কেন? শুধু আছে ওই এক পেল্লায় ভাঙা বাড়ি। বাবুরা আর পুজোর খরচাও দেন না। কিন্তু মায়ের পুজো তো আর বন্ধ হতে পারে না। তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে ভাগাভাগি করে খরচাপত্তর দিয়ে পুজোটা সারা হয় নমো নমো করে।

গত বছর সুরেন্দ্র আর তার দলবল বললে, গাঁয়ের লোকের পয়সাতেই যদি পুজো হয়, তো সে পুজো হবে গাঁয়ের মাঝখানে চালা বেঁধে। জমিদারদের বাড়িতে হবে কেন? যে জমিদারদের কানাকড়ির মুরোদ নেই, সে কেন শুধু শুধু পুণ্যি লুটবে?...ব্যাটার এখনো রাগ আছে চৌধুরীদের ওপরে। যে বাড়িতে বরাবর দুর্গোৎসব হয়, হঠাৎ একবার বন্ধ হয়ে গেলে, সে বাড়ির ওপর মায়ের অভিশাপ নেমে আসে। সে কথা সুরেন্দ্র জানে। আরে ব্যাটা, জমিদারবাবুরা এখন তো মরমে মরেই আছে, তুই আর এখন কতটা মারবি। অমন দুর্দান্ত ছিলেন মেজোবাবু তাঁর ছোটছেলে এখন জেল খাটছে। কলেজে পড়ার সময় মার-দাঙ্গা করতে গিয়েছিল। মেজোবাবুর আর এক ছেলে রেলের গার্ড। হে-হে-হে-হে।

শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্র প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দুর্গোপুজো করিয়ে ছাড়লে। শহর থেকে চাঁদার বই ছাপিয়ে এনে পয়সা তুললে সব ঘর থেকে। দুর্গোপুজোর ঠিক আগেই ধান ওঠে, লোকের হাতে দু-পাঁচটা পয়সা থাকে। গাঁয়ের যে পাঁচটা ভদ্দরলোক আগের বছর পুজোর সময় সদ্দারি করতেন, তেনারাও ওদের সঙ্গে কোনো তক্কো-ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। যে-বাবুরা আগের বছর চাঁদা দিতেন পঁচিশ টাকা, তাঁরা দিলেন পাঁচ টাকা। সুরেন্দ্রর চেলারাই মাঠের মাঝখানে ছাউনি বেঁধে মাকে নিয়ে এল।

অষ্টমী পুজোর দিন মাঝরাতে সুরেন্দ্রর সে কি নাচ! ক বোতল মাল টেনেছিল কে জানে! চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মোষের মতন চেহারা, ব্যাটাকে দেখাচ্ছিল নন্দি-ভৃঙ্গীর মতন। দুহাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে নাচতে নাচতে সে কি মা মা বলে চেল্লানি। নেশার ঝোঁকে পায়ের ঠিক নেই, এক একবার ঢলে পড়ছে, ধুনুচিতে গনগনে আগুন, একবার তো সবসুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আগুন লেগে যে ওর চোখ দুটো কানা হয় নি, সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পড়লো তো আর ওঠেই না। ওর শাগরেদরা ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করে, হাত ধরে টানাটানি করে, তবু কোনো সাড়া নেই। অতবড় লাশকে টেনে তোলে কার সাধ্যি। শেষপর্যন্ত নেতাই যখন এক কলসি জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিতে যাবে, সেই সময় নিজেই লাফিয়ে উঠে হো-হো করে হাসতে লাগলো। ঢং। এতক্ষণ ঢং করছিল। যত সব নেশাখোরের কাণ্ড।

মেজোবাবুর যে ছেলে এখন জেল খাটছে, গত বছর পুজোর ঠিক পরপরই সে এসেছিল একবার গাঁয়ে। সঙ্গে দুই বন্ধু। আগে বাবুরা আসতেন মোটরগাড়িতে, এ ছেলে এলো মোটর সাইকেলে। তা ভালই করেছে, মোটর সাইকেলের বেশ একখানা জমিদার জমিদার শব্দ আছে। অতবড় চৌধুরীবাড়ির দুতিনখানা ঘরও এখন আস্তো আছে কিনা সন্দেহ। উঠলো সেখানেই। বুড়ো গোমস্তাবাবু নিশ্চয় ছোটবাবুর কাছে সব লাগানি-ভাঙানি দিয়েছে। পরদিন পাঁচুমুদির দোকানে ছোটবাবু নিজে এসে জিজ্ঞেস করলো, বলতে পারো, সুরেন কোথায় থাকে?

পাঁচুমুদি সাবধানে বললো, কোন্ সুরেন?

ছোটবাবু বলল, যে এবার গাঁয়ে বারোয়ারি পুজো করিয়েছে। সে নাকি আবার ভূত ধরার দলও গড়েছে?

পাঁচুমুদি বলল, তার বাড়ি তো পাঁচলা মোড় ছাড়িয়ে আরও এক মাইল, গাঁয়ের একেবারে কিনারে। কিন্তু রোজ তো সে গাঁয়ে থাকে না।

কিন্তু সেদিন রবিবার, সুরেন্দ্র ঠিকই থাকবে।

সবাই ভাবলো, এবার সুরেন্দ্রর সঙ্গে লাগবে ছোটবাবুর। অবস্থা পড়ে গেছে, তবু তো জমিদারি রক্ত শরীরে,

ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। এরকম চেহারার মানুষ আজকাল গাঁ দেশে একদম দেখাই যায় না। যখন জমিদারি ছিল, তখন দুচারজন অন্তত ছিল। এখন সব শহরে।

আগেকার দিন তো নেই যে ছোটবাবু পাইক পাঠিয়ে সুরেন্দ্রকে ধরে এনে জুতো পেটা করবে! বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই মোটর সাইকেলে চলে গেল ফটফটিয়ে। তারপর সুরেন্দ্রর সঙ্গে তার যে কী কথা হল, তা কেউ জানে না। তবে খানিকবাদে দেখা গেল, ছোটবাবু আর তার বন্ধুরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর ঘর থেকে। কী একটা কথার পর ছোটবাবু সুরেন্দ্রর কাঁধ চাপড়ে দিতে চায়, কিন্তু সুরেন্দ্র অত্যধিক লম্বা বলে ছোট-বাবুর হাত ঠিক মতন পৌঁছোয় না। বরং ছোটবাবু পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বার করতেই কিছু জিজ্ঞেস না করে সুরেন্দ্র তার থেকে একটা তুলে নিল। একেই বলে কলিকাল! দূর থেকে নিবারণ এটা নিজের চোখে দেখেছে।

কোনো কারণ না থাকলেও ছোটবাবুর প্যাকেট থেকে সুরেন্দ্রর ওই সিগ্রেট তুলে নেওয়া দেখে নিবারণের মনে পড়েছিল সুরেন্দ্রর সেই কথা, 'মানুষের আত্মা নেই।' ওঃ, ভাবলেই যাতনা হয়। অবশ্য সুরেন্দ্র পরে একথা স্বীকার করতে চায়নি। যোগেন মাস্টার জিজ্ঞেস করেছিল।

পাশাপাশি দু গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইস্কুল। সেই ইস্কুলে সরকারি নতুন মাস্টাররা আসে আর দু এক বছর বাদেই চলে যায়। আবার অন্য মাস্টার আসে। শুধু থেকে গেল যোগেন মাস্টার। যোগেন মাস্টার বিকে লের দিকে নদীর ধারে একা-একা বসে থেকে সূর্য ডোবা দেখে। ভাবুক মানুষ।

সেই যোগেন মাস্টার হাটবারে একদঙ্গল লোকের মাঝখানে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁ গো সুরেন, তুমি নাকি বলেছো, মানুষের আত্মা নেই?

সুরেন্দ্র কখনো পড়েনি যোগেন মাস্টারের কাছে। সে বিড়ি লুকোয় না। কিন্তু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও বলল না। ঘাড় চুলকে জবাব দিল, সে তো আপনারাই ভাল জানেন। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি কি অত বুঝি? আমি কখনো আত্মা দেখি নাই।

যোগেন মাস্টার গোঁফ-এঁটো-করা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, আরে পাগল, এই যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, সে বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাই? তার মানে কি বাতাস নেই?

যারা শুনছিল, তারা মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, জব্দ করেছে বটে যোগেন মাস্টার। এবার বল ব্যাটা, বাতাস নাই।

সুরেন্দ্র বলল, বাতাস চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ধরা যায়। যোগেন মাস্টার বলল, বাতাস ধরা যায়? বল কি হে? কেউ কখনো তা পেরেছে? বুকের মধ্যে একটুখানি বাতাস ধরে রাখো, অমনি প্রাণ-পাখি ছটফট করে উঠবে। কী, উঠবে না? তোমরা কী বল?

সকলে মাথা নাড়লো।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বেলুনওয়ালা। সুরেন্দ্র একটা নেতানো বেলুন খপাৎ করে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে সেটাকে লাউ করে ফেলল। তারপর সেটার ঠুঁটো চেপে ধরে হাত উঁচিয়ে বলল, এই দ্যাখেন মাস্টারমশাই, বাতাস ধরলাম। আপনি বুঝিয়ে দ্যান তো, আত্মাকে ধরা যায় এই ভাবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেই আমি মেনে নেবো!

মাস্টার বলল, আত্মাকে ধরবে? ও চিন্তাও করো না বাপ। উনি কখনো ধরা-ছোঁওয়া দেন না। নৈনং ছিন্দন্তি অং বং চং। তার মানে হল গে, আত্মাকে কখনো ছাঁদা করা যায় না, তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। আত্মা অজয় অমর।

সুরেন্দ্র বলল, মানুষ মরে গেলে যখন তাকে পোড়ানো হয়, তখন কি ফুস করে আত্মাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? কোথায় যায়?

মাস্টার বলল, তখন তা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর।

সুরেন্দ্র বলল, অ।

মাস্টার বলল, কি, কথাটা পছন্দ হলো না? তুমি মানলে না?

সুরেন্দ্র বলল, মানবো না কেন? আপনার মতন পড়া-লেখা জানা লোক যখন বলছেন, তখন কি আর ভুল বলবেন?

যোগেন মাস্টারের জয়ে সবাই বেশ খুশি হয়ে অবাকও হয় খানিকটা। সকলেই ভেবেছিল, সুরেন্দ্র ফাটাফাটি তর্কো করবে মাস্টারের সঙ্গে। বেলুনটা ফুলিয়ে সে বেশ একটা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে এত সহজে মেনে নিল লক্ষ্মী ছেলের মতন?

যোগেন মাস্টার বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে সুরেন্দ্রর গা চাপড়ে দিলেন। যেন সে একটি বেশ ভাল ছাত্তর। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন তুই নাকি ভূত ধরার ব্যবসা খুলেছিস?

সুরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের এক বাবু আমাকে অর্ডার দেছেন। একটা ভূত যোগান দিলেই আড়াই শো টাকা পাব। আমি কিনবো একশো টাকায়। আমার মোটা লাভ। এই দ্যাখেন না, এই হাট থেকে ব্যাপারিরা

প্যাঁজ কিনে নে যাচ্ছে সাতাশ টাকা মণ দরে। শহরে পাইকারি রেটে ছাড়বে পঁয়তিরিশ টাকায়। আমিও তেমনি চালানি ব্যবসা ধরেছি।

যোগেন মাস্টার এ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ করে হেসে উঠলেন।

সুরেন্দ্রও ঠিক সেই তালে তাল মিলিয়ে হাসতে লাগল। যেন সে সত্যিই বেশ একটা মজার কথা বলেছে।

—পেয়েছিস, একটাও?

—না।

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। একি ছেলেখেলা? ভূতের ব্যবসার কথা বাপের জন্মে শুনিনি। এসব কথা মন থেকে বাদ দাও। এ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস, কখন কী হয়ে যায়, বলা যায় না।

সুরেন্দ্র আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আপনার বাড়িতে একদিন যাব মাস্টারমশাই। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কথা হয় না। আপনি জানেন, আমার বাবাকে ভূতে গলা টিপে মেরেছিল।

মাস্টার বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

সুরেন্দ্র বলল, আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিল সেই টাকা, আত্মা না পরমাত্মা? কার বেশি টাকার দরকার? আপনার ঠেঙে জেনে আসব। গাঁয়ের একটা লোকও সেদিন সাক্ষী দেয়নি।

পুরোনো খালটা মজে হেজে গেছে। সরকার থেকেই সেই খালটা নতুন করে কাটাচ্ছে এবার। পাশের গাঁয়ের রহমান সাহেব সেই খাল কাটার ইজারা নিয়েছেন। এ-খাল দিয়ে আবার জল বইলে এ-তল্লাটে চাষের সুবিধে হবে। এই কথাটা ভেবে নিবারণ নিজেকে নিজে ভ্যাঙচায়।

আড়াই বিঘে জমি ছিল, গত ফাগুনে তা বন্ধক রাখতে হয়েছে। না রেখে উপায় ছিল না, নিবারণ নিজেই বড় শক্ত অসুখে পড়েছিল। যদি তার ছেলে, মেয়ে, বউ বা বাপের অসুখ হতো, সে জমি বন্ধক দিত না কিছুতেই, কিন্তু সে নিজে তাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ, সে মরে গেলে আর সকলকে বাঁচাতো কে? তার বাপ তো তিনকেলে বুড়ো। কুটোটি নাড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু এখনো রাক্কুসে খিদে আছে। মরেও না কিছুতে। তার অন্য ভাইরা কেউ বাপকে নেয়নি নিজেদের সংসারে। শুধু নিবারণেরই যত জ্বালা।

মহাজনকে সে বলে রেখেছে, ভাগচাষের স্বত্ব তারই থাকবে। নিজের জমিতেই সে ভাগচাষি হবে। ধান উঠে গেলে ওই জমিতে সে ফুলকপি বসাবে।

সরকার বাহাদুর খাল কাটাচ্ছেন। আর দুবছর আগে কাটাতে পারেন নি, যখন জমিটুকুন নিবারণের নিজেরই ছিল? এখন ভাগচাষ করে সে সংসারের পেট ভরাবে, না বন্ধকি দেনা শুধবে?

দৈনিক পঞ্চাশজন লোক লাগে খাল কাটার জন্য। সারা গাঁয়ের লোক গিয়ে হামলে পড়েছিল। কারুর হাতে এখন কাজ নেই। নিবারণরা বংশ-পেশায় ঘরামি। এখন কাজ জোটে না। এক কাহন খড়ের দাম চব্বিশ টাকা। যাদের হাতে দুপয়সা আছে, তারা টালি দিয়ে চাল ছাইছে, সেজন্য শহর থেকে মিস্তিরি আসে।

রহমান সাহেব নিজের গাঁ সোনামুড়ি থেকেই মাটি কাটার মজুর নিয়েছিলেন পঞ্চাশজন। সেই নিয়ে পরশুদিন খুব হাঙ্গা হয়ে গেল। খালটা দু গাঁয়ের মাঝখানে, তা হলে শুধু এক গাঁয়ের লোক কাজ পাবে কেন? এ-গাঁয়ে কাজের মানুষ নেই?

রহমান সাহেব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সব শুনেটুনে উনি ঠিক করে দিয়েছেন, প্রতিদিন এ-গাঁ থেকে পঁচিশজন, ও-গাঁ থেকে পঁচিশজন কাজ পাবে। এক লোক পরপর দুদিন কাজ পাবে না। সাড়ে চার টাকা রোজ, আর একবেলা খোরাকি।

নিবারণ গতকাল কাজ পেয়েছিল; আজ পাবে না। ঘরামির ছেলে শেষ পর্যন্ত মাটি কাটা কুলি। আজকাল অত কিছু ভাবলে চলে না। ভাত এমন চিজ, খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।

আজ তার কাজ নেই, তবু নিবারণ খালধারের দিকে যাচ্ছে। অন্য কোনো কাজও তো নেই এখন, তবু ওসব দেখতে ভাল লাগে।

যেতে যেতে তার বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভাল। পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরে না। সুরেন্দ্র ফিরল কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে শয়ে টাকা, কিন্তু এমনি তো সে কারুকে দেবে না। ভূত কেনার বায়না! নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কতদিকে সুরাহা হত। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না। এই পৃথিবীতে কারুর থাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি,

আর কেউ প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারে না, এটাই বুঝি ভাগ্যের নিয়ম! কতজনে কত ভূত দেখে, তার ভাগ্যে জোটে না একটাও! সন্ধের পর সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজে, চমকে ওঠে দু একবার, তারপর ভাল করে চোখ কচলে দেখে। না, একটা কলাগাছ, কিংবা বেল গাছ। দূর, দূর!! তখন আরও রাগ হয় সুরেন্দ্রর ওপর।

খাল পাড়ের উঁচু বাঁধটার ওপরে এসে দাঁড়ায় নিবারণ। বুক চিতিয়ে নিশ্বাস নেয়। খালি পেটে বেশি হাওয়া খেলে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। মন খারাপ লাগে। পঞ্চাশটা লোক একসঙ্গে মাটি কাটছে, ওরা যেন সবাই আলাদা, নিবারণ ওদের কেউ নয়! আর খানিকবাদেই ওরা নগদ সাড়ে চারটা টাকা পাবে, নিবারণ পাবে না। কদিন ধরেই তার বউটা পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছে। রাত্তিরবেলা ঘুঙিয়ে ঘুঙিয়ে কাঁদে। এইসময় ওর একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার দরকার। একটু দুধ পেলে শরীরের পুষ্টি হত, পেটের বাচ্চাটা...। কিন্তু দুধ...কতদিন আগে পয়সা দিয়ে দুধ কিনেছে, মনেই পড়ে না নিবারণের। পুকুরের ধারে কলমিশাকপাতা আপনি জন্মায়, ক'দিন ধরে সেই কলমিশাক সেদ্ধ আর ফ্যান ভাত চলছে।

আকাশটাকে গাঢ় লাল রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এই সময় আকাশটাকে ভগবানের রাজবাড়ির মতন মনে হয়। সেদিকে হাত তুলে মনে মনে নিবারণ বলল, এ-জন্মে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান, পরজন্মে একটুখানি সুখ দিও, যেন দুবেলা পেটপুরে দুটো ভাত খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোদের হাতে একটু নাড়ু-বাতাসা দিতে পারি।

ডানদিকে, খানিকটা দূরে নিমগাছটার তলায় একটা ছোটোখাটো জটলা। বিনা পয়সায় দু এক টান বিড়ি খাওয়ার লোভে নিবারণ সেইদিকে এগিয়ে গেল। এবং গিয়েই একটা চমকপ্রদ খবর শুনল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিংস্র আনন্দে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। সে যেন এবার তার সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে।

উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে জোর করে মাথা গলিয়ে নিবারণ জিজ্ঞেস করল, ওসব কথা ছাড়ো দিকিনি! কেউ নিজের চোখে দেখেছে?

সোনারং গ্রামের বাঙাল চারু বলল, নিজের চোখে দেখিনি কি চাটাম মারছি নাকি?

নিবারণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এখনো আছে?

—এই তো ভানু দেখে এয়েছে একটু আগে। মাটিতে গইড়ে ছটফটাচ্ছে।

—সত্যি রে, ভানু?

ভানু অতি সরল নির্বোধ লোক। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস থেকেই তার মাথায় টাক। সবাই জানে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই ভানুর।

ভানু বলল, হ্যাঁ দেখিছি, কালো জামগাছটার তলায়। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ওঝা এয়েছে। এমন ধুনো জ্বেলেছে না, চোখ জ্বালায় আমি আর তিষ্ঠুতে পারলাম না।

নিবারণ রাগ করে বলল, ওঝা? তোদের শালার কি ঘটে বুদ্ধি হবে না কোনোদিন? সুরেন্দ্রকে খবর দিস নি কেন? সে বাঞ্চোৎ যে বড় তড়পায়! সে হারামির বাচ্চাটা আজ দেখাক তার কতখানি মুরোদ।

ভানু বলল, সুরেন্দ্র তো টাউনে?

—শালাকে টাউন থেকে ধরে নিয়ে আয়! ওর ইচ্ছে মতন তেনারা কী শুধু ছুটির দিনে দেখা দেবেন?

—মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা সুরেন্দ্র টাউন থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কোন মাগিকে নাকি ওর মনে ধরেছে।

—তবে ডাক না শালাকে!

সকলে হৈ-হৈ করে খালপাড়ের বাঁধ থেকে নেমে গ্রামের দিকে ছুটে গেল। সুরেন্দ্রর বাড়ি গ্রামের এক টেরেয়। বাড়ির লগ্তের ধানি জমি এককালে তাদেরই ছিল। তার বাপ ছিল খুব শক্ত হাতের চাষি। কথাবার্তায় কাউকে রেয়াৎ করতো না। অল্প জমিতে গায়ে খেটে সে নিজের বউ-ছেলেকে দুবেলা খইয়ে পরিয়ে রেখেছিল।

সে জমি-জেরাত সব গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনো আছে। গ্রামের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। সব সময় ফন্দি-ফিকির করে এ ওর জমি কিংবা বাগান নিজের ভাগে নিয়ে নিতে চায়। মিথ্যে মোকদ্দমা লাগে। তা ছাড়া গা-জুয়ারি দখল তো আছেই। কিন্তু অন্যের বসতবাড়ি কেউ চট করে দখল করতে চায় না। সব গ্রামেই একখানা দুখানা বসতবাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, মালিকের কোনো পাত্তা নেই, দিনেরবেলা ঘুঘু চরে সেখানে, তবু অন্য কেউ সে বাড়িতে চট করে বাস করতে আসে না। তাতে বাস্তুদেবতা অসন্তুষ্ট হন। অভিশাপ দেন। সেইজন্যই, এমনকি পাশের বাড়ির লোকও আত্মীয়-কুটুম হঠাৎ এসে পড়লে নিজেদের বাড়িতে জায়গা না থাকলেও তাদের সেই ফাঁকা বাড়িতে থাকতে পাঠায় না। বরং সেটা পোড়োবাড়ি হয়ে যাক, তাও ভাল। লোকে জানালা দরজাগুলো খুলে নিয়ে জ্বালানি করে।

সুরেন্দ্র নিজেদের বাড়িটাতে জানালা কপাট বসিয়ে আবার বাসযোগ্য করে তুলেছে। শহরে তার ফ্যাকটরির পাশে নিজস্ব কোয়ার্টার আছে। সেখানে পাকা নর্দমা আর কলের জল। তবু সুরেন্দ্র আজকাল প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে এসে

থাকতে ভালোবাসে। এই মাটি তাকে টানে। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে নিজের ঘরে একা শুয়ে থেকে সুরেন্দ্র আপনমনে কাঁদে। গলগল করে চোখের জল বেরোয়। অত বড় দশাসই লোকটা যে কাঁদতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুরেন্দ্র কাঁদে একা। তার খুব কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। একদিন নিষ্ঠুরের মতন সে তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। চৌধুরীবাবুরা বিনা দোষে তাকে শুয়োর পেটা করার ফলে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। মায়ের কথাও তখন তার মনে পড়েনি। সে পালিয়েছিল। তার মা খেতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে গেছে। এই ঘরে। তার মায়ের নাকি ওলাউঠা হয়েছিল বলে গাঁয়ের কেউ তাকে ছোঁয়নি, তিনদিন ধরে বাসি মড়া পড়েছিল এখানে। তারপর থেকে আর ভয়ে কেউ এ-বাড়ির পাশ মাড়াতো না।

সুরেন্দ্র এতদিন বাদে ফিরে এসেছে এই গাঁয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এখন তার পকেটে টাকা আছে, শরীরে বল আছে, মনে জোর আছে—তবু সে আর তার মাকে ফিরে পাবে না।

নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সুরেন্দ্র এক একবার ভাবে, একদিন সে এ গ্রামেরই কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে। তাহলে, তখন হয়তো এ গ্রামের ওপর তার মায়া পড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম মেয়ে কই? কারুকেই চোখে ধরে না। রূপের কথা ছেড়েই দাও, একটারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। কারুর ভাল করে বুকটুকুও ওঠেনি।

বাইরে থেকে কে যেন মোটা গলায় ডাকে, সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র!

ঠিক যেন তার বাবার গলা।

সুরেন্দ্র শুয়ে শুয়ে হাসে। গাঁয়ের উটকো ছেলেরা তাকে নানারকম ভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে অনেকবার। টিনের চালে ঢেলা ছুঁড়েছে, জলে ডোবানো বেড়াল ছেড়ে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। একদিন তক্কে তক্কে থেকে সুরেন্দ্র কয়েকটা ছোঁড়াকে ধরে ফেলে বেধড়ক ধোলাই দিয়েছিল। তারপর থেকে ওসব উৎপাত অনেকটা কমেছে, কিন্তু দু-চারজন এখনো তার পেছনে লেগে আছে। আবার ধরতে পারলে হয়।

আবার সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র বলে ডাক উঠতেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ নেই। আকাশে তৃতীয়ার ফালি চাঁদ। কয়েকটা চামচিকে উড়তে উড়তে চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে। পরপর চারটে নারকোল গাছের সব কটা পাতা এখন হাওয়ায় উত্তরমুখো।

কেউ নেই, তবু কে ডাকল?

সুরেন্দ্র চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। খানিক আগে সন্ধে হয়েছে। এর মধ্যেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে মোহনিদ্রা। সুরেন্দ্র নিজের কপাটবুকে হাত বুলিয়ে মনে মনে বলল, ওরকম হয়। একলা থাকলে ওরকম শোনা যায়। আর বেশিদিন একলা থাকতে ইচ্ছে করে না।

অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে কারা যেন হেঁটে আসছে। সাত আটজন মানুষ। তারা আসছে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে, এ বাড়ির দিকেই। সুরেন্দ্র স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলের প্রথমেই আছে নিতাই। সে লাফাতে লাফাতে এসে বলল, সুরেনদা, ও সুরেনদা জবর খবর আছে! আমি তোমার কাছেই আসছিলাম, পথে এনাদের সঙ্গে দেখা হল। জবর খবর!

সুরেন্দ্র বিনা উত্তেজনায় বলল, কী খবর?

—সোনারং গাঁয়ের সর্বানন্দ দাসের পুতের বউকে ভূতে ধরেছে।

সুরেন্দ্র ঠাট্টা করে বলল বটে? কতখানি ভাং খেয়েছিস?

এবার অন্য চার পাঁচজন এগিয়ে এসে বলল, সাচ্চা কথা! সর্বানন্দের ছেলে বিভূতির বউকে পেত্নিতে ধরেছে। সকাল থেকে মাটিতে পড়ে ছটফটাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কথা বলছে পেত্নিটা। কী সব কুচ্ছিত কথা!

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখেই সুরেন্দ্র বলল, বটে! কী কুচ্ছিত কথা বলতো শুনি?

—সে তুমি গেলেই নিজের কানে শুনতে পাবে।

—আপনারা কেউ শোনেন নি? কেউ চোখে দেখেছেন?

নিবারণ উগ্র গলায় বলল, আলবত দেখেছে। এই তো চারু আর ভেনো—দুজনেই দেখেছে। ওঝা এসেও সে পেত্নিকে ভাগাতে পারছে না।

—সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি কোথায়?

—সে তো দুর্গাপুরে কাজ করে।

—ওদের বাড়ির কেউ আছে এখানে? ওদের বাড়ির কেউ তো ডাকতে আসে নি আমাকে।

—কেন, আমরা বললে তুই যাবি না? আমাদের কথা কথা নয়? আমরা কি ফ্যালনা?

—দ্যাখো, আমি সাফ কথা বলি। সর্বানন্দের বাড়ি দুআড়াই মাইলের রাস্তা। অতখানি রাস্তা উড়ো কথা শুনে যদি শুধুমুধু যেতে হয়, তার চেয়ে ঘরে বসে কেত্তন গাওয়া অনেক ভাল!

—নাকি তুই ভয় পাচ্ছিস এখন?

সুরেন্দ্র এবার হাসল। এত বয়স্ক বয়স্ক লোকদেরও তার খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। এদের মাথায় গোবর। সে বলল, আমার এমন লাভের কারবার, তাতে কী ভয় পেলে চলে? কিন্তু খাঁটি মাল পাচ্ছি কোথায়?

এবার গিয়েই দ্যাখ না।

—যাচ্ছি তা হলে। কিন্তু গিয়ে যদি দেখি ভাঁওতা, তা হলে কিন্তু উত্তম ফুত্তম করে ছাড়বো আমি। আমার সঙ্গে মাজাকি কর না। আমি সরল কথার মানুষ।

সুরেন্দ্র ঘরের মধ্যে ফিরে গেল রেডি হয়ে নিতে। অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু নিতাইয়ের অধিকার আছে ঘরে ঢোকার।

সুরেন্দ্র একটা ঝোলার মধ্যে কয়েকটি জিনিস ভরে নিচ্ছে। একটা ছোট টিনের বাক্স, তার মধ্যে কী আছে, নিতাই জানে না। একটা টর্চ। এক বান্ডিল ব্যান্ডেজের কাপড়। আর একটা বিলিতি মদের (দিশি-বিলিতি) খালি বোতল।

নিতাই জিজ্ঞেস করল, সুরেনদা, খালি বোতলটা নিচ্ছো কেন?

এক গাল হেসে সুরেন্দ্র বলল, জানিস না? এই বোতলের মধ্যেই পেত্নিটাকে ভরবো। ভূত-পেত্নিরা বোতলকে বড় ডরায়। যেই বোতলটা তুলে ধরবো, অমনি তার মধ্যে সুরুত করে এসে ঢুকে পড়বে। শালা! তুইও ওদের কথায় নেচেছিস!

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুরেন্দ্র বলল, চল। কয়েক পা এগিয়েই নিবারণ তাকে জিজ্ঞেস করল, টাকা এনেছিস তো সুরেন? একশো টাকা দিবি বলে কথা দিয়েছিস, আজ তোর টাকা খসবে।

সুরেন্দ্র নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিল, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন নিবারণকা? ভাল মাল পেলে আমি দাম দেব। টাকা যদি পায় তো পাবে সর্বানন্দ দাস, তোমাকে কি তার থেকে একটা পয়সাও দেবে?

নিবারণ খানিকটা চুপসে গেল। তবু সে মনে মনে বলল, তা আমি পেলাম আর না পেলাম, তবু তোর পকেট থেকে টাকা খসতে দেখলেই আমার আনন্দ হবে। হারামির বাচ্চা, তোর তেজ আজ ভাঙবে!

সর্বানন্দ দাসের অবস্থা এককালে বেশ স্বচ্ছল ছিল। এখন আর তেমন রমরমা নেই, জমি-জায়গা বেহাত হয়ে গেছে, তবু তার বড় ছেলে শহরে চাকরি করে বাড়িতে টাকা পাঠায়। বাড়িটি বেশ সুন্দর। মস্তবড় উঠোনের চারপাশে চারটি ঘর। আর সে বাড়ি ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো সুপুরিগাছ। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটি সুপুরিগাছ ঘেরা পথ চলে গেছে পুকুর পাড় পর্যন্ত। উঠোনের এককোণে একটি বড় কালোজাম গাছ।

বাড়িটি এখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ভিড় সামলাবার চেষ্টাও কারুর নেই। যার যা খুশি করছে, লোকের চ্যাঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। সেই সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া। একটা হ্যাজাকের আলো ঘিরে উড়ছে অসংখ্য পোকা।

সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তি শুয়ে আছে উঠোনে। তার সর্বাঙ্গের পোশাক ভেজা, মাথার চুল জল কাদায় মাখামাখি। চোখ দুটি বন্ধ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে অনবরত। শরীরটা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে হঠাৎ বেঁকে দুমড়ে উঠছে, যেন অসহ্য যন্ত্রণায়।

বড় একটা মাটির মালসায় টিকের আগুন জ্বেলে তাতে একটু একটু ধুনো দিচ্ছে সর্বানন্দ নিজে। আর শান্তির পাশে বসে ওঝা অনবরত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে চোখ বুজে, তার হাতে একটা ঝাঁটা।

ওঝাটি বেঁটে বাঁটকুল। এ গ্রামের মহাদেব ওঝার ছিল দারুণ নাম ডাক। আশপাশের দশ বিশখানা গাঁ থেকে তার বায়না হত। চেহারাও ছিল সাঙ্ঘাতিক, দেখলে ভয় ও ভক্তি—দুটোই জাগতো। মেয়েমানুষের মতন কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, এদিকে গালভর্তি চাপদাড়ি, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা, চোখ দুটিও সেইরকম লাল, হাতে একটা ডাণ্ডা। এই মহাদেব ওঝা নাকি মন্ত্রের জোরে ভূত-প্রেতদের তিড়িংবিড়িং করে নাচাতে পারতো। মাস ছয়েক আগে সেই মহাদেব ওঝা মারা গেছে। সে নাকি নিজের শরীরের মধ্যে এক সঙ্গে দুটো ভূত ঢুকিয়ে আটকে রাখতে গিয়েছিল।

পুরুতের ছেলে যেমন পুরুত হয়, তেমনি ওঝার ছেলেও ওঝা হয়েছে। কিন্তু বাপের চেহারা পায় নি ছেলে। বয়েস তার মাত্র কুড়ি-বাইশ, দেহটি নাদুস নুদুস। তা হোক, বাপের কাছ থেকে মন্ত্রগুলো তো সব পেয়েছে। তার আর একটি বড় গুণ আছে, সে জিভ দিয়ে নিজের নাক ছুঁতে পারে।

মহাদেবের ছেলের নাম সুবল। সে মাটিতে জোড়াসন করে বসে খুব ভাব দিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, আর বউটি যেই মাঝে মাঝে বেঁকে দুমড়ে উঠছে, অমনি সে হাতের ঝাঁটা দিয়ে সপাং সপাং করে পিটোচ্ছে। মহাদেব ওঝা নাকি মারের চোটে রক্ত বার করে দিত। সুবল অতজোরে মারতে না পারলেও তার গালাগালির জোর আছে। শান্তি একবার বেশি করে হাত-পা ছুঁড়তেই সুবল ওঝা এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারতে মারতে বলল, যা, যা, আবাগির বেটী, শতেক ভাতারি, দূর হ! দূর হ!

সুরেন্দ্র ভিড় ঠেলে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়াল। মিশমিশে কালো যমদূতের মতন তার চেহারা। রাগে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে। প্রথমেই তার ইচ্ছে হল, সুবল হারামজাদাকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটো লাথি কষায়। শুয়োরের বাচ্চাটা মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে! সুরেন্দ্র দুপা এগিয়েও গেল তার দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারলো না। তার মনে পড়লো ফাদার পেরেরার কথা। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া কারুকে মারতে নেই। যখন তখন মারামারি করে জন্তুরা। তুমি তো মানুষ, সুরেন্দ্র!

সে ঝুঁকে সুবলকে বলল, দেখি কর্তা, ছাড় ছাড়! আমি একটু দেখব।

আজ যদি মহাদেব ওঝা থাকতো, তাহলে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত একটা। মহাদেব ওঝার কাজে কেউ কখনো বাধা দিতে সাহস করে নি। সুরেন্দ্রর মতন সা-জোয়ানকেও গ্রাহ্য করতো না সে, তার গায়েও শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ছেলেটি হয়েছে অকালকুষ্মাণ্ড!

সুবল মিনমিন করে বলল, আমার কেস, তুমি দেখবার কে? বেটিকে এই তাড়ালুম বলে! আর একটুখানি।

সুরেন্দ্র তাকে পোকামাকড়ের মতন অগ্রাহ্য করে বলল, সরো, সরো!

তারপর সর্বানন্দকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল?

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে একটা হাত তুলে বলল, ওই জামগাছটা—

সুবলই এবার বাকিটা বলে দিল। আজ ভোরবেলা বাসি কাপড়ে এই বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। তখনও ভাল করে সূর্য ওঠে নি। ঘর থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখলো, তিনটে কই মাছ। একটা বড় মাটির হাঁড়িতে কাল রাত থেকে কইমাছ ভিয়োনো ছিল। এ বাড়িতে প্রায় এরকম জিওল মাছ রাখা থাকে। কোনোক্রমে হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে- ছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা মাছ। বেড়ালে যে খেয়ে ফেলে নি, তাই ভাগ্যি। বেড়াল অবশ্য জ্যান্ত কই মাছকে ভয় পায়। বউ তাড়াতাড়ি মাছগুলোকে ধরে হাঁড়িতে ভরলো। সেই আঁশ হাত না ধুয়েই মুছে ফেলল কাপড়ে। তারপর ঘুমচোখে জল খালাস করে আবার ঘরে ফিরে শুতে যাবে, এমন সময়—

এই পর্যন্ত বলে সুবল থামল। উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্রায় বার পঞ্চাশেক শুনেছে, তবু সুবল খানিকটা নাটকীয় করবার জন্য বলল, ওই জামগাছটা, ওই জামগাছে ওঁত পেতে বসেছিল দুটিতে, দুই দুষ্টু আত্মা, ওরা তো এইসব সুযোগই খোঁজে! বাসি কাপড়ে আঁশ হাত মুছেচে, তার ওপর পেচ্ছাপ করে এসে পায়ে জল দেয় নি, বউ যেই জামগাছতলা দিয়ে আসছে, অমনি গাছের একটা ডাল নিচু হয়ে নেমে এসে মারলো তার মাথায় একটা ঝাপটা। ব্যস, সেই যে পড়ে গেল উঠোনে, তার তাকে নড়ানো যায় না।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, অত ভোরে আর কেউ জেগেছিল? কেউ দেখেছে যে বউ কইমাছ ধরেছিল? কিংবা পায়ে জল দেয় নি?

সুবল বিজ্ঞের মতন বলল, দেখতে হবে কেন? আমি তো কেস দেখেই বুঝে নিয়েছি। ওই যে বারান্দায় জিওল মাছের হাঁড়িটা এখনো রয়েছে।

সুরেন্দ্র বলল, হুঁ!

সুবল বলল, প্রমাণ চাও? দেখবে?

হাতের ঝাঁটা দিয়ে শান্তিকে খুব জোর একটা বাড়ি মেরে বলল, হারামজাদি, ছোটলোকের নাণ্ডি, বল বল, বউ বাসি কাপড়ে মাছ ধরে নি?

শান্তির মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুলো, উঁ উঁ।

ওই দ্যাখো, স্বীকার পেয়েছে। আরও শুনবে?

আবার সে শান্তিকে ঝাঁটা মেরে বলল, গুখাগি, বল, গাছের ডাল নিচু হয়ে এসে ওর মাথায় মারে নি? বল, মারে নি?

এবার শান্তির মুখ দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বেরুলো, মেঁরেচে, মেঁরেচে!

সুবল সগর্বে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

সুরেন্দ্র সুবলের হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

শান্তি এ-গ্রামের মেয়ে নয়। সর্বানন্দের মামার বাড়ি রসাপাগলা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সর্বানন্দ এই মেয়ে পছন্দ করে এসেছিল। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি মহকুমা শহর থেকে বি-এ পাস দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এ মেয়েকে মানিয়েছিল ভাল। ঘরের বউ হয়েও শান্তি জোড়াবিনুনি করতো অনেকদিন। শহরে খরচ বেশি বলে বিভূতি এই দুবছর হল বউকে গ্রামের বাড়িতে রেখেছে; সে নমাসে ছমাসে একবার আসে। এখনো বাচ্চাকাচ্চা হয় নি, ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বউ বাঁজা।

সুরেন্দ্র তাকিয়ে রইলো শান্তির দিকে। একটু আগে উপুড় হয়েছিল এখন সে চিৎ হয়েছে, একটা হাত চাপা পড়েছে

পিঠের তলায়, মুখটা মাটির দিকে ফেরানো। ভরা যৌবনের এক নারী এতগুলো লোকের চোখের সামনে পড়ে আছে মাটিতে, ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে, আঁচলটা অজগর সাপের মতন গোল হয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে পায়ের কাছে, কোমরের কষিও আলগা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু সে চোখে কোনো দৃষ্টি নেই।

বাঁজা মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। সুরেন্দ্র এ পর্যন্ত দু গাঁয়ের মধ্যে শান্তির মতন সুন্দরী আর দেখেনি।

সুবল বললো, এক সঙ্গে দু দুটো দুষ্টু আত্মা এসে বসেছিল ওই জামগাছে। মদ্দাটা এখনো বসে আছে ওখানে, আমি গাছটার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিয়িছি, এদিকে আসতে পারবে না। পেত্নিটা সেঁধিয়েছে বউয়ের শরীলে। এক সঙ্গে ছাড়া দুটোতে যাবে না।

সুরেন্দ্র এগিয়ে গেল জামগাছটার দিকে। সুবল চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে যেও নি, গায়ে বাতাস লেগে যাবে, তোমার গাছে বাতাস লেগে যাবে বলে দিচ্ছি। মদ্দাটা এখনো বসে আছে। দ্যাখো না হাওয়া বাতাস নেই, তবু ডগার ডালটা আপনা আপনি নড়ছে।

ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় সত্যিই মনে হয়, জামগাছের ডগার ডালটা দুলছে একটু একটু।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, ও যেতে চায় যাক না।

সুরেন্দ্র নিচু হয়ে তার খাকি প্যান্ট গুটিয়ে ফেলল হাঁটু পর্যন্ত, তারপর তরতর করে উঠে গেল জামগাছে। সবচেয়ে মোটা ডালটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় সে?

সুবল বলল, আরো ওপরে, একেবারে ডগায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাসছে ব্যাটা। আর একটু ওপরে ওঠ, টেরটি পাবে।

সুরেন্দ্র বুঝল ওর চালাকিটা। জামগাছের ডাল তেমন মজবুত নয়। তাদের বাড়িতে একটা জামগাছের পিঁড়ি ছিল, কথা নেই বার্তা নেই একদিন এমনিই সেটা মাঝখান থেকে ফেটে দুভাগ হয়ে গেল। এখন সে তার এতবড় শরীরটা নিয়ে যদি আরও ওপর ওঠে, তাহলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যাবে। আর না উঠলে ওরা বলবে, সে হেরে গেল!

কোমরের বেল্টটা খুলে সে একটা গোল ফাঁস করলো। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে যতটা লম্বা হওয়া সম্ভব লম্বা হয়ে, সে বেল্টের ফাঁস দিয়ে ধরার চেষ্টা করলো ডগার ডালটা। একবার ধরতে পেরেই সে মট করে ডাল ভেঙে সেটা হাতে নিয়ে নেমে এলো নিচে।

গাছের ডালটা সে সুবলের নাকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো, এর মধ্যে তোমার মদ্দা ভূতটা বসে আছে?

সুবল ভয় পেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল খানিকটা।

শান্তি এর মধ্যে উঠে বসেছে আর ফিকফিক করে হাসছে। সুরেন্দ্রর দিকে হাতছানি দিয়ে বললো, এই শোনো, শোনো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, ডেকেছে, ডেকেছে, পেত্নিটা ওকে ডেকেছে।

সুরেন্দ্র খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক যেন স্বাভাবিক মানুষের মতন গলা। তবে কি বউটা এতক্ষণ নকল যাত্রা করছিল? সুবলের হাতে এত মার খেয়েও?

পাকানো আঁচলটা তুলে নিয়ে শান্তি গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হলো। সেই রকমই ফিকফিকিয়ে হেসে হাতছানি দিয়ে সুরেন্দ্রকে বলতে লাগলো, এই শোনো, শোনো, শোনো না—

সুরেন্দ্র এগিয়ে বললো, কী?

—শোনো। আরও কাছে এসো—

আর একটু এগিয়ে সুরেন্দ্র বললো, কী?

শান্তি মাটির ওপর চাপড় মেরে বললো, বসো, এখানে এসে বসো। লজ্জা কি? আমাকেও তোমার লজ্জা? তুমি যে আমার নাগর। বসো—

সুরেন্দ্র মাটিতে বসলো।

শান্তি বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কানে কানে বলবো—

সুরেন্দ্র বললো, ওইখান থেকেই বলো—

পা ঘষটে ঘষটে শান্তি নিজেই চলে এলো সুরেন্দ্রর কোলের কাছে। তার মাথাটা ধরে টানলো। সুরেন্দ্র খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে। শান্তি তার কানে কানে কী যেন বলতে চায়।

সুরেন্দ্রর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে শান্তি ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগলো। সুরেন্দ্র বুঝতে পারলো না তার একটাও বর্ণ। এক সময় সে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলো। শান্তি তার কান কামড়ে ধরেছে। সুরেন্দ্র ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল শান্তিকে। তার কান দিয়ে দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে।

জনতা হেসে উঠলো হো-হো করে। সুরেন্দ্রর দুর্দশা দেখে তারা দারুণ মজা পেয়েছে। সেইদিন থেকে তার নাম হয়ে গেল, 'কানকাটা সুরেন!'

কিন্তু জনতার হাসিও থেমে গেল শান্তির অকস্মাৎ হাসিতে। শান্তি হি হি হি হি করে হেসে উঠলো, তার ঠোঁটের পাশে রক্ত। তারপর একটা অদ্ভুত বিকট গলা বার করে বললো, এই সুরেন্দ্র, আমাকে বিয়ে করবি? আয় না! বিয়ে করবি? তোতে আমাতে পাটক্ষেতে লুকিয়ে থাকবো। বিয়ে করবি? এই সুরেন্দ্র! আয় না!

সবাই জানে, সর্বানন্দের ছেলের বউ শান্তি বড় লাজুক মেয়ে। পাঁচজনের সামনে সে কক্ষনো রা কাড়ে না। বিশেষত শ্বশুরের সামনে সে কোনোদিনও এরকমভাবে খারাপ কথা বলবে না। তা ছাড়া এ তো শান্তির গলা নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।

শান্তি আবার হাসতে লাগলো হি হি হি হি করে। মানুষে সেরকম হাসতে পারে না। ঠিক যেন দুটো ছুরিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। শুনলেই গা ছমছম করে। অনেকেই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সুরেন্দ্র রুমাল দিয়ে তার কানটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভিজে গেছে তার ঘাড়ের কাছের জামা।

শান্তি এবার সুরেন্দ্রর বুকের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, খেলবি? আমার সঙ্গে খেলবি? এই সুরেন্দ্র, আয় না, খেলবি? হি-হি-হি-হি।

স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা বিষয়ক বিধিনিষেধ ভুলে গেল সুরেন্দ্র। সে নিজেই এবার শান্তির চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দু গালে সপাটে দুটো থাপ্পড় কষালো। সুরেন্দ্রর মাথায় রাগ চড়ে গেছে।।

চড় খেয়ে শান্তি আবার নেতিয়ে পড়লো মাটিতে।

যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সুরেন্দ্র রক্ত মুছচে কান থেকে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে নিবারণ বললো, এই সুরেন্দ্র, এবার টাকা বার কর, টাকা দে।

আর পাঁচজন বললো, হ্যাঁ, এবার টাকা দিতে হবে। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, কিসের টাকা?

—তুই যে বলেছিলি, চোখের সামনে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি? দে শালা সেই টাকা! এই মাত্তর কী দেখলি?

সুরেন্দ্র বললো, কী দেখলাম?

—এখন ন্যাকা সাজছিস? সবাই সাক্ষী দেবে, তুই পঞ্চাশবার বলেছিস নিজের চোখে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি। এই মাত্তর দেখলি না?

সুরেন্দ্র বললো, না দেখিনি।

—মিথ্যে কথা। টাকা মারবার মতলব! দে টাকা। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো, আজ আর ছাড়ান ছুড়ন নেই। বড় টাকার গরমাই দেখায়—

অনেকে মিলে গোল হয়ে এগিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর দিকে। ওরা সুরেন্দ্রকে এক সঙ্গে চেপে ধরবে। রোগা, খেতে না-পাওয়া, ভীতু নিবারণের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশি। সে ওই টাকার একটা আধলাও পাবে না, তবে তো সুরেন হারামজাদার দেমাক ঠাণ্ডা করা যাবে! সুরেন্দ্রর নিজের দলের ছেলে নিতাই পর্যন্ত এই কাণ্ড দেখে পেছনে লুকিয়েছে, সে আর মুখ খুলছে না। শান্তি বউদির ব্যাপার স্যাপার দেখে তার বুক কাঁপছে।

সুরেন্দ্র সামনের দুজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, তারপর জামার তলায় কোমর থেকে একটা মস্ত বড় ভোজালি টেনে বার করে বললো, খবরদার, আমার সঙ্গে এঁটেলবাজি করতে এসো না, তা হলে আমি রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো!

এবার দৌড়ে পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ের ওপর উল্টে পড়লো। সুরেন্দ্রটা একটা খুনে, ঠিকই বোঝা গিয়েছিল আগে।

সুরেন্দ্র হাওয়ায় ভোজালি ঘুরিয়ে বললো, আমি এক কথার মানুষ। একশো টাকা দেবো বলিছি, আসল মাল পেলে ঠিকই দেবো। তা বলে আমাকে বাজে মাল, ভূষি মাল গছাবে? একটা মৃগী রুগী, তাই দেখিয়ে টাকা চাইছো? অ্যাঁ!

ভাঙা জামগাছের ডালটা মাটিতে তিনবার আছড়ে বললো, এর মধ্যে মদ্দা ভূত আছে? কোথায় সে শালা? নাকি আমাকে দেখেই পালিয়েছে?

ঝোলা থেকে খালি বোতলটা বার করে সুবলের সামনে ঠকাস করে রেখে সে বললো, সাপুড়েরা যেমন সাপ ধরে, সেই রকম একটা ভূত ধরে দাও দিখি আমাকে! তুমি তো ভূত ধরে বেড়াও। এই বোতলটার ছিপি আটকে দেবার পর যদি আপনা আপনি লাফায়, তবে আমি এক্ষুনি তোমাকে একশো টাকা দেবো। এক্ষুনি। এই দেখো টাকা।

সুরেন্দ্র পকেট থেকে একগোছা এক টাকার নোট বার করে দেখালো।

কিছু না পেরে সুবল বললো, যা যা।

মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে সুরেন্দ্র ভোজালিটা পাশে নামিয়ে রাখলো। তারপর শান্তির নেতিয়ে পড়া একটা হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগলো।

সর্বানন্দ এতক্ষণে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললো, এই, তুমি আমার বউয়ের গায়ে হাত ছুঁইয়ো না।

সুরেন্দ্র তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ! একটু আগে তোমার ছেলের বউ আমার কানে কানে কী বলেছে জানো? যদি সবার সামনে বলে দিই, তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।

সর্বানন্দ চুপসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওঝার ছেলে ওঝা সুবল কিন্তু এত সহজে তার দাবি ছাড়তে চায় না। দর্শকদের মধ্যে যে-কজন দূর থেকে তখনও উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাদের উদ্দেশে সে বলল, তোমরা দেখলে, তোমরা পাঁচজনা দেখলে, ও আমার কেস কেড়ে নিচ্ছে। এ বাড়ি থেকে আগে আমার ডাক পড়েছিল—

সুরেন্দ্র বললো, এতক্ষণ ধরে তো ভ্যাজর ভ্যাজর করলে, ধরতে পেরেছো পেত্নিটাকে?

সুবল বললো, তুমি সরো। এবার আমি ভূতডামরতন্ত্র শুরু করবো। বেটি ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?

সুরেন্দ্র বললো, রাখো তোমার ভূতডামরতন্ত্র! তুমি তোড়লতন্ত্রের নাম শুনেছো? সে হলো গে সব তন্ত্রের বাবা। এইবার দ্যাখো, আমি সেই তোড়লতন্ত্র শুরু করছি!

সুরেন্দ্র তার ঝোলা থেকে টিনের বাক্সটা বার করে খুললো। তার মধ্যে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর টুকিটাকি ওষুধ। একটা অ্যাম্পিউল ভেঙে সবটা ওষুধ ভরে নিল সিরিঞ্জে। তারপর ডগাটা উঁচু করে হাওয়া বার করলো।

সবাই শঙ্কিত বিস্ময়ে চুপ।

সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, ভয় পেয়ো না, আমার সুঁই দেওয়ার অভ্যাস আছে। ফাদার পেরেরার নাম শুনেছো? মস্ত বড় ডাক্তার। আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খাইয়ে পরিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তেনার কাছ থেকে সুঁই দেওয়া শিখেছি।

প্যাট করে সিরিঞ্জের সুচটা সে ফুটিয়ে দিল শান্তির ডান বাহুতে। পাকা কম্পাউণ্ডারের মতন তার ভঙ্গি। শান্তি একটুও শব্দ করলো না। সবটুকু ঢেলে দিয়ে সুচটা বার করে সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বললো, তোমার ছেলের বউয়ের হিস্টিরি অসুখ হয়েছে। এখন দশ বারো ঘন্টা ঘুমোবে। তারপর জেগে উঠলে ভাল করে খেতে দিও। সেরে যাবে। যাও, এবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাওগে! উঃ, কানটা একেবারে ফালা ফালা করে দিয়েছে।

সর্বানন্দ বললো, বউয়ের গায়ে এখন এত শক্তি যে পাঁচজন মিলেও ওকে আগে ধরে রাখতে পারে নি। ঘরে নিয়ে যাবো কী করে?

সুরেন্দ্র বললো, হুঁঃ?

তারপর দক্ষযজ্ঞের শিবের মতন সে শান্তিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মাটি থেকে। সর্বানন্দকে বললো, কোন্ ঘরে শোয় দেখিয়ে দাও, বিছানায় রেখে আসছি।

বারান্দা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে সে সর্বানন্দর দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকালো। তারপর নিচু গলায় বললো, পোয়াতি বউটাকে বুঝি এইভাবে মেরে ফেলতে চাও? ছিঃ। তোমরা না ভদ্রলোক!

তিনদিন ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বিশ্বাসই হয় না যে এটা শীতকাল। ঠিক যেন বর্ষার ধারা।

সারা গায়ে জল-কাদা মেখে সন্ধের সময় টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে নিবারণ। নেশাভাঙ কিছু করে নি, তবু তার পায়ে জোর নেই। শরীর যেন আর বয় না। যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় পড়ে যাবে। তার বুকে সারা বিশ্বের হতাশা।

মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে নিবারণ তার বন্ধকি জমিতে ফুলকপির চারা লাগিয়েছিল মাত্র পাঁচদিন আগে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। এই সময় এত বৃষ্টির কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এ যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। আজ আবার পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়লো। কপির চারাগুলো সব পচে যাবে। কিছু কিছু চারা তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল নিবারণ, কিন্তু অর্ধেকের বেশিই বাঁচাতে পারে নি। মহাজনের সঙ্গে শর্ত ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আজ! কাল দুপুর থেকে মাটি কাটা বন্ধ হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে মাটি কেটে কোনো লাভ নেই। অথচ আজই ছিল নিবারণের পালা। আজ কাজ থাকলে সে নিজের খোরাকির ভাত আর নগদ সাড়ে চারটে টাকা পেত। এখন মনে হচ্ছে সাড়ে চার টাকায় কত কিছু কেনা যায়। মাত্র সাড়ে চার টাকায় এক পৃথিবী ভর্তি সুখ।

রহমান সাহেব বলেছেন, আজ যারা কাজ পেলো না, কাল যদি বৃষ্টি থামে, তবে তারাই কাজ পাবে আগে। আর কালও যদি বৃষ্টি থাকে তাহলে পরশু! মোট কথা নিবারণের কাজ বাঁধা। এখন কাল বা পরশু পর্যন্ত নিবারণকে পেটে কিল মেরে বেঁচে থাকতে হবে।

নিবারণ ক্রুদ্ধ দু'চোখে আকাশের দিকে তাকালো। মেঘও মানুষের এত শত্রুতা করে? ছোট ছোট ফুলকপির চারাগুলো দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠিক যেন মায়ের কোলে মুখ লুকোনো শিশু, আকাশের দেবতাদেরও একটু মায়া হলো না তাদের মেরে ফেলতে? ফুলকপির চারাগুলো কাঁদছিল ডুকরে, নিবারণ শুনেছে।

কাদার মধ্যে পা হড়কে যেতেই নিবারণের কোমরের কষি একটু আলগা হয়ে গেল, আর অমনি তার ট্যাঁক থেকে টুপুস করে খসে পড়লো একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি। তার মধ্যে রয়েছে কালো-হলদে রঙের লম্বা লম্বা দুখানা ওষুধ। অন্ধকারে কাদার মধ্যে শিশিটা আবার গেল কোথায়? নিবারণ রোগা রোগা আঙুল দিয়ে সেটাকে খুঁজতে লাগলো। বিরক্তিতে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। তার কিছুই ভাল লাগছে না।

পাওয়া গেল শিশিটা। ভেতরে কাদা ঢোকে নি তো? না, ওপরে একটা রবারের ছিপি আছে, হাওয়াও ঢুকতে পারে না। শিশিটা খুঁজে পেয়ে আনন্দ হবার বদলে নিবারণের ইচ্ছে হলো সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সোনারং-এর হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুর খুব মাছ ধরার শখ। এক এক রোববার এক এক পুকুরে মাছ ধরতে যান। গত রোববার এসেছিলেন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির পেছনের মজা দীঘিতে। পাপ্তি আর গেনু ঘুরঘুর করেছে সেখানে। মাছ ধরারই ঝোঁক ডাক্তারবাবুর, মাছ খাওয়ার লোভ নেই। একটার বেশি মাছ ধরা পড়লে বাকিগুলো অন্যদের বিলিয়ে দেন। সবাই জানে। সেদিন ডাক্তারবাবুর ছিপে একটাও মাছ ধরা পড়ে নি অবশ্য, কিন্তু তিনি একবার এসেছিলেন নিবারণের বাড়িতে। অল্প-বয়েসি ডাক্তারবাবুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করেন খুব। পাপ্তি আর গেনুই টেনে এনেছিল ডাক্তারবাবুকে। ওরা ওদের দাদুকে ভালোবাসে। ক'দিন ধরে পবন খুবই অসুস্থ, কথা বলার ক্ষমতাও প্রায় নেই।

তা ডাক্তারবাবু পবনকে দেখে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলে গিয়েছিলেন। এটা খাওয়াতে হবে, সেটা খাওয়াতে হবে। নিবারণ সে সব কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার বাপ বুড়ো হয়েছে, এবার মরবে। তা নিয়ে আর আদিখ্যেতা করার কি আছে? শীতের শেষটাতেই পুরোনো রুগীরা টপাটপ মরে। গতবারেও এই সময়ে পবন শয্যা নিয়েছিল। সেবার খুব আশা করেছিল নিবারণ যে, বাবা এবারেই যাবে। শুধু শুধু বেঁচে থেকে তো পৃথিবীর এক রত্তি উপকারে আসে না। ওমা, বুড়ো কদিন বাদেই হাত-পা ঝেড়ে আবার উঠে বসলো! অবশ্য এবার আর পার পাবে না।

আজ বৃষ্টির মধ্যেও খালধারে ঝাড়া দু ঘন্টা নিবারণ বসেছিল গাছতলায়। যদি হঠাৎ বৃষ্টি থামে, যদি মাটিকাটা শুরু হয়। সে সময় ছাতা মাথায় দিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে কলে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু।

নিবারণকে দেখে থামলেন। ডাক্তারবাবুটি আবার সবার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে তিনি নিবারণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাবা কেমন আছেন?

এসব জায়গায় শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই নিবারণ বলেছিল, ভালো।

—আমার ওখানে একবার আসবেন। আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দেবো, আপনার বাবাকে একটা টনিক খাওয়ানো দরকার—

নিবারণ চুপ করেছিল।

ডাক্তারবাবু আবার বলেছিলেন, আজই আসতে পারেন। এই ধরুন ঘন্টাখানেক বাদে। আমি তার মধ্যেই ফিরে আসবো।

সেই সময়, যেন নিবারণ নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলে উঠেছিল, ডাক্তারবাবু, আমরা গরিব, ভগবান আমাদের দুবেলা পেটের ভাতও দেন নি, আমরা কি ওই সব দামি ওষুধ খেতে পারি?

ডাক্তারবাবুটির জোড়া ভুরু। তিনি তাঁর বড় বড় কালো দুটি চোখ নিবারণের মুখের ওপর স্থিরভাবে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন। তারপর নিজের হাতের মস্তোবড় ব্যাগটা খুলে এই ওষুধের শিশিটা নিবারণকে দিয়ে বললেন, এটা দিনে দুটো করে খাওয়াবেন। ভাত খাওয়ার পর। আজ না হোক, কাল পরশু আমার ওখানে একবার আসুন, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

নিবারণ কোনো কথা বলছে না দেখে তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, কখনো আশা ছাড়তে নেই।

তখনও নিবারণের আনন্দ হয় নি। রাগই হয়েছিল। এক এক সময় মানুষের দয়া দেখলেও রাগ হয়। ডাক্তারবাবু যদি আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বড় বড় উপদেশের কথা বলতেন, তা হলে নিশ্চয়ই নিবারণ মনে মনে তাঁকে বাপ মা তুলে গাল দিত। সহ্য হয় না, কিছুই সহ্য হয় না।

অন্ধকারে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে নিবারণের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, যা না-ক্রোধ, না-ঘৃণা, না-উপহাস, না-দুঃখ, না-করুণার। সে হাসিটা অন্যরকম, বড় দুর্বোধ্য। ডাক্তারটি বললেন, ওষুধটা দুবেলাতে ভাত খাওয়ার পর খাওয়াবে। ডাক্তারটা বোকা, কিছুই শেখে নি। এখন নিবারণ যদি ওষুধটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি তার পাপ হবে?

ওষুধটা ফেললো না নিবারণ। যাই হোক, দামি জিনিস তো। সে আবার হেঁটে চললো। মাঝারি ধারায় অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় পৃথিবীতে নিবারণ ছাড়া কেউ নেই। সে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে ঘৃণার জায়গা তার নিজের বাড়ি, তবু সে সেখানেই যাবে।

আর বেশি দূর নেই। রাস্তার মাঝখানেই খানিকটা জল জমে আছে, সেইখানে নিবারণ তার পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। তারপর সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠলো সে।

তার বাড়ির সামনে বাতাবিলেবু গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে? বৃষ্টির মধ্যে ভাঙা ভাঙা অন্ধকারে দেখা যায় এক প্রেত। নিবারণের প্রাণটা যেন এসে আটকে গেল গলার কাছে। প্রথমেই তার মনে হলো, পিছন ফিরে দৌড় দেয়। প্রেতের বুকের পাঁজরার সবকটা হাড় স্পষ্ট, কঙ্কালসার একটা হাত সামনে বাড়ানো। নিবারণ মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করলো, আঁ আঁ।

প্রেতমূর্তি তখন নাকি ভাঙা গলায় বললো, কে নিবারণ এঁলি?

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েও থেমে গিয়ে নিবারণ বললো, ধুর শালা।

সকালবেলাও নিবারণ যাকে দেখে গেছে বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগা ওঠার ক্ষমতা নেই, কথা বলার শক্তি নেই, সে যে এই বৃষ্টির মধ্যে রাত্তিরে উঠে এসে বাইরে এসে দাঁড়াবে—একথা তো নিবারণ কল্পনাই করে নি। এ যে কইমাছের মতন কড়া জান। হারামির বাচ্চা, শালা।

নিবারণ এক ধমক দিয়ে বললো, তুমি আবার বাইরে এয়েছো কেন?

পবন কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার গলাও খোনা খোনা মনে হয়। সে বলল, তুই এখনো ফিরিস নি। যা বৃষ্টি বাদলা, আমি চিন্তা করছিলাম। নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এ যে স্পষ্ট কথা বলে। তাহলে কি এ যাত্রাতেও বেঁচে গেল? হা ভগবান, আরও কতদিন এ বোঝা বইতে হবে?

পবন জিজ্ঞেস করলো, কিছু এনেছিস!

নিবারণ বললো, কী?

—চাল-আটা কিছু আনিস নি?

—কোতা থেকে আনবো? তোমার বাপের কাছ ঠেঙে? আজ মাটি কাটার কাজ হয় নি। আজ আমার যে-টুকু সব্বোনাশ বাকি ছিল, তাও হয়ে গেছে।

—কিছুই আনিস নি?

ট্যাঁক থেকে শিশিটা বার করে নিবারণ বললো, ওষুধ এনেছি। ডাক্তারবাবু বিনিপয়সার ওষুধ দিলেন তোমার জন্য। নাতি-নাতনি দুটোকে খুব জপিয়েছো তো, তারা ডাক্তারবাবুকে ধরেছিল।

পবন ওষুদের ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই না দিয়ে বললো, চাল-আটা কিছুই আনিস নি? আজ সারাদিন বাড়িতে আখা ধরে নি।

সেই মুহূর্তে নিবারণ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললো। সে দৃঢ় গলায় বললো, আমাদের আর এখানে কোনো আশা নেই। কাল চলে যাবো। টাউনে গিয়ে রেল ইস্টেশনে ভিক্ষে করে খাবো।

পবন খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, তাই চল।

—তুমি যেতে পারবে?

—কেন পারবো না? একটু ধরে নিয়ে যাবি।

—যেতে পারো ভালো, না হলে তুমি বাড়ি পাহারা দেবে।

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, বউ শুয়ে শুয়ে জেগে আছে। চোখ দুটি বিবর্ণ। সারা শরীরের মধ্যে শুধু পেট ছাড়া আর সব জায়গাতেই স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট।

ঘরে ঢুকে নিবারণ গম্ভীরভাবে বললো, আজ কিছু আনতে পারিনি।

বউয়ের মুখে কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না।

—ঘরে কিছু আছে?

বউ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, না।

নিবারণ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বললো, নেই কেন? আমি এখন খাবো কি? কাল রাত্তিরে যে খানিকটা আটা বেঁচেছিল?

বউ একটুও উত্তেজিত হলো না। সেই রকমই মুখ ফিরিয়ে থেকে বললো, বিকেল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, তারপর পাতি আর গেণ্ডু জল দিয়ে ওলে সেই আটা খেয়ে ফেলেছে।

ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে দিয়ে পবন শুয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ উঠে বসে ছেলের পক্ষ নিয়ে আলাদা একটা দল পাকাবার চেষ্টা করলো। কুটিল চোখে সে একবার তার পুত্রবধূ, একবার তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো, দ্যাখ না, আমাকে পর্যন্ত একটু দেয় নি। নিজেরাই সব খেল। আমি কতবার বললাম, ও বউ, আমাকে একটু দে। আজ আমার জ্বর ছেড়েচে, আজ আমার খিদে বেশি হবে, অন্তত আমাকে ছটাক খানেক দে। কিংবা আমাকে না দিস, ছেলেটার জন্য একটু রাখ, সারাদিন খেটে-খুটে আসবে—সেকথা গ্রাহ্যই করলো না। নিজেরাই গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে—

বউ এবার দেয়াল থেকে চোখ ফেরালো। শ্বশুরের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেই দৃষ্টিতেই তাকে ভস্ম করে দেবে। কনুইতে ভর দিয়ে আধা-বসা হয়ে কণ্ঠে বিষ ঝরিয়ে সে বললো, খালভরা, তোমার মরণ নেই? একথা বলার আগে তোমার জিভ খসে গেল না? ছেলেমেয়ে দুটো খেয়েছে, আমি নিজে একটা দানাও ছুঁয়েছি? আমার পেটে একটা শত্তুর, তবু আমি কিছু খাইনি। আর তোমার নোলাটাই বড় হলো? ভারি যে ছেলের জন্য দরদ! নিজে তিনবার রান্নাঘরে গিয়ে ঘুটঘাট করে আসো নি? ছেলের জন্য তুমি রাখতে? সব জানা আছে আমার! অলপ্পেয়ে, তুমি মরতে পারো না? মরলে আমার হাড় জুড়োয়!

পবন ছেলের দিকে চেয়ে বললো, দেখলি? দেখলি?

নিবারণ কোনো পক্ষই নিল না। তার ইচ্ছে হলো, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটোকে জোরে জোরে লাথি কষায়, বাপকে লাথি কষায়, বউকেও। খাবার দরকার ছিল তার একার। কাল যদি ভগবান করেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়, তাহলে না-খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে সে মাটি কাটতে যাবে কী করে? সে নিজে না বাঁচলে আর কেউ বাঁচবে! সেকথা এরা কেউ বোঝে না। সকলেই রাক্ষুসে খিদে নিয়ে হাঁ করে আছে।

কাল যদি বৃষ্টি না থামে, তাহলে যেতেই হবে টাউনে। রেল ইস্টিশানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে। টাউনে কেউ না খেয়ে মরে না। টাউনের লোকদের ওপর ভগবানের অশেষ দয়া।

বউ তখনও গজগজ করে যাচ্ছিল, নিবারণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ!

দরজার বাইরে থেকে জল গড়িয়ে আসে ঘরের ভেতরে, তাই সেই জল আটকাবার জন্য দরজার কাছে একটা ন্যাতা পেতে রাখা আছে। সেই ভেজা ন্যাতাটা তুলে নিয়ে নিবারণ হাত পায়ের কাদা মুছলো। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে তার পুকুরে যাবার ইচ্ছে নেই। ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে সে শুয়ে পড়লো।

পাশাপাশি একখানা বড় ঘর আর ছোট ঘর। মাঝখানের দরজাটা আজকাল খোলাই থাকে। ছোটঘরের জানালাটা নিশ্চয়ই খোলা রয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট আসছে এ ঘর পর্যন্ত। নিবারণ ভাবলো, তার বাপ ভিজছে। ভিজুক। আজও তো চলাফেরার ক্ষমতা রয়েছে, নিজে উঠে বন্ধ করতে পারে না? নিবারণের গায়ে যদি বেশি ছাঁট লাগে, সে পা দিয়ে ঠেলে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেবে।

কোন শব্দ নেই, শুধু টিনের চালে কাকের পায়ের আওয়াজের মতন বৃষ্টি। ছেলেমেয়ে দুটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর জাগে নি। তারপর ঘুমোয় গর্ভিণী, কিন্তু খালি পেট নিয়ে নিবারণের কিছুতেই ঘুম আসে না। আর এক অসুস্থ বৃদ্ধের তো সহজে ঘুম আসবার কথা নয়।

খানিকবাদে পবন কোঁ কোঁ শব্দ করে ওঠে।

নিবারণ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো আবার?

পবন শ্বাস টেনে টেনে বলে, কিছু না। দুদিন ভাত খাইনে, বড় খিদে পায়।

নিবারণ ওষুধের শিশিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, এই নাও, খাও।

পবন শ্বাস টেনে টেনে বলে, কিছু না। দুদিন ভাত খাইনে, বড় সত্যি সবকটা ক্যাপসুলই মুখে পুরে চিবোতে থাকে। খচর মচর শব্দ হয়।

একটু পরে সে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, উফ। কতদিন তামাক খাই না। বউয়ের কাছে একটু আগুন চাইলাম, দিল না।

—তুমি চুপ করবে?

বুড়ো চুপ করে যায়, তবু মুখ থেকে চাপা কোঁ কোঁ শব্দ বেরোয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ বাদে, তখনও নিবারণ ঘুমোয়নি, জানালা দিয়ে একফালি আলো ঢুকে দেওয়ালের গায়ে দু-এক পলক কাঁপে, আবার মিলিয়ে যায়। কিছু দূরে শোনা যায় ক্ষীণ রুনুঝুনু শব্দ।

নিবারণ কান খাড়া করে থাকে। ওরা আসছে। আশ্চর্য, এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যেও বেরিয়েছে ওরা? নিবারণের পেটের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলে অহেতুক রাগ। ওদের পকেটে টাকা আছে, গায়ে শক্তি আছে, তাই ওরা এইসব

আমোদ আহ্লাদ করতে পারে। ওরা নিবারণের মতন লোকদের আরও কষ্ট দেবার জন্য আসে। কান-কাটা সুরেন্দ্রটা মরে না কেন? কত লোক বে-ঘোরে মরে, ওর মরণ হয় না?

ওরা পাঁচলার মোড়ের গাছতলায় এসে পৌঁছে গেছে মনে হয়। ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গান ঃ

ভূতের নাতি ভূতের পুতি...বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি

যেমন তেমন ভূত পেলে ভাই...

ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে...

শটাকা শ টাকা...

এক এক ভূত এক এক শো টাকা...

পবন দুবার কেশে ওঠে। বোঝা যায় সেও জেগে আছে। নিবারণ জিজ্ঞেস করে, বাবা, ও বাবা? তোমার কষ্ট হচ্ছে?

পবন বলে, না।

—বাবা, তুমি ভূত দেখেছো কখনো, সত্যি করে কও তো।

—হ্যাঁ, দেখিছি। অনেকবার দেখিছি।

—কারা মলে ভূত হয়? সকলেই মলে ভূত হয়?

—যারা অপঘাতে মরে, মরার পরেও যাদের আত্মিকে থেকে যায়।

নিবারণ হঠাৎ উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দেখা যায় তার শরীরটা।

পবন জিজ্ঞেস করে, ওঠলি যে? বাইরে যাবি?

নিবারণ বললো, না। বাবা তুমি মলে...

পবন বলে, হ্যাঁ আমি ভূত হবো নিশ্চয়। সে কি আর তোকে বলতে হবে...নাতি নাতনি দুটোর মুখ চেয়েও...সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস...আমি বোতলে ঢুকে যাবো, তুই একশো টাকা...

তারপরই চিৎকার ও কান্না মিশিয়ে সে বলে ওঠে, ও বাবা নেবারণ আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আমি দুটো দিন... একটু গরম গরম ভাত দিস...দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই...এক ছিলিম তামাক...ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি...আর দুটো দিন...একটু গরম ভাত...তোর পায়ে পড়ি, ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন...

PATHAGAR.NET

পাখির মা

ছেলেটা বিশেষ কথা বলে না। বেড়ার বাইরের পেঁপে গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁড়ে। একটা আট হাত ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। খালি গা। বেশ তেল চকচকে কালো। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সেই চুলে লাল গাঁট বাঁধা, তাতে আবার গুঁজেছে শকুনের পালক। বয়েস বাইশ তেইশের বেশি না।

উঠোনটা ঝাঁট দিতে দিতে মঙ্গলা মুখ তুলে তৃতীয়বার বলল, আজ কিছু নেই রে!

উঠোনের এক কোণে প্যাঁক প্যাঁক আর হ্যাঁস হ্যাঁস করছে তিনটে হাঁসা আর হাঁসী। তেঁতুল গাছের বিরবিরে ছায়ায় বসে আছে কুকুরটা। ধানের গোলার পাশে খাটিয়া পেতে বসে পুরনো খবরের কাগজ লম্বা করে মেলে পড়ছে জগদীশ। ভাঁজ করা লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা, তার একটা পা অস্বাভাবিক সরু, জীবনে কখনো সে সোজা হয়ে দু পায়ে হাঁটেনি।

জগদীশ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছে? কী চাই?

মঙ্গলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ডুরে শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে বলল, ও সেই লোধাদের ছেলেটা। ডুলুং।

একটা আতা গাছের আড়াল পড়েছে বলে জগদীশ ছেলেটিকে ঠিক দেখতে পাচ্ছেনা। তার ভুরদুটো কোঁচ হয়ে গেল, সে নিম্নস্বরে বলল, ওকে দিয়ে আজ কী করাবে?

মঙ্গলা উত্তর দিল, সেই তো বলছি, আজ কোনো কাজ নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে।

এটা হাসির কথা নয়, তবু মঙ্গলা হাসল। অত বড় একটা জোয়ান ছেলে, তবু যেন সব কথার মানে বোঝে না। পেঁপে গাছতলায় নখ নিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সে একটা গর্ত করে ফেলেছে।

জগদীশ বলল, ওকে যেতে বলে দাও! বলো, দুতিন মাসের মধ্যে আমাদের আর লাগবে না।

কুকুরটা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে।

কুকুরটাকে অ্যাই চুপ মার বলে মঙ্গলা ডাকল, কমলা একঝাড়ি মুড়ি নিয়ে আয় তো!

জগদীশ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, আবার ওকে মুড়ি খাওয়াবে?

মঙ্গলা তো গ্রাহ্য করল না। জমি-জিরেত, টাকাপয়সার ব্যাপারে সে যেমন তার স্বামীর মতামতের প্রতিবাদ করে না, সেইরকম সংসারের জিনিসপত্র, কিংবা কে কী খাবে সে ব্যাপারেও সে জগদীশের মতামতের মূল্য দেয় না।

ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরী কমলা একটা কলাই করা বাটিতে নিয়ে এল মুড়ি। সে আগেই ডুলুংকে দেখেছে, মুড়ির সঙ্গে তিনটে পেঁয়াজ আর গোটা দশেক কাঁচা লঙ্কাও এনেছে।

বেড়ার ধারে গিয়ে বলল এই নাও!

হাতের টাপিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ডুলুং প্রথমে দু হাত অঞ্জলিবদ্ধ করল, তারপর মুড়ির পরিমাণ অনেকটা দেখে সে ধুতির কাছাটা খুলে মেলে ধরল।

এ রকম একটা শক্ত সমর্থ পুরুষকে ভিক্ষের মতন মুড়ি দিতে কমলার খারাপ লাগে, আবার ডুলুং-কে সে একটু ভয়ও পায়। কেমন যেন খয়েরি ধরনের চোখ, তাতে রাগ রাগ ভাব।

মুড়ি পেয়েই পুঁটুলি বেঁধে মাঠের দিকে নেমে গেল ডুলুং। উঠোনে এসে হাসিতে ফেটে পড়ল কমলা, মঙ্গলাও কোমরে হাত দিয়ে হাসতে লাগল। জগদীশ মন দিয়ে আবার কাগজ পড়ছে।

সপ্তাহ দু-এক আগে ধান সেদ্ধ করার সময়ে অনেক কাঠের দরকার পড়েছিল। এদিকে পাটকাঠি পাওয়া যায় না। এদের বাগানেই একটা জারুল গাছে উই ধরে ফোঁপরা অবস্থায় ছিল, সেটাকে আর রেখে লাভ নেই, কিন্তু অত বড় গাছটাকে চ্যালা করবে কে? বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে তো ওই একজন, জগদীশ, তার এক পায়ে জোর নেই, সর্বক্ষণ বসে থাকে বলে ইদানীং তার কোমরেও জোর কমে গেছে।

লোধাদের এই ছেলেটা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ডেকেছিল মঙ্গলা। তা এক বেলাতেই ছেলেটা জারুল গাছটাকে কেটে কুটি কুটি করে ফেললে। তার বদলে পাঁচটা টাকা দিতেই সে খুশি!

এদের একটা জমিতে মুড়ির ধান হয়। মঙ্গলা সেদিন মুড়ি ভাজছিল। ডুলুং অত খাটল, তাকে কিছু মুড়ি খেতে দেওয়া হল। সে একখানা দৃশ্য বটে!

ছেলেটার ডান-বাঁ জ্ঞান নেই, সে দু হাতে মুড়ি খায়। প্রায় চোখের নিমেষে এক বাটি মুড়ি শেষ। আর দুটি দেব? সে ঘাড় হেলাল।

বাচা ঝাল কাঁচা লঙ্কা সে এমন কচ কচ করে চিবোয় যেন টিয়াপাখি, তার ঝালের কোনো বোধই নেই। আবার মুড়ি দেওয়া হল, তাতে সে, জল ঢেলে দলা পাকিয়ে খেতে লাগল, যেন আগে কখনো সে মুড়ির মতন অমৃত খায়নি। বড় মজা হয়েছিল সেদিন।

লোধাদের ছেলেদের দিয়ে কাজ করানো পছন্দ হয়নি জগদীশের। ওদের একবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলেই সব ঘাঁত-ঘোঁত জেনে যায়। তারপর কখন এসে যে চুরি করে সব ফাঁক করে দেবে, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া এ বাড়িতে কখনো জন খাটাবার দরকার হলে পরিচিত সাঁওতাল পরিবার থেকে ডাকা হয়, অন্য গ্রামের লোধাদের কাজ দিলে সাঁওতালরা চটে যাবে।

তা নিত্যি নিত্যি কীই-বা এমন কাজ থাকে। তবু ছেলেটা খোঁজ নিতে আসে, বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বলে না, কোনো দাবি জানায় না। তাকে একবাটি মুড়ি দিলে সে খুশি হয়ে চলে যায়। কাজের খোঁজে, না মুড়ির লোভে সে আসে? মুড়ি কি আর কোথাও পাওয়া যায় না?

একদিন মঙ্গলা বাড়ি ছিল না, কনক-দুর্গার মন্দিরে মানতের পুজো দিতে গিয়েছিল। ওই ডুলুং বেড়া ঠেলে ঢুকে পড়েছিল উঠোনে, পেঁপে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছিল না। জগদীশ হুংকার দিয়ে বলে উঠেছিল, অ্যাই ছোঁড়া, তুই ঠক করে ভেতরে ঢুকলি যে? কে তোকে হুকুম দিয়েছে? ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে, বাইরে যা! বাড়িতে কেউ নেই।

পাথরের মতন শক্ত শরীর, বুকখানা যেন লোহার পাত, মাথায় বাবরি চুল, হাতে ধারাল টাঙ্গি, তবু সেই ছেলে জগদীশের মতন একজন পশু মানুষের ধাক্কা খেয়ে কুঁকড়ে যায়, পায়ে পায়ে পালায় উঠোন ছেড়ে।

যার শরীরে শক্তি নেই, তার তাগদ হল টাকা। যার টাকার জোর থাকে, তার বন্দুকও থাকে। জগদীশের বন্দুক তো আছেই, তাছাড়াও আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামের মানুষ জানে, জগদীশের মতন সেরা মাথা আর কারুর নয়।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লতিদিন বসে থাকে উঠোনের ওই খাটিয়ায়। খুব বৃষ্টির সময় খাটিয়াটা টেনে আনা হয় একটা ছাউনির তলায়। ওইখানে বসে বসে জগদীশ তার বিষয় সম্পত্তি চালায়। তার জমি চাষ করে বর্গাদার। জগদীশ কখনো তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলে, কখনো ধমকায়, কখনো অযাচিতভাবে দু পয়সা বেশি দেয়, কিন্তু কেউ তাকে এক কড়া ফাঁকি দিতে পারে না। সব দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই ভাবে সে তার দু মেয়ের বিয়ে দিয়েও জমি বাড়িয়েছে।

তবে নিছক বিষয়ী নয় জগদীশ, সে পড়াশুনো করা মানুষ। ইস্কুলে ফার্স্ট লাইন পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর এই খাটিয়ায় বসে বসেই সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছে। যখনই সময় পায়, সে কিছু না কিছু পড়ে। পোস্টাফিসে তার নামে খবরের কাগজ আসে, পত্র-পত্রিকা আসে। পশু পা নিয়ে সে কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যায় বটে কিন্তু সারা দেশে কোথায় কী ঘটছে, সে সব খবর তার জানা। এমনকি বিদেশি অতিথিও আসে তার বাড়িতে।

ধানের গোলাটা নিছক শোভা। গোমুখ্যু ছাড়া কি কেউ আজকাল উঠোনের গোলায় ধান ভরে রাখে? এ যেন নেমন্তন্ন করে চোর ডাকাতদের ডেকে আনা। এক বস্তা খোরাকির চাল রেখে বাকি সব ধানদান দিয়ে দেয় জগদীশ। কাঁচা টাকাও সে বাড়িতে রাখে না। তা হলে আর গ্রামে পোস্ট অফিস হয়েছে কেন? তার বন্দুক আছে বটে কিন্তু কখনো বার করে না, বছরে একবার শুধু এস ডি ও অফিসে সে লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়ে আসে। বছর সাতেক আগে জগদীশ একবার একটা পাগলা কুকুরকে একগুলিতে খতম করে তার হাতের টিপ বুঝিয়ে দিয়েছিল। গ্রামের বড়লোক এখনো সেইগল্প করে।

ধানের গোলা একেবারে শূন্য রাখতে নেই, তাই দু কুলো ধান সেখানে ঢালা হয় প্রতি মরসুমে। জগদীশ মজা লাগে বলে, মাঝে মাঝে গোবরছড়া দিয়ে গোলাটা লেপে দিতে, তখন গোলাটা বাপদাদার আমলের মতন সুন্দর দেখায়। জগদীশের দেখতে ভাল লাগে।

গোলাটায় হেলান দিয়ে সে বসে। তার বাড়ির ডানপাশে নিজস্ব বাগান, তারপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে খাঁ খাঁ মাঠ, তারপর নদী। সেদিকে চোখ চলে যায়।

অনেক দূরে, একটা পাবুড় গাছের নিচে বসে আছে লোধাদের সেই জোয়ান ছেলেটা। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। মাঝে মাঝে সে হাতের টাঙ্গিটা তুলে শাসাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মাটিতে। ঠিক যেন একটা ছায়া পুতুলের নাচ।

চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে এসে কমলা ওইদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করল, বাবা, ওই ছেলেটা সারাদুপুর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় কেন, ও কোনো কাজ করে না?

জগদীশ বলল, ওরা কী কাজ করবে? চাষের কাজ জানে না, কিছু জানে না। কোনো কাজেই ওদের একদিনের বেশি দু দিন মন বসে না। মাঠে মাঠে ঘোরে কেন জানিস? ইঁদুর খোঁজে।

ইঁদুর?

হ্যাঁ রে, ইঁদুর। ফসল কাটা হয়ে গেছে, এখন ফুরো ধানের লোভে মোটা মোটা ইঁদুর মাঠে এসে হুটোপুটি করবে। ওরা ইঁদুর ধরে সেই মাংস খায়।

ইঁদুরের মাংস খায়? অ্যাঃ! থুঃ!

ইঁদুরের মাংস বোধ হয় খেতে খুব খারাপ হবে না রে! খরগোশের থেকে খারাপ হবার তো কোনো যুক্তি নাই!

ও সারাবছর ইঁদুর খায়?

নাঃ, অত ইঁদুর পাবে কোথা থেকে। তাছাড়া ইঁদুর ধরাও তো সোজা কম্মা নয়। যখন মাঠে কিছু পায় না, তখন জঙ্গলে যায়। নদীর ওধারে ওই যে জঙ্গল। ওখানে দু-একটা খরগোশ-মরগোশ যদি পেয়ে যায়। অনেক গাছতলায় ছাতু হয়। বুনো জাম আর কুসুম ফল খায়। ওরা বিয়ের সময় কী করে জানিস?

কমলা দু দিকে মাথা নাড়ে।

ওই যে ছোঁড়াটা, ভুলুং, মনে কর ওর বিয়ে করার শখ হয়েছে। একটা মেয়েকে মনেও ধরেছে বেশ। তখন ও মেয়ের বাপকে জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাবে। তড়বড় তড়বড় করে একটা বড় গাছের ডগায় উঠে গিয়ে এক হাত ছড়িয়ে হেঁকে বলবে, ওই যে দেখছ টিলাটার মাথায় একটা শিমুল গাছ লি লি করছে, এখেন থেকে ওই পর্যন্তক জঙ্গল হল গে আমার! তার জানে কী বল্ তো?

কমলা আবার দুদিকে মাথা নাড়ে।

জগদীশ বলল, জঙ্গলের মালিক তো আর ও নয়। জঙ্গল সরকারের। বিয়ের পাত্তর জানাবে যে এতখানি জঙ্গলের ফল মূল কুড়োবার সে হক্কদার। সেই রোজগারে সে বউকে খাওয়াবে।

কমলা একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বাবার দিকে। তার জ্ঞানের বয়েস থেকে সে বাবাকে এই খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে থাকতে দেখেছে, কখনো জগদীশ ওই ডাঙা জমি কিংবা নদীর ওপারের জঙ্গলে যায়নি। খোঁড়া পা-টা এখন প্রায় অসাড় হয়ে গেছে বলে সে আর হাঁটতেই চায় না। কমলা একদিন শুনেছিল, তার বাবা একজনকে রাগ করে বলেছিল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ভিখিরিরা। আমাকে কি সেই পেয়েছ!

মাঠে বা জঙ্গলে যায় না জগদীশ। তবু সে মাঠ আর জঙ্গলের সব বৃত্তান্ত জানে।

কমলা তারপর চেয়ে রইল নদীর ওপারের অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে।

সে যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল, একজন সুঠাম যুবক একটা বিশাল শিরীষ গাছের মগডালে উঠে চিৎকার করে বলছে, এই জঙ্গল আমার।

ভুলুং-এর কি বিয়ে হয়ে গেছে? ওর মুখ দিয়ে তো কোনো কথাই বেরোয় না।

এক ঝলক শীতের হাওয়া এসে শরীরে আদর করে দিল। এখন রোদ্দুরটা কী মনোরম লাগছে। একা দোকা খেলার মতন পা ফেলার ভঙ্গিতে কমলা ছুটে চলে গেল পুকুর ধারে।

॥ ২ ॥

প্রথমে ঘুম ভাঙল মঙ্গলার।

যাকে গোটা সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেই মেয়ে মানুষের ঘুম কখনো গাঢ় হয় না। এই তো মাস দু-এক আগে এক চোর এসেছিল, কুকুরটা ঘেউ ঘেউয়োবার আগেই সামান্য শব্দ শুনে মঙ্গলা উঠে বসে চেঁচিয়েছিল, কে? কে?

তার সেই চিৎকার শুনে ভেগে গিয়েছিল চোরেরা। রাত-বিরেতে একা বাইরে বেরুতেও ভয় পায় না মঙ্গলা।

আজও মঙ্গলা চোখ মেলে উৎকর্ণ হল। প্রথমে মনে হয় স্বপ্ন।

ঝড় এল নাকি? সবেমাত্র কুমড়োর ডগাগুলো ঘরের চালে তুলে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। না, না, অঘ্রাণ মাসে ঝড় আসবে কেন! তা হলে কি অনেক মানুষজন জড়ো হয়ে কথা বলছে?

কয়েক মুহূর্তেই মঙ্গলার ঘোর কেটে গেল। স্বামীর গায়ে ধাক্কা মেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, ওরা এসে গেছে গো এসে গেছে!

পাশের ঘরে কমলা, তার ছোট বোন নীতি, বুড়ি পিসি, তার ছেলে নাড়ু সবাই জেগে উঠেছে। জগদীশ লম্বা টর্চটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এল।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে উঠোন, ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই তবু শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে মাথার ওপরে। লম্বা ডানা মেলে বিশাল আকারের এক একটা পাখি বাড়িটার ওপর দু-এক চক্কর ঘুরে তারপর ঝুপ করে এসে বসছে শিরীষ গাছে। একটার পর একটা!

কমলা ফিসফিস করে বলল, মা, আগের বছর ওরা দুপুরবেলা এসেছিল না?

মঙ্গলা মাথা নাড়ল। কোনো বছরই ওরা রাত্তিরে আসেনি। এখন রাত অন্তত তিন প্রহর হবে। কতদূর থেকে, রাত্রির আকাশ পেরিয়ে ওরা আসে, তবু এই বাড়ির বাগান চিনতে ভুল হয় না।

নাড়ু গুণতে লাগল, তের-চোদ্দ-পনেরো....

একবার দিনের বেলা ওরা গুণেছিল, দুশো সাতটা।

গাছে বসার পর ওরা ডাকছে কঁক কঁক, কঁক কঁক, কঁক....এক একসময় মানুষের গলার আওয়াজ বলে ভুল হয়। ঠিক যেন মানুষের মতনই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে।

যেন ওরা বলতে চাইছে, আমরা আবার এসেছি গো। তোমাদের অতিথি। চিনতে পারছ?

শেষ দুটো পাখি এখনো বসেনি, ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, ডানা ঝটপটিয়ে যেন ওদের প্রণাম জানাচ্ছে।

কমলা বলে উঠল, কী সুন্দর!

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না জগদীশ, সে একটা মাচিয়া পেতে বসল, সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা বাতাস চাঁদের আলোয় নির্মল, তার মধ্যে সাদা ধপধপে একটা একটা পাখিকে মনে হয় যেন স্বর্গের পরী।

একসময় মঙ্গলা বলল, এবার ভেতরে চল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

জগদীশ বলল, তোমরা শুয়ে পড়ো গে, আমি আর একটু বসি।

এখন প্রত্যেকদিনই এই পাখিগুলোকে দেখা যাবে, তবু এই চাঁদের আলোয় ওদের ওড়াউড়ির দৃশ্য জগদীশকে মুগ্ধ করে রাখে।

প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জগদীশের এই পাখিগুলো সম্পর্কে প্রীতি অনেকের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এদের সঙ্গে তার লাভ-লোকসানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তবে এটা বিস্ময়কর ঠিকই, এই বিদেশি পাখিরা এ গ্রামের আর কোনো বাড়িতে যায় না, আর কোনো গাছে বসে না। জগদীশের বাগানে দুটি মাত্র শিরীষ গাছ তাদের পছন্দ, সেই দুটি গাছে অতগুলো পাখি গাদাগাদি করে থাকে। এক একসময় ওরা সবাই মিলে যখন কঁক কঁক করে, তখন আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

এই সারস জাতের পাখিগুলো যে ঠিক কোথা থেকে আসে, তা সঠিক জানে না কেউ। কেউ বলে অস্ট্রেলিয়া, কেউ বলে সুইডেন। এই দুটো দেশ যে পৃথিবীর একেবারে বিপরীত দিকে, সে জ্ঞান জগদীশের আছে। পাখি সম্পর্কে সে বাংলা বইও আনিয়েছে কলকাতায় অর্ডার দিয়ে। মাইগ্রেটরি বার্ডদের সম্পর্কে সে পড়েছে, কিন্তু তার বাগানের পাখিগুলো যে ঠিক কোন্ দেশ থেকে উড়ে আসে, তার হদিশ সে পায়নি।

সাঁওতালরা বলে সাহেব পাখি!

নিজের বাড়ির উঠোন ছেড়ে কোথাও যায় না জগদীশ, এই পাখিগুলো তার কাছে বাইরের পৃথিবীর দূত।

শহরের মানুষ এদিকে বেড়াতে এলে পাখিগুলো দেখতে আসে। এক একজন এক একরকম ইংরিজি মার বলে, বাংলায় কেউ কিছু স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে না। খবরের কাগজের লোক এসে দু একবার ছবি তুলে নিয়ে গেছে। বাইরের লোক এ গ্রামে এসে জিজ্ঞেস করে, পাখাওয়ালা জগদীশ মণ্ডলের বাড়ি কোন্‌টা?

এ গ্রামের মানুষ কেউ ঐ পাখিদের মারে না। সাঁওতালরাও মারে না। পাখিগুলো তাদের অতিথি। শুধু ভয় লোধাদের সম্পর্কে। এককালে ওরা ছিল যাযাবর, এখন ঘর-বাড়ি বেঁধে থাকলেও ওদের কারুর কারুর স্বভাব আজও অনেকটা বনচর ধরনের রয়ে গেছে। মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যে-জঙ্গলে কোনো জানোয়ার নেই বলে সবাই ভাবে, সেখান থেকেও ওরা হঠাৎ একটা শুয়োর মেরে নিয়ে আসে। সাপ মারে, ইঁদুর মারে। কবুতর মেরে পুড়িয়ে খায়। এরকম বড় বড় সারস পাখি পেলে তো তারা মারবেই। এক একটা পাখির মাংস হবে অন্তত চার-পাঁচ কিলো।

লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক ভাল না। লোধারা সাধারণত প্রকাশ্যে নিজেদের এলাকা ছেড়ে এ গ্রামে আসেও না। তবু কয়েকজনকে ধরে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের কোনো বাড়িতে বড় রকমের চুরি হলে দু-চারটে লোধাকে ধরে ঠ্যাঙানি দেওয়া হয় এক চোট, তারা চুরি করুক, বা না করুক, সে প্রমাণের দরকার নেই, ওদের ভয় পাইয়ে রাখাটাই দরকার।

জগদীশ সারারাত বসে রইল জ্যোৎস্নার মধ্যে।

সকালবেলায় মঙ্গলা বাগানের শিরীষ গাছদুটোর তলায় গিয়ে কুলোয় ধান-দুব্বো নিয়ে পাখিগুলোকে বরণ করল। কমলা শাঁখ বাজাল। উলু দিল বুড়ি পিসি।

ধানগুলো দুটো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিল মঙ্গলা। যদিও এই পাখিরা ধান খায় না।

গাছদুটো একেবারে সাদা বপ্‌বপে হয়ে গেছে। যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। পাখিগুলো ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে। তবু ওরা অন্য গাছে যাবে না। এই গাছদুটোই যে ওদের কেন এত পছন্দ কে জানে! কত শত মাইল দূর থেকে তারা উড়ে আসে, এখানে নামে, একবারও ভুল করেও অন্য কোনো গাছে বসে না।

কমলা বলল, দ্যাখ নাড়ু, এবার মনে হচ্ছে তিন চারটে নতুন বাচ্চা এসেছে!

পাখিগুলোর মধ্যে ছোটো বড়ো আছে, কিন্তু কোনগুলো যে ঠিক বাচ্চা, তা ওরা বুঝতে পারে না।

তবু নাড়ু বিজ্ঞের মতন বলল। তিন-চারটে নয়, এগারোটা বাচ্চা, আমি গুণেছি।

বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত এই পাখিগুলোকে চেনে, কোনো পাখি কখনো দৈবাৎ গাছ থেকে খসে পড়লেও সে তেড়ে যায় না, খুঁই খুঁই শব্দ করে লাজ নাড়ে। এক এক সময় সে গাছতলায় গেলেই তার গায়ে পিচিং পিচিং করে পাখিদের পুরীষ পড়ে। মঙ্গলা—নাড়ুরা হেসে ওঠে।

সব পাখিগুলো এক সঙ্গে খাবারের সন্ধানে যায় না। এক ঝাঁক যায়, এক ঝাঁক ফিরে আসে। ওরা জঙ্গলের মধ্যে যেতে চায় না, নদীর ধারটাতেই বেশির ভাগ সময় বসে। ওরা যে ঠিক কী খেয়ে বেঁচে থাকে, তাও বোঝা যায় না। শীতের শীর্ণ নদীতে কী-ই বা মাছ আছে। গেঁড়ি-গুগলিও তেমন চোখে পড়ে না। তবে ওরা লম্বা লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে প্রায়ই জল পান করে অনেকখানি।

সব পাখির মধ্যে সারস জাতীয় পাখিরই জলপিপাসা বেশি, এ কথা জানিয়েছে জগদীশ। হয়তো এই ছোট্ট নদীর জলটাই ওদের বেশি পছন্দ, সেইজন্যই ওরা এখানে আসে।

ওরা মানুষ দেখে ভয় পায় না। তবে মানুষদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রাখে। নদীর ধারে, জঙ্গলের দিকটায় ওরা দল বেঁধে বসে, সেদিকে কখনো মানুষ এসে পড়লে ওরা মুখ তুলে দেখে, একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, যেন ওরা মানুষ চেনে, কোনো কোনো মানুষের চোখ দেখে কিছু বোঝে, হঠাৎ দল বেঁধে এক সঙ্গে উড়ে যায়। আবার কোনো কোনো মানুষ দেখলে একটু সরেও না।

প্রথম কয়েকদিন কমলা, নীতি, নাড়ুদের খুব উৎসাহ থাকে। অনেকক্ষণ বাগানে বসে থেকে পাখিগুলোর ডাক শোনে, কীর্তিকলাপ দেখে। নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে কোনো পাথরের আড়ালে বসে থাকে। গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরা এলে তাদের দিকে কমলা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। এসব আদের বাড়ির পাখি, তাদের নিজস্ব।

নদীর ধারের সব কাশ ফুল এখনো শুকিয়ে যায়নি। তাদের সঙ্গে যেন মিশে গেছে ঝাঁক ঝাঁক সারস। মাঝে মাঝে এক একটা লম্বা ডানা ঝাপটে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে, আবার ফিরে আসছে, নদীর ওপর চক্রবাকের বুকের ঘুরতে নামিয়ে দিচ্ছে দুটি পা, নখগুলো ছড়ানো, একটা ছাতার মতন আস্তে আস্তে পড়ছে নদীর জলে।

পাকুড়গাছের তলায় বড় পাথরটার আড়ালে বসে ছিল ডুলুং, কমলাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার লাল ফেট্টিতে শবুরের পালকের বদলে আজ একটা সাদা পালক গোঁজা, হাতে টাঙি। খয়েরি চোখের দুটি নিষ্পলক।

নাড়ুর বয়েস মাত্র এগারো, বড়োদের গলার আওয়াজ নকল করে সে তড়পে ফেলল, অ্যাই তুই এখানে কী করছিস?

ডুলুং কোনো উত্তর দিল না।

নাড়ু কমলার দিকে তাকিয়ে বলল, এ ব্যাটার মতলব খারাপ!

কমলা একটু লজ্জা পেয়েছে ওকে দেখে। গতকাল সকালেও এই ডুলুং এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের বেড়ার পাশে, মঙ্গলা তখন পুকুরে স্নান করতে গেছে। জগদীশ খুব জোর ধাবড়ি দিয়েছে ডুলুংকে। রোজ রোজ মুড়ি ভিক্ষে করতে আসিস, তোর লজ্জা করে না? এ বাড়িতে কোনো কাজ নেই, যা ভাগ!

বাড়িতে মুড়ি ফুরিয়ে এসেছে, অন্যদের দান করার মতন বিশেষ নেই, তবু মঙ্গলা থাকলে দুটি দিত নিশ্চয়ই।

ডুলুং কমলার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সব দোষ তার।

এই বছরই পুরুষ মানুষের সোজাসুজি দৃষ্টি দেখলে কমলার গা শিরশির করতে শুরু করে। সামনের বৈশাখে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। নীলমণির হাটের জগন্নাথ দাসের ছেলে গগনের সঙ্গে। ওদের একটা মুদির দোকান আছে, গোয়ালে পাঁচটা গরু আছে। মাত্র তো দুখানা গ্রাম পরে, খুঁই বাড়িতে যদি ডুলুং কখনো যায়, কমলা তাকে পেট ভরে মুড়ি খেতে দেবে।

কমলা জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, তোমার বিয়ে হয়েছে? তুমি একটা গাছের মাথায় চড়ে.....

কমলার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না ডুলুং, দৌড়ে নেমে গেল নদীতে; তারপর হাঁটু সমান জল হপছপিয়ে নদী পার হয়ে নল খাগড়ার জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

সেদিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল কমলা। সেই ছোটবেলায় সে ওই জঙ্গলে গিয়েছিল, এখন সবাই যেতে বারণ করে। ওখানে নাকি লুকিয়ে থাকে চোর-ডাকাতেরা। কারা যেন গাছ কাটে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে বড় বড় শাল গাছ। জঙ্গল নিকেশ হয়ে যাচ্ছে প্রায়। উঁচু উঁচু গাছগুলো সব নষ্ট হয়ে গেলে ডুলুং কোন্ গাছের ডগায় চড়ে বসবে, এই জঙ্গল আমার?

পাখিগুলো হঠাৎ জোরে জোরে ডাকতে শুরু করেছে। এক জায়গায় দশ বারোটা পাখি কঁক কঁক করতে করতে লাফাচ্ছে। কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য ওখানে। নদীতে গা ভাসিয়ে যে পাখিগুলো শুশুকের মতন স্নান করছিল, তারাও ডেকে উঠল।

নাড়ু উত্তেজিত ভাবে বললো, ইঁদুর! ইঁদুর!

একটা মস্ত খেড়ে ইঁদুর প্রাণ ভয়ে ছুটছে এদিক-ওদিক, দশ বারোটা সারস তাকে ঘিরে ধরে ঠোকরাবার চেষ্টা করছে। ইঁদুরটা পালাতে পারল না, মিনিট খানেকের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিহ্ন!

কমলার গা-টা গুলিয়ে উঠল। এমন সুন্দর ধপধপে সারসগুলো ইঁদুর খায়? ডুলুং এখানে ইঁদুর খুঁজতে এসেছিল, প্রতি বছর এই সারসরা এসে ডুলুংয়ের খাদ্যে ভাগ বসায়।

পরক্ষণেই কমলা আবার ভাবল, ও মা, এ আবার কী কথা! ইঁদুর বুঝি মানুষের খাদ্য! সাপ কিংবা পাখিদেরই তো ইঁদুর মারার কথা। কাক-চিলরাও তো ইঁদুর পেলেই ধরে।

॥ ৩ ॥

নদীর ওপারে কাশ বনের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আছে ডুলুং। হাতে তার গুলতি। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে সে, সারা শরীরে তার আশঙ্কা ও উত্তেজনা, কষ্টে যাচ্ছে বারবার। একবার সে ঠিক লাগিয়ে দিল। একটা ছোট মতন সারস ঢলে পড়েছে।

এক লাফে বেরিয়ে এল ডুলুং। দ্রুত দেখে নিল এদিক-ওদিক। পাখিটা খোঁড়াচ্ছে, ওড়ার চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না উঁচুতে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছে। ডুলুং ঝাঁপিয়ে পড়েই টাঙ্গি দিয়ে এক কোপ বসাল পাখিটার গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে পড়ল ডুলুং-এর গায়ে, কিন্তু পাখিটা এখনো মরেনি, নদীতে নেমে পড়ার চেষ্টা করছে, ডুলুং আবার গিয়ে পা চেপে ধরল, এলোপাতাড়ি টাঙ্গি চালাতে লাগল।

অন্য সারসগুলো প্রথমটায় ভয় পেয়ে ফুস করে উড়ে গেল একসঙ্গে, একটু দূরে গিয়ে বসল, উঁচু গলায় চিৎকার করতে লাগল, যেন অন্য সঙ্গী-সাথীদের ডাকছে, আবার তারা লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগল। এতবড় পাখি, লম্বা ধারালো ঠোঁট, একসঙ্গে অন্তত তিরিশটা রয়েছে। তবু ওরা মানুষকে আক্রমণ করতে জানেনা। শুধু চিৎকার করে।

ডুলুং যেটাকে ধরেছে, সেটা প্রায় বাচ্চাই। বেশিক্ষণ সে বুঝতে পারল না। মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলেছে ডুলুং, পাখিটার চোখ দুটো স্থির। তাড়াতাড়ি পালক আর চামড়া ছাড়িয়ে সে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু এখন তার মাথার ওপর চার-পাঁচটা পাখি খুব কাছে এসে তীব্র স্বরে কঁক কঁক করছে। ঢিলে ছোঁড়ে, কাকেরাও মাথায় ঠোকর দেয়, ডুলুং ভয় পেয়ে গেল, সে প্রথমে পাখিটার ধড়টা নিয়ে দৌড়লো, তারপর আবার ফিরে এসে মুণ্ডুটাও কুড়িয়ে নিল, এক হাতে টাঙ্গিটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটল প্রাণপণে।

পাখিদের ডাক আর আর্তনাদের মধ্যে একটা তফাত বোঝা যায় ঠিকই। রক্তাক্ত পালক খসে খসে পড়ছে, পাখিটাকে এক হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে ডুলুং, তাকে নদীর এপার থেকে দেখতে পেয়ে গেল নাড়ু।

নাড়ুও রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

জঙ্গলে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উবু হয়ে বসে রইলো ডুলুং। তার সারাশরীরে একটা ঝাঁঝুনি ধরে গিয়েছিল। তার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল সকাল থেকে। সেটাও কমে গেছে অনেকটা। এতবড় শিকার সে কোনোদিন পায়নি। এই শিকারের বিপদটাও সে জানে। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে চোখের সামনে এমন লোভনীয় খাদ্য দেখে সে আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি।

কেউ তাকে তাড়া করে এল না। কোনো হৈচৈ রব শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে পালকগুলো সব ছাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করল সে। ওগুলোও কাজে লাগবে। মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে বুনো কলাপাতায় মুড়ে নিল। তারপর সন্ধের মুখে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেল সে। বেশি লোককে জানানো যাবে না, আজ তাদের বাড়িতে ভোজ হবে। সে জঙ্গল থেকে পাখি মেরে এনেছে।

নাড়ু গিয়ে প্রথমেই বকল কমলাকে। তার আনন্দ এই যে জগদীশমামা এবার গুলি করে ডুলুংকে মারবে!

নাড়ুর চেয়ে কমলার বয়েস বেশি, সে বিপদের সম্ভাবনাটা ঠিক বুঝল। সে নাড়ুর চুলের মুঠি ধরে শাসাল, খবরদার বাবাকে বললি না! তা হলে তোকে খেতে দেব না। মা তোকে ভাত দেবে না!

মঙ্গলা ওনে মুখ কালো করে ফেলল। এই পাখি মারলে বাড়ির অকল্যাণ হবে। এরা অতিথি। ছোট মেয়েটার কাল থেকে জ্বর!

ঠিক করে মাটিতে থুতু ফেলে মঙ্গলা বলল, নিমকহারাম!

কিন্তু জগদীশকে জানানো চলবে না। জগদীশ শুনলেই সব দোষ চাপাবে লোধাদের ঘাড়ে। ডুলুংকে বাড়িতে ডেকে এনে কাজ দেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলাও দোষের ভাগী হবে।

আজ শিরীষ গাছদুটোয় সন্ধের পরেও কোলাহল খুব বেশি।

জগদীশ আপনমনে বলল, গাছে সাপ উঠল নাকি?

মঙ্গলা বলল, শীত পড়ে গেছে, এখন আবার সাপ আসবে কোথা থেকে?

জগদীশ বলল, একটা ট্যাসনাকে পরশুও আমি দেখেছি খেঁড়ার ক্ষেতের পাশে।

গায়ে চাদর জড়িয়ে, লম্বা টর্চটা নিয়ে জগদীশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল শিরীষ গাছতলায়। আলো দেখে পাখিরা আরও জোরে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনো সাপ চোখে পড়ল না।

খাওয়া দাওয়ার পর জগদীশ দাওয়ায় বসে পরপর সিগারেট টেনে যেতে লাগল। আজ তার চোখে ঘুম নেই। এক সময় সে মঙ্গলাকে ডেকে বলল, শোনো, একটা পাখি কাঁদছে। একেবারে ঠিক কান্নার শব্দের মতন!

সারাদিন খাটিয়ায় বসে থাকে জগদীশ, পাখির ডাক শুনতে শুনতে সে বোধ হয় পাখির ভাষাও শিখে ফেলেছে।

মঙ্গলা কান পেতে শুনল। কঁক কঁক কঁক-এর মধ্যে শুধু একটা যেন কোঁ কোঁ টানা সুর। কান্নার মতনই শোনায় বটে! মানুষের কান্নার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই।

খুব সাবধানে মঙ্গলা বলল, দুটো একটা বাচ্চা তো মরেই!

সে কথা ঠিক। এখানে সে ধু-আড়াই মাস থাকে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা পাখি নিজে নিজেই মারা যায়। গাছ থেকে খসে পড়ে। শুকনো, রক্তশূন্য চেহারা। পাখিরাও বুড়ো হয়। পাখিদেরও শিশুর মৃত্যু আছে।

মরা পাখিগুলোকে ওরা কুকুরটাকেও খেতে দেয় না। বস্তু করে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে আসে। গাছের ওপরের পাখিরা সব লক্ষ করে। গাছ থেকে খসে পড়া মৃত পাখিদের জন্য জীবন্ত পাখিরা কোনোদিন শোক করেনি।

কিন্তু আজ যেন স্পষ্ট কোনো কান্নার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জগদীশকে অন্যমনস্ক করার জন্য মঙ্গলা পাঁচ রকম সংসারের কথা তোলে। ধান-চাবের হিসেব নিতে নিতেও জগদীশ এক সময় বলে উঠল, ঠিক মানুষের মতন কাঁদছে মনে হচ্ছে না? এ রকম আগে শুনেছ?

মঙ্গলা বলল, কমলা কখন থেকে পাত পেড়ে বসে আছে, তুমি খাবে না? এস—

কান্নার আওয়াজটা শুনতে শুনতে জগদীশ অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে ছটফট করল। পাশের ঘরে নাড়ুকে কমলা আরও অনেকবার ভয় দেখিয়েছে।

ভোর হতে না হতেই জগদীশ আবার গেল গাছতলায়। একটাও মরা পাখি নেই সেখানে।

এর পর দু দিন গাবুড় গাছতলায় পাথরের পাশে বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখল কমলা আর নাড়ু। শীতির জ্বর খুব বেড়েছে। চিলকিগড় থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছিল তার জন্য। মঙ্গলা কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। এক একবার সে কমলার দিকে রোগের দৃষ্টিতে তাকায়। মা-মেয়েতে যুক্তি হয়েছিল যে অশুভ সংবাদটা জগদীশকে জানানো হবে না, কিন্তু এখন এক একবার মঙ্গলার মনে হয়, ডুলুং-র শাস্তি পাওয়া দরকার। নইলে পাখির মায়ের কান্না থামবে না। ওর অভিশাপেই কি মঙ্গলাকে সারাজীবন কাঁদতে হবে?

কমলা আর নাড়ু দেখতে পায় না ডুলুংকে। সে বোধহয় ভয় পেয়ে আর আসছে না এদিকে।

ডুলুং অবশ্য ঠিকই আসে। এই গ্রামে ঢোকে না। জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকে, বিকেলের পর গুঁড়ি মেরে এগোয় নদীর দিকে। এক ঝাঁক পাখি সন্ধের পরেও স্নান করতে ভালবাসে। লম্বা গলাটা তুলে আকাশের দিকে জল ছড়ায়। ওপরে উঠে ডানা ঝাপটায়। একজন আরেকজনের ঘাড়ে আদর করে। প্রথম চাঁদের আলোয় ওদের ধপধপে শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে।

একটা মারার পর ডুলুং-র সাহস বেড়ে গেছে। সে খুব তাকে তাকে থাকে। কাশ বনের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে। অপেক্ষাকৃত ছোট কোনো সারস দেখলে সে টাঙ্গির এক কোপে গলাটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

গাবুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কমলা আস্তে আস্তে ডাকে, ডুলুং! ডুলুং!

কোনো সাড়া আসে না।

একদিন জ্যোৎস্না রাতে ওরা এসেছিল, এক সকালে ওরা ফিরে যেতে শুরু করে। এবার মাত্র পনেরো দিন কেটেছে।

ওদের উড়ে যাবার সময় একটা আলাদা ডাক আছে। প্রথমে একজন ডাকে, তারপর আর একজন, তারপর একসঙ্গে অনেকে। প্রথমে তিন-চারজন গাছ ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তারপর এক একটা দল শূন্যচারী হয়। দশ মিনিটের মধ্যে গাছদুটো ফাঁকা হয়ে যায়।

জগদীশ ঠিক ধরতে পেরে যায়। এ তো অন্যদিনের মতন আহারের সন্ধানে উড়ে যাওয়া নয়। তার বাড়ি ঘিরে পাখিগুলো উড়ছে যেন বিদায় জানাচ্ছে। আকাশ সাদা হয়ে গেছে একেবারে। তাদের ডানার শব্দ ঠিক ঝড়ের মতন। তাদের কঁক কঁক ডাকের মধ্যে যেন ঝরে পড়ছে অভিমান।

প্রত্যেক বছর এরা মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত থাকে। এবারে ভাল করে শীতই এল না, তবু ওরা চলে যাচ্ছে কেন?

জগদীশ চেঁচিয়ে ডাকল, মঙ্গলা, মঙ্গলা।

কমলা, নাড়ু পিসিমা সবাই এসেছে, এমনকি নীতির জ্বর ছেড়েছে গতকাল, সেও ছুটে এল উঠোনে। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে। সবাই বুঝেছে।

জগদীশ হাহাকার করে বলল, তোমাকে বলেছিলুম না, পাখির মা রোজই কাঁদে। এবার কিছু একটা হয়েছে ওদের!

নাড়ু আর কথা চেপে রাখতে পারল না। সে বলল, ডুলু পাখি মেরেছে!

কমলা এক চড় কষালো নাড়ুকে।

জগদীশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওরা আর কোনোদিন আসবে না ফিরে।

জগদীশের অনুগত সাঁওতালরা নদীর ওপারের কাশবন আর জঙ্গল ঘুরে দেখে এল। অন্তত চার জায়গায় সাদা পালক, রোঁয়া আর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। লোধারা নিয়মিত এই পাখি মারতে শুরু করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই হিংস্র মানুষদের দেশে ওই সুন্দর পাখিরা আর থাকবে কেন? সারা পৃথিবীতে কি আর জায়গা নেই?

সাঁওতালদের কাছে এই পাখি পবিত্রতার প্রতীক, তারা দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জগদীশ শুয়ে পড়েছে খাটিয়ায়। তার মুখে ম্লান ছায়া। যেন এই বিশ্বনিখিল থেকে সে আজই চির নির্বাসিত হল একটা ছোট্ট উঠোনে।

দুপুরের দিকে একটা ভিড় জমে গেল। গ্রামের অনেকেই শোক প্রকাশ করতে এল। পাখিগুলো অসময়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, এ তো এ গ্রামেরই অপমান। বাইরের লোকেরা এর পরে এসে ছি ছি করবে। অথচ তাদের তো কোনো দোষ নেই।

লোধাদের একটা ছেলেকে যে এ বাড়িতে আসবার দেওয়া হয়েছিল, সে কথা উঠলই। গ্রামে ঢুকি বেড়েছে, সে কথাও বলল কেউ কেউ। পরশুদিন হাট থেকে সাঁওতাল মেয়েরা ফিরছিল সন্ধের পর, ফুলমণি নামে একটি মেয়ের পায়ে কাচ ফুটেছিল, সে হাঁটতে পারছিল না ভাল করে। পিছিয়ে পড়েছিল খানিকটা। হঠাৎ দুটি ছেলে শাল জঙ্গলের আড়াল থেকে এসে তাকে চেপে ধরে। কোনো সাঁওতাল ছেলে এমন কাজ করবে না। এ নিশ্চয়ই লোধাদেরই অপকীর্তি।

উত্তেজনা বাড়তেই লাগল ক্রমশ। সন্ধের পর প্রায় পাঁচশো লোকের বিরাট একটা দল টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে আক্রমণ করল লোধাদের গ্রাম।

লোধারা প্রথমেই এগিয়ে দিয়েছিল ডুলুংকে। মাংস অনেকেই খেয়েছে। তবু সব দোষ ডুলুং-র। প্রথমে একটা শাবলের বাড়ি খেয়ে সে ছিটকে পড়ল মাটিতে, বাচ্চা সারসটার মতনই সে হাঁচোড় পাঁচোড় করে পালাবার চেষ্টা করল, পারল না, একটা টাঙ্গির কোপ পড়ল তার ঘাড়ে।

তাকে খুন করার পরেও জনতার ক্রোধ কমল না। মরল আরও তিনজন, জখম হল সাতাশ জন। পুলিশ এল আড়াই দিন পর।

জগদীশকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারল না। সে পঙ্গু শরীর নিয়ে দাসত্ব করতেও যায়নি, তার বন্ধুকও সে অন্যকে ধার দেয়নি। সে খাটিয়াতেই শুয়েছিল আগাগোড়া। দারোগাবাবু তার বাড়িতে এসে চা খেয়ে গেল।

জনা দশেক সাঁওতাল চালান হয়ে গেল সদরে। তারাও পার্টির দৌলতে জামিন পেয়ে গেল কয়েকদিন বাদে। লোধাদের তুলনায় সাঁওতালরা সংখ্যায় অনেক বেশি, সেই জন্য তাদের প্রতি দরদ আছে রাজনৈতিক দলগুলির। এরপর মামলা কবে উঠবে ঠিক নেই, সব কিছু চুকে যুকেই গেল বলা যায়।

কমলা মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে ঘুমের মধ্যে। সে যেন দেখতে পায়, একটা বাঁকড়া শিরীষ গাছের ডগায় উঠে সেই কালো কুচকুচে চেহারার যুবকটি হাত বাড়িয়ে ডাকছে, এই সব জঙ্গল আমার!

তারপরই সে দেখতে পায় মড়মড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। কমলা তখন হাত-পা ছুড়ে আঁ আঁ শব্দ করতে থাকে।

মেয়ের তড়কা রোগ হয়েছে এই ভয় পেয়ে মঙ্গলা তাকে নিয়ে গেল কনক-দুর্গার মন্দিরে। পুরুতমশাই তাকে মন্ত্রপড়া জল দিয়ে বললেন, ও কিছু নয়, বিয়ের পরই সেরে যাবে।

জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে বলে, পাখির মায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছ? শোনো, শোনো, ঠিক সেই কাঁ কাঁ শব্দ আসছে গাছ থেকে।

মঙ্গলা অনেক শক্ত মনের মেয়েমানুষ। সে বলল, কোথায় শব্দ? ও তোমার মনের ভুল!

জগদীশ বিষণ্ণভাবে বলল, তাই হবে বোধ হয়। ওরা অসময়ে চলে গেল, আর কোনোদিন আসবে না, না গো?

মঙ্গলা বলল, দেখই না সামনের বছর কী হয়। আমরা তো আর কোনো দোষ করিনি!

জগদীশ আবার বালিশে মাথা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ক্রমে শীত এল জাঁকিয়ে।

সাঁওতালরা তাদের বাৎসরিক শিকার করতে জঙ্গলে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এল। হরিণ-শুয়োর তো দূরের কথা, একটা খরগোশও পায়নি একবার। সাপ, ইঁদুররাও এই শীতে গর্তে ঢুকে থাকে। জঙ্গলের আর কোনো চক নেই। সেই জঙ্গলই বা কোথায়। কারা যেন ওর মধ্যে চাষও শুরু করেছে।

চালের দাম এই শীতে বেড়ে গেল হু হু করে।

নদী শুকিয়ে গেছে। এ বছর তেমন শাকসবজিও ওঠেনি। এ বছরটা বড় নির্দয়। সবাই পাখিদের কথা ভুলে গেছে। শীতে কোনো আনন্দ নেই। আবার কবে বর্ষা আসবে, সবাই চেয়ে আছে সেই আশায়।

উঠোনে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ডালের বড়ি দিচ্ছে মঙ্গলা। খাটিয়ায় পা ছড়িয়ে আধ শোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে জগদীশ। কুকুরটা হঠাৎ ঘ্যা ঘ্যা করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে। পেঁপে গাছটার তলায় কোনো মানুষ বসে আছে।

মঙ্গলা বলল, কে দেখ তো কমলা!

কমলা আর নাড়ু এক সঙ্গে ছুটে গেল। পুরুষ নয়, একজন স্ত্রীলোক। বুড়ি। পেঁপে গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে। গায়ে একখানা কাদা রঙের ছেঁড়া শাড়ি। মুখে অসংখ্য রেখা, মাথার চুল শনের নুড়ির মতন। ঘোলাটে ঘোলাটে চোখ।

কী চাই?

বুড়িটা ফ্যাস ফ্যাস করে কী যে বলল বোঝাই গেল না। তার গলা ভাঙা। কিংবা কোনোকালেই বোধ হয় তার কথা বলার শক্তি ছিল না।

তোমার কী চাই এখানে?

বুড়িটা কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ঠিকই। পেটের ভিতর থেকে একটা শব্দ বার করার চেষ্টা করছে।

নাড়ু হঠাৎ চিনতে পেরে বলল, এ তো ডুলুং-র মা। বাজারের কাছে দেখেছি!

কমলা শিউরে উঠল। আবার লোধারা এই গ্রামে আসতে শুরু করেছে!

চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে ডুলুং, সে আর আসবে না। এই তার মা? এর মুখে এত রকম আঁকিবুঁকি যেন মনে হয় একহাজার বছর বয়েস। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে কমলার, এখন তার আলাপ করার সময়। তবু তার চোখ জ্বালা করে উঠল।

বুড়িটা উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে কী যেন বলল।

অতি কষ্টে তার দু-একটা শব্দ উদ্ধার করা গেল। বুড়িটা বলছে, একটু.....মুড়ি!

গোঘ্ন

চারু মাস্টারের বেহালা শুনে দোলাই বড় কেঁদেছিল। দোলাই ছিল নরম মনের ছেলে। বলেছিল, আপনার যন্তরে কী জানি কী জাদু আছে, কলজে টাটায়। হেই মাস্টেরবাবু, আপনার বিটির বিভায় যত কুমড়ো লাগবে, হামি দিবো। যত কলাই লাগবে, তাও দিবো।

চারু মাস্টারের বিটির ফাগুন মাসে বিভা। দোলাই তার আগেই গাবতলার গোরে ঘুমোতে গেছে। নিচে ধু ধু পদ্মার জল ছুঁয়ে শেষ মাঘের হাওয়া এখন চারু মাস্টারের বেহালার সুরে বাজে। তাই শুনে ভাই হারাইয়ের মনে টান বেজেছিল। ফাগুন মাসে মাস্টারের বিটির বিভা। যত কুমড়ো লাগে দেবে বলেছিল দোলাই। যত কলাই লাগে, তাও দিতে চেয়েছিল।

উঠোনের কোনায় বসে শালপাতায় ভাত খেতে খেতে হারাইভাইয়ের কথা বলে। চারু মাস্টার মোড়ায় বসে গায়ে রোদ নেন। যে বিটির বিভা হবে, সে খঞ্জনীর মতো মিঠে স্বরে বলে— ও চাচা, লজ্জা কোরো না পেট পুরে খাও।

বাঁ হাতের আঙুলে নাক-ঝেড়ে পাছায় মোছে হারাই। মাথা নেড়ে বলে— খাছি মা, খুব খাছি। বড় মিঠা আপনারঘে রাঢ় দ্যাশের ভাত।

ফাগুন মাসে বিভা। ভাঁড়ার ঘরে দু'বস্তা কলাই, কুড়িটে বড় বড় কুমড়ো— ভেতরটা নাকি লাল বিরিং! এই সুখে আহ্লাদী মেয়েটা খিল-খিল করে হসে। — ও চাচা! তোমাদের দেশের ভাত বুঝি তেতো?

হারাইও হাসে— দানাগুলান মোটা, বিটি রে! বাবাকে পুছো, হামারঘে দ্যাশে রাঢ়ি চালের ভাত খায় শুধু আমির বড়লোকে। পুছো মাস্টেরবাবুকে, বিটি রে।

চারু মাস্টার চোখ বুঝে ঝিমোচ্ছেন। তাঁর মেয়ে অবাক হয়ে বলে— তোমরা কী খাও, চাচা?

—ইয়া মোটা মাসকলাই আটার লাহারি। ছাতু। ভুজা। গেঁহু উঠলে দুটা মাস সুখ। আম-কাঁঠালের সঙ্গে গেঁহুর আটার চাপড়ি। বলে হারাই ফের নাকের ডগা মোছে। ভাত মাখে। পরম নিষ্ঠায় সে মুখে তোলে, সাবধানে।

মেয়ে মুখে দুঃখ রেখে বলে— ভাত খাও না তোমরা, চাচা?

Scanned by CamScanner

—অল্পস্বল্প খাই। আউষের ভাত। সেও মাসে আর ক'দিন? হারাই উজ্জ্বল মুখে পাঁচিল ঘেঁষে রাখা ধানের তিনটে বস্তার দিকে তাকায় একবার। ফের বলে— বিটি রে! তুমারয়ে দ্যাশের ধান লিতেই তো ফি বছর কষ্ট করে আসি। হামারয়ে কষ্ট, জানোয়ারেরও কষ্ট। বাঁওয়ালি বলদটার হালগতিক খারাপ।

তার উজ্জ্বল মুখে দ্রুত ছায়া নামে। ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে নিমতলায় গাড়ি রেখেছে। বলদ দুটো দু চাকায় বাঁধা। চারু মাস্টার কিছু খড় দিয়েছেন। তাদেরও কপাল হারাইয়ের কপালে বাঁধা। হারাই যখন আমন ধানের সুন্দর ভাত খাচ্ছে, তারাও কত সুখে নাড়া খড় চিবুচ্ছে। তবে বাঁয়েরটা রাত থেকে কেমন ঝিমন্ত। নাদির লক্ষণ গোলমেলে। পাকা রাস্তা থেকে এই গাঁয়ে ঢুকতে পা টেনে হাঁটছিল আর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

চোখ বুজে রেখে চারু মাস্টার বলেন—এ গাঁয়ে গোবদ্যি নেই। এক ঘর বেদে ছিল, মরে হেজে গেছে। হারাই, তুমি সানকিভাঙার কাছে গাড়ি রেখো। রেখে পিরিমল হাড়িকে ডেকে এনো। আমার নাম করো, কম পয়সায় কাজ হবে।

কান করে কথাটা শোনে হারাই। তারপর বলে —জি হ্যাঁ!

—জি হ্যাঁ না, অবশ্যি করে দেখিয়ে নিও। চারু মাস্টার এবার চোখ খোলেন! মোটাসোটা মানুষ। পিঠে কাঁচা-পাকা লোম। পুরু গোঁফ। লুঙির ভেতর হাত ঢুকিয়ে জাং চুলকে বলেন ফের —তোমরা বাঘড়ে গাঁড়োয়ানরা বড্ড আলসে মাইরি! দোলাইকে গতবার বললুম, দোলাই, পথেই তো ইকরোল পড়বে। ভুতু কোবরেজের কাছ হয়ে যাস। দোলাই বললে, যাব। পরে ভুন্দ্রার সঙ্গে দেখা হল গিয়ে কাঁদির বাজারে। জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, না তো! তেমন কেউ যায়নি তো!

ভুতু কোবরেজের কাছে গেলে দোলাই মরত না, এ বিশ্বাস হারাইকে অস্থির করে। ভাতগুলো কোনওরকমে গিলে সে এঁটো কুড়োতে থাকে। তারপর শালপাতাটা সাবধানে বাইরে নিয়ে যায়। রাস্তার ধারে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। ও পাশে ছোট্ট পুকুর। ঘাটে লোক আছে দেখে সে আঘাটায় নামে।

এটা হিন্দুর গাঁ। ছোঁয়াছুঁয়ির হালহদিশ সবই জানে হারাই, সে দেশচরা মানুষ। এ গাঁয়ে মোছলমান থাকলে সে চারু মাস্টারের বাড়ি ভাত খেত না। তার কপালে নমাজ পড়ার ঘেঁটো। ফতুয়ার পকেটে তালপাখার শিরে তৈরি একটা গোল টুপি আছে। পথেই সময় হলে গাড়ি বেঁধে রেখে সে নমাজ পড়তে ভোলে না। ছোটভাই দোলাই প্রথম তার সঙ্গে এসে ভড়কে গিয়েছিল। —হেঁদুর বাড়ি খাবা? ও বড়ভাই, হেঁদুর বাড়ি খাবা? খালি ও কথা। চোখ রাঙিয়ে হারাই ধমক দিয়েছিল— জান বাঁচানোর ফরজ (অবশ্যপালনীয়) কাম, জানিস গে ছো করা? খালি বকর বকর! মুখে কুলুপ দেদিনি!

পরে যত বয়েস হল দোলাই পাকল। বড় শৌখিন ছেলে ছিল সে। চারু মাস্টারের গাঁয়ে আসার জন্যে প্রতি মাঘে আনচান করত। মাঘে ঈশানদেবের চত্বরে শিব চতুর্দশীর মেলা শুরু। গাঁয়ের যাত্রা দল পালা গায়। চারু মাস্টার বেহালা বাজায়। তাঁর বেহালার সুরে কী জাদু, কলজে বড় টাটায়। চোখে ঘোর লাগে। আর সামিয়ানার তলায় শব্দহারা মানুষজন ঘিরে কী এক চিরকালের দুঃখ স্রোত বয়ে যায়। মাস্টার গে, হেই মাস্টের! এ বড় যাদুর খেলা। নিশুতি রাতে নির্জন দুরগামী সড়কে ক্লান্ত পা-টেনে-চলা বলদের বোবা অবোলা চোখের কোনায় যেন চারু মাস্টারের বেহালার ছড়-টানা রেখা। আর আতেলা ধুরির চারদিক ঘুরে ঘুরে কালের চাকার মতো এই গাড়ির দুই চাকায় সেই করুণ সুর নিরন্তর বাজে! মাঠ পারের গাঁয়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙা মানুষজনের কানে ছড়িয়ে যায় হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো চাকা গড়ানো গুরুগুরু গভীর গম্ভীর দূরের ধ্বনিপুঞ্জের সঙ্গে কোঁ কোঁ বেহালার সুর। মাস্টার গে, হেই মাস্টের! তুমি বড় যাদুকর। এই বয়েসেই কী দুঃখু চিনিয়ে দিয়েছিলেন পদ্মার কোলের এক আপনভোলা ছেলেকে। তাই নিয়েই সে গোরে ঘুমোতে গেল।...

Scanned by CamScanner

নিমতলায় দাঁড়িয়ে ভাইয়ের কথা মনে পড়ে হারাইয়ের। দোলাই থাকলে এবার ফের বাড়ি ঢুকত গলা খাঁকারি দিয়ে। মাস্টারের মেয়েকে ডেকে বলত—ও বহিন, বহিন গে! ইবারে একখিলি পান দ্যাও, খাই।

হারাই পান খায় না। বিড়িতামাক খায় না। সন্ধ্যায় মসজিদে গিয়ে ধর্মকথা শোনে। দুটো কাঁঠাল আর তিনটে আম গাছ আছে। সতেরো কাঠা ভুঁই আছে। দুটো বলদ গোরু আছে। একটা গাড়ি আছে। শীতের শেষে দূরের এই রাঢ়ে গেরস্থরা যখন ধান ঠেঙিয়ে মড়াইতে তোলে, হারাই তখন চনমন করে ওঠে। সতের কাঠা খেতের খন্দ কী সবজি, গাছের ফল-মাকড় বোঝাই করে সন্ধ্যা থেকে। গাড়ির সব বাঁধন আঁটো করেছে বিকেলে। ধুরিতে রেড়ির তেল মাখানো হয়ে গেছে। প্রথম প্রহর শেষ হলে আদাড়ে শেয়াল ডাকে। লম্ফ হাতে পাটকাঠির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে তার বউ আর ঘুমঘুম চোখে ছেলেমেয়েরা—প্রত্যেকটি মুখে প্রত্যাশা ঝমমক করে। বাপ ফিরে এলে রাঢ়ি মিঠা ধানের ভাত খেতে পাবে। যে ভাত পালায়-পরবে খায় মোন্নাজিরা, মিয়াসায়েবরা, বাবুমশাইরা। সেই ভাত— সাদা ঝকঝকে মিহি স্বাদু 'শাহ্‌দানা'। মোন্নাজি বলে, শাহ্‌দানা। শ্রেষ্ঠ দানা বা শস্য। রাঢ়ে শাহ্‌দানার মরশুম এলে সারা বাঘড়ি অঞ্চলে শিহরণ ঘটে যায়। ভাগীরথী-ভৈরবী-পদ্মার পলিতে ভরাট নরম মাটির এই সমতল দেশে সাড়া পড়ে যায়। খন্দ-ফলমূল গোরু-মোষের বাড়িতে বোঝাই করে দলে দলে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে সোনার রাঢ়ের দিকে এগিয়ে চলে। চাকায় চাকায় সদ্য তেলমাখানো ধুরির শব্দহীন চাপা আবেগ তখন থরথর করে। আর চলে ভুখা মিছিল। তারা বলে — 'হামরা মুসাফির! সফরে চলুন।' ভাগীরথী পেরিয়ে কতক দূরে কেউ এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে পরখ করে! এ মাটির রং সোনালি। এই মাটি শাহ্‌দানা ফলায়। সাদা ঝকঝকে, মিহি চিকন স্বাদু ভাত। ভাপের গন্ধে মন ভরে যায়। ভুখ মিছিলের মুসাফির মাটির গন্ধ শোঁকে। যেন সেই ভাতের গন্ধ পায়।

হারাই সেই 'মুসাফির' নয়। মাঙতে আসে না রাঢ়মুলুকে। খন্দ ফলমূল সবজির বদলে ধান মেপে নেয় তারাজুতে। এই শেষ মাঘে সে এসেছে মরা ভাইয়ের কথা রাখতে। কিন্তু চারুমাস্টার বড় দয়ালু ভালোমানুষ। তিন বস্তা ধান দিয়েছেন। বলদের জন্যে দু তড়পা খড়ও দিয়েছেন। দু রাতের রাস্তা। আর বাঘড়ির এসব মানুষজনের সঙ্গে রাঢ়ি মানুষের বংশপরম্পরা কুটুম্বিতে। হারাইয়ের বাপ মরশুমে এলে চারু মাস্টারকে দেখা না দিয়ে যেত না। ফি বছর আম-কাঁঠাল দিয়ে যেত সেধে। চারুবাবুর মা বুড়োকে জোর করে এক পুঁটুলি মুড়ি গছিয়ে দিতেন। বুড়িমা আর বেঁচে নেই। থাকলে হারাইকে একখানা নতুন গামছাও দিতেন বইকি।

বেলা হু হু করে পড়ে এল। শেষ শীতের রুক্ষ ক্ষয়াখর্বুটে রাঢ়ি গাছপালা আর শুখা ন্যাড়াটে ঘরবাড়ির গায়ে রোদের রং তেল-তেলে দেখাচ্ছে। বস্তা তিনটে বয়ে এনে গাড়িতে চাপায় এবং বাঁধাছাদা করে হারাই। চারু মাস্টারের মেয়েটা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসে।—ও চাচা, তোমাদের দেশে আম পাকলে আনবে তো? আসবে তো, চাচা?

—আসব বিটি, আসব,.. হারাই ডাইনের বলদটাকে চাকা থেকে খুলে এনে জোয়ালে দড়ি আটকায়। বাঁ দিকেরটা খুলতে গিয়ে ফের বলে— তো ও গে ভালোমানুষের বিটি! ফাগুন মাসে তুমার বিভা। চাচাকে বিভা খেতে তো ডাকলে না। হেই মা, হামি কি তুমারঘে পর?

লজ্জায় রাঙা হয়ে বিটি দরজার আড়ালে ঢোকে। তার বাবা নিমতলায়। বলেন— ডাকলেও কি আসতে পারবে, হারাই? আর তো মোটে দিন দশেক আছে। পারলে অবশ্যি এসো।

হারাই বাঁওয়ালি বলদটাকে ওঠাতে ব্যস্ত। —ইর্‌র্‌র্ হেট হেট হেট! হিঁই! দেখছ, দেখছ? হুঁঃ হুঁ! সে লেজ ধরে টানাটানি করে। গর্জায় বারবার।— দুশমন! জোভিয়াঃ (জবাইযোগ্য)! জবাই করব বুলছি হুঁ। উঠল? উঠল এখনও? তারপর একটু ঝুঁকে আদুরে স্বরে — হামার বাপধোন রে! সোনা রে। মানিক রে। এট্টুকুন কষ্ট কর্ বাছা। সানকিভাঙা পজ্জন্ত ঠুক ঠুক করে গেলেই খালাস। ইর্‌ইর্ হেট্ হেট্! ওরে, আর জ্বালাসনে বাপ! বাড়ি যাব— আমরা বাড়ি যাব!

Scanned by CamScanner

এইরকম আদর, ছেলেভুলোনো কত কথা, কখনও কসাই ডাকার শাসানি, জবাই করার হুমকি—ফের গায়ে হাত বুলিয়ে—নেমকহারামি করিস নে সোনা! অ্যাটুকুন থেকে পুষে পেলে এত বড়টা করনু। তার এই ফল রে?

চারু মাস্টার হো হো করে হাসেন।—ওরে উতুরে ভুত! ও হারাই! বরং এক কাজ কর। গাড়ি থাক। তুই সানকিভাঙা চলে যা। পিরিমল বদ্যিকে ডেকে নিয়ে আয়। দেখছিস না, ছ্যারানি হয়েছে গোরুটার?

তা তো দেখতেই পাচ্ছে। খড়ের গোছা মুখে ধরা। চোখের কোনায় কালি। কালো ধারা আঁকা। হাড়ের সার ঠেলে উঠেছে রাতারাতি। হারাই উঠে দাঁড়ায়—বরাবর একটুকুন বদমাইসিও আছে, মাস্টেরবাবু। বুঝলেন? হ্যাঁকাৎপনাও আছে। ঘাড়বেঁকিয়ে দাঁড়াল তো দাঁড়াল। তবে পা ফেললে থামানো যায় না। ব্যাটার এই বড় গুণ। তখন পংখিরাজ ঘোড়া।

ঘুরে সূর্যটা দেখে নিয়ে ফের সে লেজে মোচড় দেয় এবং পাঁজরে পাচনের গুঁতো মারে। চারু মাস্টারকে অবাক করে গোরুটা হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ায়। বস্তায় হাতের গোবর মুছে হারাই একটু হেসে বলে—দেখলেন?

—তা তো দেখলাম। কিন্তু পিরিমলকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস বাপু।

হারাই জোতা পরায়। অবোলা জানোয়ার। বুঝতে পেরেছে এবার ঘরে ফেরার সময়। রোগা পা টেনে চলা বলদের এখন যেন পিঠে ডানা গজায়। সব গাড়োয়ানই তা টের পায়। হারাই গাঁয়ের পথে ধুলো উড়িয়ে যেতে যেতে খুশিতে চ্যাঁচায়—হামার পঙ্খীরাজের বাচ্চারে! হামার এরুপ্লেলেন রে! হেই মাস্টেরবাবু ফাগুন মাসে বিটির বিভায় যদি আসি, হামার ধনাকে পাঁচ তড়পা খ্যাড় দিতে হবে—এ—এ এ!

চারু মাস্টার বেহালা বাজানো কোমল হাত তুলে নাড়েন। আহ্লাদী মেয়ে দৌড়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে হারাই চাচার গাড়ি যদ্দূর যায়, দেখতে থাকে। শূন্য মাঠের বুকে শেষ মাঘের বিকেলে ধুলো উড়িয়ে যেতে যেতে গাড়িটা পাকা সড়কে পৌঁছুলে সে বলে—ও বাবা! হারাই-চাচাকে নেমন্তন্ন করলে না? তুমি ভারি ভুলো মন!...

একটা মাঠ পেরিয়ে পুকুরপাড়ে ক'ঘর লোকের বাস। পাকা রাস্তার ধারে একলা এক লম্বা নির্জন গাছ। দোনামোনা করে গাড়ি বাঁধে হারাই। সূর্য পাটে বসতে আর বিঘৎখানেক দূরত্ব। গাড়িতে তিন বস্তা ধান আছে। হারাই দৌড়ে যেতে যেতে বার বার পিছু ফেরে। সামনের মেয়েটাকে বলে—বিটি, ইখানে গোবদ্যি কে আছে রে?

মেয়েটা ঝোপের আড়ালে কম্ম কবতে এসেছে। তলপেটে আস্তে আস্তে থাপ্পড় দিচ্ছে। একটু বিরক্ত হয়ে বলে—হুই দেখ না। পিরিমল খুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

চেহারায় সেটা মালুম বটে। বেঁটেখাটো লিকলিকে কালো গোবদ্যির জটা আর ডুগডুগে সিঁদুর হু হু জ্বলছে। রুক্ষু লাল চোখে কিসের ঘোর। এক শুকনো গাছের ডগায় দাঁড়কাক ডাকলে হাতের সাপমুখো বাঁকাচোরা লাঠিটা তুলে নাকি স্বরে বলল—যা, যা! ইখেনে কী? পুবে যা, পছিমে যা, উত্তুরে দক্ষিণে যা! ইখেনে কী?

হারাই কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—বিষম বিপদ। চণ্ডীতলার চারু মাস্টের বুললেন...

—বুঝিছি। শিসটানা, না বাঘতড়পা? মুসকো না ছ্যারানি?

—ছ্যারানি।

—ডাইনালি, না বাঁওয়ালি?

—বাঁওয়ালি।

Scanned by CamScanner

—মরেছে! ... বলে পিরিমল হাড়ি ঘরে ঢোকে। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলে—তা মাস্টেরের খাতির, পাঁচ সিকে লাগবে।

হারাই চোখ কপালে তোলে।—অত তো নাই বদ্যিমশাই! আনা বারো আছে। দয়া করুন, বড় বিপদে পড়ে এনু।

পিরিমল হাড়ি বকের ঠ্যাঙ বাড়িয়ে হাজার কথা বলে—তোমাদের বাঘড়ে গাড়োয়ানদের ওই এক দোষ বাপু। নেয্য পয়সাটা দেবে না। খালি মাস্টেরের খাতির! মাস্টের কি আমার অন্নদাতা, না মুনিব? ভারি তো ক্যাঁই কোঁ কোঁ বাজনা শিখেছেন। আমি কি মেয়েমানুষ যে মজিছি? যেতে যেতে তিন পুরুষের নামধাম গোরু দুটোর জীবনচরিত জেরা করে জেনে নেয় পিরিমল বদ্যি। তারপর অর্জুন তলায় গিয়েই লাফিয়ে ওঠে।—এঃ হে হে হে হে হে! করিছিস কি! ওরে ফুটুকচাঁদা! ওরে বাঘড়ে ভূত! এইখেনে গাড়ি বেঁধেছিস? হায় হায় হায় হায়! আবাগীর বেটা করিছে কী গো!

সূর্য পাটে বসেছে। দুপাশে প্রসারিত শস্যশূন্য মাঠে বুনো পায়রার ডানার রং ঘনিয়ে আসছে—এই পৃথিবীটাকে মনে হয় মুখ গুঁজে থাকা বুনো পায়রার মতো ঝিম। উত্তরের হাওয়ার দাপট একটু কমেছে এই দিনশেষে। শেষ মাঘের হিম চোঁয়াতে শুরু হয়েছে আকাশ থেকে। অনেক দূরে আলের আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার একটা শেয়াল ডেকেই চুপ করে গেল। ধরা গলায় হারাই বলে—ইখানে গাড়ি বাঁধলে কী দোষ, বদ্যিমশাই?

পিরিমল হাড়ি গাছের শেকড়ের বাঁকাচোরা লাঠিটা তুলে বলে—হুই দেখছিস একটা শুকনো ছালছাড়া ডাল। দেখতে পাচ্ছিস?

ভয়ে ভয়ে দেখে নিয়ে হারাই বলে—হুঁ।

—কালুদিয়াড় চিনিস কুথা?

—সে তো ভৈরব নদীর পাড়। ভগীরথপুরের ধারে।

—কালুদিয়াড়ের ইসমিলকে চিনতিস?

—না, বদ্যিমশাই।

—ইসমিল ইখেনে গাড়ি রেখে কী করিছিল জানিস?

—না, বদ্যিমশাই।

—আপ্তহত্যে।

হারাই শিউরে উঠে তাকায় শুধু। মন কেন খালি কু গায়? ধনা ফের শুয়ে পড়েছে। একরাশ ছ্যারানিতে এরই মধ্যে অনেকটা জায়গা নোংরা। কটু গন্ধ ছোটে। মনা ডান দিকের জোয়াল থেকে একঠ্যাং বাড়িয়ে ধনার কপাল চাটছে। আহা, অবলা-জন্তু। একসঙ্গে ওঠাবসা গতায়াত খাওয়া-দাওয়া। একের কষ্ট অন্যে টের পায় বইকি।

পিরিমল ফের বলে—আপ্তহত্যা। ডালটা সেই তাতে শুকিয়ে যেয়েছে। তা যাক গে, না জেনে যা করিছিস! কই চাট্টি খ্যাড় দে।

চারু মাস্টারের দেওয়া তড়পা থেকে এক গোছা খড় আনে হারাই। বদ্যি খড়গুলো দু দিকে মুড়ে তার মধ্যে একটা শেকড়-বাকড় ঢোকায়। তারপর ধনার মাথায় বুলিয়ে বলে— ভালামোন বাপ রে! জাদু রে! গোজন্মের বড্ড কষ্ট, তা কি জানি না? ইবারে খেয়ে ফেলো দিকিনি! চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। আলন্দে জাওর কাটো। একটুখানি জিরিয়ে লাভ। তাপরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। ... বালটিন আছে সঙ্গে?

হারাই ব্যস্ত হয়ে বলে—ডোলচি আছে।

পিরিমল খিক খিক করে হাসে।—তোরা বুলিচ ডোলচি, আমরা বুলি বালটিন। একই কথা। যা বাপ, আঘাটার জল লিয়ে আয়। এক লিঃশ্বেসে ভরবি। সাবোধান!

Scanned by CamScanner

বালতি নিয়ে হারাই দৌড়ে যায়। দম আটকে আঘাটার জল ভরে অর্জুন তলায় এসে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। হাঁফায়। পিরিমল বদ্যি খড়ের নুড়োটা ধনার মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধনা আস্তে আস্তে চোয়াল নাড়ছে। তারপর পিরিমল কোমর থেকে একটা শুকনো লতানে ঘাস বের করে। সেটা ঘনার মাথা থেকে লেজ অবধি বার কতক বোলায়। তাপর বলে—জল কই?

বালতির সামনে বসে সে বিড় বিড় করে মন্ত্রপড়ে। ফুঁ দেয় জলে। শেষে বলে—ইবারে একটুখানি খাইয়ে দে। বাকি জলটা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর খাওয়াবি বাপ। সাবোধান, রাতটো কিছু খেতে দিবি নে। সকালে শুকনো দুব্বোর সঙ্গে এই ওযুধটা খাওয়াবি। তারপর পারিস তো একটুকুন ভাতের ফ্যান দিস। হুঁ, পয়সাটা দে। চলে যাই। এক জায়গায় ভূতে ধরা রুগি দেখতে যেতে হবে।

কাঠের হাতে বারো আনা পয়সা এগিয়ে দেয় হারাই। পিরিমল উঠে দাঁড়িয়ে বলে— জল দে মুখে। আর শোন বাপ, ইখেনে থাকিস নে। শালা ইসমিল জ্বালাবে। কাজটা ভালো করিস নাই। বরঞ্চ মেদীপুরের বাজারে গিয়ে জিরেন দিস। রাতটুকু।

বকের ঠ্যাং ফেলে পিরিমল হাড়ি চলে গেল। আলোর রং ধূসরতর। হারাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বালতির জল আঁজলা করে তুলে ধনাকে খাওয়াবার চেষ্টা করে। গড়িয়ে যায়। ফের দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। তার একটু পরেই আচমকা অর্জুনের ডালে প্যাচা চ্যাঁচায়—ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও! শরীর ভারী হয়ে হারাইয়ের। বিড় বিড় করে দোওয়া আওড়ায়। মাঝে মাঝে একটা করে মোটরগাড়ি উজ্জ্বল অলো ফেলে চলে যায়। সেই আলোয় গোরু দুটোর চোখ থেকে নীল রং ঠিকরে বেরোয়, আর হারাই হিমে ও ত্রাসে ঠকঠক করে কাঁপে।...

হারাই কাঁপে, কারণ সামনে এক ভয়ের রাত হাঁ করেছে দেখতে পায়। তার লকলকে কালো জিভ থেকে হিমের লালা গড়িয়ে পড়ছে খোদা তালার দুনিয়ায়; আর বিকেল ও সন্ধ্যা দু-দুবার নমাজ না-পড়ার গোনাহ হারাইয়ের কপালে আঁকা পুণ্যের দাগটাকে যেন ঘষে তুলে ফেলছে। হারাই বার বার চমকায়। ধূসর আলোয় শেষ পাখির ঝাঁক মাঠে শস্যদানা খুঁটে খেয়ে ফিরে আসে অর্জুনের ডালে। তারা চাপা স্বরে কী বলাবলি করে। চারপাশে চক্রান্ত চলতে থাকে। সামনে ওই ভয়ের রাতের মুখের হাঁ বড় হতে থাকে। মাকড়সার জালে আটকে পড়া পোকার মতো নিঃসাড় হয়ে জুলজুলে চোখে বসে থাকে বাঘড়ি দেশের গাড়োয়ান।

ফের সে ঘাড় ঘুরিয়ে ইসমিলের শুকনো ডালটা দেখে। পশ্চিমের লালচে একটুখানি ছটা, আর কী হল বলে আগ বাড়িয়ে দেখতে আসা হঠকারী এক নক্ষত্রের ক্ষীণ ছুঁচলো আলোয় বাকলছাড়া ডালটা এখনও আবছা দেখা যায়। কালুদিয়াড়ের ইসমিল কি হারাইয়ের দশা দেখে মিটিমিটি হাসছে? ... তা হারাই অনেক ইসমিল দেখেছে। দিনের রোদে দূরে পথ ভাঙতে অবলা জানোয়ারের কষ্ট বলেই বাঘড়ে গাড়োয়ান রাতচরা। দিনে জিরেন, রাতে গড়িয়ে চলা। কত রকম ভূত আর জিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কত ইসমিল গাড়ির সঙ্গ ধরে। পাশে, সামনে বা পিছু পিছু হেঁটে আসে। কখনও মানুষের রূপ, কখনও শেয়াল কী বেড়াল। আবার কখনও পাখি হয়ে কানের পাশে ডানা ঝাপটে যায়। একবার তো দোলাইয়ের বাঁ কানের ডগা রক্তারক্তি করে দিয়েছিল। গাড়োয়ানকে কান-মাথা ঢেকে গামছা জড়িয়ে রাখতে হয়। আনাড়ি দোলাই তা জানত না। খুব শিক্ষে হয়েছিল ছোকরার।

আর ভয় রাহাজানির। তাই সঙ্গে হেতেরপাতি রাখতে হয়। দল বেঁধে যাতায়াত করতে হয়। সামনে গাড়ির বলদজোড়া খুব 'ছিক্কিত' আর 'মর্দমান'—অর্থাৎ কিনা বলবান হওয়া চাই। তার গাড়োয়ানও হবে দলের সেরা অভিজ্ঞ আর সাহসী মানুষ। আবার পেছনের গাড়ির বলদ ও গাড়োয়ানও তেমনি হওয়া দরকার। এর নাম গাড়োয়ানি বিদ্যে। অনেক ঠেকে ঠকে ও দেখেশুনে, এই বিদ্যের ধার বাড়ে। তবে কথা কী, হারাই চিরাচরিত সেই মরসুমি সওদাগরিতে এবার আসেনি।

Scanned by CamScanner

ফাগুন মাসে চারু মাস্টারের বিটির বিভা। তাই দোলাই বলেছিল, যত কুমড়া লাগে দিব। যত কলাই লাগে দিব। হারাই ভাইয়ের কথা রাখতে এসেছিল।

আসন্ন অন্ধকার ভয় দেখানো রাতের সামনে বসে মোহ্যমান বাঘড়ে গাড়োয়ান এতক্ষণে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে একটু শোক কিংবা অসহায়তা প্রকাশ করল। মেদীপুর চটি সামনে ক্রোশ দুই পথ। গাড়িটা সেখানে নিয়ে যেতেই হবে। এই নির্জন ভয়ংকর জায়গায় আর থাকা উচিত নয়। তিন বস্তা ধান নয়, তিন বস্তা সোনা। রাঢ়ি ভাতের সাদা ঝকঝকে স্বাদু সুগন্ধময় কণা বউছেলেমেয়েদের খিল খিল করে খুশিতে হেসে ওঠার মতো দেখতে পেল হারাই মনের কোনায়। এই 'শাহ্‌দানা'র প্রত্যাশায় এখন বাঘড়ির কত দুঃখী হাভেতে ছেলেমেয়ে ঘরে-ঘরে অপেক্ষা করে আছে। হারাই চঞ্চল হল। এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর রুগ্‌ণ গোরুটার গায়ে হাত রাখল স্নেহে।

—বাপ্‌, ধনা রে!

হারাই ধনার পিঠের কাঁপন টের পায়।—কষ্ট করে এট্টু গা তোল্‌ বাছা! বদ্যির ওষুধ খেয়েছিস, আর ভয় কিসের? ওরে বেটা, না না। ভাবছিস তোকে গাড়ি টানাব ফির (ফের)? হামি কি লিদয়া মানুষ? সোনার হামা, ওঠ্‌ দিকিনি!

হারাই আরও আদর ও সান্ত্বনায় জিভ চুকচুক করে বলে—বুঝি রে বুঝি! সেই ছুটো থেকে মাগমরদে পেলেছি, তু হামারঘে বেটা। হামারঘে কলিমদ্দি ছলিমদ্দি আসিরদ্দি যেমন ব্যাটা, তোরা ধনা-মনাও হামারঘে দুই ব্যাটা। ওঠ্‌ বাপ্‌। হুই মেদিপুর! হুই দ্যাখ!

সে ধনার মুখটা তুলে ধরে। ধনা জোরে মাথাটা নাড়ে। শিঙের গুঁতো লাগে হারাইয়ের হাঁটুর কাছে। অমনি খেপে ওঠে বাঘড়ে গাড়োয়ান। গর্জায়—জোভিয়ে! জবাই করব! কলজে খাব শালার ব্যাটা শালার। কেমন বেইমান দেখছ?

সে পেটের খোঁদলে পাচনের গুঁতো মারে বারবার। তখন ধনা সামনের দুই পা বাড়িয়ে মাটি আঁকড়ায় এবং ওঠার চেষ্টা করে। হারাই গোবরমাখা লেজটা টেনে পেছন দিকটা তোলে। মুখে গাড়োয়ানি বুলি বলতে থাকে—ইররর হেট্‌ হেট্‌ হেট্‌। লে লে লে লে! হুদ্দে হুদ্দে হুদ্দে। হে হে হে হেঃ।

ধনা দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে হারাই। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে তাকে গাড়ির পেছনে নিয়ে যায়। বেঁধে দেয় পাছোটের বাঁশের সঙ্গে। তারপর মনাকে ডাইনের জোয়ালে জুতে দিয়ে নিজে বাঁ দিকের জোয়াল ধরে দু হাতে। বুকের সঙ্গে জোয়ালটা চেপে গর্জন করে টানে সে। চাকা গড়ায়।

পিঠে উঠে একটু দম নেয়। তারপর পা বাড়ায়। গাড়ির পিছনে বাঁধা রোগা বলদটা এখন ভারমুক্ত। দড়িতে টান পড়ে আর নড়বড় পা ফেলে সামনে। রাস্তার চাকার সেই পুরনো শব্দ ওঠে ধারাবাহিক—গভীর এবং চাপা গম্ভীর শব্দ, হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো। আর তেল-শুকনো ধুরি থেকে এতক্ষণে কেমন একটা রুগ্‌ণ কোঁ কোঁ শব্দ শোনা যায়। হারাই শোনে চারু মাস্টারের বেহালা বাজছে।

হারাই গাড়ি টানে আর চারু মাস্টারের বেহালা বাজতে থাকে।

ধীরে ফুটে ওঠে মাথার ওপর নক্ষত্রমালা। উত্তরের রাতচরা ডাকিনীর মাঠে মাঠে ছেঁড়াখোঁড়া খড়নাড়া, মরা শামুক ও ঝিনুকের খোল আর শুকনো পাতার ওপর হালকা পা ফেলে হেঁটে আসে। ভয়ে ও কষ্টে চেঁচিয়ে ওঠে দূরের শেয়াল। নক্ষত্রের তাপ নিতে নিতে হিম ডানা নেড়ে উড়ে যায় বুনো হাঁসের ঝাঁক। হারাই শ্বাস টেনে একবার মুখ তুলে দেখে নেয়। কখনও হাঁফাতে হাঁফাতে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—আয় বাপ, জিরেন খেতে খেতে আয়। আর হারাইয়ের মনে কত কথা এখন। এতো মাঘ মাস বেটা ধনা! ডাকপুরুষের বচনে আছে, 'আধা মাঘে কম্বল কাঁধে।' কিন্তু ডাকপুরুষ যে ডাকপুরুষ, সেও কি জেনেছিল গোজন্মের কী কষ্ট? হুঁ, গোজন্মে বড় কষ্ট বাপ। আজ

Scanned by CamScanner

খোদাতালা হামাকে সিটা জানান দিলে। বড় কষ্ট, ধনা। এখন তো জাড় কমে এল। কিন্তুক আঘুন পোষের জাড়? হায় বাপ, বুঝি নাই। সেকথা এই মানবজন্মোতে ঠাউর করি নাই। এখন করুন। গোজন্মের ঘাটে ঠেকে, ধনা, (আর মনা তুইও শোন) সব ঠাউরানু ক্রিমে ক্রিমে। এই এই দ্যাখ বাছা, হামি মানুষ। হামি তোর মতন জানোয়ার হয়ে গেনু!

দুঃখে হেসে ওঠে হারাই। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে হাসে। ...হাসছিস না বেটা? জান ভরে হাস। তবে কথা কী, ভেবে দেখলে দুনিয়ার অনেক মানুষও তোদের মতন অবোলা জানোয়ার বইকি। ঠাউর করে দেখবি, তাদেরঘেও পিঠে ওজনদার ছালা চাপানো আছে, ধনা। তাদেরঘেও ছালা বহিতে হয়, বাপ্। হুঁ ঠাউর করে দ্যাখ। হাসিস না। তাদেরঘে ভি কষ্ট। ঘাড়ে কালো দাগ পড়ে। গোস্ত দড়কচা পড়ে যায়। শাঁস (শ্বাস) ফেলতে হাঁপানি, পা ফেলতে জ্যাংয়ে বেথা, পিছের ভার টেনে হাঁটে। তাদেরঘে ভি মুনিব আছে। ঠাউর করে দ্যাখ।

হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয় হারাই। ফের বলে—গোজন্মে বড় যন্তন্না। আর তার এই অর্ধস্ফুট বাক্য নতুন এক প্রজ্ঞার মতো আবছা অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূরের জনপদে ছড়িয়ে যায়। আর চাকায় চাকায় চারু মাস্টারের বেহালা বাজতে থাকে করুন সুরে। আকাশে মুখ তুলে ভারবাহী গাড়োয়ান ফের সেই প্রজ্ঞা উচ্চারণ করে—গোজন্মে বড় যন্তন্না।

মেদীপুর চটি কি মুচে গেছে দুনিয়া থেকে? সানকিডাঙা থেকে বড়জোর দু ক্রোশ পথ। অথচ এখনও সামনে হাঁ করা অন্ধকার রাত। হারাই থমকে দাঁড়ায় বারবার। আর কতদূর মেদীপুর? অবোধ জন্তুর চোখে তাকায় সে। বুঝতে পারে না, কতকাল সে তিন বস্তা রাঢ়ি ধান টেনে আনছে মনার সঙ্গে। ঠাওর হয় না কিছু। যেন কত বছর মাস রাত আর গ্রীষ্ম বর্ষা শীত কেটে গেল। গাড়ি টানতে টানতে হারাইয়ের কালো চুল দাড়ি কি সাদা হয়ে গেল? হা খোদা? এভাবে গাড়ির জোয়ালে আটকে থেকেই কি তার মউত হবে? ভয়ার্ত গাড়োয়ানের কানে ভেসে আসে যেন মৃত্যুদূত আজরাইলের ডানার শব্দ। সে বার বার আকাশ দেখে। নক্ষত্র ভরা আকাশের দিগন্তে এক ছবি দেখতে পায়। তার ছোট্ট বাড়ির সামনে ওই যে ওই, পাটকাঠির বেড়ার ধারে লম্ফ হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলে পুলের মা! আসবার সময় ধনা মনার পা ধুইয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে মেয়েটা বলেছিল —ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে আনিস মানুষটাকে। তোদের হাতে ওনাকে জিম্বা দিনু। আর বাছারা, তোরাও যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসিস। এমনি লম্ফ হাতে দাঁড়িয়ে পিতিক্ষে করব দোরগোড়ায়। হামারু নিঁদ হবে না, বেটা রে।

...বহু গে। হামি ভালয় ভালয় ফিরে এনু। এই দ্যাখ তোর ধনা, এই দ্যাখ তোর মনা। বড় গুণের বেটা তোর, বুহ। ..হারাই হাসবে। ধনাকে দেখিয়ে বলবে— বেটা বহুৎ কষ্ট দিয়েছিল বহুগে। তোর বেটাটো বড় হারামজাদা! ভালো করে পা ধুইয়ে দে। ক্যাশ দিয়ে ভি মুছিয়ে দে। ..হুঁ, তা তো দেবেই মুছিয়ে। বাছুর-বয়সে ধনা যেদিন ঘরে এল, সেদিন, বহু কেশ দিয়ে চার পা মুছিয়ে দিয়েছিল। পদ্মার জল মাটির কলসিতে ভরা। অবেলায় এনে রেখেছে মায়েঝিয়ে। সেই জলে অজু করে নমাজ পড়েছে কলিমুদ্দির মা। মঙ্গল কামনা করেছে। আর পদ্মার জল মাটির বদনায় ভরে দোরগোড়ায় পায়ের কাছে রেখে রোজ শেষরাত অবদি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে মেয়েটা। গোহিলে (গোয়ালঘরে) ভুষির জাবনা ভেজানো থাকবে।

হঠাৎ চমকায় হারাই। বাঁ পাশে ধনার পেছনে এক মূর্তি ভেসে উঠেছে। হারাই ভয় পাওয়া গলায় বলে—কে, কে গে? সাড়া নাই শব্দ নাই। কে আসে গে?

লোকটা লম্বা পা ফেলে পাশে এসে একটু হাসে। —বাড়ি কোথা গাড়োয়ান ভাইয়ের?

সন্দিগ্ধ গলায় হারাই জবাব দেয়— বাঘড়ি, ভাইজান।

আসসালাম আলাইকুম।

Scanned by CamScanner

মুহূর্তে হারাই আশ্বস্ত। কিন্তু কষ্টে জবাব দেয়— ওয়া আলাইকুম আসসালামা।—গরুটার কী হল? বেমার নাকি?

কথা বলার লোক পেয়ে হারাই দাঁড়িয়ে পড়ে — হুঁ ভাইজান। হঠাৎ ওবেলা থেকে ছ্যারানি। বড় মুশকিলে পড়নু। সানকিভাঙায় বদ্যি দাওয়াই দিয়েছে। তাই ভাবনু... মানুষের সামনে পড়ে একটু লজ্জাও পেয়েছে হারাই। গোরুর মতো গাড়ি টানার লজ্জা। সে অপ্রস্তুত হাসে।

লোকটা বলে—লণ্ঠন নাই সঙ্গে? এমন করে আঁধার ভেঙে যাচ্ছ দেখি! রোঁদের পুলিশ ধরবে যে!

সঙ্গে সঙ্গে হারাই গাড়ির জোয়াল থেকে ছিটকে বেরোয়। একপাশে টেনে মনার কাঁধ থেকে জোয়াল নামায়। তারপর — এ হে হে, কথাটো মোনেই ছিল না, হামার মাথায় বজ্জঘাত ভাই রে, বলে হাঁটু গেড়ে গাড়ির তলা থেকে হেরিকেনটা আনে। কোঁচড় থেকে দেশলাই বের করে জ্বালে। হাওয়া বেড়েছে। নিবে যায়। তখন লোকটা নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে বলে— এ জন্যেই তোমাদের বলে বাঘড়ে! কই দেখি, জ্বেলে দিই।

কাচ ভাঙা লণ্ঠন যথেষ্ট আলো দেয় না। ফাটলে কাগজ গোঁজা। সেই হেরিকেন তুলে লোকটা ধনাকে দেখতে থাকে। সামনে থেকে পেছন অবধি দেখে এবং গায়ে একটা হাত রাখে। ধনা কেন যেন নড়াচড়া করে। শিং নাড়ে। পা ঠোকে। হারাই মনে আশা নিয়ে ভাবে, এও এক বদ্যি। লোকটারপরনে টেককাটা লুঙি, গায়ে হাফশার্ট, কাঁধে গামছা ঝুলছে। টেড়িকরা তেল চুকচুকে চুল। চিবুকে দাড়ি আছে একটুখানি। পানের রসে ঠোঁট লাল। তার পায়ে গাম্পশু জুতো আর কাঁধে ঝোলা ঝুলছে। হারাই বুঝতে পারে, কাঁদির টাউনে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরছে। বাসভাড়া ফুরিয়ে গেছে হয়তো। হারাই বিবেচনা করে। হুঁ লোকটা সুখী লোক। মুখের ভাবে সেইভাব। আর রাঢ়ে তো সবাই সুখী। রাঢ় দ্যাশ সোনার দ্যাশ। সাদা ঝকঝকে স্বাদু সুগন্ধ শাহদানা খায় দুবেলা। রো-ও-জ খায়! ভাবা যায় দুবেলা ভাত, তিরিশ দিন বারো মাস বছরের পর বছর।

রাঢ়ি লোকটা ধনাকে দেখার পর শুকনো ঘাসগজানো একরাশ পাথরকুচির ওপর হেরিকেন রাখে। তারপর বসে হাঁটু দুমড়ে। হারাইও বসে। লোকটা পকেট থেকে বিড়ি বের করে বলে— চলে ভাই?

হারা মাথা দোলায়।

সে বিড়িটা ধরিয়ে বলে—আমার নাম দিলজান। মেদীপুরের পাশে বাড়ি। গাড়োয়ান ভাইয়ের নাম?

—জি, হারুন আলি। হারাই বলে ডাকে। হারাই তার দিকে ব্যাকুল চোখে তাকায়। ফের বলে —কেমন দেখলেন, ভাইজান?

দিলজান একটুকরো পাথরকুচি কুড়িয়ে বলে—গোরুটার গতিক ভালো না। রাত পেরোয় কিনা। আঁতকে ওঠে হারাই। বোবায় ধরা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে— বাঁচবে না?

—তাই মোনে হয়।

—সানকিভাঙার বদ্যি...

—আরে থোন ভাই পিরিমলের কথা। শালো গোবদ্যি! ফাঁকির কারবার। দিলজান বাঁকা মুখে বলতে থাকে। গাঁজাখোর শালো প্যাটের জ্বালায় গোবদ্যি সেজেছে! আমি যা দেখল্যাম ভাই, আপনার গোরু বাঁচবে না। এক কলম লেখে দিতে বোলেন তাও দিব।

দিলজানের পকেটে কাগজকলম আছে। হারাই ধুলোয় আঙুলের দাগ টানে আর জুলজুলে চোখে তাকায়। কী বলবে ভেবে পায় না।

দিলজান বলে— এক কাজ করুন, ভাই আপনিও মোছলমান, আমিও মোছলমান জাতভাই বুলেই বুলছি।

Scanned by CamScanner

খুব আগ্রহে হারাই বলে—কহেন। কহেন জী!

—বুলছি কী, গোরুটা আমাকে দেন। দু পয়সা আপনার হোক, আমারও হোক!

হারাই দম আটকে বলে—জি?

দিলজান হাসে খুক খুক করে।—গোরুটা দেন আমাকে। হালাল করি।

অমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হারাই। বুকফাটা চিৎকার করে বলে—হ্যা! তারপর হাঁফাতে থাকে। তার নাকের ডগায়, চিবুকে, কপালে এই শীতেও ঘামের ফোঁটা চকচকে করে। সে ফের ধরা গলায় বলে—হ্যা। এবং মাথাটা জোরে দোলায়। সে ভূতের মতো অঙ্গভঙ্গি করে।

দিলজান হা হা করে হাসে।—তিরিশ টাকা দাম পাবেন ভাই। দিলজানের নগদানগদি কারবার। আপনি জাতভাই, রাস্তার মধ্যে বিপদে পড়েছেন বুলেই বুলছি। আপনার গোরু বাঁচবে না। এ দিলজান দেখে দেখে বুড়োতে চলল, ভাই রে। তামাম এলাকার লোক সেটা জানে।

হারাই মুখ নামিয়ে ঘাড় গোঁজ করে বলে—মাফ দিবেন, ভাইজান। আপনি হামার কলজে কিনে লেন, দিব। ধনা হামার বড় কষ্টের ধোন! হামার বহু ধনাকে বেটার মতন পেলে বড় করেছে। সে ফের জোরে মাথা দোলায়।

—শেষ কথা চল্লিশ টাকা। দ্যাখেন ভেবে।

হারাই দ্রুত হেরিকেন তুলে নেয়। হাঁটু দুমড়ে গাড়ির তলায় ধুরিতে আটকে দেয়। তারপর জোয়ালে যায়। মনাকে জুতে দিয়ে আগের মতো ধনার জায়গায় বুকে জোয়াল তোলে। পা বাড়ায়। গাড়ি গড়াতে থাকে। আবার চারু মাস্টারের বেহালা বেজে ওঠে করুণ সুরে।

দিলজান পাশে হাঁটে।—খুব ঠকলেন, ভাই। মোছলমান বলেন...

হারাই ভয়ংকর গর্জন করে চেরা গলায়—হামার কলজে!

আরি দিলজান অন্ধকার ফাটিয়ে হা হা হা হা হাসে।—আপনার কলজে হারাম, ভাইজান। আমি হালাল জিনিস কিনতে চেয়েছি। রাগ করবেন না। মাথাটা এট্টু ঠান্ডা করুন। আপনার 'ডাহিনালি' গোরুটা তো কিনতে চাইছি না। আপনার 'বাঁওয়ালি'টা মরে যাবে। চল্লিশ টাকা!

হারাই মুখ ঘুরিয়ে রাগী চোখে তাকায় শুধু। তারপর অস্পষ্ট হাঁকরানি দিয়ে জোয়াল টানে।

—দেখছেন! আর বেচারি হাঁটতে পারছে না। ওই...ওই দেখুন, থুবড়ে পড়ল! হ্যাঁ, ধনা বার বার হাঁটু মুড়ে টাল খাচ্ছে। শুকনো পিচে খট্-খটাখট আওয়াজ উঠছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে হারাই ফের বলে—ক্ষেমা দিবেন হামাকে। আপনি আপনার ঘাঁটায় যান, হামি হামার ঘাঁটায় (রাস্তায়) হাঁটি।

দিলজান তবু সঙ্গ ছাড়ে না। পকেট থেকে নোট বের করে, আর সেই একই কথা। কিন্তু মেদীপুর আর কতদূর? হা খোদা! হারাই যে বুড়ো হয়ে গেল, তবু পৌঁছতে পারল না মেদীপুরে! যত চলে, দূরে সরে যেতে থাকে মেদীপুর! পেটে টান বাজে। বত্রিশ নাড়িতে টান লাগে। আহা, গোজন্মের বড় কষ্ট, ধনা রে! দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে বাঘড়ে গাড়োয়ানের। হেই বাপ! আর পারি নে! হামি তো মানুষ বটি। হামি জানোয়ার লই। এই ভার টানার তাকত হামার নাই। আঃ! বড় তিয়াসে গলা শুখা। বুকের ভেতরটাও শুকিয়ে যাচ্ছে। জিভ হয়ে গেছে খড়ের গুছি। মেদীপুরে গিয়ে পানি খাব। ধনা তোকেও খাওয়াব। আর মনা, তুইও খাবি। আর এট্টু কষ্ট করি দুজনায়।

—শেষ কথা ভাইজান, পঞ্চাশ। এই নেন।

দিলজান হারাইয়ের ফতুয়ার পকেটের দিকে হাতটা নিয়ে আসে। আর ফের হারাই গর্জন করে ওঠে—হামার কলজে! বেরহম (নির্দয়)! পাষাণ! আপনার দেলে দয়া নাই। হারাই শ্বাস টেনে বলে—আপনি আজরাইল!

দিলজান আর সহ্য করে না। অশ্লীল গাল দিয়ে বলে —এ জন্যেই বলে বাঘড়ে ভূত। শালোর মাথায় ভূত ঢুকেছে। জাতভাই বলে দয়া হল। আর শালো বোলে কি না আজরাইল! মুখ সামলে কথা বুলবি, শালো!

Scanned by CamScanner

রাগী দিলজান হন হন করে হেঁটে সামনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। হারাই দু কাঁধে দুই চোখ ঘষে নেয়। তারপর তার চমক খেলে। কলজে শিরশির করে ওঠে। ও কি এসে তাকে লোভ দেখাচ্ছিল? সে ভয়ে ভয়ে পিছু ফিরে ধনাকে দেখে নেয়। কে ওই লোকটা অন্ধকারে কখন তার পিছু নিয়েছিল? হারই বিড় বিড় করে বলে—ধনা! ডর পাসনে বেটা। হামি আছি। তারপর থেকে বার বার তার চমক খেলে মনে। হঠাৎ পিছনে, পাশে,সামনে অদৃশ্য দিলজান এসে দাঁড়ায়। তার হাতে ছোরা চকচক করে। ক্রমে অন্ধকারে তার মূর্তিটিও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হারাই তখন বিড় বিড় করে দোওয়া আবৃত্তি করে। রাত বিরেতে রাস্তায় চলা যাদের জীবন, তারা 'দোওয়া গঞ্জেল আরশ্' মুখস্থ রাখে। হারাইয়ের বাপ হারাইকে ছেলেবেলায় এই দোওয়া শিখিয়ে দিয়েছিল। পথেঘাটে বিপদ-আপদে পড়লে এই দোওয়া আওড়াস বেটা। বালা মুসিবত দূর হয়ে যাবে। ভূত-ভুতিনী, জিন-পরী কী চোর-ডাকাত একতিল ক্ষেতি করতে পারবে না। বিপদ যত বেশি হবে, তত জোরে জোরে পড়বি 'গঞ্জেল আরশ্।'

সুতরাং হারাই ভয়-কান্না-ক্ষোভ মেশানো কাঁপা কাঁপা সুরে জোরালো গলায় 'গঞ্জেল আরশ' উচ্চারণ করতে থাকে। আর চাকায় চাকায় বাজতে থাকে সুরে সুর মিলিয়ে চারু মাস্টারের বেহালা। নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ছড়িয়ে আসে পরম করুণামাখা আশ্বাস।

হারাই যখন মেদীপুর চটির কাছাকাছি, তখন কৃষ্ণপক্ষের আধমরা চাঁদটা মাঠের ওপর ভেসে উঠেছিল। সেই ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নায় সামনে দূরে যেন একবার দিল জানকে দেখেছিল— চোখের ভুল হতেও পারে। পিছনে তখন ধনার খুরের শব্দটা বেশি করে শোনা যাচ্ছিল। বার বার ঘুরে দেখছিল, ধূর্ত কসাইটা পিছনে ঘুরে গিয়ে ধনার দড়ি খুলে দিচ্ছে নাকি! কিন্তু পিছনে খুরের শব্দ জোরালো আর ধারাবাহিক। ধনা আর হাঁটতেও পারছে না, তাই ওই শব্দ। তবু ওই শব্দেই তো সে তখনও বেঁচে আছে! বার বার তাকে সাহস দিচ্ছিল হারাই— ডর কী? হামি তো আছি।

চটির ধারে বটতলায় একদঙ্গল বাঘড়ে গাড়োয়ান ছিল, তার প্রমাণ ছড়ানো। তারা সন্ধ্যায় চলে গেছে। একলা হারাই গাড়ি রেখে রাত জেগেছে। চোখের পাতা কষ্টে খুলে রেখেছে। কী জানি কখন, দিলজান কিংবা কেউ গোরু খুলে নিয়ে যায়। আর ওই তিন বস্তা সোনা গাড়ির ওপর রাখা।

কিন্তু খিদেয় পেট চোঁ চোঁ। পিরিমল বদ্যি পকেট খালি করে দিয়েছে। অগত্যা বস্তা খুলে কিছু ধান গামছায় বেঁধে চিঁড়ের দোকানে গিয়েছিল সে। চিঁড়ে আম ভেলি গুড় কিনে খেয়েছিল। শুয়ে পড়েছিল ধানের বস্তায় ঠেস দিয়ে। ধনা আরও কাহিল হয়েছে। ছ্যারানি বেড়ে গেছে। মাঝে উঠে গিয়ে মন্ত্রপড়া জলটা খাইয়েছে হারাই। আশায় থেকেছে, শেষ রাত নাগাদ গোরুটা নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে।

ভোরে কোথায় আজানের শব্দ শুনতে পেল। কী একটা স্বপ্ন দেখছিল, মনে পড়ল না। হারাই হুড়মুড় করে উঠে বসল। সারা শরীরে ব্যথা। জ্বর ভাব। আর শেষ রাতে বেজায় জাড় পড়েছিল। গোরু দুটোর পিঠে ছালা চাপানোর কথা মনেই ছিল না। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে আগে ধনার দিকে তাকায়। কলজে চিরিক করে ওঠে। গোরুটা দু পায়ের ওপর মুখ রেখে শুয়ে আছে। চোয়াল অল্প অল্প নড়ছে। পিঠে হাত বোলায় কিছুক্ষণ। তারপর মন্ত্রপূত এক আঁচলা জল ফের ঠোঁটের কাছে ঝাপটানি মেরে ছুঁড়ে দেয়। কষায় গড়িয়ে পড়ে।

আর সেই আজানের কাঁপা কাঁপা সুরে অসহায় হারাইকে ঈশ্বরের দিকে মুহুর্মুহু ডাকতে থাকে। সে ঝটপট পাশের পুকুরে অজু (প্রক্ষালন) করে গাড়ির তফাতে পরিষ্কার জায়গা বেছে নেয়। শুকনো ঘাসে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ে। মাথা কোটে। হু হু করে কেঁদে বলে—হামার বেটার জান মাঙি হুজুর। আর কিছু মাঙি না সংসারে। তারপর কী এক হঠকারিতায় আচ্ছন্ন গাড়োয়ান চুপি চুপি ফের বলে—হেই পরোয়ারদিগার! হামরা মাগমরদ বাঁজা লই তুমার মেহের বানিতে। তুমি এক ব্যাটার জানের বদলে হামারঘে আরেক ব্যাটার হায়াত (আয়ু) দাও।

Scanned by CamScanner

ব্যাটা মরবে, ব্যাটা জন্মাবে। কিন্তু গোরু মলে গোরু কোথায় পাবে হারাই! একটা গোরুর দাম জোগাতে অন্ধেক জমি বেচতে হবে। খোদা কি এটা বোঝেন না? একটা গোরুর অভাবে তার গাড়োয়ানি বন্ধ হবে। চাষবাস বন্ধ হবে। খন্দ ফলমূল ফিরি করতে আসা হবে না রাঢ়ে। বাঘড়িমুলুকে কে এসব কিনবে? না খেয়ে মারা পড়বে হারাইয়ের বহু-বেটা-বিটিরা। 'মুসাফির'দের মতো তাদেরও যে মরসুমে ভিখ মাঙতে যেতে হবে রাঢ়ে! ঠিক এমনি করে একটা গোরুর অভাবে বাঘড়ির কত মানুষ মুসাফির ভিখিরি হয়ে গেছে! তাই ভেবে হারাই কাঁদে। নমাজে বসে থাকে অনেকক্ষণ। খোদাতালাকে ইনিয়ে বিনিয়ে সব কথা বোঝাতে চায়।

রোদের ছটা ফুটেছে মেদীপুরের গাছগাছালির মাথায়। হারাই যখন গাড়ির কাছে এল, তখন একটা দুটো করে লোক জমেছে দোকানপাটে। তারপর ভিড় বাড়তে থাকে। সূর্য উঠল। আবার কিছু ধান দিয়ে হারাই চিঁড়ে গুড় এনে খেল। ধনা তেমনি শুয়ে আছে।

তারপর যত বেলা বাড়ে, একটা দুটো করে লোক এসে হারাইয়ের গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। ওবা কীভাবে টের পেয়ে গেছে, বুঝতে পারে না হারাই। আসলে গাঁ-গেরামের মানুষ গোরু-অন্ত প্রাণ। গোরুর কিছু হলে ভিড় করে আসবেই। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হারাই কোণঠাসা। নানান জনে নানান ওষুধ বাৎলায়। কেউ বলে—বাঁচবে না। কেউ বলে—বাঁচতেও পারে। অনেকে রোগা গোরুর কাহিনি শোনায়। হারাই চুপচাপ বসে থাকে। আশা নিরাশার টানাপোড়েন চলতে থাকে মনের ভেতর।

আজ হাটবার। মেদীপুর চটির হাটতলা ক্রমশ ভরে উঠেছে মানুষে। বটতলায় একটা দুটো করে গাড়িও এসে জুটছে। আশেপাশের গাঁ থেকে এসেছে হাট সারতে। তারা হারাইকে হাজার কথায় উপদেশ দেয়। আর কেউ কেউ বলে—বেচে দাও কসাইকে। হালাল করুক। অমনি রাগী লাল চোখে তাকায় হারাই। মাথাটা দোলায়। কেউ বলে—বাঘড়ির গাড়ির ঝাঁক আসবে যখন, তাদের গাড়িতে বস্তাগুলো তুলে দিও। আর গাড়িটা একটা গাড়ির পেছনে বেঁধে দিও। তবে রোগা গোরুটা...

একজন হেসে বলল—রোগা গোরুটা আর কতক্ষণ? হুই দ্যাখো, কাছেই পুকুরপাড়ে ভাগাড়।

হারাইয়ের ঠোঁট কাঁপে। কথা বলে না। চারপাশে এই ভিড় তার দমকে আটকে দিয়েছে। ধনারও দম আটকে দিচ্ছে। হাওয়া চাই, অনেক হাওয়া! দোহাই বাবাসকল, একটু ঘুরে দাঁড়াও। হামারঘে এট্টু হাওয়া বাতাস দাও। মনে এই করুণ মিনতি বুজবুড়ি তোলে। চোখ দিয়ে জল গড়ায় নিঃশব্দে একটি অসহায় মানুষ আর একটি রুগ্ণ জানোয়ারের। ক্রমে বেলা বাড়ে। কোলাহল বাড়ে। একের পর এক মানুষ এসে ভিড় করে আর চলে যায়। শেষ কথা বলে যায়। তারপর ভিড় ঠেলে আসে কেউ।—আসসালাম আলাইকুম, ভাইজান!

হারাই তাকাই! সেই দিলজান! টেড়ি করা তেল চুকচুকে চুল। চিবুকে দাড়ি। গায়ে হাফ শার্ট, বুকপকেটে কাগজ কলম। পরনে চেককাটা লুঙ্গি আর পায়ে পাম্পশু। কাঁধের গামছায় ঠোঁটের পানের রস মুছে হাসে। হারাই চোখ নামিয়ে ধুলোয় আঁক কাটে কাল রাতে এই লোকটাই কি তাকে গালমন্দ করেছিল? বিশ্বাস হয় না। মুখে মিঠে হাসি।

—কী ভাই? কী ঠিক করলেন? ... দিলজান পাশে এসে বসে। কাল সন্ধেবেলা বুলেছিলাম পঞ্চাশ। তখন অবস্থা ভালো ছিল। এখন তিরিশেও রাজি হব কি না বলা কঠিন। বলুন তাড়াতাড়ি।

হারাই গলার ভেতর বলে— কী?

—ভুল করবেন না। তিরিশ টাকা কম নয়। নিয়ে যেতে যেতে যদি জান বেরিয়ে যায়, সব টাকা বরবাদ কিনা বলুন! আমি 'রিসিক' লিচ্ছি। দেরি যত করবেন, তত দুজনারই ক্ষেতি।

চারপাশ থেকে সবাই সায় দেয়। এক গলায় বলে—দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। কেউ বলে—হালাল জিনিস। মানুষের ভোগে লাগুক। ক্যানে শেয়াল শকুনকে খাওয়াবে বাপু! এবং ফের দিয়ে দাও,

Scanned by CamScanner

দিয়ে দাও, এই কোরাস ব্যূহের মতো ঘিরে ফেলে হারাইকে। দিলজান পকেট থেকে টাকা বের করে।—লেন। হাত পাতুন। তারপর সে হারাইয়ের আড়ষ্ট হাতে তিনটে নোট গুঁজে দেয়। মুঠোটাও চেপে বুজিয়ে দেয় এবং ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। কাকে ডেকে বলে—শিগ্‌গিরি গাড়ি জুতে আন। হাঁটতে পারবে না। জলদি যাবি! তারপর সে ব্যস্তভাবে ধনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

হারাই টাকা মুঠোয় নিয়ে বসে থাকে। দু চোখে শব্দহীন জল বয়ে যায়। একজন বলে—আহা! আর কেঁদে কী হবে, ভাই? গোজন্মে খালাস পেল। বেঁচে গেল, তাই মোনে করো। তবে হ্যাঁ, বেথা তো হবে। পালা জন্তি কত আদর খেয়েছে। বেথা বাজবে বইকি। ওরে ভাই, নিজের জোয়ান ব্যাটা যে মরে যায়, তার বেলা?

হারাই লোকটাকে দেখতে থাকে। লোকটা ঢ্যাঙা। গোঁফ আছে মস্ত। খালি গা, পরনে মালকোচ করা ধুতি। বগলে তেল পাকানো লাঠি। কোমরে লাল গামছা জড়ানো। খৈনি ডলছে। লোকটা হিন্দু, তা বুঝতে পারে হারাই। খৈনি ডলে সে তালুতে চটাস শব্দ করে ফুঁ দিতে দিতে ফের বলে অ্যানেক লোকসান বাঁচে। যা পাওয়া যায় দু দশ টাকা, এ বাজারে তাই লাভ। বরঞ্চ ওই টাকায় একটা বাছুর কেনো। ইচ্ছে থাকলে ইখেনেও কিনতে পারো। আমার আছে। সস্তা করে দেব। দেখবে নাকি হে?

হারাই মুখ নিচু করে শুধু বলে—বাছুর বড়ো হতে হতে মনাগোরে যাবে, হামি ভি গোরে যাব, দাদারে!

ভট্টমাটির বদর হাজির মাঠে গিয়েছিলেন। দেড় বিঘে জমির আখ কাটা হচ্ছে। আজই দুপুর বেলা মোষের গাড়িতে মাড়াইকরা কল আর কড়াই আনা হয়েছে মউলে থেকে। বাড়ির পাশে বাঁশবনের ভেতর বসানো হচ্ছে। হাজি গিয়েছিলেন আখ কাটার তদারকে। মাঝ রাত নাগাদ তাঁরই আখ দিয়ে মরশুমের গুড় তৈরির পালাটা শুরু হবে। ইমানদার তীর্থফেরত মানুষ। আল্লার নেকনজর তাঁর ওপর। গাঁয়ের সব কাজ তাঁকে দিয়েই শুরু হয়। বিশেষ করে গুড় তৈরিতে আবর পয়-অপয় যা ভালো মন্দ 'সাইতে'র ব্যাপার আছে। জ্বাল দিচ্ছে তো দিচ্ছে, রসো আঠা ধরে না। কিংবা আঠা ধরল তো এমন ধরা ধরল, চিটে হয়ে গেল। সু-কুয়ের দৃষ্টি আছে। দোয়াদরুদ পড়তে হয়। শয়তান খেদাতে হয়। সে অনেক ঝক্কি। বদর হাজি মক্কা থেকে পবিত্র আবে-জমজম (জমজম নামক কুয়োর জল) এনে রেখেছেন। ফুটন্ত রসে একটু ছেটালেই বরন ধরে উজ্জ্বল সোনালি। আর কী স্বাদ! বদর হাজির মুখের বচনের মতো স্নিগ্ধ আর মিঠে। ওঁর মনের মতো নরম।

হাজির পরনে হাঁটু অবধি ঝুল পানজাবি। গোড়ালির ওপর থেকে লুঙির ঝুল। পায়ে থ্যাবড়া চটি। কাঁধে বিহারের দেওবন্দ্ শরিফের হলুদ ডোরাকাটা গামছা— এক মৌলবির কাছে কেনা। তিনি সেখানকার বিখ্যাত মাদ্রাসায় সবে পাস দিয়ে এসে ভট্টমাটিতে মক্তব খুলেছেন। ডেরা গেড়েছেন হাজিসায়েবের দলিজ ঘরে।

আর বদর হাজির মাথায় আরবি গোল টুপি। মক্কার বাজারে কেনা। হাতে এনামেলের বদনা। আখ কাটা মুনিশদের মিঠে কথায় তম্বি করে চলে এসেছেন রাস্তার ধারে পুকুরপাড়ে। তালগাছগুলো ন্যাড়া করে পাতা কাটা হয়েছে। সেগুলো দিনমান রোদে ক'দিন ধরে শুকোচ্ছে। গুড়ের চুলোয় জ্বালানি হবে। হাজি রোজ দুবেলা এসে একটা একটা করে গুণে যান। একটু আগে বিকেলের নমাজ সেরে পাতা গুণছেন। হঠাৎ চোখ গেল রাস্তায়। থমকে দাঁড়ালেন।

একটা গাড়ি আসছে। তার জোয়ালের একদিকে গোরু, অন্যদিকে মানুষ।

গাড়ির ধুরিতে তেল পড়েনি। কোঁ কোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে।

লোকটা রোগা। পরনের ময়লা লুঙ্গিটা বেশরমভাবে কাছা মারা। দুই জাং আর পাছার অনেকটা উদোম। কবর থেকে মরামানুষ উঠে এসে যেন গাড়িতে 'বাঁওয়ালি' টানছে। এ বড় তাজ্জব!

বদর হাজি নানা জায়গা ঘোরা মানুষ। কলকাতায় মানুষটানা ঠেলাগাড়ি আর রিকশো দেখেছেন। কিন্তু ভট্টমাটির পথে এমন কখনও দেখেননি। জিভ চুকচুক করে বললেন— আহা

Scanned by CamScanner

বেচারা! তাঁর মন এমনিতে নরম। গরিব-মিশকিনকে ভিক্ষে দেন। মুসাফির দেখলে ডেকে খাওয়ান। ভাই রে! এ সংসার ক'দিনের? এক পা গোরে দিয়েছি।

নাদুস-নুদুস শরীর ধুপধুপিয়ে বদর হাজি উঁচু পুকুরপাড় থেকে রাস্তায় নেমে গেলেন। মিঠে গলায় বললেন— বাড়ি কোথা, বাপ?

হারাই দাঁড়ায়। শুকনো ঠোঁটে একটু হেসে সালাম বলে ক্ষীণ স্বরে। চোখের কোনায় গর্ত। ফের নাম বলে। ধাম বলে। মেদীপুরের বাজার থেকে গাড়ি ছেড়েছে দুপুরের নমাজ পড়ে। চিড়ে গুড় দিয়ে ক্ষিদে মিটিয়েছে। সেই সব কথাও বলে। বদর হাজিকে তার মেহেরবান মনে হয়। মনের সব দুঃখ খুলে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শরমের চাপের ধনাকে বেচার কথাটা লুকোয়। শুধু বলে, বাঁওয়ালি গোরুটা রাস্তায় মারা পড়েছে।

বদর হাজি সব শুনে জিভ চুকচুক করে বলেন— আহা! তাহলে তো বড়ই মুশকিল! কিন্তু বাড়ি বুললে তো সেই পদ্মার ধার শিমুলেকেষ্টপুর! সে তো কমপক্ষে বিশ কোশের মাথা! দু লদীর পার, তিন লদীর কিনারে।

—জি হাঁ! জি হাঁ। হারাই খুব সায় দেয়।

বদর হাজি একটু রাগ করে বলেন— বুলছ তো জি হাঁ! তুমরা বাঘড়ে গাড়োয়ানরা বেজায় বোকা!

হারাই খালি দাঁত বের করে।

—এক কাম করো।

—কী? মুশকিলআসান হাজিসায়েবের কথা শুনে হারাই বড় প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে।

হাজি বলেন— আমার উখানে তুমাদের বাঘড়ির একদল গাড়োয়ান এসেছে। আজ রেতেই উয়ারা চলে যাবে বুলছিল। বুঝলে?

—জি, জি।

—আমি বুলে দিব উয়াদের। কারুর পেছনে জুতে দিও গাড়ি। ওই তো কখান বস্তা। কী আছে ওতে?

—ধান, বাপজি।

বাপজি শুনে দয়ালু বদর হাজি বলেন — দেখ দিকিনি কী বিপদ! অমন একলা দলছাড়া হয়ে আসে রে, বাবা?

সুখে দুঃখে আবেগাপ্লুত হারাই বলে — চন্ডীতলার চারু মাস্টেরের বিটির বিভা হবে ফাগুন মাসে। হামার একটা ভাই আছিল। তিনি কথা দিয়ে এসেছিল, বিভার কুমড়া-কলাই যা লাগে দিবে। ভাইয়ের জবান, বাপজি হাজিসায়েব! সেই ভাই হামার এখন গোরে! সে চোখ মোছে। নাক ঝাড়ে।

হাজি বলেন— এস, এস। কপালের ফের আর কী! আর কক্ষনও অদ্দুর থেকে অমন করে একা এসো না। শিমুলে-কেষ্টপুর সে কি ইখেনে? দুই লদীর পার। তিনি লদীর কিনারে। সেই লালগোলার মুখে। ওপারে গোদাগাড়ি ঘাট। জেলা রাজশাহি। এই সেদিনেও ইস্টিমার চলত। কী সব হেঁদু-পাকিস্তান করে গোল বাধালে।...

বদর হাজি আগে আগে হাঁটেন। পদ্মাপারের গল্প বলেন। পাকা মানুষ। কত দেশ ঘুরেছেন। আর দ্যাখ্ বাপ, দ্যাশচরা মানুষেরর কাছে সব বিদ্যাশীই আপন। কত জায়গায় গিয়ে ঠেকেছি। আলাপ পরিচয় হয়েছে। কুটুম্বিতে করেছি। তাই বিদ্যাশী সবাই আমার মেহমান। অতিথি। যা আছে খোদার ফজলে, তাই খেতে দিই। চাট্টি ডালভাত খাবি, বাপ। শরম করিস না। তুই আমার মেহমান।...

দলিজ ঘরের সামনে মস্তো চটান। খামার বাড়ি। শীতের ধানটা ওখানেই ঠ্যাঙানো হয়েছে। চকচকে গোবরলেপা মাটি। এক পাশে খড়ের পালা সার। খামারের কোনার দিকে বাঘড়ে

Scanned by CamScanner

গাড়োয়ানদের গাড়িগুলো রয়েছে। মাথার ওপর ডালপালা ছড়ানো শিরীষ গাছ। ইটের উনুন জ্বালিয়ে গাড়োয়ানরা রান্নাবান্না করছে। রাতের নমাজের ওপর খেয়েদেয়ে গাড়ি ছাড়বে। হারাই কিন্তু নিরাশই হল। ওরা যাবে কাতলামারির দিকে। বহরমপুর থেকে ছাড়াছাড়ি হবে। তখন ফের হারাইকে গাড়ি টানতে হবে। শেষে ভাবল, যদ্দুর যাওয়া যায়। পথে যদি কপাল গুণে নিজের এলাকার কোনও দল পেয়ে যায়, ভালোই হবে।

দল বেঁধে সবাই নমাজ পড়ে এল পাশের মসজিদে। তারপর ওরা খেতে বসল গাড়ির কাছে। হারাই বদর হাজির মেহমান। বড় আশায় সুখে মনটা চনমন করছে। ঘরের ভেতর তক্তপোশে নকশা আঁকা সাদা দস্তরখানা পড়ল। মৌলবি হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে বসলেন। বদর হাজি ডাকলেন— আয় বাপ হারুন আলি! হারাই সংকোচে এক পাশে বসল। আমির-বড়লোকের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম সে খাচ্ছে। জীবনের সব দুঃখ, বঞ্চনা, হারানোর শোক ক্ষোভ আর ধনার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল। তার সামনে বিশাল খাঞ্চায় ভরা শাহদানার স্তূপ। সাদা ঝকমকে স্বাদু সুগন্ধ রাঢ়ি অন্ন। বাড়ি ফিরে বউ ছেলেপুলের কাছে কত গল্পই না করবে হারাই! তার বংশে এটা গল্প হয়েই থাকবে বইকি—এই বংশের এক পুরুষ আমির বড়লোকের সঙ্গে বসে একই খাঞ্চা থেকে ভাত আর একই বাটি থেকে তরকারি তুলে খেয়েছিল!

শরীয়ত মতে খেতে বসে খামোকা কথা বলতে নেই। তবু বদর হাজি একটু গপ্পে মানুষ। হঠাৎ হেসে মৌলবি সায়েবকে বলেন— আপনার বরাতে ছিল! তারপর মেহমান হারাইয়ের দিকেও তাকান।—তোরও বরাত, বাপ!

হারাই মুখ তোলে। মৌলবি বলেন—জি?

বদর হাজি একটা প্রকাণ্ড চীনেমাটির বাটি থেকে চামচে করে কী একটা তরকারি তুলে আগে মৌলবির থালায় দেন। তারপর কয়েকটা টুকরো তুলে হারাইয়ের থালায়, শেষে নিজে থালায় নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেন—আমাদের গাঁয়ে এই এক জ্বালা। হেঁদু জমিদারের মাটি। বাপপিতেমোর আমল থেকে চলে আসছে এই নিয়ম। এ মাটিতে হালাল হয় না।

মৌলবি বলেন— বলেন কী! এ তো বেআইনি। তা ছাড়া এখন জমিদার কোথা?

—আইন-বেআইনের কথা লয়, মৌলবি সাহেব! বদর হাজি বলেন। জমিদারের সাথে প্রোজার বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক ছিল। বাপ-দাদো জবান দিয়ে গেছে তেনার কাছে। সেটাই হল গে বড় কথা। তা ছাড়া ই ভট্ট-মাটিতে পেরায় সব লোকই 'পরোজি'—গোরুর গোশ তো খায় না। আপনি নতুন এসেছেন। বিয়েশাদির খানা হলে দেখবেন। বলবে—ভাইসকল! কে কে 'পরোজি' আছ হাত তোলো। দেখবেন একশোটা হাত খাড়া হবে আসমানে।

বদর হাজি হা হা করে হাসেন। মৌলবি সায়েব গম্ভীর মুখে মাথা নাড়েন।—এটা বে-শরা। ঠিক না।

হাজি বলেন—তো কী আর করা! মাঝে মাঝে সেই মেদীপুরে হালাল হয়। লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ কিনে এনে খায়। আমার ভাগ্নেব্যাটা একেবারে গো-খাদ (খাদক)। আজ হাটবার ছিল। দিলজান একটা হালাল করেছে শুনে নিয়ে এসেছিল। তা দেখছি, ভালোই হল। আপনি আছেন। আর এই আমার মেহমান বেটা আছে। মেহমানেরও খাতির হল।

হারাই টুকরোটা মুখে পুরেছিল। আচমকা নড়ে ওঠে। তারপর তক্তাপোশের নিচে থু থু করে ফেলে দেয়।

হতবাক হাজি বলেন—ও বাপ! তুইও পরোজি নাকি? তা বুলিস নাই ক্যানে? আ ছি ছি ছি!

হারাই মুখে হাত চেপে নেমে যায় আসন ছেড়ে। ছিটকে বাইরে যায়। বাইরে তার ওয়াক তোলার শব্দ। খাওয়া ফেলে বদর হাজি দৌড়ে যান।

গিয়ে শোনেন, যেন বমিতোলার ওয়াক নয়। তাঁর আধবুড়ো বাঘড়ে মেহমান বুকে হাত দিয়ে

Scanned by CamScanner

বারান্দার ধারে বসে হা হা করে বুক ফেটে কাঁদছে। হাজি বলেন—ও বাপ! তোর কী হুল? শরীল খারাপ?

হারাই ভাঙা গলায় বলে— হেই হাজিসাব! হামাকে হারাম খাওয়ালেন!

অমনি ভেতর থেকে মৌলবি বেরিয়ে এসে গর্জন করেন— অ্যাই কমবখ্‌ত! অ্যাই বে-শরা উল্লুক! তোর মুখ, না পায়খানা? ও কী বলছিস? হালালকে হারাম বলছিস? তওবা তওবা! নাউজুবিল্লাহ্!

হারাই কথা কানে নেয় না। বারান্দা থেকে নিচে নেমে রাতের আবহমন্ডল এফোঁড় ওফোঁড় করে বলে— হামাকে হামারই বেটার গোশতো খাওয়ালেন! হেই হাজিসাব! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গে! এক-পদ্মার পানিতেও ই আগুন নিভবে না গো।

বদর হাজি হাসতে হাসতে বললেন— বাঘড়ে ভূত কাঁহেকা! মৌলবি বলেন— জাহান্নামী কাঁহেকা! হাদিসে লেখা আছে— হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করে যে, তার পিঠে চল্লিশ কোড়া (কশা) মারো! বাঘড়ে গাড়োয়ানের দল লণ্ঠনের আলোয় ভাত খেতে খেতে এদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। কিছু বুঝতে পারে না। দলিজঘরের নিচে আবছা আলো-অন্ধকারে একটা লোক জবাইকরা প্রাণীর মতো ধড়ফড় করছে।...

পশ্চিম দেশ থেকে চলেছে এই পথ পুবের দেশে, সোনালি মাটির এলাকা থেকে সাদা গুঁড়ো দুধের মতো নরম মাটির এলাকায়। কালো পিচে ঢাকা এই আঁকা বাঁকা পথ। চলেছে ভাগীরথী পেরিয়ে, ভৈরব পেরিয়ে পদ্মাসীমান্তের দিকে। আজ রাতে এই পথে চারু মাস্টারের বেহালা বাজছে করুণ সুরে। চারু মাস্টারের বিটির বিভা হবে ফাগুন মাসে। দোলাই বলেছিল সেই বিভার সব কুমড়া আর কলাই দেবে। দোলাই এখন পদ্মার পাড়ে গাবগাছের তলায় মাটির ভেতরে শুয়ে আছে। তার বড়ভাই হারাই ফিরে আসছে সেই কুমড়া আর কলাই দিয়ে। নিয়ে আসছে কিছু রাঢ়ি ধান আর চারু মাস্টারের বেহালার সুর। সে দেখছে, নক্ষত্রভরা আকাশের ঈশানকোণে এক ছবি। দূরের গাঁয়ে পাটকাঠির বেড়ার ধারে লম্বা হাতে দাঁড়িয়ে আছে কলিমদ্দিদের মা। হারাইয়ের বহু। তার পায়ের কাছে মাটির বদনায় পদ্মার জল। ধনা-মনার পা ধুয়ে দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখা যায়।

Scanned by CamScanner

বাদশা

বাদশা ধানখেতে গিয়েছিল।

মাঠে তখন হলুদ হেমন্ত। আকাশের রং হট্টিটি পাখির ডিমের মতো নীলধূসর। ধানখেত থেকে সুদিনের ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে এবং চারদিকে কুয়াশায় ঘুম ঘুম আলস্যের স্বাদ। রাতের শিশির তছনছ করে দিয়েছে মাকড়সার জাল। উদাসীন লালপোকা নীলপোকারা সেখানে বসে রোদ শুষছে। আর সেই বিচ্ছুরিত রোদ, শিশির, লালপোকা, নীল পোকা ও মাকড়সার জাল দেখে মনে হয় ঝুটা রঙিন পুঁতি বসানো রাঙতার রাজমুকুট সামিয়ানার তলায় ফেলে সাজঘরে চলে গেছে রাজপুরুষেরা। শেষ রাতে হয়তো বড় বেশি ঘুম পেয়েছিল।

বর্ষা এবার বড় তুখোড় ছিল। তাই বাদশা একটা প্রচণ্ড শীতের আশা করছিল। আর কিছুদিন পরেই রাতগুলো কত লম্বা হতে পারে ভাবছিল সে। সেই সব রাতে এ মাঠের পোকামাকড় পাশ ফিরে শুলেই মৃত্যুকে কাছে পায়। ফাটলেও গর্তে সাপের গায়ের রংও ঠান্ডায় নীল হয়ে যায়। কাতর শেয়াল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তাপ যাচ্ঞা করে। সারা মাঠ ঢেকে দিয়ে সাদা থানের কফিন হতে থাকে বিস্তীর্ণতর। কুয়াশার টুপিপরা গাছগুলো মুসল্লীদের মতো মৃতের জন্যে প্রার্থনায় — 'জানাজার' নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে সার বেঁধে।

আসন্ন শীত শিশির কুয়াশা মৃত্যু ও জানাজার কথা ভাবতে গিয়ে, কিংবা হলুদ ধানের মাঠে সুফলা বছরের গন্ধে আবিষ্ট বাদশার হঠাৎ মনে হয়েছিল, তার একটা বাড়তি মেয়েমানুষ থাকা উচিত।

একটা সুফলা বছরের সামনে দাঁড়িয়ে আনুষ কত কিছু যাচ্ঞা করে। বাদশা যাচ্ঞা করেছিল একটা বাড়তে মেয়েমানুষ। নতুন চালের সুগন্ধি ভাপওঠা ভাতের মতো সুস্বাদু মেয়েমানুষ। শীতের প্রচণ্ড হিমে ভাঁড়ুলে কাঠের উজ্জ্বল আগুনের মতো মেয়েমানুষ।...

বাদশা যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন সে এক অলীক জ্বরে আচ্ছন্ন। তার দু'চোখে ভাঁড়ুলে কাঠের দু'টুকরো অঙ্গার। থমথমে লাল মুখ। শ্বাসপ্রশ্বাস গরম।

তার বউ আনমনী বলল— কী হয়েছে গো? জ্বর, না জ্বারি?

বাদশা বলল— কী হবে? খালি কী হয়েছে আর কী হয়েছে সবসময়!

তার কণ্ঠস্বর এখন রুক্ষ। উঠোনে একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরল। মুরগির পাল তাড়া করল। এটা নাড়ল, ওটা চাড়ল। গোয়াল ঘরে গিয়ে বলদ দুটোকে বেমক্কা শাসাল।

তখন আনমনী বলল— ঢং!

বাদশা বাইরে খামারে গিয়ে মুনিশ ও মাহিন্দারদের কতক্ষণ গাল দিল। গাঁয়ের কিছু লোকের উদ্দেশে চোখ রাঙাল। তারপর আবার বাড়ি ঢুকল। উঠোনে শীতের ধান শুকোবার মতো যথেষ্ট রোদ পড়বে না বলে মরা শ্বশুরকে একচোট নিল। ঘরে গিয়ে তক্তাপোশে বসে ট্রানজিস্টার চালিয়ে দিল জোরে। তাই শুনে তার পাঁচটা ক্ষুদে ছেলেমেয়ে ভিড় করে দৌড়ে এল। বাদশা গর্জে উঠল— অ্যাই শ্যালশকুনের পাল!

এবার আনমনী উঠল ফুঁসে।—কী, হয়েছে কী তুমার? সাপের পাঁচপা দেখে এসেছ, নাকি দিনে তারা দেখে এসেছ? সে হাতের কাজ ফেলে তার মরদকে দেখতে থাকল।

ছেলেমেয়েরা বাপের মেজাজ দেখে দেয়ালে সেঁটে গেছে। আনমনীর কথা গ্রাহ্যই করল না বাদশা। অমনি আঁতে ঘা লাগল আনমনীর। ধাড়ী মুরগি যেমন চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের ডানার

Scanned by CamScanner

তলায় ঢাকতে আসে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে এগিয়ে ওদের আড়াল দিল। তারপর বাদশার কাছে হঠাৎ ঝুঁকে ট্রানজিস্টারের চাবিটা বন্ধ করে দিল।

বাদশা গর্জে উঠল— অ্যাই মাগী!

—মাগী! তুমি আমাকে মাগী বুললে! স্তম্ভিত আনমনীর চোখ ফেটে জল বেরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। যা এতকাল বুলো নি, আজ মুখ দিয়ে তাই বেরুল? সে আক্ষেপে অস্থির হয়ে ভাঙা গলায় বলতে থাকল—হাজির বেটিকে মাগীছাগী বুলার সাহস তুমার হল? কোথা পেলে এ সাহস? বুলো— তুমি বুলো! কে এ সাহস দিলে তুমাকে? এক রকম বেরুলে, ফিরে এলে অন্য রকম। ক্যানে তা বুলো। ক্যানে— ক্যানে— ক্যানে...

আনমনী দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করল। বাচ্চাগুলোর মুখে কথা নেই। তারা বাবা-মায়ের এমন হুলুস্থুলু কখনও দেখেনি।

দেখেনি পাড়াপড়শি, গাঁয়ের মানুষও। বাদশা বরাবর শান্ত, নিরীহ আর অমায়িক। তার চেহারায় উদাসীন সৌন্দর্য আছে। দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, অনেক দূরে ঘোরে। মাঠের দিকে তাকালে পুরো একটা দিগন্ত ও আধখানা আকাশকে ধরে রাখার ক্ষমতা তার ঈষৎ পিঙ্গল চোখ দুটির আছে। তার এই চাউনি দেখলে মনে হবে, সে আজীবন ধানখেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে কোন এক মক্কায় পৌঁছতে চায়। একদা সন্ধ্যায় রাখাল ছেলে বাদশাকে বাঁ-কাঁধে চাঁদ নিয়ে মাঠ থেকে আসতে দেখেই পছন্দ হয়েছিল ধার্মিক মানুষ তোরাপ হাজির। একমাত্র আদরের বেটি আনমনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বাদশার বাবা ছিল খেতমজুর, মা ছিল মাঠকুড়োনি। আর বাদশা ছিল তোরাপ হাজির রাখাল। রাখাল জোয়ান হয়ে উঠলে তোরাপ আলি তাকে জামাই করে নিয়েছিল। শেষবার হজে গিয়ে বিলিতি ঘড়ি আর ট্রানজিস্টর এনে দিয়েছিল সে। মক্কার বাজারে কেনা পবিত্র তীর্থের খুশবোতে ভরা এক শিশি আতরও উপহার দিয়েছিল মেয়ে জামাইকে। চাষার সংসারে সারাক্ষণ কাজ আর কাজ। আতর মাখার ফুরসৎ কোথায়? ফুল ও পাখি আঁকা সবুজ বাকসে সেই আতরের শিশি ঘুমিয়ে আছে গাঢ় ঘুমে। বাদশা ঘোরে মাঠে-মাঠে সারাদিন। সন্ধ্যায় ফিরে এক পেট খেয়ে শুয়ে পড়ে। আনমনী উঠোনের উনুনে এক হাতে তুষে ধান সেদ্ধ করে, অন্য হাতে ভাত রাঁধে। সন্ধ্যারাতের পেঁচাটা একবার ডেকেছে কী ডাকেনি, তার চোখে ঘুমের ঢল নামে।

এবং তার মধ্যেই কীভাবে পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে তার কোলে এসে গিয়েছিল।

বাদশা এমন মানুষ, ওদের সবার নাম মনে রাখতেই পারে না। ভুল নামে ডাকে। টের পাইয়ে দিলে শান্ত হাসে। তার জানের দোস্ত হরমুজ তার বাড়িতেই মাহিন্দার হয়েছে। বছরে মোটে এক কুইন্টাল ধান তার মাইনে আর পুরো খোরপোশ। সেই হরমুজ তাকে বলেছিল, বেশি ছেলেপুলে হওয়া ভালো নয়।

—ক্যানে ভালো লয়?

—সুখ পাবা না হে!

—ক্যানে পাব না?

হরমুজ মুচকি হেসে বলেছিল— হাজির বেটিকে তো ছেলে বয়স থেকে দেখছি। কী ছিল, কী হয়েছে! মুড়ো বিরিক্ষ। শুখা বিল। খরার লদী।...

হরমুজের বলার ধরনটি এরকম। উপমা আর ছড়া ছাড়া আর কথা নেই। বাদশা বলেছিল.. তাই বটে, তাই বটে হে!

এরপর হরমুজ তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছিল — আমি যা করেছি, তাই করে ফেলো।

চমকে উঠেছিল বাদশা।—কী? কী করেছ তুমি?

Scanned by CamScanner

—'পেলানিং'।

—পেলানিং?

—হুঁ। পেলানিং।

বাদশা সন্দিগ্ধভাবে বলেছিল— অসুবিধে হয় না?

হরমুজ হেসে খুন। বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে বলেছিল— লা, লা। ... খুশির সময় তার নল হয়ে যায়। সে আবার মাথাটি জোর নেড়ে বলেছিল—কোনও অসুবিধে লাই।

চিন্তিত বাদশা বলেছিল —হাজির বেটি কী বলে দেখি। কথাটা তো ভালোই।...

আনমনীর সাংসারিক বুদ্ধি খুব পাকা। বাপের শিক্ষায় তার শিক্ষা। বড় একটা খেত-খামার চলছে তারই শলায়। বাদশা এত কিছু বোঝেই না। কিন্তু বাদশা অবাক হয়েছিল, হাজির বেটি তার কথা শুনে ধরা গলায় বলে—আমি আর পারিনে গো। আমার গতরখানা ওরা ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে! সংসার দেখব, গেরস্থালি সামলাব, না ওলাদ দেখব? বাছারা আমার গুয়েমুতে পড়ে থাকে। আর আমারও তো কত সাধ আহ্লাদ ছিল। বাপের দেওয়া শাড়িবেলাউজ বাকসোতে পোকায় কাটে। আতরের শিশি পচে ভুট হয়ে গেল। যৈবনে বুড়ি হয়ে গেলাম গো।

বাদশা আরও একটু যুগিয়ে দিল।—হরমুজ বলছিল, টাকাও পাওয়া যায়। অনেকগুলো টাকা।

—হুঁ। তুমি পেলানিং করো।

—করি। কিন্তুক বড় ডর লাগে।

—কিসের ডর?

—গোনা হবে না? শ্বশুর বুলত, ওটা গোনার কাজ।

—বাপ তা বুলত বটে। বুলত, ক্ষিদের জ্বালায় ওরা পেলানিং-এর গোনা করছে। বুঝছে না, জান যখন দিয়েছে খোদা—রুজিও তার। হুঁ, বাপ তাই বুলত।

—তাইলে?

একটু ভাবনাচিন্তার পর হঠাৎ আনমনী ফিক করে হেসে বলেছিল — ধরতে গেলে মানুষের গোনার কি কমতি আছে? পায়ে-পায়ে গোনা। অত ধরলে চলে? চলে না। আর শোন, আজকাল তোমার পাশে শুতেও বড্ড ডর লাগে। আবার যদি।

আনমনীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সুগন্ধে আবিষ্ট বাদশার মনে হয়েছিল, হায় রে হায়! এই তো সেদিন উঠন্ত বুক নিয়ে মেয়েটা তার পাশে শুতে এল, কানের পাশে সারারাত অনর্গল কথা আর কথা— মসজিদে ভোরের আজান দিল তখনও কথা— আর দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল। মুড়ো বিরিক্ষি। শুখা বিল। খরার নদী।

বর্ষায় চাষার মরারও ফুরসৎ নেই। একটা সপ্তা খরচ করতেই হবে— হরমুজ জানায়। বর্ষা গেল। ভাদ্রের মাঝামাঝি মাঠের কাজ থেকে খানিক ছুটি মিলল। তারপর বাদশা শহরের হাসপাতালে গিয়ে 'পেলানিং' করে আসে। গোপনেই রাখা হয় ব্যাপারটা। জ্বরজ্বারির ছুতো রটিয়ে কয়েকটা দিন শুয়ে থাকে বিছানায়। তারপর বাইরে বেরোয়। সাবধানে হাঁটে। অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভোগে কিছুদিন।

ওদিকে মাঠের ধান রং খেয়ে-খেয়ে ডাগর হতে থাকে। বুকে থোড় আসে। গাঢ় সবুজ রঙের সেই বিস্তীর্ণ যৌবন দেখে বাদশা নিজের যৌবনের দিকে ঘুরে তাকায়। কত ছায়া-ছায়া চুপকথা মনে ভেসে আসে। একটা গোপন স্বাধীনতা এসে তাকে ছোঁয়।

আর হাজির মেয়েও গেরস্থালির খড়কুটো ধুলোময়লা থেকে মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ায়— তার চোখে কী এক ঝিলিক খেলা করে। প্রবল আবেগ দিয়ে শরীলের সুখ লুঠে নিতে চায়।

Scanned by CamScanner

কিন্তু বাদশার তাতে খারাপ লাগে। আনমনীর শরীল সেই একই মুড়ো বিরিক্ষি, শুখা বিল, খরার নদী। যে-শরীলের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফেরা ক্লান্ত এক রাখালের মনে পড়ে যেত সবুজ দামে ঢাকা কিংবদন্তীর জলা আর পানকৌড়ির ডানার শব্দ, দলপিপির ডাক— সেই শরীলে ফাটল ভরা থকথকে পাঁক এবং ক্বচিৎ পাঁকের কোনায় কয়েকটা ম্রিয়মাণ শালুক ফুল।

আনমনী টের পাচ্ছিল, ভুল করে ফেলেছে ঝোঁকের বশে। তার জোয়ান মরদটাকে যেন সে নিজেই জোয়ালমুক্ত করে দিয়েছে। তার ছেলেপুলের বাপের চোখের সেই ভাসা-ভাসা দৃষ্টিটা এখন যেন চঞ্চল। ইতিউতি চাউনি। মেয়েমুনিষদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বাদশা অন্যমনস্ক— এবং হাজির মেয়ে ডাকলেই চমকে ওঠে।

অমন শান্ত মানুষকে কোনওদিন কড়া কথা বলতে পারেনি আনমনী। তাই ঠাট্টার ছলে বলে— কী? বদুমিয়ার মতো রাখ্‌নী (রক্ষিতা) চাই নাকি তুমার? বুলো না একবার মুখফুটে। বুলো বুলো। আমার তাতে বাধা নাই। তুমার সুখে বাধা দোব ক্যানে গো?

বাদশা শুকনো হাসে।—তাই মনে হয় নাকি তোর?

—হুঁ। হয়।

—ক্যানে?

—তুমার চাউনি দেখে। তুমার হাবভাব দেখে।... আনমনী হাসির ছলেই বলতে থাকে। তা যদি ইচ্ছে হয়, বাধা নাই আমার। কিন্তুক...

—কিন্তুক?

—তাই বুলে নিকে করে কাউকে এ হাজিবাড়ি ঢোকাবে, তা হবে না— পষ্ট কথা বুলছি। আনমনী সব সইবে, সতীন সইবে না। এ আমার মরা বাপের শিক্ষে।

বাদশাও ঠাট্টার ঢঙে বলেছিল—ধম্মত আমি চার বিবি রাখতে পারি জানিস?

—হুঁট। পারো। কিন্তুক হাজির জমির ধান খাইয়ে তাদের পুষবে ভেবো না। চার ক্যানে, ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি পোষ—গতর খাটিয়ে খোর পোষ যুগিও। এ হল আনমনীর সোজা কথা।

বাদশা অভিমান দেখিয়ে বলেছিল—খোঁটা দিচ্ছিস? তোর বাপের খাচ্ছি, তাই?

পলকে আনমনীর চোখে জল ছলছল। ঢোক গিলে মুখ নামিয়ে বলেছিল— কী কথায় কী! হাজির যা কিছু আছে, সবই তো তুমার বৈ অন্যের লয়।...

একটু পরে কথাটা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল।—সবই তুমার বেটাবেটির।...

সবুজ আশ্বিনে তাহলে একটা বিষপোকা এসে লুকিয়ে ছিল। হলুদ কার্তিকের এক সকালে সে ফর ফর করে ডানা মেলে উড়ে বেড়াল আনমনীর গেরস্থালিতে। এ পোকা আনমনী কেমন করে মারবে জানে না।

ক'দিন পরে গাঁয়ের ডাক্তার হরিপদবাবু দেখলেন, ডিসপেনসারির সামনে শিউলি গাছের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘোমটা। গায়ে লাল চাদর ঢাকা। এখনও শিউলির গন্ধ ফুরিয়ে যায়নি। তার পায়ের কাছে শিউলি কুড়োচ্ছে জামাপেন্টুল পরা একটা বাচ্চা। দেখে নিয়ে হরিপদবাবু প্রেসক্রিপশান লিখতে-লিখতে বলেন—ওটা কে রে? ওই মেয়েটা?

এক রুগি মিনমিনে গলায় বলে—তোরাপ হাজির বেটি। বাদশার বউ। হরিপদবাবু নড়ে ওঠেন। ডেকে বলেন— ওখানে কেন মা? আ ছি ছি! খবর দিলেই যেতাম! এস— এস। কী হয়েছে! তোমার নিজের, না বাচ্চার?

হাজির বেটি কয়েক পা এগিয়ে ঘোমটার ফাঁকে বলে—একটু কথা ছিল ডাক্তারবাবু। অল্প এট্টুকুন কথা। সবার ছামুতে তা বুলা যাবে না ডাক্তারবাবু।

Scanned by CamScanner

হরিপদ ডাক্তার একটু অবাক হন। হাজির বেটির কথাগুলোতে কান্নার ঝাঁঝ মেশানো। রুগি ফেলে উঠে যান কাছে। ওর বাপের সঙ্গে ভাব ছিল খুব। দুর্দিনে অনেক উপকার পেয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখেন মেয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। গাল ভেসে যাচ্ছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে— আমাকে একটু পরীক্ষে করবেন ডাক্তারবাবু? যত টাকা চান দেব আমি। খোদা আপনার ভালো করবেন। আমাকে একবার পরীক্ষে করে দেখুন ডাক্তারবাবু!

— কী হয়েছে মা? অসুখ করেছে?

জোরে মাথা নাড়ে গুণ্ঠনবতী। বলে— জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।

— কষ্ট হচ্ছে বুঝি? বুকে, না কোমরে?

হু হু করে কেঁদে ওঠে সে। — আপনার পায়ে ধরি, ঘরে লিয়ে যেয়ে পরীক্ষে করুন আমাকে!...

ঘরের ভেতর খানিকটা জায়গায় কাঠের পার্টিশান করা। লম্বা টেবিলে অয়েলক্লথ বিছানো আছে। ছেলেটা আপন মনে বাইরে শিউলিতলায় তখনও ফুল কুড়োচ্ছে। তার মা নিঃশব্দে চাপা কাঁদে এ ঘরে। হরিপদ ডাক্তার বলেন— কই, শুয়ে পড়ো তো, দেখি কী হয়েছে? তখন সে বাধ্য মেয়েটি হয়ে শোয়।

স্টেথিসকোপ কানে গুঁজতে যাচ্ছেন ডাক্তার, তখন সে বলে— আমার নাকটা পরীক্ষে করুন।

—নাকে কী হল?

হাঁফাতে-হাঁফাতে হাজির বেটি বলে— আমার নাকে নাকি গন্ধ! আমার নাকে গন্ধ বুলে হাজির জামাই পাড়াসুদ্ধু রটিয়েছে। আমি আমার বেটাবেটিদের ডেকে-ডেকে বলেছি, শুঁকে দ্যাখ্ তো বাছারা, গন্ধ পাস নাকি? তারা সক্কলে বুললে—না তো মা! তুমার নাকে আতরের বাস। ও ডাক্তারবাবু, আমার ওই ছোট খোকাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। কচি বাচ্চা, দুনিয়ার ভালো মন্দটি বোঝে না। সে বুললে— ও মা, আবার একটা নিঃশ্বেস দাও! হা কপাল! দুধের বাছার কথা শুনে তার বাবা বলে... ছি, ছি! মুখে আনা যায় না।

কপালে চটাচট্ থাপ্পড় মেরে অভিমানে হাজির বেটি আবার বলে—হা ডাক্তারবাবু! তারপর কতজনকে শুঁকিয়ে দেখলাম। কেউ বুললে না, মেয়ে, তোর নাকে গন্ধ! অথচ হাজির জামাই বুলছে, মাগী! তোর কাছে আর শুতে পারি না। তোর নাকে গন্ধ।

হরিপদ ডাক্তার হেসে ওঠেন। — পাগল, না মাথা খারাপ? কই, দেখি— দেখি। ক্ষুদে টর্চের আলো ফেলে নাকের ফুটো দুটো পরীক্ষা করেন ডাক্তার। স্বাভাবিক অবস্থা। কপাল টিপে বলেন— ব্যথা হয়? মাথা ধরে কখনও? সর্দিটর্দি হয়?

—না ডাক্তারবাবু।

—ভুরুর ওপর টনটন করে? মুখ নামালে ভার বোধ হয়?

না তো! হাজির বেটি চোখ মুছে বলে। আমার এতটুকুন বেথা নাই কোথাও।

হরিপদ ডাক্তার তার ভুরুর ওপর ঠুকে-ঠুকে পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন— নাঃ কিচ্ছু নেই।

—কিচ্ছু দেখলেন না?

—না।

আনমনী অয়েলক্লথে দুই কনুই রেখে শরীরের ওপরটা তুলে বলে— আপনি আমার মরা বাপ। ও ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে ধরি, আপনি নিজে একবার আমার নাকটা শুঁকে দেখুন।

বিব্রত ডাক্তার কাঁচুমাচু হেসে বলেন—না, না। কোনও দুর্গন্ধ নেই। আমি বলছি।

ডুকরে কেঁদে ওঠে আবার সে।—তবু দেখুন। আমি আপনার বেটি, ডাক্তারবাবু!

অগত্যা ডাক্তার তার মুখের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলেন—আতরটাতর দিয়েছ বুঝি?

Scanned by CamScanner

মুখ নামিয়ে আনমনী বলে—হুঁ। কাল রেতের বেলা একটুকুন আতর দিয়েছিলাম— লুকোবো না। আমার বাপের আতর। সেই মক্কা-মদিনার জিনিস ডাক্তারবাবু। তবু হাজির জামাই আমাকে বুললে—সরে শো মাগী! তোর নাকে গন্ধ।

—মিথ্যে বলেছে।

জলভরা চোখে কাকুতি মিনতি করে হাজির মেয়ে। — তাইলে একটা সাট্টিফিট্ লেখে দেন ডাক্তারবাবু! লেখে দেন, আনমনীর নাকে গন্ধ নাই।

—সার্টিফিকেট? কেন?

—দরকার আছে। যত টাকা লাগে, দেব। ...বলে সে আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বের করতে থাকে।...

সন্ধ্যায় হাজিবাড়ির উঠোনে মজলিস বসেছে। হাজির মেয়ের ডাকে পাড়ার মোড়ল-মুরুব্বিরা এসেছে। বাদশা বাইরে ঘুরছিল। শেষ অব্দি তাকেও আসতে হয়েছে।

বারান্দায় মেয়েদের ভিড়। কাঠের খুঁটির মাথায় একটা হ্যাজাগ জ্বলছে। হ্যাজাগটা শ্বশুর-জামাই মিলে কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। তার আলো পড়েছে উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা বাদশার হাতঘড়িতে। কানকুটোরি পোকার মতো উজ্জ্বল নীল দুটো কাঁটা চকচক করে উঠছে। বারান্দা থেকে তার দিকে আঙুল তুলে আনমনী নালিশ করে।—আপনারা শুধোন ওকে। পষ্টাপষ্টি শুধোন। কানে অ্যাদ্দিন পরে আমার নাকে গন্ধ পেল তা শুধোন!

একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ওঠে।—বাপ বাদশা!

—উঁ?

—হাজির বেটি ও কথা ক্যানে বুলছে?

—হুঁ। আমি ওর কাছে শুতে পারি না। গন্ধ লাগে।

বাঁকা হেসে মোড়ল বলে— গন্ধ কি হঠাৎ পেলে বাপ বাদশা? এতকাল পাওনি?

—পেয়েছি। বরাবর পেয়েছি।

মজলিশ নড়ে ওঠে। বারান্দায় সাড়া পড়ে যায়। আনমনী নিষ্পলক চোখে তাকায়।

—বরাবর পেয়েছো? তাইলে অ্যাদ্দিন বুলোনি ক্যানে বাপ?

—বুলিনি হাজির মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাকে সে মানুষ করে ছিল। কষ্ট পাবে—তাই বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিতে চাইনি।

আনমনী বাঘিনীর গলায় গর্জায়।—মিথ্যে। মিথ্যে। মিথ্যে। তারপর হরিপদ ডাক্তার সার্টিফিকেট ছুঁড়ে দেয় মোড়লের দিকে।—হরি ডাক্তার সাট্টিফিট দিয়েছে। পড়নদারকে দিয়ে পড়িয়ে শুনুন আপনারা। ওই লোকটাও শুনুক।

বাদশা বলে ওঠে—টাকা দিলে পঞ্চাশখানা সাট্টিফিট পাওয়া যায়। আমার নিজের নাক।

মোড়ল সার্টিফিকেট মুঠোয় ধরে বলে—তাইলে কী তুমার কথা, সেটাই শুনি।

বাদশা মুখ নামিয়ে বলে—হাজির নুন খেয়েছিলাম। নুন শোধ দিয়েছি।

মাথা দোলায় মোড়ল—তা বুললে তো চলে না বাছা। কেমন করে শোধ দিলে, বুঝিয়ে দাও।

—কেমন করে?

—হুঁ। কেমন করে!

বাদশা একটু ভেবে নিয়ে বলে—হাজি চেয়েছিল, তার বেটি যেন পিতাপুরুষের ভিটে আগলায়। আর চেয়েছিল, তার ভুঁইখেত যেন ভিনগাঁয়ের কেউ ভোগ না করে। কেমন কি না?

—হুঁ হুঁ।

Scanned by CamScanner

—আমি হাজির বেটিকে ছেলেপুলে দিয়েছি। ভিটেয় রানি হয়ে বসে আছে। নুন শোধ হয়নি আমার?

মজলিশ হেসে ফেলে। কেউ কেউ বলে— ইটা ঠিক কথা বটে। মোড়ল তাদের থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে— বেশ। নুন শোধ করেছে। তা'পরে?

তা'পরে? ... বাদশা একটু ইতস্তত করে ফের বলে—তা পরে...

তার দোস্ত হরমুজ গতিক দেখে মুখ খোলে।—বাবা সকল! বাদশার কথা হল—সে নিকে করবে। যারই ভুঁইখেত আছে, সেই করে। বাদশাও করবে তাতে দোষ কী?

আনমনী হরমুজের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। এবার ফুঁসে ওঠে।—ওরে নেমকহারাম! ওরে শয়তানের ছা! দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম রে। তুই তবে ওর মুন্সী হয়েছিস! ধিক্ তোকে!

আবার সাড়া পড়ে যায়। মোড়ল চড়া গলায় ধমক দিয়ে চুপ করায় সবাইকে। তখন সবাই চুপ চুপ বলে চ্যাঁচায় কিছুক্ষণ। তারপর স্তব্ধতা আসে, সেই স্তব্ধতার ওপর হ্যাজাগের শোঁ শোঁ শব্দের আড়ালে হাজির মেয়ের চাপা কান্না শোনা যায়। ওড়াউড়ি করে পোকার ঝাঁক। তারপর বাড়ির কুকুরটা ডেকে ওঠে। মোড়ল বলে— তাড়াও, তাড়াও!

কুকুরটা বাদশার প্রিয়। তাকে চুপ করিয়ে পায়ের ফাঁকে চেপে রাখে সে। কুকুরটার লেজে জোনাকি। তাই ছটফট করতে থাকে। তখন বাদশা তাকে ছেড়ে দেয়। কুকুরটা মুখ ঘুরিয়ে জোনাকিটা খপ্ করে গিলে ফেলতেই স্তব্ধতা ফিরে আসে।

মোড়ল একটু কেসে গলা সাফ করে নিয়ে বলে— তাইলে মা আনমনী?

—উঁ?

—বাদশা নিকে করতে চায়। শুনলে তো?

আনমনী হঠাৎ ক্লান্ত যেন। ভাঙা গলায় আস্তে বলে— করুক। কিন্তু এ বাড়ি সতীন ঢোকেনি কোনও পুরুষে। ঢুকবে না।

—বাদশা! শুনলে তো বাপ?

—হুঁ, শুনলাম।

—তাইলে?

তার বন্ধু হরমুজ ওত পেতে আছে। সে বলে ওঠে— এ গেরস্থালিতে এতকাল খেটেছে বাদশা। তার কি কিছুই নাই? বিচার যদি করতে হয়, লেয্য বিচার করুন আপনারা। হাজির ভুঁইখেতে তো এমনি-এমনি ধান ফলেনি। বাদশা নিকে করে কি গাছতলায় যাবে?

বাদশার সমর্থকরা তাকে সায় দেয়।—খুব খাঁটি কথা। লেয্য কথা।

অগত্য মোড়ল বলে— তাই তো! বড় সমিস্যে।

আনমনী উঠে দাঁড়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলে, হুঁ। বুঝলাম। কিন্তুক, নিকে করারই যদি সাধ ছিল ওর, তাইলে আমার নাকে গন্ধ আছে বলে বদনাম দিলে ক্যানে? ক্যানে বুললে না আমাকে—শওকতের মা, আমি নিকে করব?

ধূর্ত হরমুজের চোখ শেয়ালের নীল চোখের মতো চকচক করে। সে বলে—তাইলে তুমি রাজি হতে?

চিলচিৎকার করে ওঠে আনমনী।—ক্যানে হব না রাজি, ওরে গোডহরের শকুন? আমি হাজির বেটি আনমনী রে, পাপিষ্ঠি বিলবাঁওরের ভূত! এখন বুঝতে পারছি রে, কার ফুঁসে পড়ে পেলানিং করতে ছুটেছিল! ওরে মুন্সীমশায় রে।

তারপর সে খুঁটি জড়িয়ে ধরে মাথা ঠোকে। তাকে টানাটানি করে মেয়েরা। ফুলে-ফুলে কাঁদে। — তাই যদি মোনে ছিলে, ক্যানে আমাকে বদনাম দিলে? ক্যানে বুললে আমার নাকে গন্ধ? উঃ মা গো!...

Scanned by CamScanner

বাদশার দল কোলাহল করে বলে—কান্নাকাটি পরে হবে। ফায়সালাটা হয়ে যাক্।

পলকে আনমনী ঘুরে দাঁড়ায়। তার কপাল কেটে রক্তের ক্ষীণ ধারা। তার চুল আলুথালু। তার শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে। লাল ব্লাউসের বোতামঘর বাচ্চার দৌরাত্ম্যে খোলা আছে। তাই তার বিশাল জননীস্তন হ্যাজাগের কচি কলাপাতা রঙের আলোয় ঝলমল করতে থাকে। সে চেরা গলায় বলে— না। এ বাড়ি সতীন ঢুকবে না। আগে আমাকে তালাক দিক। তাপরে যত খুশি নিকে করুক।

বাদশা ঝোঁকের মাথায় কী বলতে যাচ্ছিল, সমর্থকরা তাকে থামিয়ে দেয়।

গম্ভীর স্বরে মোড়ল বলে— বাবাসকল! তোরাপ হাজি বেঁচে নাই। আর তারই বাড়ির মধ্যে বসে তার বাড়িরই কেলেঙ্কারির ঝড় বইছে। তবে কথা কী, হাজি নাই— কিন্তু আমরা আছি। তার মেয়ের বেইজ্জতি হলে কারবালার লোহু বইবে। এ আমার পষ্ট কথা।

এই হুমকিতে স্তব্ধতা আসে আবার। সেই স্তব্ধতা চিরে চাপা কান্নার ক্ষীণ শব্দ। শিশিরে হিমে ভারি হয়ে ওঠা রাতটা কাঁধে নিয়ে কারা যেন গোরস্থানের দিকে চলেছে।...

সুফলা বছরের এমন দিনে তোরাপ হাজির খেতে-খামারে তার আদরের জামাই বাদশা নেই। আনমনী কোমরে আঁচল বেঁধে মুনিষদের তদারক করে বেড়ায়। বড় ঘরের মেয়ে সে। জীবনে মাঠেঘাটে রাস্তায় নামেনি। কিন্তু এখন সে বেপরোয়। শীতের যে রোদ মুনিষদের কাছে অঢেল আরাম, অনভ্যাসে তা সইতে পারে না হাজির মেয়ে। বাপের মক্কা থেকে আনা ফোল্ডিং বিলিতি ছাতির আড়ালে সে রোদ ও ঈষৎ সংকোচ থেকে নিজেকে বাঁচায়।

তার ছেলেমেয়েরা হঠাৎ-হঠাৎ প্রশ্ন করে—বাপ কই মা?

আনমনী বলে—জাহান্নামে।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওদের বলে—তোর মায়ের নাকে গন্ধ বুলে তোর বাপ পালিয়েছে। ওরা তাই শুনে মায়ের কাছে এসে চুপিচুপি প্রশ্ন করে—ও মা, তুমার নাকে গন্ধ, তাই বাপ পালিয়ে যেয়েছে?

আনমনী রাক্ষসীর মতো তেড়ে যায়। তারপর রাতে ঘুমঘুম বড় ছেলেকে চিমটি কেটে বলে—অ্যাই! শোন একটা কথা। মিঠাই খাওয়াব, শোন। শুঁকে দেখ্ তো বাছা, গন্ধ পাস নাকি?

—ও মা, রোজ খালি শুঁকতে ভালো লাগে না!

—বাছা আমার! মানিক আমার!

কোলেরটা আধোআধো বলে— ও মা! আমাকে এট্টা হামি দ্যাও!

তাকে বুকে জড়িয়ে চোখে জল নিয়ে হাজির মেয়ে বলে— তুই আমার আপন রে। আমার রক্তের গোটা। ওরা বাপ চিনেছে। চিনুক না। তুই থাকলেই আমার বুক ভরে।...

শুধু হরমুজ জানে, বাদশা কোথায় আছে। হরমুজ তা গোপন রেখেছে। তাকে হাজিবাড়ির মাহিন্দারি ছাড়তে হয়েছে অসময়ে। রাগে দুঃখে পস্তানিতে ছটফট করে। ভাবে, আনমনীর কাছে কেঁদেকেটে মাফ চেয়ে নেবে। বাদশার খবরটাও দেবে। কিন্তু আনমনীর আজকাল যা মূর্তি!

বাদশা আছে শহরে।

রিকশোওলা গোলামের মেয়ে আয়নাকে নিকে করেছে। আয়না গাঁয়ে যেত চাল কিনতে। সাইকেল চালাতে পটু সে। রডে এক-দেড় মন চালের বস্তা চাপিয়ে কর্ডন পেরিয়ে শহরে ফিরত। কতবার বাদশার বাড়ি থেকে চাল নিয়ে গেছে সে। আনমনীর সামনে বাদশা নিজের হাতে আয়নাকে চাল মেপে দিয়েছে।

একবার বাদশা শহরে সিনেমা দেখে ফেরার সময় হঠাৎ আয়নাকে দেখতে পেয়েছিল। আয়না খাতির করে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি মানে খোলার ছোট্ট ঘর। বলেছিল— তুমি ভাই রাজাবাদশা মানুষ। এ হচ্ছে গরিবের কুঁড়েঘর।

Scanned by CamScanner

বাদশা বলে—তবু শহর জায়গা তো! এই খুব ভালো।

—ভালো! চালওয়ালি যুবতী চোখে ঝিলিক তুলেছিল। তোমার মতো অত টাকা-পয়সা সম্পত্তি তো নেই। তবু তোমার কাছে ভালো?

—হুঁ খুব ভালো। শহরে সুখ আছে। গাঁয়ে তো শুধু বাদাড়।

—ও মা! বাদাড় বলছ কেন? দেখছ না, তোমাদের গাঁয়ে না গেলে আমার মুখে ভাত জোটে না?

বাদশা লাজুক যুবক। মুখ ঘুরিয়ে বলে—তা তুমি যদি খামোকা কষ্ট করো। মেয়েমানুষ হয়ে কষ্ট করাটা ঠিক লয়।

—কী ঠিক, শুনি?

—ক্যানে? বিভাহ (বাদশা মাঝে মাঝে শুদ্ধ কথা বলতে চায়) করলেই পারো।

আয়না খিলখিল করে হাসে।—বিয়ের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই ভাই। আর বোলো না। একা আছি—এই আমার সুখ।

সেদিন বাদশার মনের তলায় লোভ গরগর করে ওঠেনি, এমন নয়। কিন্তু এই শহুরে মেয়ের কাছে তার ভীরুতাটা খালি বেড়ে যাচ্ছিল। সোজা চোখের দিকে তাকাতেও পারে না কোনওবার। আয়না তাকে চা বিস্কুট খাইয়েছিল। গঙ্গার ব্রিজ অবদি এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাসে চাপার সময় বাদশার হঠাৎ মনে হয়েছিল, শহুরে মেয়েরা কি ভালো হয়? সাইকেলে চড়া চোরাচালানি মেয়ে আয়না। কোথাও একটা অবিশ্বাস কুটকুট করে।

তবু মাঝে মাঝে শহরে গেলে আয়নার বাসায় সাহস করে গেছে সে। দেখা পায়নি। আয়না গেছে চাল কিনতে কোন গাঁয়েগেরামে। তার বাপ গোলাম রিকশো চালাচ্ছে রাস্তায়।

এবার মাঠের কাজ শেষ করে বাদশা শহরে এসেছিল কাপড় কিনতে। কী ভেবে আয়নার বাসার দিকে চলতে থাকে সে। অনেকদিন আয়না চাল কিনতে যায়নি। সেই অছিলায় দেখা করা যাবে।

কিন্তু কোথায় আয়না? খোলার ঘরটাতে অন্য লোক বাস করছে। এক বুড়ি বলে— আয়না? গোলামের মেয়ে? ওরা তো বাস স্ট্যান্ডের ওখানে কোথায় যেন আছে শুনেছি।

বাসস্ট্যান্ডের আনাচেকানাচে ঘুরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বাদশা দেখল, বটগাছের তলায় কয়েকটা ছোট্ট ছেঁড়া তেরপলের ছাউনি—গোরুর গাড়ির টাপরের মতো। আর আয়না সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার?

বাদশা বলে—খবর ভালো?

—কেমন ভাল, চোখেই দেখছ ভাই। আয়না তাই বলে হাসতে ভোলে না। সে বলে—কর্ডনের নতুন লোক এল। দরে পোষাল না। সাইকেলখানা কেড়ে নিলে। পুঁজিসুদ্ধু গেল। তারপর বাপটাও গেল দুম করে মরে। তখন কী করব? এ বাড়ি ও বাড়ি ঝিগিরি করে খাচ্ছি।

—বড় দুঃখের কথা। ....বাদশা জিভে চুকচুক শব্দ করে মাথা দোলায়।

—ও বাদশাভাই, কটা টাকা দাও না, বড্ড দরকার।

—টাকা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ টাকা। অত টাকার মালিক হয়েও টাকা চেনো না?

বাদশা কাঁপা কাঁপা হাতে তিনটে টাকা তিনবার করে গুণে তাকে দেয়। আনমনী হিসেবি মেয়ে। পাইপয়সা গুনে বুঝে নেবে।

আর তখনই যেন বাদশার মনে হয়েছিল—সে একটা কলুর বলদ। ধিক বাদশা, তোকে ধিক।

সেদিন বটতলায় দাঁড়িয়ে বাদশারই পয়সায় দুজনে চা খেয়েছিল। তারপর হাত বাড়িয়ে আয়না বলেছিল—কই, এবার মুখশুদ্ধি করি। সিগারেট দাও।

অবাক বাদশা তাকে দলাপাকানো বাকি সিগারেটটা দিয়েছিল।

—ও কী! আর নেই? কি হাড়কেপ্পন মানুষ তুমি ভাই।

Scanned by CamScanner

আয়না সিগারেট খায়, সে জানত না। তাকে সিগারেট টানতে দেখে খারাপ লাগছিল। আর এইরকম গাছতলা, তেরপলের খুপড়ি, চারপাশে কত রকম ভালো-মন্দ লোক।

বাদশা একটু পরে যখন বাসে চাপছে, আয়না বলেছিল— টাউনে এলেই দেখা করে যেও। কেমন?...

হরমুজ আয়নাকে চিনত। কতবার মেয়েটা হাজিবাড়ি চাল কিনতে গেছে। বাদশা জানের দোস্ত হরমুজের সঙ্গে আয়নাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করেছে। আয়নার বাস স্ট্যান্ডে থাকার কথাও না বলে পারেনি।

হরমুজ বলেছিল— মেয়েটাকে লিয়ে এস।

—তা কি আসে? শহুরে মেয়ে।... বাদশা বলেছিল। তাছাড়া হাজির বেটি গলায় কোপ মেরে বসবে, জানো না?

হরমুজ বলেছিল—হুঁ। সমিস্যে।

কিন্তু সেই সমিস্যে এমন করে মেটাতে হবে, বাদশাও ভাবতেও পারেনি। ভাঁড়ুলে কাঠের উজ্জ্বল আগুনের মতো কিংবা নতুন চালের ভাপ-ওঠা অঘ্রানের সুস্বাদু ভাতের মতো সুগন্ধি মেয়েমানুষের কথা ভাবতে ভাবতে এবং খুঁজতে খুঁজতে সে যাকে দেখেছিল, তার নাম আয়না।

গাঁ থেকে রাতারাতি চলে আসার সময় কিছু টাকা এনেছিল বাদশা। টাকাগুলো আনমনীর। ফাল্গুন মাসে জমি বেঁচে দেয় গরিবগুরবো চাষা। আনমনী সারা বছর ধরে তাই বাড়তি কিছু টাকা জমিয়ে রাখে। মাস কলাই ভর্তি হাঁড়ির মধ্যে লুকোনো সেই টাকার কথা জানত শুধু বাদশা। এ বছর আর আনমনীর জমি কেনা হল না।

আনমনীর খুব মাটির খিদে। বাদশার রক্তে বুঝি মাটির স্বাদ অচেনা। আয়নার কাছে এসে বাদশার মনে হয়েছিল, খামোকা মাটি মাটি করে তার চমৎকার একটা বয়সই মাটি করে ফেলেছে সে। এই শহরে কত উজ্জ্বলতা। মুহুর্মুহু তার চোখে ছটা লেগেছে। তারপর সয়েছে। সে শুদ্ধ কথা কইতেও শিখেছে। কিনেছে নীল রঙের পাতলুন, ঘাসফড়িংয়ের খসখসে সবুজ ডানার মতো শার্ট আর খয়েরি চপ্পল। স্নো মাখতে তার আনন্দ। টেরিকটনের ফুলছাপ শাড়ি পরিয়ে আয়নাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে দেখতে তার যৌবন ফিরে এসেছে।

আর আয়নার ফ্যাকাসে পাতাঢাকা ঘাসের মতো গায়ের রং আবার চেকনাই হয়েছে। তার ভ্রূকুটি করা হাসিতে বাদশা দেখে বাবলতলীর মাঠের আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের প্রথম বিদ্যুৎ।

তাহের মোক্তার তোরাপ হাজির মামলা লড়তেন। বাদশা মোক্তার সায়েবকে সব কবুল করেছিল। তাহের বলেছিলেন— বেশ করেছ। ধর্মত কাজ করেছ বাবা বাদশা। হাজিসায়েবের মেয়ের রাগ পড়ে যাবে দেখবে। তখন বরং বউকে গাঁয়ে নিয়ে যাবে।

তাহের সাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাতে তাঁরও কিছু পয়সা হয়েছে। মোটামুটি সস্তা ভাড়ায় একটা বাসাও দেখে দিয়েছিলেন মুসলিম মহল্লায়। শ্বশুরের সম্পত্তি কোনও ফিকিরে জামাই কায়দা করতে পারে, তাও বাৎলেছিলেন। বাদশার সাহস ও আশা বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু শীতের শেষে টাকাকড়ি ফুরিয়ে আসে। বাদশা ভাবনায় পড়ে যায়।

আর আয়না ভেবেছিল, তাকে গাঁয়ে নিয়ে যাবে বাদশা। গাঁয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে যে সুখী গেরস্থালি দেখে এসেছে, তাই নিয়ে তার স্বপ্ন। কারণ, আয়নাও ছেলেবেলায় গাঁয়ে কাটিয়েছে। তার জন্ম পাড়াগাঁয়ে। তার বাপ গোলাম পেটের জ্বালায় মেয়েকে নিয়ে শহরে রিকশো টানতে এসেছিল।

আর মাঝে মাঝে বেভুলে অন্যমনস্ক বাদশা খেতখামার, পুকুর, গাছপালার গল্প করে। এবার বর্ষায় পুকুরে প্রচুর পোনা ছেড়েছিল। এখন আধ কিলো করে ওজন হয়েছে। বাগানে আমগাছগুলোতে মুকুল দেখা দিয়েছে বুঝি। নারকোল গাছে ইয়া বড় নারকোল ফলে— কলসির মতো পেকান্ড। আড়াই 'রিঞ্চি' পুরু তার শাঁস।

—হ্যাঁ গো, তোমরা নারকোল নাড়ু করো না?

Scanned by CamScanner

—হুঁ।

—পুকুরের মাছগুলো কিসে ধরো?

—ক্যানে? জালে।

—তুমি জাল ফেলতে পারো?

—হুঁ! কী বলে শোন দিকিন! বাদশা হেসে খুন। আমি নিজেই তো জাল বুনতে পারি।

—আমাকে জালবোনা শেখাবে? আমি জাল ফেলে মাছ ধরব।

—হুঁউ। ...একটু করে বেভুলে বাদশা আবার বলে— দশ কাঠা ভুঁইয়ে আখ আছে। পেকাণ্ড আখ। গুড়ের সময় হয়ে এল। চত্তির মাসে গাঁওলারা কল আনবে রূপমারি থেকে। সেই বিন্দেহাটি-রূপমারি। নতুন গুড়ের কী গন্ধ! ...অন্ধকারে নাক তুলে শোঁকে বাদশা। আবিষ্ট হয়ে বলে— আঃ! ফাস্টোকেলাস!

আয়না বলে—তা তোমাদের গাঁয়ে সব ভালো। কিন্তু বড্ড অন্ধকার। শোন, একবার মাঝপথে গেল সাইকেলের টিউব ফেঁসে। তোমাদের গাঁয়ে ঢুকলাম। কী অন্ধকার, কী অন্ধকার! কেউ নেই। ... আয়না হাসে।

উত্তেজনায় বাদশা বলে—তাপরে? তাপরে?

—সামনে যে-বাড়ি পেলাম, ঢুকে গেলাম।

—হুঁ হুঁ। হরমুজের বাড়ি।

—সন্ধ্যেবেলাতেই সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ডেকে ওঠালাম। তারপর...

বাদশা ফুঁসে ওঠে!—শালা হরমুজ বলেনি আমাকে। শালা!

—শুতে তো পেলাম। সারা রাত মুতের দুর্গন্ধ। ছ্যা ছ্যা! একগ্গাদা বাচ্চা। খালি কাঁদে।

—ও শালার বউটা বড্ড ইবলিস। ... বাদশা ফের আস্তে বলে— ক্যানে? আমার বাড়ি যাওনি ক্যানে?

আয়না তার চুল খামচে ধরে হাসে। —অন্ধকারে না চিনলে কেমন করে যাব?

—আর থাকবে না আঁধার। ইলেকটিরি আসবে। বাদশা ঘোষণা করে। বাবুপাড়ায় শুনেছিলাম, লাইন আসছে।

—এই! আমার জন্যে আলাদা বাড়ি করবে কিন্তু। ইটের বাড়ি।

—হুঁ।

—একটা ফ্যান নেবে।

—হুঁ।...

শীত ফুরিয়ে গেল। গঙ্গার ধারে সরকারি অরণ্যে বসন্ত এল। গুলমোহরে রাধাচূড়ায় ফুল ফুটল। শ্মশানের শিমূল লাল চোখে জেগে উঠল দীর্ঘ ঘুম থেকে। কৃষ্ণচূড়া সাজতে বসল।

এখন বাবলতলীর মাঠে গোরু বাছুরের খুরে ধুলো ওড়ে। রোদে ঝিকিমিকি ছটা দেয় মরা শামুকের সোনালি খোল। ঘুটিঙে ডাঙার অশথ গাছে বেগুনী রঙের কচি পাতা কাঁপে। উদাসীন হেঁটে যায় মাঠকুড়োনি মেয়েটা। বিলের ধারে নাবাল ভুঁইয়ে চৈতালির সবুজ রং হলুদ হয়ে এল। ট্যাসকোনা পাখির নীলচে রেশমি পালক কুড়িয়ে চুলে গোঁজে কোনও একলা রাখাল।

আর হলুদ সর্ষেফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আবিষ্ট প্রাচীন চাষাপুরুষ ডাক দেয়— হেই-ই-ই বাদশা—আ—আ! বাদশা হে— এ— এ— এ!

গভীর ঘুমের মধ্যে বাদশা সাড়া দেয়— যেছি হে— এ— এ— এ!

আনমনী মাঠে গেছে। গাঁয়ে আখের কল বসেছে। নতুন ফুটন্ত গুড়ের গন্ধ মউমউ করে। আখ কাটা হচ্ছে। হাজিবাড়ির খামারে গমের বিচালিতে লুটোপুটি খেলছে আনমনীর বেটা-বেটিরা। বাদশার কুকুর হঠাৎ ডেকে ওঠে। তারপর দৌড়ে যায়।

Scanned by CamScanner

ছেলেমেয়েগুলো তক্ষুনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছে। নীল পাতলুন, ঘাসফড়িংবর্ণ জামা গায়ে একটা ঝকমকে মানুষকে দেখে তাদের কত কী মনে পড়ে যায়।

তারপর কোলাহল ওঠে। বাপ এসেছে! বাপ এসেছে! বাপ এসেছে!

বাদশা হাসে। পাঁচটা পিঠাপিঠি বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরলে তখন তার চোখ ছলছল করে। ভাঙা গলায় বলে— তোদের মা কই সোনামানিকরা?

—মা আখের ভুঁইয়ে। এক্ষুনি ডেকে আনি। ... বলে সবার বড়ো যে, সে দৌড়ে যায়।

মুনিষ-মাহিন্দার এসে ভিড় করে। পাড়ার লোকেরাও এসে যায়। সেই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাদশা খালি হাসে। শুধু হাসে। ভিড় বলে — ঘরের মানুষ ঘরেও যাও বাছা! বাদশা সাহস করে ঘরে যায়।

বাড়িভরা আতরে গন্ধ। বাদশা বলে— আতরের গন্ধ ক্যানে?

উঠোনের উনুনে ধান সেদ্ধ করছিল আনমনীর পাড়া সম্পর্কে দাদি ঝুরনবুড়ি। ফ্যাক ফ্যাক করে সে হেসে বলে— হাজির বেটি আতরওলার কাছে আতর কিনে ফতুর হল ভাই বাদশা! ই কী বিষম নেশা দেখ! তাকভর্তি খালি আতরের শিশি। এত করে বুঝিয়েও বোঝে না।

বাদশা আস্তে বলে— ক্যানে?

—ক্যানে? ঘোলাটে চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে ওঠে ঝুরনবুড়ির। মানুষ হও তো বুঝে দেখ। এখন এসে বুলছ—ক্যানে? মেয়েটাকে ক্ষেপি করে দিয়েছ জানো না? গতর কালিবন্ন, হাড় কখানা সার। তাই লিয়ে ভুঁই খেত করে ঘুরছে। কখন শুনব...

বুড়ি কথা শেষ করতে পারে না। মুখ ঘুরিয়ে তোবড়ানো গালে তুষের আগুনে ফুঁ দিতে থাকে।

একটু পরে বড় ছেলে শওকত ফিরে এসে বলে—মা এল না।

—কী বললে? ...বলেই বাদশা আগের গলায় ফের বলে—কী বুললে?

—কিছু বুললে না।

বাদশা সিগারেট ধরায়। একবার ঘর দেখে, একবার উঠোন। একবার আকাশ দেখে, একবার দেখে সিগারেটের নীল ধোঁয়া।

ঝুরনবুড়ি আবার হাসে।—তা ভাই বাদশা!

—উঁ?

—নোতুনীকে কোথা রেখে এলে?

—জাহান্নামে।

—ও কী কথা ভাই বাদশা?

—হুঁ, ওই কথা।

বুড়ি তুষ ছড়ায় উনুনে আর আপন মনে বলে— তুমার লোতুনীকে (নতুন বউ) তো আমরা দেখেছি। না দেখা লয়। দেখতে-শুনতে তো ভালোই ছিল। তবে কি না বাজারি মেয়ে। দোষের মধ্যে এই। তা ভাই, হাজির বেটির মোনে দয়াধম্ম আছে। খালি বুলে, তাই যদি মোনে ছিল, ক্যানে বুললে না আমাকে? আমি লিজে বিহা দিয়ে দিতাম। ক্যানে বুললে আমার নাকে গন্ধ?

বাদশা আধপোড়া সিগারেট চপ্পলের তলায় চেপে নিবিয়ে দেয়।

ফের ঝুরনবুড়ি বলে—সঙ্গে আনলে ভালোই করতে। বুঝিয়ে-বাঝিয়ে ভিড়িয়ে দিতাম আমরা। হাজির বেটির মোনে দয়াধম্ম আছে।

বাদশা এবার শুকনো হাসে।—শালীকে তালাক দিয়ে এলাম।

—অ্যাঁ? ক্যানে? ওমা, সে কী কথা।

—শালীর বড় খাঁকতি। ওই বাজারি মেয়ের খাঁকতি আমি মেটাতে পারি? এটা চাই, ওটা চাই। হেন চাই, তেন চাই!...

Scanned by CamScanner

বাদশা বেরুল।

মাঠে আখের খেতে আনমনী দাঁড়িয়ে আছে দেখল, তার মাথায় রঙিন ছাতি।

বাদশাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছে আখকাটা মুনিশেরা। আনমনী ঘুরেছে।

বাদশা যত কাছে যায়, আনমনী আখের খেত থেকে তত দূরে চলে যেতে থাকে।

বাদশা একটু থমকে দাঁড়ায়। তারপর জোরে হাঁটতে থাকে। কেটে নেওয়া ধানের মুড়োয় তার চপ্পল আটকে যায়। তখন চপ্পল দুটো খুলে হাতে নেয়।

মাঠ জুড়ে চৈতালি আর আখের খেতে লোকেরা কাজ ফেলে ব্যাপার দেখতে থাকে।

হাজির বেটি চলেছে আর চলেছে।

বাদশা দৌড়ে তার নাগাল পায় না।

ঘুটিঙে ডাঙা, সিঙাকুড়ির মাঠ, ছোট টিঙা বড় টিঙা দুই যমজ পুকুর ছাড়িয়ে হিজলতলা পেরিয়ে বাঘনখা গাছটার কাছে গিয়ে বাদশা মেঠো গলায় গর্জন করে— আনমনী।

আনমনী একবার ঘোরে। আবার হাঁটতে থাকে। তার গায়ের ওপর দিয়ে জোরালো ঘূর্ণি হাওয়া চলে যায়। তার শাড়ি অগোছাল হয়ে পড়ে। শীর্ণ হলুদ দুই জাং উন্মোচিত হয়। তার সুদৃশ্য ছাতিটা উড়ে যায়। বাদশা ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিলচিৎকার করে হাজির মেয়ে বলে—মা!

নির্জন এই দূরের মাঠে আনমনীকে দু হাতে তুলে নিয়ে বাদশা ফের গর্জন করে—চুপ!

আনমনী ছটফট করে গাঙ ফড়িঙের মতো।—আমার নাকে গন্ধ! আমার নাকে গন্ধ! সে হু হু করে কাঁদে আর চেলা গলায় আকাশকে শুনিয়ে বলে—আমার নাকে গন্ধ!

—তোর নাকে আতরের বাস। বলে বাদশা হা হা করে হাসে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সে তার নাক চুষতে থাকে।

ধীরে অবশ হয়ে হাজির মেয়ে বলে— ছাতাটা উড়ে গেছে!

তাকে নামিয়ে দিয়ে বাদশা দৌড়ে ছাতি কুড়িয়ে আনে। তারপর দুটিতে নাড়াখড়ের ওপর পা ফেলে গাঁয়ের দিকে হাঁটতে থাকে। প্রজাপতির মতো রঙিন ছাতিটা নাচে।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে আনমনী আস্তে বলে— ওকে এনেছ?

জোরে ঘাড় নাড়ে বাদশা।—না!

আনমনী রুগ্ণ মুখে হাসে।—ক্যানে আনলে না?

বাদশা গলার ভিতর থেকে বলে—পোষাল না। বড় খাঁকতি মাগীর। হেন চাই তেন চাই...

—চাইবে না ক্যানে? সবাই চায়। ...বলে আনমনী বাচ্চামেয়ের মতো ভঙ্গী করে হাসে। ফের বলে—তবে আমি যা পেয়েছি, আমার সতীন তা পেত না!

—কী পেয়েছিস আনমনী?

—বেটাবেটি।

—হুঁ। ... বাদশা মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে— একদিন হঠাৎ দেখি, ওর পেটে দাগ। কিছুতেই বুলবে না, কিছুতেই না। শেষে কবুল করলে। পেটের জ্বালায় অপোরেশান করেছিল। অনেক টাকা পেয়েছিল।

—হা পোড়াকপালি!

বাদশা বাঁকা মুখে বলে— পেটের জ্বালায়, নাকি কিসের জ্বালায়! আনমনী বলে— ছিঃ! বড় ঘরের জামাই তুমি। মুখ খারাপ করতে নাই।...

সেবার খরার দুপুরে গাঁয়ে এসেছে চাল-চালানিরা। এক ঝাঁক সাইকেল। রডে বস্তা বাঁধা। হাজির বাড়ির দরজায় হাঁক শোনা যায়— কই গো! চাল-টাল দেবে নাকি?

আনমনী ডেকে বলে— ভেতরে এস বাছা। চাল দেব।

Scanned by CamScanner

তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আয়না সাইকেলটা দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে উঠোনে আসে।—আগে এক গেলাস ঠান্ডা পানি দাও বোন। গলা বুক জ্বালা করছে।

আনমনী নিজের হাতে কাঁসার গেলাসে জল আনে। বলে— বসো বহিন, বসো। কতকাল আসোনি তুমি! ... ফের সে চোখে চাপা ঝিলিক তুলে বলে— কোথা ছিলে অ্যাদ্দিন, শুনি?

—আসব কী! কর্ডনের মিনসেরা সাইকেল কেড়ে নিয়েছিল। অনেক কষ্টে অ্যাদ্দিনে ছাড়িয়ে আনলাম। কী করব? পেটে তো দুটি খেতে হবে, পরনেও একখানা শাড়ি চাই।

ঢক ঢক করে জল খায় মেয়েটা। নাকের ডগায় ঘাম, চিবুকে ঘাম, কপালে ঘাম। বাকি জলে মুখ ধোয়। কোমর থেকে রুমাল বের করে মোছে। আনমনী তাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

—কী দেখছ ভাই? আয়না হাসে। কই, চাল বের করো। ...

চাল ওজন করে দেয় আনমনী নিজের হাতে। বস্তায় ভরে নেয় আয়না। কী নির্বিকার ওই মুখ! দুহাতে অনেকটা চাল ফাউ দিতে গেলে, এটাই আশ্চর্য, আয়না ভুরু কুঁচকে বলে— ভিক্ষে নিই নে বোন।

—ভিক্ষে না। ফাউ।

টাকা মিটিয়ে আয়না গম্ভীর মুখে বলে— আজকাল ফাউয়ের চলন নেই। তারপর বস্তার মুখে দড়ি বাঁধতে থাকে। তিরিশ কিলো চাল অবহেলায় তুলে নিয়ে যায়। রডে চাপায়। দড়ি দিয়ে কষে বাঁধে।

আনমনী কাছে গিয়ে বলে—এই রোদে যাবা? একটু জিরিয়ে নেবে না বহিন?

আয়না কেমন হাসে!—না ভাই। সে-কপাল তো করে আসিনি!

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে সে বেরিয়ে গেলে আনমনী ফিরে আসে। বারান্দায় উঠে একটুখানি আনমনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে ঢোকে। বাদশা দুপুরের ঘুম দিচ্ছে। এ তার নতুন অভ্যাস। আনমনী তাকে গুঁতো মেরে ফিসফিস করে বলে— জানো, কে এসেছিল?

বাদশা চোখে বুজে থেকে শুধু বলে—জানি।...

Scanned by CamScanner

- ট্রেনের বিলম্ব কমাতে জার্মান রেলের জোর উদ্যোগ
- জার্মানিকে 'ইইউ'-চ্যুত করার প্রস্তাব দিল এএফডি
- কবিতার জন্য আবার হেনস্থার শিকার কবি
- জাতীয় বিতর্কের আহ্বান জানালেন মাক্রোঁ

from: dw.com

আলোচনা - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিখ্যাত গল্প " গোঘ্ন"

২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ বিকাল ৫:২৬
এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে : Tweet Like 27 Share

অলোক গোস্বামী -ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কোনটা বেশি উৎসাহ দিত, ইমেজ, চরিত্র, নাকি থিম?একটা চরিত্রকে নিয়ে শুধু গল্প হয় না ।আখেরে থিমটাই ত ইটসেলফ একটা গল্প লিখতে প্রেরণা দিল ?

সিরাজ – দুটোই হয়, দুটোই আমার জীবনে ঘটেছে।হয়ত বোধ, ছেলেবেলায় দেখা বিশেষ কোন চরিত্র আমাকে হন্ট করে এসেছে সারাজীবন।কোন মুহূর্তে লিখবার সময় হঠাৎ,এই যে 'রানীঘাটের বৃত্তান্ত' … ওখানে ঐ যে ফালতু নামের চরিত্র, বাবার পরিচয় নেই,পাগলীর ছেলে,ঐ চরিত্রটা আমি দেখেছিলাম।আবার থিম ও এসেছে। …..
জ্যোৎস্নারাতে প্রায়ই বের হতাম। বাশি বাজান অভ্যাস ছিল,দেখেছিলাম একটা লোক গরুর গাড়ির একটা জোয়াল নিজের বুকের কাছে নিয়েছে, এবং পেছনে একটা গরু।সে আপন মনে কথা বলতে বলতে আসছে গরুটার সসঙ্গে।এটা আমার মনে ছাপ ফেলে দিয়েছিল।মনে হয়েছিল গরুটা রুগ্ন এবং সে মুর্শিদাবাদের

উত্তর বাগড়ী অঞ্চলের লোক।

অলোক – হ্যা, সেটা বলেছেন।

সিরাজ – এই দৃশ্য আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল।মাঝে মাঝে মনে পড়ত, একটা লোক ভারবাহী জন্তুর মত যাচ্ছে। গরুর প্রতি কি ভালবাসা!অসুস্থ গরু ....
এইটা মনে চাপা ছিল।পরে একসময় বের হয়ে আসে দুইটা জিনিস-
একটা চরিত্র ও একটা থিম।
(এভাবেই একদিন তার বিখ্যাত গল্প গোঘ্ন বের হয়ে আসে।)

মাইকে সিরাজের দানাদার গলা শুনলে মনে হবে কোন কথকঠাকুর কথকতা করছেন । ওর গল্পেও এই কথকতা থাকে। কথা বলতে বলতে ও সড়াৎ করে গভীরে নেমে যায়। নাইলে গোঘ্ন লেখে কি করে ?
– **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়**

"চারু মাস্টারের বেহালা শুনে দোলাই বড় কেঁদেছিল। দোলাই ছিল নরম মনের ছেলে।বলেছিল আপনার যন্তরে কী জানি কী যাদু আছে, কলজে টাটায়।হেই মাস্টারবাবু, আপনার বিটির বিভায় যত কুমড়া লাগবে, হামি দিবো। যত কলাই লাগবে, হামি দিবো।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিখ্যাত গল্প "গোঘ্ন"এভাবেই শুরু হয়।দোলাই মাস্টারের বিটির বিভায় যত কুমড়া লাগে দেবে বলেছিল।যত কলাই লাগে দেবে বলেছিল। কিন্তু তার আগেই গাবতলার গোরে ঘুমিয়ে গেল দোলাই। হারাই তাই ভাইয়ের কথা রাখতে রাঢ় অঞ্চলে এসেছে।

ভাত খেতে খেতে হারাই বলে,খাছি মা খুব খাছি।বড় মিঠা আপনারঘে রাঢ দেশের ভাত।চারু মাস্টারের মেয়ে হাসে।ও চাচা!তোমাদের দেশের ভাত বুঝি তেতো? হারাই হাসে। – দানাগুলান মোটা,বিটিরে!হামারঘে দ্যাশে রাঢ়ি চালের ভাত খায় শুধু আমির-বড়লোকে। মাস্টারের মেয়ে ত অবাক।তোমরা কি খাও, চাচা?

মোটা মাসকলাই, আটার লাহারি, ছাতু, ভুজা, গেঁহু উঠলে আম-কাঁঠালের সঙ্গে গেঁহুর আটার চাপড়ি। আউষের ভাত মাত্র মাসে কয়েকদিন।- হারাই বলে। তাদের রাঢ়ি অঞ্চলের চাল নিতে বছরে একবার আসে – তাও বলে।

কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এরপর আমাদের জানাতে থাকেন ভাগীরথী-ভৈরবী – পদ্মার পলিতে ভরাট নরম মাটির সমতল দেশে এ মিঠে ধান বড়ই অমূল্য ,সারা বাঘড়ি অঞ্চলে যার নাম শাহদানা,শ্রেষ্ঠ দানা বা শস্য।রাঢ়ে শাহদানার মউসুম এলে তাই বাঘড়ি অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। সোনার রাঢ়ের দিকে দলে দলে ছুটে ভুগা মুসাফির।

হারাই মুসাফির নয়।মাঙতে আসে না রাঢ়মুল্লুকে। গরুর গাড়িতে নিয়ে আসা খন্দ,ফলমূল সবজির বদলে শাহদানা নিয়ে যায়। কোথাও সংলাপ, কোথাও পরিবেশের পাশে মিশিয়ে চরিত্রের প্রয়োজনীয় স্কেচটুকু দক্ষ হাতে একে যান, বলা ভাল বলে যান সিরাজ। তার নির্মিত জগতে কখন যে ঢুকে পড়ে পাঠক,টের পাওয়া যায় না।দক্ষ কথক সিরাজ এভাবেই তার গল্পের কেন্দ্রবিন্দুপথে পাঠককে নিয়ে যাবার জন্য তার প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

তারপরের দৃশ্যে চলে আসে ধনা,গল্পের প্রেক্ষণবিন্দু কিছুক্ষণ পর যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও নিঃশেষ হবে।ধনা অসুস্থ।চোখের কোনায় কালি।কালো ধারা আকা।হাড়ের সার রাতারাতি ঠেলে উঠেছে।চারু মাস্টার বলে-পরিমল বদ্যিকে ডেকে নিয়ে আয়।ছ্যারানি হয়েছে গরুটার।

হারাই হাসে।এতটুকুন বদমাইসিও আছে মাস্টারবাবু।তবে পা ফেললে থামানো যায় না।একদম পঙ্খিরাজ ঘোড়া!চারু মাস্টারকে অবাক করে দিয়ে ধনা দাড়ায়। হারাই হাসে।বলে দেখলেন?।দেখলাম-মাস্টার বলে।তবে পিরিমলকে দেখিয়ে নিয়ে যাস।হারাই কথা রাখে।তারপর চলতে চলতে সন্ধ্যা।হারাই কাঁপে, কারণ সামনে ভয়ের রাত হাঁ করে আছে।রাতচরা বাঘড়ে গাড়োয়ানের ভুত ও জীনের কথা মনে হয়।গাছের ডালে আত্মহত্যাকারীরা মানুষ, শেয়াল, বেড়াল বা পাখির রুপ ধরে সামনে আসে।রাহাজানির ভয় ও আছে । দল বেধে তাই যাতায়াত করতে হয়।হেতেরপাতি রাখতে হয়।গরু বলবান হওয়া চাই।গাড়োয়ান সাহসী হওয়া চাই।কিন্তু এখন ত মউসুম নয়।হারাই কেবল ভাইয়ের কথা রাখতে এসেছে।

রাত হয়।পিরিমল বদ্যি বলেছিল মেদীপুর বাজারে রাত জিরোতে ।দু ক্রোশ মাত্র দূর।কিন্তু ধনা অসহায়। মুখ বেয়ে ওষুধ গড়িয়ে পরে।ধনাকে সরিয়ে নিজেই জোয়াল তুলে নেয় হারাই।ধনাকে গাড়ির পেছনে বেঁধে চলতে শুরু করে।হঠাৎ হারাইয়ের সামনে অন্ধকার ফুঁড়ে উপস্থিত হয় এক আগন্তুক,নাম দিলজান। পেশায় কসাই।দিলজান ধনাকে লক্ষ্য করে বলে এ গরু রাত পোহাবে না।তার চেয়ে আমাকে দেন।হালাল করি।হারাই বুকফাটা চিৎকার করে উঠে।দিলজান দাম চড়ায়।কিন্তু হারাই তার সমস্ততা নিয়ে " না"।

তারপর?হারাই গঞ্জেল আরশ পড়তে পড়তে মেদীপুর চটির কাছাকাছি চলে আসে।ততক্ষণে ধনা প্রায় নির্জীব,হাটতেও পারছে না।মন্ত্রপড়া জল খাইয়ে হারাই শেষ রাত নাগাদ গরু ভাল হয়ে যাবার আশায় থাকে।শেষ রাতে হারাইয়ের পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করে।চিড়ে গুড় খেয়ে হারাই যখন তন্দ্রামত অবস্থায়,তখন ভোরে আজানের শব্দ শুনতে পায়।ধনার দিকে তাকাতেই তার কলজে চিরিক করে ওঠে।গোরুটা দু পায়ের উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে।অল্প অল্প নড়ছে চোয়াল।

এরপরই গল্প সবচেয়ে সংবেদনশীল,মর্মস্পর্শী কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়ে হারাই বলে ওঠে- "হামার বেটার জান মাঙি হুজুর। আর কিছু মাঙি না সংসারে। ...হেই পরোয়ার দিগার ! হামরা মাগ-মরদে বাঁজা লই তুমার মেহেরবানিতে। তুমি এক ব্যাটার জানের বদলে হামারঘে আরেক ব্যাটার হায়াত দাও!
ব্যাটা মরবে,ব্যাটা জন্মাবে। কিন্তু গোরু মলে কোথায় পাবে হারাই।একটা গরুর দাম জোগাতে অর্ধেক জমি বেচতে হবে।খোদা কি এটা বোঝেন না ?
একটা গরুর অভাবে তার গাড়োয়ানী বন্ধ হবে।চাষবাস বন্ধ হবে।খন্দ ফলমূল ফিরি করতে আসা হবে না রাঢ়ে ।না খেয়ে মারা পড়বে হারাইয়ের বহু বেটা বিটিরা।'মুসাফির'দের মত তাদের ও যে ভিগ মাগতে যেতে হবে রাঢ়ে।ঠিক এমনি করে একটা গরুর অভাবে বাঘড়ির কত মানুষ মুসাফির ভিখিরি হয়ে গেছে।তাই ভেবে হারাই কাঁদে।নমাজে বসে থাকে অনেকক্ষণ।খোদাতালাকে ইনিয়ে বিনিয়ে সব কথা বোঝাতে চায়।"

এই জায়গায় এসে গল্প গল্পকে ছাড়িয়ে যায়, হয়ে ওঠে আখ্যান, গল্প শুধুমাত্র হারাইয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না,হারাই ধরা দেয় ভারতবর্ষের প্রান্তিক কৃষককুলের প্রতিনিধি হয়ে, যাদের অস্তিত্বই গরুর উপর নির্ভরশীল,গরু তাই সন্তানের চেয়েও বেশি। সন্তান মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়,আত্মজ হেতু আত্মিক নৈকট্য ও বেশি,কিন্তু এই গল্পে গরু দুইক্ষেত্রেই মানুষকে প্রতিস্থাপিত করেছে, ছাপিয়ে গেছে। সামান্য কটা বাক্যে ভালবাসার তীব্র ব্যাকুলতা, প্রয়োজনীয়তা,চূড়ান্ত অসহায়তা,অস্তিত্ব সংকটের অশনি সংকেত,হৃদয়ের অকপট সরলতাসমেত হাহাকারে উদ্ভাসিত,যা পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়।

গল্পটির তাৎপর্য এখানেই শেষ হতে পারত,এরপর স্বাভাবিক নিয়মে এগোতে পারত সমাপ্তিবিন্দুর দিকে, কিন্তু ব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার সময়, তার জনপদের মানস চিত্র আঁকা সিরাজের স্বভাব , তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গল্প তাই নতুন বাক নেয়, নিতে হয়, নিয়ে আবার ফিরে আসবে হারাইয়ের কাছে, ফলে আমরা বুঝতে পারব ধনা আসলেই হারাইয়ের পুত্রসন্তান,কিংবা তার চেয়ে বেশি,তার ভালবাসা নিখাদ,গল্পকারের আরোপিত নয়, অবশ্য প্রথমেই তা বোঝা গেছে, যদিও- তা হৃদয় দিয়ে , যুক্তিতে নয়।কিন্তু এখন তার আচরণ আমাদের কাছে সব স্পষ্ট করে দেবে, এবং তার তীব্র ও অনিঃশেষ ভালবাসার নির্যাসে পাঠক হৃদয় তুমুলভাবে আলোড়িত হবে, যার রেশ গল্প শেষ করেও থেকে যাবে, অনেকদিন,যে কোন মহৎ গল্প পাঠের মতই।

গল্পে ফিরে আসি।।পরের সকালে মুমূর্ষু ধনাকে কিনে নেয় সেই দিলজান।তারপর জোয়াল কাধে পথ চলতে শুরু করে হারাই।পথে বদর হাজি নামের এক শরীফ ব্যক্তির সাথে দেখা। হাজি বদর জোঁয়াল কাঁধে বলদের মত চলতে কাউকে কখনো দেখেন নি।তার দয়া হয়। তিনি হারাইকে কারো গাড়ির সঙ্গে তার গাড়ি বেঁধে নেয়ার পরামর্শ দেন।তার ঘরে আনেন। স্বভাবসুলভ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করেন।নিজেই হারাইয়ের পাতে মাংস তুলে দেন। আর গরুর মাংস কিভাবে পেলেন বলতে থাকেন।বললেন – দিলজান হালাল করেছে। তখন টুকরোটা হারাই কেবল মুখে পুরেছিল,আচমকা নড়ে ওঠে থুথু করে ফেলে দেয়। বমি করে। বুক ফাটা কান্নায় বলে ওঠে – হেই হাজিসাব!হামাকে হারাম খাওয়ালেন! হামাকে হামার বেটার গোস্ত খাওয়ালেন!

তারপর?

গল্প ফিরে যায় পেছনে।দোলাই চারু মাস্টারের মেয়ের বিভার সব কুমড়া-কলাই দিতে চেয়েছিল।সে এখন পদ্মার পাড়ে ঘুমিয়ে।কুমড়ো আর কলাই দিয়ে হারাই ফিরে আসছে।নিয়ে আসছে ধান,চারু মাস্টারের বেহালার সুর।বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বউ।মাটির বদনায় পদ্মার জল।এ জল ধনা মনার পা ছুঁয়ে দেবে।

গল্পকে এখানে শেষ হতে হয়, কারণ গল্পের নাম গোঘ্ন।গো হত্যাকারী। বৈদিক ভারতে এই শব্দের অর্থ ছিল অতিথি। এবং অতিথিকে গরু দিয়ে আপ্যায়িত করতে হত।আশ্চর্যের সাথে খেয়াল করতে হয় গল্পে গোঘ্ন শব্দের দুটা রুপই আছে।বদর হাজি হারাইকে গরু দিয়ে আপ্যায়িত করে। ধনাকে দিলজানের হাতে দিয়ে হারাই ত গোঘ্নই,যদিও পরিস্থিতির চাপে,তবু হারাই নিজেকে গোঘ্ন ভাবে,ভাবে বলেই মনের সব দুঃখ বদর হাজির কাছে খুলে বলতে ইচ্ছে হয়,ধনাকে বেচার কথা লুকোয়, গরুটা রাস্তায় মারা গেছে বলে।এবং ভাতের পাতে ধনার কথা জানার পর তার মানসিক যন্ত্রণা ভেতর থেকে উপচে পরে,জবাই করা প্রাণির মত ধরফড়ায়, আমরা জানি এক পদ্মার পানিতেও এ আগুন নিভবে না গো। ফলে মানবতার অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনিতে সিক্ত হয় পাঠকহৃদয়,সঞ্চারিত হয় অপার বেদনাবোধ, -তাতে মিশমিশ ব্যক্তি।সময়।সমাজ।ইতিহাস।

রাঢ়বাংলা ও রাঢ়ের মানুষের জীবন সিরাজের গল্পের মূল চারণভূমি।তাদেরকে উপস্থাপিত করতে তিনি এনেছেন লোকজ মিথ,মানুষের চিরায়ত বিশ্বাস,আচার,প্রেম,ভালবাসা,প্রকৃতি ও জীবন সংগ্রাম।গোঘ্ন গল্পেও তার ব্যত্যয় হয়নি,অন্তজ মানুষের কঠোর কঠিন নির্মম জীবন,ও পোষাপ্রাণির প্রতি কৃষকের জীবন নির্ভরতার এক অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য চিত্র তিনি শব্দের তুলিতে এঁকেছেন। তাতেও থেমে থাকেননি,মানুষ ও সভ্যতার ইতিহাস ভালভাবে জানা আছে বলেই তিনি অবলীলায় বলে যেতে পারেন, –
”দুনিয়ার অনেক মানুষ ও তোদের মত অবলা জানোয়ার বইকি। ঠাউর করে দেখবি, তাদেরঘে ওপিঠে ওজনদার ছালা চাপানো আছে, ধনা!তাদের কেও ছালা বহিতে হয়, বাপ।হু ঠাউর করে দ্যাখ।হাসিস না । তাদেরঘে ভি কষ্ট। ঘাড়ে কাল দাগ পড়ে।গোস্ত দরকচা পড়ে যায়। শাঁস ফেলতে হাঁপানি, পা ফেলতে জ্যাংয়ে বেথা,পিছের ভার টেনে হাঁটে। তাদেরঘে ভি মুনিব আছে।ঠাউর করে দ্যাখ।”

ইতিহাসের অনাদিকাল হতে চলা জীবন সংগ্রামের যে বিন্দুটায় মানুষ ও জন্তু একাকার হয়ে যায় – হারাই ও ধনা তার প্রতীক,এর বিস্তার পুরো দুনিয়ায়, এ গল্প তাই পুরো বিশ্বের শোষিত শ্রেণীর গল্প , সমকালীন এবং শোষণ থাকা সাপেক্ষে চিরকালীন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রয়েছে জাদুকরি গদ্যভাষা।তার হাতে পড়ে শব্দ অলৌকিকতা পায়,গদ্যশরীর থেকে বের হয় সোদামাটির গন্ধ।
প্রমিত গদ্যের ভেতর তিনি অনায়াসে মিশিয়ে দেন পটভূমিজাত উপভাষার নির্যাস।’গোঘ্ন’ গল্পেও তার এই শৈল্পিক দক্ষতা হীরের মত উজ্জ্বল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পের ভাণ্ডারে সার্থক শিল্পশস্যের অভাব নেই।বাংলা সাহিত্য তার বিস্ময়কর অপার দানে সমৃদ্ধ। ‘গোঘ্ন’ তার শ্রেষ্ঠ শিল্পের একটি। এই শিল্পসুধা পানে পাঠক নিজেকে সমৃদ্ধ করবেন এই কামনা।